মাওলানা ইউনুস পালনপুরী

মুক্তার চেয়ে দামি

৪



মুক্তার চেয়ে দামী

(৭ম ও ৮ম খণ্ড)

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

মুক্তার চেয়ে দামী-৪

(৭ম ও ৮ম খণ্ড)

মূল
মাওলানা ইউনুস পালনপুরী
ইবনে মাওলানা উমর পালনপুরী রহ.
যিম্মাদার, মুম্বাই মারকায, ভারত

ভাষান্তর
আরিফ বিল্লাহ

আকিক পাবলিকেশন্স ! এদারায়ে কুরআন
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮৯৮৫২, ০১৭২৪ ৬০৪১৩৬

তৃতীয় প্রকাশ : জানুয়ারি ২০২০ ঈ.

মুক্তার চেয়ে দামী-৪
(৭ম ও ৮ম খণ্ড)

স্বত্ব : প্রকাশক

প্রকাশক : জসিম উদ্দিন
আকিক পাবলিকেশন্স
১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৩৩২১৪, ০১৭২৪ ৬০৪১৩৬
E-mail : akikpublication@gmail.com

পরিবেশক
কথাপ্রকাশ, ৩৭/১ বাংলাবাজার, পি. কে. রায় রোড, ঢাকা-১১০০
ফোন : ৯৫৮১৯৪২, ০১৭০৬৮৯৩২১০, ০১৭১৪৬৬৬৯৪৬

কলকাতা শাখা
কথাপ্রকাশ, বিদ্যাসাগর টাওয়ার, দোকান নং এ-১৪ (গ্রাউন্ড ফ্লোর)
১৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ফোন : ০৩৩২২৪১০৪০০ (+৯১৩৩২২৪১০৪০০)

মুদ্রণ : সুবর্ণ প্রিন্টার্স, ৩/ক-খ পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৫৭৩৯৭০৮১, ০১৭২৬৪৬২৫৩৩

প্রচ্ছদ : হাশেম আলী

মূল্য : ৪০০/= (চারশত টাকা মাত্র)

ISBN– 978–984–93076–0–0

উৎসর্গ–

মাওলানা উমর পালনপুরী রহ.—
যিনি দীনের জন্য জীবন উৎসর্গ করে গেছেন।
আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন।

প্রকাশকের কথা



সকল প্রশংসা সেই মহান আল্লাহর যিনি দিয়েছেন বাকশক্তি ও কলম দ্বারা মনের ভাব প্রকাশের যোগ্যতা। দরূদ ও সালাম পেশ করছি সেই মহান রাসূলের সমীপে যিনি ছিলেন আরবের শ্রেষ্ঠ বিশুদ্ধভাষী এবং যাঁকে দান করা হয়েছে সর্বমর্মী বচন।

আলহামদুলিল্লাহ! ইসলামী সৃজনশীল প্রকাশনার জগতে **"আকিক পাবলিকেশন্স"** একটি অনন্য নাম। ইসলামের দাওয়াত ও বাণী বাংলা ভাষাভাষী মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানটি ইসলামী বই-পুস্তক, ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত গল্প-উপন্যাস ও গ্রন্থজীবনী প্রকাশ করে আসছে। এরই ধারাবাহিকতায় মাওলানা ইউনুস পালনপুরীর ইসলামী জ্ঞানের অফুরন্ত ভাণ্ডার "বিখরে মোতী" কিতাবের অনুবাদ গ্রন্থ **"মুক্তার চেয়ে দামী"** গ্রন্থটির ৭ম ও ৮ম খণ্ড একত্রে প্রকাশ হতে যাচ্ছে। লেখক কুরআন-হাদীস, নবী-সাহাবী এবং বুযুর্গানেদীনের অমূল্যবাণী ও তাঁদের নন্দিত জীবনের বিভিন্ন ঘটনার মণি-মুক্তা দ্বারা গ্রন্থটিকে সুসজ্জিত করে তুলেছেন। ইসলামী মননশীল পাঠকদের জন্য এতে রয়েছে শিক্ষণীয় অনেক উপাদান। যা আহরণ করে ইহকাল ও পরকালের জীবন সফল ও স্বার্থক করার রয়েছে সুবর্ণ সুযোগ। ইতোপূর্বে লেখকের ১ম থেকে ৬ষ্ঠ খণ্ড পাঠক মহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। আশা করি এই খণ্ডটিও পাঠক মহলকে উপকৃত করবে।

পরিশেষে দয়াময় আল্লাহর কাছে মিনতি জানাই, তিনি যেন গ্রন্থটিকে কবুল করেন এবং লেখক, প্রকাশক ও একাজে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেন এবং পরকালে নাজাতের ফায়সালা করেন। আমীন ॥ —**প্রকাশক**

সূচি

সপ্তম-খণ্ড

মাওলানা উমর পালনপূরী রহ.-এর সংবর্ধনা----২৫
অন্ধদের জন্য বিশেষ ফযীলত----২৫
যেসকল কারণে প্রকৃতি অশান্ত হবে----২৬
মাতৃভক্তির বিস্ময়কর ঘটনা----২৭
মায়ের অবাধ্যতা কিয়ামতের আলামত----২৮
মুহূর্তের ভুলের জন্য সারাজীবনের কান্না----২৮
একটি শিক্ষণীয় আলাপচারিতা----৩০
মায়ের সেবার বদৌলতে কবীরা গুনাহ মাফ----৩০
সন্তানদের সম্পর্কে অভিযোগ----৩১
নিষ্পাপ শিশুর করুণ ঘটনা----৩২
শিক্ষণীয় কার্যবিবরণ----৩৪
ফারাযদাকের পিতা চুরানব্বইটি শিশুকে বাঁচিয়েছিলেন----৩৫
হযরত আলী ও ফাতেমা রা.-এর মাঝে খুনসুটি----৩৭
হযরত ইয়াকুব আ.-এর বিস্ময়কর আকাঙ্ক্ষা----৩৭
মহান মায়ের দীক্ষায় বদলে গেল ভাগ্য----৩৮
উপযুক্ত আত্মীয়তার সন্ধানে----৪০
জীবনসঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি----৪১
রাসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশনা----৪২
একটু ভাবুন, মৃত্যুর আগে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিন----৪৪
কুরআনুল কারীমের আদব ও সম্মান----৪৪
টাকায় বই কেনা যায়; বিদ্যা পাওয়া যায় না----৪৭
দীনদার গরীব আল্লাহর আপনজন----৪৭
বন্ধুকে উর্দূতে কেনো দোস্ত বলা হয়?----৪৭
হযরত হাসান বসরী রহ.-এর জীবনী পড়ুন----৪৮
ইরানের তিন রাজকন্যা পছন্দ করলেন মদীনার তিন দীনদার যুবককে----৫৮

হযরত সুমামা ইবনে ওয়াসিলা রা.-এর ঘটনা ৭০
গোপনে ঋণ পরিশোধকারী দু'টি বিশেষ নেয়ামত পাবে ৭৫
মুসলমান প্রথাপালনে আগ্রহী ও সুন্নতে অনাগ্রহী ৭৬
ব্রাশ দ্বারা মিসওয়াকের সাওয়াব হয় না ৭৮
মিসওয়াক করার সময় এ নিয়ত করুন ৭৯
মিসওয়াক করার সুন্নাত পদ্ধতি ৭৯
মিসওয়াক কতোটা লম্বা হবে? ৮০
মিসওয়াক দাঁড় করিয়ে রাখার ফযীলত ৮০
মিসওয়াক করার সময় লক্ষ্যণীয় বিষয় ৮০
অন্যের মিসওয়াক ব্যবহার করা মাকরূহ ৮১
দীনদারদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা যাবে না ৮১
নফসের ক্ষুদ্র ধোঁকা থেকেও বাঁচুন ৮১
প্রতিপক্ষের কল্যাণকামী হোন ৮২
হাকিম তিরমিযীর বিস্ময়কর স্বপ্ন ৮৩
ঘরে প্রবেশের সময় 'সূরা ইখলাস' পড়লে রিযিকে বরকত হয় ৮৫
আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ.-এর ইন্তেকাল ৮৫
আল্লাহর নিকটবর্তী করে এমন কাজই উত্তম ৮৬
রব তো সবার একজনই ৮৭
কুকুরের দশটি বৈশিষ্ট্য ৮৮
গুনাহ করার চারটি কারণ ৮৯
জুনাইদ বাগদাদী রহ. স্বেচ্ছায় হেরে গেলেন ৯১
তোমাকে নিজের বান্দা মনে করে ক্ষমা করে দিলাম ৯২
স্বপ্নে ক্ষেতে লবণাক্ত পানি দেখা ও তার ব্যাখ্যা ৯৩
উকবা ইবনে আমির রা.-কে রাসূল সা.-এর উপদেশ ৯৩
'আল্লাহর রঙে রঙিন হও' এ কথার উদ্দেশ্য কী ? ৯৪
একশ'টি ছড়ানো মুক্তা ৯৫
প্রশ্ন : ইস্তিগফার আগে পড়বো না দরূদ শরীফ? ৯৫
প্রশ্ন : ইসমে আযম কী? ৯৬
হৃদয়ও হাড়ির মতো ৯৬
ওলী, গুনাহগার এবং শয়তান ৯৬
সত্যকে আড়াল করো না ৯৭
ইখলাস কাকে বলে? ৯৭
এক বুযুর্গের সুপারিশ নামা ৯৮
মসজিদে প্রবেশকালে এ দোয়া পড়ুন ১০৫
রাসূল সা.-এর ভালোবাসার বিস্ময়কর ঘটনা ১০৫

রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় রাসূল সা.-এর আগ্রহ ১০৬
নেয়ামতের উভয় দিকই লক্ষ্য করবে ১০৭
দীনি কাজের দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করা অন্যায় ১০৮
আমরা সুন্নাত ছেড়ে দেই অবহেলা করে ১০৮
হারও মিলল; হারওয়ালীকেও পাওয়া গেল ১০৯
মতভিন্নতা ঐক্য নষ্ট করে দেয় ১১১
মানুষ প্রশংসা করলে নীরব থাকবো ১১১
একত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ ১১২
অমীয় বাণী ১১৬
যে তিনটি বিষয় মুক্তি দান করে ১১৮
যে তিনটি বিষয় ধ্বংস বয়ে আনে ১১৮
যে তিনটি বিষয় মর্যাদা বৃদ্ধি করে ১১৮
খাবার খাওয়ানোর দ্বারা ১১৮
তাহাজ্জুদ নামাযের দ্বারা ১১৯
তিনটি বিষয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে ১১৯
হযরত জিবরাঈল আ.-এর উপদেশ ১১৯
ছয় লক্ষ সিটের উড়োজাহাজ ১২৩
দাওয়াতি কাজ ফরয, ওয়াজিব না সুন্নাত? ১২৩
জান্নাতের প্লেনে স্বর্ণের চেয়ার থাকবে ১২৪
শেকড় থেকে দু'টি নহর বের হবে ১২৫
কালিমাটি পড়ে ছয়টি ফযীলত লাভ করুন ১২৬
রাসূল সা.-এর পারিবারিক জীবন ১২৭
এক সহজ সরল জীবন ১২৮
স্ত্রীগণের সঙ্গে সদাচরণ ১২৮
রাসূল সা. আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কে বললেন ১৩০
সন্তানদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা ১৩১
খাদেম ও সেবকদের সাথে আচরণ ১৩৪
রাসূল সা.-এর অভ্যাস ১৩৫
নবীগৃহের দুনিয়াবিমুখ পরিবেশ ১৩৬
হযরত উমর রা.-এর লিখিত ফাতাওয়া ১৩৯
নওমুসলিম মহিলার বিস্ময়কর কাহিনী ১৪০
স্বপ্নের আদব ১৪৪
স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করা ১৪৫
স্বপ্ন উপস্থাপন করা ১৪৫
স্বপ্ন পছন্দ করা ১৪৬

ফজরের পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানা ১৪৬
ফজরের পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া ১৪৬
প্রথম ব্যাখ্যাই ধর্তব্য ১৪৭
স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় কী পড়বে? ১৪৭
মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের একটি অংশ ১৪৭
সুস্বপ্ন মুমিনের জন্য সুসংবাদ ১৪৮
ভাল স্বপ্ন দেখলে কী করবে? ১৪৯
শয়তানের স্বপ্ন ১৫০
খারাপ স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না ১৫১
খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী করবে? ১৫১
স্বপ্নের দরুন অসুস্থ ১৫১
ভোরের স্বপ্ন খুব বেশী সত্য হয় ১৫৩
সত্যবাদীর স্বপ্ন সত্য হয় ১৫৩
স্বপ্ন কার কাছে বলবে? ১৫৩
স্বপ্ন নিজের ভালো বন্ধুকে বলবে ১৫৪
স্বপ্ন বলার আদব ১৫৪
ব্যাখ্যা প্রতিফলিত হয় ১৫৫
স্বপ্ন ব্যাখ্যার মূলনীতি ১৫৫

নবীজী সা. প্রদত্ত কিছু স্বপ্নের ব্যাখ্যা

চাঁদের ব্যাখ্যা ১৫৫
দুধ পান করার ব্যাখ্যা ১৫৫
ফুঁ মেরে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাখ্যা ১৫৬
মধু ও ঘি-এর ব্যাখ্যা ১৫৬
মাথা কাটার ব্যাখ্যা ১৫৭
স্বপ্ন যেন বাস্তব ১৫৭
সাদা পোশাকের ব্যাখ্যা ১৫৭
অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাখ্যা ১৫৮
কয়েকটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা ১৫৮
রাসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখার কথা ১৫৯
সম্মতি লাভের কিছু উপকারীতা ও ব্যাখ্যা ১৬১
স্বপ্নে রাসূল সা.-এর দীদার লাভের পন্থা ১৬২
রানী যুবাইদার ক্ষমাপ্রাপ্তি ১৬৩
এক কামারের ঘটনা ১৬৪
স্বপ্নে আযান দেওয়া সম্মানেরও; লাঞ্ছনাকরও ১৬৪
মসজিদের আদব ১৬৫

হাদীস ও রাসূল সা.-এর সুউচ্চ মর্যাদা ১৭১
হাদীসের নববী সা.-এর আদব ১৭৩
হাদীসের মজলিশে পালনীয় কিছু আদব ১৭৫
হাদীসের আদব সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা ১৭৫
সাতটি বিস্ময়কর প্রশ্ন ও তার উত্তর ১৭৭
রাত ছোট হওয়ায় ফাতেমা রা.-এর কান্না ১৭৯
স্বামী যখন ব্যবসার কাজে যাবে ১৭৯
প্রথম যুগের নারীরা রুটি বানানোর সময়ই ১৮০
সে যুগের নারীরা শিশুদেরকে দুধ পান করানো সময়ই ১৮০
হিরা তুমি খুঁজবে, মূল্য আমি নির্ধারণ করবো ১৮১
আলেম তিন প্রকার ১৮৩
বদ আমলের কারণে বিশৃঙ্খলা ছড়ায় ১৮৩
গ্রামে নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ১৮৫
সর্বদা বৃদ্ধ পিতা-মাতার খেয়াল রাখবে ১৮৬
মা, মেয়ে, স্ত্রী ও বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা ১৮৯
নারীর আসল শিক্ষালয় তার শ্বশুরবাড়ি ১৯১
আর্থিক স্বচ্ছলতার নাম উন্নতি নয় ১৯৪
কন্যা সন্তান আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত ১৯৭
সন্তানের ব্যাপারে মা'য়ের দোয়া কবুল হয় ২০০
অনর্থক কথাবার্তা থেকে বাঁচুন ২০২
নিজের সংশোধন নিজেই করবো ২০৪
নবী কারীম সা.-এর ছায়া দেখা যেত কি? ২০৬
যৌতুকের অভিশাপ থেকে বাঁচুন ২০৭
ইসলামের দণ্ডবিধি মানবসমাজের জন্য রহমত ২০৯
তোমার কোলে লালিত হয় জাতির ভাগ্য ২১২
কুরাইশী নারী ২১৫
অহংকারের পরিচয় ও তার পরিণতি ২১৮
আবু হুরায়রা রা.-এর মায়ের নাম কী ছিলো? ২১৮
স্বেচ্ছাচারিতা ধ্বংসের কারণ ২১৯
ইসলামের সর্বপ্রথম আমীর কে? ২১৯
যিনি সাঁতরে তাওয়াফ করেছিলেন ২১৯
নির্বাচিত দু'টি কলি ২২০
আপনি শ্রেষ্ঠ মা-বাবা হতে পারেন ২২০
কোমল শ্রেণীর যত্ন নেওয়া খুবই জরুরী ২২২
সমাজনির্মাণে নারীর ভূমিকা ২২৫

আবু হানীফা রহ.-এর বিচক্ষণতায় একটি সংসার রক্ষা পেলো ২২৬
এক লক্ষ হাদীস এমনভাবে মুখস্থ আছে যেভাবে সূরা ফাতেহা মুখস্থ থাকে ২২৮
কু প্রবৃত্তি থেকে বাঁচার উপায় ২২৯
নবী সা.-এর পবিত্র মুখে নামাযের উপকারিতা ২৩০
হারাম মালের অনিষ্টতা ২৩৩
পিতা-মাতার আনুগত্যশীল হওয়ার উপায় ২৩৪
মাসতুরাতের ২৪ ঘণ্টার সংক্ষিপ্ত কাজ ২৩৫
মহিলাদের মাঝে দাওয়াতী মেহনতের সূচনা ২৩৯
আমলহীন ঈমান ঘ্রাণহীন ফুলের মতো ২৪৩
জাহান্নামী জাহান্নামে অনেক মোটা হবে ২৪৪
আল্লাহর অনুগ্রহে জান্নাত পাওয়া যাবে ২৪৪
দু'পক্ষের কথা শুনেই সিদ্ধান্ত দেবে ২৪৫
কারো দোষ দেখলে চর্চা করবে না ২৪৫
আল্লাহর রহমত একশ' ভাগ ২৪৬
প্রত্যেক মুত্তাকী মুমিন আল্লাহর ওলী ২৪৭
জান্নাত ও জাহান্নামের ঝগড়া ২৪৭
সিজদায়ে তেলাওয়াতের মাসনুন দোয়া ২৪৮
নির্বাচিত পংক্তিমালা ২৪৮
নিজে সুখে থেকে অন্যকে সুখে রাখবে ২৫০
ভিতরের অনুভূতিগুলো গোপন রাখতে শিখুন ২৫০
সমাজ উপযোগী মানসিকতা গড়ুন ২৫১
তিক্ত কথাগুলো ভুলে যান ২৫১
অন্যের অনুভূতিকে মূল্যায়ন করুন ২৫২
চাটুকরিতার পথ পরিহার করুন ২৫২
দৃষ্টিভঙ্গিতে নম্রতা আনুন ২৫২
কিছু নির্বাচিত পংক্তিমালা ২৫৩
নেককার স্ত্রী এক অমূল্য সম্পদ ২৫৩
আপন দাম্পত্য জীবনকে সুখী করুন ২৫৫
ঘরে দীনি পরিবেশ তৈরি করুন ২৫৭
কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ মুক্তা ২৬০
বিবাহিত ছেলে-মেয়েদের দায়িত্ব ২৬১
তারকারাজীর ঊর্ধ্বের আরো একটি জগত ২৬৩
পশ্চিমা সভ্যতা বনাম প্রাচ্য সভ্যতা ২৬৫
ফজর নামায পড়ে শয়ন করা নিষেধ ২৬৮

সূ চি

অষ্টম-খণ্ড

প্রতিমুহূর্তে উচ্চারিত হয় আজানের ধ্বনি ২৭১
মক্কা ও মদীনার সম্মান ২৭২
কুরআন তেলাওয়াতের আদবসমূহ ২৭৩
কুরআনের বেআদবীর কিছু নমুনা ২৭৫
মা-বাবার আদব রক্ষার সুফল ২৭৭
মা-বাবার আদব ও পূর্বপুরুষদের অবস্থা ২৭৮
ছাত্রদের ইলমের লোভ থাকা উচিত ২৮০
দস্তরখান উপযুক্ত জায়গায় ঝাড়বে ২৮২
মহিলাদের জন্য বিশেষ কিছু আদব ২৮৪
বিভিন্ন আদবসমূহ ২৮৫
বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর দুরবস্থা ২৮৬
ছয় শ্রেণীর মানুষ অভিশপ্ত ২৮৭
মুমিন ও মুশরিকের সন্তানদের পরিণাম ২৮৭
আদম আ. নিজের আয়ু দাউদ আ.-কে দিয়েছিলেন ২৮৮
আল্লাহ! আমাদেরকে ডানদিকের অধিকারী বানান ২৮৯
মানুষের স্বভাব অপরিবর্তনশীল ২৮৯
জান্নাত লাভের তিনটি উপায় ২৯০
ঝগড়াটে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয় ২৯০
একটি বেদআতের কারণে একটি সুন্নত বিলুপ্ত হয় ২৯০
দাওয়াত সম্পর্কীয় অপূর্ব প্রবন্ধ ২৯১
অন্তর থেকে যেভাবে ইলম বেরিয়ে যায় ২৯১
কিয়ামত দিবসে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে ২৯১
যারা ইসলাম ধ্বংস করে ২৯১

জান্নাতে অসংখ্য মহল বানানোর উপায়----২৯১
হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর নাম আরশেও উচ্চারিত হয়েছে----২৯২
আত্মকলহ ধ্বংস ডেকে আনে----২৯২
দোয়া শেষে চেহারায় হাত বুলানো----২৯৩
কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তি আল্লাহ থেকে দূরে থাকে----২৯৩
জান্নাতী জীবন যাপনের নববী পদ্ধতি----২৯৩
যে ব্যক্তিকে দেখে আল্লাহ হাসেন----২৯৪
শহীদদের জন্য বিশেষ পুরস্কার----২৯৪
জান্নাতী কিছু মানুষ----২৯৪
মৃতব্যক্তি জীবিতদের আওয়াজ শোনে----২৯৫
গনীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করার পরিণাম----২৯৫
আবু জেহেলের তলোয়ার কে পেলো?----২৯৮
রাসূল সা.আত্মসাৎকারীর জানাযা পড়েননি----২৯৮
গনীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করার শাস্তি----২৯৯
ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.-এর ন্যায়পরায়ণতা----৩০০
ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানদের সালামের রীতি----৩০১
অধীনস্থদের তারবিয়াত ও সতর্কীকরণ----৩০২
"লোকে বলে" এই কথাটি খারাপ----৩০৩
অতিরিক্ত কথা বলার পরিণাম----৩০৩
যবান সংযত রাখুন----৩০৩
আগুনের দুই জিভ থেকে বাঁচো----৩০৩
আফসোস তোমার প্রতি----৩০৩
দুটো জিনিস জান্নাতে আর দুটো জিনিসজাহান্নামে পৌঁছায়----৩০৪
আক্ষেপ ওই ব্যক্তির জন্য----৩০৪
কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না----৩০৫
গীবত সাগরকেও দূষিত করে দেয়----৩০৫
কাউকে গুনাহের জন্য লজ্জা দেবে না----৩০৬
কারো কষ্টে খুশি হবে না----৩০৬
ফাসেকের প্রশংসায় আরশ কেঁপে ওঠে----৩০৬
সাতটি অমূল্য উপদেশ----৩০৬
গীবতের কাফফারা আদায় করো----৩০৭
ওয়াদা রক্ষার একটি বিরল ঘটনা----৩০৭

সুন্দর জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত ৩০৭
মা বাবার হক আদায়ের ফজিলত ৩০৮
মুসলমান ভাইয়ের হক ৩০৯
কারা জান্নাতী হবে ৩০৯
পাঁচ শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামী ৩০৯
প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী পূর্ণ মুমিন নয় ৩১০
জান্নাতে নবী সা.-এর প্রতিবেশী হওয়ার উপায় ৩১০
যে কাজ করলে জান্নাত আবশ্যক হয় ৩১০
বিধবা নারী সন্তানের প্রতি মনোযোগী হবে ৩১১
প্রতিবেশী ভালো বললেই তুমি ভালো ৩১১
অন্যের প্রয়োজন পূরণ করার ফযিলত ৩১১
যা করলে সত্তরহাজার ফেরেশতা সঙ্গ দেয় ৩১১
সাতটি বদ অভ্যাস সমাজ নষ্ট করে ৩১২
বিদ্বেষ রাখবে না ৩১২
আল্লাহর দরবারে আমলনামা পেশ করা হয় ৩১৩
সম্পর্ক ছিন্ন করা ও হত্যা করা সমান গুনাহ ৩১৩
ঝগড়া মীমাংসা করার ফযিলত ৩১৩
ঈমান চলে যাওয়ার আলামত ৩১৩
তিনটি বিষয় লক্ষণীয় ৩১৪
অন্যকে তুচ্ছ মনে করা অহংকার ৩১৪
সীমাতিরিক্ত অহংকারের পরিণাম ৩১৫
নিকৃষ্ট ব্যক্তি ৩১৬
ক্রোধ ঈমান নষ্ট করে ৩১৭
জালেমদের আয়ু সাধারণত দীর্ঘ হয় ৩১৭
মন্দের প্রতিদান ভালোর দ্বারা দেওয়া উচিত ৩১৭
জালেমকে মদদকারী পূর্ণ ঈমান থেকে বঞ্চিত ৩১৭
জালেমের অকল্যাণ ৩১৮
অত্যাচারীকে বোঝানো উচিৎ ৩১৮
নবী করিম সা.-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বয়ান ৩১৮
আখেরী যামানা সম্পর্কিত কিছু নসিহত ৩২০
ক্ষমা লাভের আকাঙ্ক্ষা ৩২১
ঈর্ষার উপযুক্ত ব্যক্তি ৩২১

ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে দরিদ্ররা জান্নাতে যাবে ৩২১
সাতটি অমূল্য উপদেশ ৩২২
মানুষের চিরন্তন আশা ৩২২
হালাল উপার্জন ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ৩২৩
দুনিয়া চার শ্রেণীর মানুষের জন্য ৩২৩
ধন-সম্পদও মুসলমানদের হাতিয়ার ৩২৪
কিয়ামত দিবসের ঘোষণা ৩২৪
আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ব্যক্তি ৩২৫
আল্লাহর অবাধ্য হওয়াকে ভয় করো ৩২৬
আল্লাহভীতির অপূর্ব ঘটনা ৩২৬
মানুষের মনের বনে বিভিন্ন শাখা আছে ৩২৭
রিজিক বান্দাকে খুঁজে বেড়ায় ৩২৮
মানুষ দীনের নামে দুনিয়া উপার্জন করবে ৩২৮
বন্ধুত্বের অন্তরালে শত্রুতা ৩২৮
দাজ্জালের চেয়েও ভয়ানক বিষয় ৩২৯
নয়টি বিষয়ের আদেশ ৩২৯
কিয়ামতের একটি আলামত ৩২৯
কোন পাপের কী শাস্তি ৩২৯
ইহুদীদের বৃক্ষ ৩৩০
কা'বার ধনভাণ্ডার হাবশী উদ্ধার করবে ৩৩০
পৃথিবীতে প্রথম যে প্রাণী বিলুপ্ত হবে ৩৩০
রাকাত ছুটে যাওয়ার চারটি ধরণ ৩৩১

হযরত ওমর পালনপুরী রহ.-এর জীবনী

জন্মস্থান, জন্ম ও শৈশবকাল ৩৩৩
স্কুলের অবকাশকালীন ছুটিতে বাড়ি ফেরা ৩৩৫
দুনিয়া পায়ের নীচে এসে পড়বে ৩৩৬
মুম্বাইয়ে পড়াশোনা ও বিবাহ ৩৩৭
চার মাস তাবলীগ জামাআতে ৩৩৮
দ্বিতীয়বার দেওবন্দে ভর্তি ৩৩৯
মা মৃত্যুশয্যায় ৩৪০
কিছু মহিলার মাধ্যমে পুরো বংশে ঈমানের আলো জ্বলে ওঠে ৩৪০
সময়ের মূল্য ৩৪১

লক্ষ মানুষের সামনে দীন ও ঈমানের বয়ান ৩৪১
ইজতেমায় তাঁর বয়ানের ধরণ ৩৪৩
জীবনের শেষ দিনগুলো ৩৪৫
স্বদেশবাসী ও কওমের উদ্দেশ্যে শেষ বয়ান ৩৪৫
দীন ও ঈমানের আলো বিকিরণকারী চিরদিনের জন্য অস্ত গেলেন ৩৪৭
শোক জ্ঞাপন ৩৪৯
দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে শোকবার্তা ৩৫০
মাওলানা আবরারুল হক রহ.-এর শোকবার্তা ৩৫১
হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহীম লাজপুরী রহ.-এর শোকবার্তা ৩৫২
মাওলানা হাবীবুল্লাহ পিরোজপুরী-এর শোকবার্তা ৩৫৩
মরিসাসের মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে শোকবার্তা ৩৫৪
চাপাটায আম্বিয়া মসজিদের পক্ষ থেকে শোকবার্তা ৩৫৪
ব্যক্তিত্ব, গুণাবলী ও অমলসমূহ ৩৫৫
বিনয় ও নম্রতা ৩৫৯
ধৈর্যধারণ ও মায়া-মমতা ৩৬০
নিজামুদ্দীন মারকাযে লাগাতার তেইশ বছর ৩৬২
আব্বাজান রহ.-এর বিশেষ বাণী ৩৬৪
অভিজ্ঞতার চেয়ে দৃঢ় বিষয় ৩৭১
সঠিক কাজ ৩৭১
রাসূলের সাথে তাঁর ভাবনাকেও স্মরণ করা ৩৭১
ফতোয়া ও তাকওয়া কী ৩৭১
মূলনীতি ৩৭১
মূল বিষয় উসূল অনুযায়ী চলা ৩৭২
ইজতেমায়ী জীবনের পদ্ধতি ৩৭২
শুধু মেহনত অব্যাহত রাখতে হবে ৩৭২
দীন যিন্দা রাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ৩৭২
যোগ্যতা থাকা জরুরী নয় ৩৭২
শয়তানের ধোঁকা ৩৭৩
জিহাদের উদ্দেশ্য কী ৩৭৩
দীন কিভাবে প্রসার হবে ৩৭৪
রাত-দিনের অভিজ্ঞতা ৩৭৪
ত্যাগের সিঁড়ি ৩৭৪

হেদায়াতের জন্য দোয়া ও মেহনত জরুরী ৩৭৪
বিশ্বজগত সৃষ্টির চারটি উপযোগিতা ৩৭৬
আজকের দুনিয়ার সবচে' মূল্যহীন সৃষ্টি ৩৭৬
পুনরুত্থান সম্পর্কে শক্তিশালী দলিল ৩৭৭
ত্যাগ ও ভোগের বিপরীতমুখী স্বভাব ৩৭৭
প্রার্থনা ও প্রচেষ্টায় সমন্বয় থাকতে হবে ৩৭৮
কিয়ামতের দিন আল্লাহ কেমন আচরণ করবেন? ৩৭৯
রহস্যের কথা ঘোষণা হলো জগতের সামনে ৩৭৯
দুনিয়ার শাসকবর্গের কাছেও কোনো পন্থা নেই ৩৮০
জাহান্নাম ঈমানদারের জন্য নিরাময়কেন্দ্র ৩৮০
সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ ৩৮১
প্রতিটি মানুষের জন্যে চারটি স্টেশন ৩৮২
ঈমানের শক্তি কী ৩৮৩
ঈমানী গুণাবলি অর্জনের শর্তে প্রতিশ্রুতি ৩৮৬
জনৈক ইউরোপিয়ানের প্রশ্নের প্রশান্তিদায়ক উত্তর ৩৮৬
জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে গভীর আলোচনা ৩৯০
আব্বাজান রহ. কয়েকবার রাসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখেছেন ৩৯৫
আব্বাজানের দাফনের পূর্বে দেখা স্বপ্ন ৪০০
আব্বাজান রহ.-এর প্রথম চিল্লা ৪০২
একটি উপদেশ ৪০৪
বিশ্বাসের উপহার ৪০৪
জাদু থেকে সুরক্ষার জন্যে অত্যন্ত পরীক্ষিত ওষুধ ৪০৫
সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির তাবিজ লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিন ৪০৫
ছড়ানো মুক্তা ৪০৫
সময়ের মূল্যায়ন ৪০৯
আল্লাহর একটি বড় নিদর্শন হলো বাতাস ৪১০
রাসূল সা.-এর শঙ্কিত হওয়া ৪১৫
প্রবলবেগে বাতাস বইলে এই দোয়া পড়বে ৪১৬
বাতাসকে মন্দ বলো না ৪১৭
কুরআনি জ্ঞান ৪১৭
আল্লাহর দরবার অনুষ্ঠিত হওয়া ৪১৮
আখেরাতে আল্লাহকে কোথায় দেখা যাবে? ৪১৮

আল্লাহর দরবারে জান্নাতবাসীদের অংশগ্রহণ ৪১৯
আল্লাহর দরবারে পবিত্র শরাবের আয়োজন ৪২০
হযরত দাউদ আ.-এর তেলাওয়াত ও মোনাজাত ৪২১
আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শনের প্রার্থনা ৪২১
অধিক নেয়ামত ৪২২
নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করা ৪২৩
অপবিত্র অবস্থায় কিতাব পড়া যাবে কী? ৪২৫
নির্বুদ্ধিতাও নেয়ামত ৪২৬
ধর্মভীরু স্ত্রী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত ৪২৭
প্রকৃত সৌন্দর্য ৪৩২
অন্তরের মরিচা দূর করার নববী উপায় ৪৩২
অন্যের সন্তানকে খারাপ বলাও পাপ ৪৩২
হুযুর সা.-এর মজলিসের একটি ঘটনা ৪৩৪
স্বভাব ধর্ম ও আমাদের জীবন ৪৩৬
একফোঁটা অশ্রুর মর্যাদা ৪৩৮
হাশরের ময়দানের আশ্চর্য ঘটনা ৪৩৮
আল্লাহর রহমতে বিশ্বাসী যুবক ৪৩৯
চির আবাদ দেশ চির অমর রাজা ৪৪০
অন্তরঙ্গতা থাকলেও অনুমতি নেওয়া আবশ্যক ৪৪১
ইলমের গুরুত্ব ৪৪১
একটি মজলুম কবিতা ৪৪২
জীবন আল্লাহর স্মরণেই কাটানো উচিত ৪৪৩
প্রেমাস্পদের দানে যতো সুখ ৪৪৪
প্রেমাস্পদের প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গিই দৃষ্টিনন্দন ৪৪৫
নবুওয়তের রাজদরবারে মিনতি ৪৪৭

মুক্তার চেয়ে দামী

(সপ্তম খণ্ড)



মাওলানা উমর পালনপূরী রহ.-এর সংবর্ধনা

হযরত মাওলানা মুহাম্মদ উমর পালনপুরী রহ.-এর ইন্তেকালের পরের ঘটনা। জানাযা এখনো গৃহেই অবস্থান করছে। ইতোমধ্যে সাহেবে নিসবত জনৈক বুযুর্গ কাশফে দেখতে পেলেন— আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলছেন, নবী করীম সা.-এর পবিত্র কবর থেকে গালিচা উঠিয়ে এনে হযরত মাওলানা রহ.-এর কবরে বিছিয়ে দাও। আর জান্নাত থেকে নতুন একটি গালিচা এনে নবী করীম সা.-এর কবরে বিছিয়ে দাও।'

সুবহানাল্লাহ! যে ব্যক্তি তাঁর জীবন দীনের জন্য কুরবান করেছেন, জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহর প্রিয় নবী মুহাম্মদ সা.-এর দীনের জন্য বিলিয়ে দিয়ে গেছেন, তাঁর সম্মানে এমন উষ্ণ অভ্যর্থনা ও সাদর সংবর্ধনার আয়োজন বিচিত্র কিছু নয়।[১]

অন্ধদের জন্য বিশেষ ফযীলত

প্রশ্ন : কোন ব্যক্তি সর্বপ্রথম জান্নাতে আল্লাহর দীদার লাভ করবে?

উত্তর : হযরত হাসান বসরী রহ. বলেন— সর্বাগ্রে যে লোকটি মহান আল্লাহর দীদার লাভ করবে তিনি হবেন, অন্ধব্যক্তি। হযরত হাসান বসরী রহ. একথাও বলেছেন— যখন মহান আল্লাহ জান্নাতবাসীদের সামনে উদ্ভাসিত হবেন এবং তাঁর দীদার লাভের পরমানন্দে তারা আপ্লুত হবেন তখন তারা জান্নাতের অন্যসকল নেয়ামতের কথা বেমালুম ভুলে যাবেন।

---

১. মাসিক আল মাহমূদ, রবিউস সানী ১৪২৯ হিজরী, এপ্রিল ২০০৮।

কবির ভাষায়—

عجب تیری ہے اے محبوب! صورت
نظر سے گر گئے سب خوب صورت

কতোই না বিস্ময়কর হে বন্ধু! তোমার প্রতিচ্ছবি,
যাঁকে দেখামাত্রই সকল নেয়ামত দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাবে।[২]

যেসকল কারণে প্রকৃতি অশান্ত হবে

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَعَلَتْ أُمَّتِي خَمْسَ عَشْرَةَ خَصْلَةً حَلَّ بِهَا الْبَلَاءُ فَقِيلَ وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ إِذَا كَانَ الْمَغْنَمُ دُوَلًا وَالْأَمَانَةُ مَغْنَمًا وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ وَبَرَّ صَدِيقَهُ وَجَفَا أَبَاهُ وَارْتَفَعَتْ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلَهُمْ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ وَلُبِسَ الْحَرِيرُ وَاتُّخِذَتْ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ أَوْ خَسْفًا وَمَسْخًا.

হযরত আলী রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন— আমার উম্মত যখন পনেরো প্রকার গুনাহে আক্রান্ত হবে তখন তাদের ওপর বিভিন্ন ধরণের বালা-মুসিবত ও বিপদাপদ নেমে আসবে। নিবেদন করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল সা.! সেই গুনাহগুলো কী? রাসূল সা. বললেন—

১. যখন গনীমতের মালকে ব্যক্তিগত সম্পদ মনে করা হবে।
২. আমানতের সম্পদকে লুটতরাজের বস্তু মনে করা হবে।
৩. যাকাতকে জরিমানা মনে করা হবে।
৪. লোকেরা মায়ের অবাধ্য হবে।
৫. আর স্ত্রীর অনুগত হবে।
৬. পিতাকে পর মনে করবে।
৭. আর বন্ধুকে আপন মনে করবে।
৮. মসজিদে তুমুল শোরগোল হবে।
৯. নিকৃষ্ট ব্যক্তি নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হবে।
১০. নিচুস্তরের ব্যক্তিরা উঁচুস্তরে আসীন হবে।

---

২. জান্নাতকে হাসীন মানাযির, পৃ : ৫৯১।

১১. কাউকে সম্মান দেখানো হবে তার অনিষ্ট থেকে বাঁচতে।

১২. মদ পানের ব্যাপকতা বেড়ে যাবে।

১৩. পুরুষরা রেশমী কাপড় পরিধান করবে।

১৪. নর্তকী ও গানবাজনা ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়বে।

১৫. শেষ যুগের লোকেরা প্রথম যুগের লোকদেরকে গালমন্দ করবে।

এ আলামতগুলো যখন প্রকাশ পাবে তখন তোমরা আল্লাহর এ সকল গযবের অপেক্ষা করবে— ১. রক্তিম বাতাস প্রবাহিত হবে ২. ভূমিধস ঘটবে ৩. লোকদের চেহারা বিকৃত হয়ে যাবে। এরকম অনেক ভয়াবহ ঘটনা এতটাই ধারাবাহিকভাবে ঘটবে, যেভাবে কোনো মালার সুতো ছিঁড়ে তার দানাগুলো একে একে খসে পড়ে।[৩]

মাতৃভক্তির বিস্ময়কর ঘটনা

হযরত মূসা আ. একদিন জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ! কোন লোক জান্নাতে আমার সঙ্গী হবে? আল্লাহ উত্তরে বললেন— অমুক কসাই জান্নাতে তোমার সঙ্গী হবে। আল্লাহ তাঁকে কসাইয়ের বাড়ির ঠিকানাও জানিয়ে দিলেন। বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, ওই সময় আল্লাহ কোনো বুযুর্গ, কুতুব, শহীদ বা হাদীসগবেষকের নাম বলেননি। শুধু বললেন— অমুক কসাই।

হযরত মূসা আ. বিস্মিত হলেন। ওই কসাইকে চাক্ষুষ দেখার কৌতুহলে তিনি ঘর থেকে বেরুলেন। কসাই লোকটি তখন বাজারে গোশত বিক্রি করছিলো। সন্ধ্যা নেমে আসতেই সে দোকান বন্ধ করে ফেললো। গোশতের টুকরোগুলো থলিতে ভরে বাড়ির উদ্দেশে রওয়ানা হলো। হযরত মূসা আ. লোকটির কাছে এসে বললেন— ভাই! আমি তোমার সঙ্গে যাবো। কসাই লোকটি হযরত মূসা আ.-কে চিনতো না। বললো— এসো।

হযরত মূসা আ. তার সঙ্গে বাড়িতে হাজির হলেন। লোকটি গোশত বের করে ছোট ছোট টুকরো করে চুলোয় বসিয়ে দিলো। আটার খামিরা করে রুটি তৈরি করলো। রান্না সমাপ্ত হতেই সে ঘরের ভিতর থেকে এক বয়স্ক মহিলাকে কাঁধে করে তুলে নিয়ে এলো। সুন্দর করে লোকমা বানিয়ে তাকে খাইয়ে দিলো। মুখ পরিষ্কার করলো। তারপর বিছানা বিছিয়ে তাকে শুইয়ে দিলো। কিছুক্ষণ খোশালাপও করলো। মূসা আ. জিজ্ঞেস করলেন— ওই মহিলাটি

---

৩. তিরমিযী শরীফ : ৩/৪৪।

কে? বললো, আমার মা। সকাল বেলা বাজারে বের হওয়ার আগে আমি তার প্রয়োজনীয় সেবা-যত্ন করে যাই। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে সর্বপ্রথম তার সেবা করি। তারপর আমার সন্তানদের দেখাশোনা করি। মূসা আ. জিজ্ঞেস করলেন— 'আমি মহিলাকে মুখ নাড়াতে দেখেছি। সে কী বলে?'

কসাই বললো— এ আর নতুন কী! প্রতিদিনই সে আমার জন্যে এ দোয়া করে। আমি যখনি তার খেদমত করি তখনি সে বলে, আল্লাহ্ তোমাকে মূসা আ.-এর সঙ্গী করুক। কোথায় আমি এক কসাই আর কোথায় আল্লাহর নবী মূসা আ.? (আল্লাহু আকবার)!!!

মায়ের অবাধ্যতা কিয়ামতের আলামত

রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করা হলো— ইয়া রাসূলুল্লাহ! কিয়ামত কখন ঘটবে? বললেন— আল্লাহই ভালো জানেন কখন ঘটবে। বলা হলো, কোনো নিদর্শন থাকলে বলুন।

বললেন— দেখো, সন্তান যখন মায়ের সঙ্গে চাকর-চাকরানীর মত কথা বলবে, বুঝবে– কিয়ামত ঘনিয়ে এসেছে।

অর্থাৎ যখন সন্তান মা-বাবার সঙ্গে এভাবে কথা বলে যেভাবে চাকরানীর সাথে বলা হয় এবং তাদের সঙ্গে সে আচরণ করা হয় যেমনটি ঘরের চাকরের সঙ্গে করা হয়; তখন বুঝবে কিয়ামত নাকের ডগায় চলে এসেছে।

মুহূর্তের ভুলের জন্য সারাজীবনের কান্না

আফগানিস্তানের এক শহরে একবার দুর্ভিক্ষ দেখা দিলো। সেই শহরে রাসূল সা.-এর বংশের এক লোক বসবাস করতো। ঘটনাচক্রে একদিন লোকটি ইন্তেকাল করে। যার ফলে তার ছোট ছোট সন্তানগুলো এতিম হয়ে যায়। দুর্ভিক্ষের কারণে এক পর্যায়ে তারা ওই শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে।

লোকটির বিধবা যুবতী স্ত্রী হাঁটতে হাঁটতে সমরকন্দ নগরীতে এসে হাজির হয়। তিনি তার ছোট ছোট শিশুদেরকে মসজিদে বসিয়ে এলাকার গভর্নরের কাছে উপস্থিত হলো। বললো, 'আমি নবী পরিবারের সন্তান। আমার জীবনে এই নিদারুণ দুর্বিপাক নেমে এসেছে। এ মুহূর্তে মাথা গোঁজার জন্যে আমার একটু আশ্রয় ও পেটের ক্ষুধা নিবারণ করার জন্যে খাবারের ভীষণ প্রয়োজন।

গভর্নর বললো, 'তুমি যে নবী-বংশের সন্তান– এর সাক্ষ্য পেশ করো।'

মহিলা বললো, 'আমি একজন বিদেশী মানুষ। এখানে আমি কোথেকে সাক্ষী নিয়ে আসবো।'

তখন লোকটি তাকে তাড়িয়ে দিয়ে বললো– এখানে প্রতিদিন নানান মানুষ এসে দাবী করে যে, আমি নবী-বংশের লোক। তোমাকে বিশ্বাস করি না। তুমি এখান থেকে চলে যাও।

মহিলা ভাঙা মন নিয়ে বেরিয়ে এলো। জনৈক লোক তার ছন্নছাড়া অবস্থা দেখে বললো, এ এলাকায় এক অগ্নিপূজারী বাস করে। লোকটি খুবই পরোপকারী। তুমি তার কাছে গেলে সে তোমার একটা বিহিত করে দেবে।

মহিলা তখন ওই অগ্নিপূজারী লোকটির শরণাপন্ন হলো। সে তার যথাযোগ্য সম্মান করলো। বাসস্থানের ও প্রয়োজনীয় খাবারদাবারের ব্যবস্থা করে দিলো।

রাতের বেলা সমরকন্দ নগরীর ওই গভর্নর স্বপ্নে দেখলো, আল্লাহর মহান নবী সা. জান্নাতে বিশাল এক অট্টালিকার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। তখন সে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল সা.! এ অট্টালিকাটি কার জন্যে নির্মিত? নবীজি বললেন— ঈমানদারদের জন্যে। সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমিও তো এক ঈমানদার। নবীজি বললেন— তুমি তোমার ঈমানের ওপর সাক্ষী পেশ করো।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটির মুখ ফেকাশে হয়ে গেলো। শরীর হলুদ হয়ে গেলো। নবীজি বললেন, আমার এক মেয়ে যখন তোমার কাছে হাজির হয়ে নবী-বংশের সন্তান হওয়ার কথা বলেছিলো তখন তুমি তাকে সাক্ষী পেশ করতে বলেছিলে। এ কথা বলে নবীজি তার দিকে বিস্ফোরিত নয়নে এমনভাবে ধমক দিলেন, ঘুমের ভিতরেই লোকটি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলো। তৎক্ষণাৎ সে অগ্নিপূজারী লোকটির বাড়িতে হাজির হয়ে কেঁদে ফেললো। অশ্রুবিগলিত নয়নে বললো– পরিবারটিকে তুমি আমার হাতে তুলে দাও। এর বিনিময়ে তুমি যা চাইবে আমি দিয়ে দেবো।

অগ্নিপূজারী লোকটি বললো, ایں سعادت بزور بازو نیست : 'এ সৌভাগ্য লাভ বাহুর জোরে মেলে না।' এ নেয়ামত আমাকে দান করা হয়েছে। তোমাকে কী করে দেবো! আমি জানি তুমি রাতে স্বপ্ন দেখেছো। ফলে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছো। নেয়ামতটি তোমাকে না দিয়ে আমাকে দেয়া হয়েছে। আমি ঈমান এনেছি। আমি মুসলমান হয়েছি। সেই প্রাসাদ তোমার নাম থেকে কেটে আমার নামে বরাদ্দ করা হয়েছে। এ পরিবার তোমাকে কী করে দিই? প্রাসাদের বাইরে যখন তোমাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হচ্ছিল তখন আমি প্রাসাদে দাঁড়িয়ে তা শুনেছি।

একটি শিক্ষণীয় আলাপচারিতা

একবার এক ব্যক্তি রাসূল সা.-এর দরবারে এসে অভিযোগ করল, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার মা কঠোর প্রকৃতির। প্রিয় রাসূল সা. বললেন— 'নয় মাস পর্যন্ত যখন তুমি তার গর্ভে ছিলে। সে সময় তো তিনি বদমেযাজী ছিলেন না।'

–সে বললো, হযরত! সত্য বলছি। তিনি বদমেযাজী।

রাসূল সা. বললেন— 'যখন তিনি তোমার জন্যে রাতভর জেগেছেন। তোমাকে দুধ পান করাতেন সে সময় তো তিনি বদমেযাজী ছিলেন না।'

–সে বললো, আমি আমার মায়ের ওই ঋণ শোধ করেছি।

রাসূল সা. বললেন— 'কী করে শোধ করেছ?'

–সে বললো, তাঁকে কাঁধে বসিয়ে হজ করিয়েছি।

রহমতের নবী সা. তখন সিদ্ধান্তমূলক উত্তর জানিয়ে বললেন— 'তোমার ভুমিষ্ঠের সময় তিনি যেই ব্যথা পেয়েছিলেন তার বিনিময় দেওয়া কি তোমার পক্ষে সম্ভব?[৪]

মায়ের সেবার বদৌলতে কবীরা গুনাহ মাফ

হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-এর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, হযরত! আমি এক মেয়েকে বিয়ের প্রস্তাব পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু সে আমার প্রস্তাব ফিরিয়ে দেয়। অন্য একজন বিয়ের প্রস্তাব পাঠালে সে মঞ্জুর করে। যা দেখে আমি ক্রোধান্বিত হয়ে ওই মেয়েটিকে হত্যা করি। এখন বলুন, আমার তাওবার কোনো সুযোগ রয়েছে কি না?

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. বললেন— 'তোমার মা কি জীবিত আছেন?'

লোকটি বললো, তিনি তো অনেক আগেই পরপারে চলে গেছেন।

তিনি বললেন— 'যাও। সাচ্চা মনে তাওবা করো। যথাসম্ভব এমন নেক কাজ করো যা তোমাকে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি এনে দেবে।

ঘটনাচক্রে ওই মজলিসে হযরত যায়েদ ইবনে আসলাম উপস্থিত ছিলেন। তিনি হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'হযরত! আপনি লোকটিকে কেনো জিজ্ঞেস করলেন, তোমার মা কি বেঁচে আছেন'?

বললেন— আমার জানামতে আল্লাহর নৈকট্য ও সন্তুষ্টি অর্জন করার জন্যে মায়ের সেবা করার চেয়ে অধিক ফলপ্রসূ কোনো আমল হতে পারে না।'

---

৪. হুসনে মুয়াশারাত, পৃ: ৪৮।

এ জাতীয় একটি ঘটনা রাসূল সা.-এর যুগে ঘটেছিলো। জনৈক ব্যক্তি নবীজির দরবারে হাজির হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমি তো অনেক বড় একটি গুনাহ করে ফেলেছি। এখন আমার তাওবা করার কোনো উপায় আছে কি?

উত্তরে দোজাহানের সর্দার সা. বললেন, তোমার মা কি জীবিত আছেন? সে বললো, না, জীবিত নেই। তখন নবীজি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার খালা কি জীবিত আছেন? লোকটি বললো, জ্বি, তিনি জীবিত আছেন। তখন নবীজি নির্দেশ করেন, যাও। খালার সেবা করো।

এসকল ঘটনা মায়ের মর্যাদা ও তার সেবার দীনি তাৎপর্য প্রমাণ করে, কোনো মানুষ যদি কোনো বড় গুনাহ করে ফেলে আর তার আযাবের ভয়েও আল্লাহকে সন্তুষ্ট করতে আগ্রহী হয় তাহলে সে যেন নিজ মায়ের সেবা করে। যদি মায়ের ইন্তেকাল হয়ে যায় তাহলে সে যেন খালাদের সেবা করার মাধ্যমে নিজ পরকালের পাথেয় সঞ্চয় করে।[৫]

সন্তানদের সম্পর্কে অভিযোগ

যেই সন্তানদের যত্নআত্তি করার জন্য দুর্বল শরীর নিয়ে মা-বাবা দিন-রাত একাকার করে শরীরের সর্বশক্তি ব্যয় করেন, যারা চোখের জলে বুক ভাসিয়ে হাত তুলে মুনাজাত করেন, সেই সন্তানরাই যদি তাদের আশাআকাঙ্ক্ষার জলাঞ্জলি দিয়ে অবাধ্য হয়, তখন তাদের কী অবস্থা হয়, তা কল্পনা করে দেখুন। তাদের মনের সেই নিদারুণ কষ্ট ও বেদনা কোনো শব্দ বা বাক্যে ব্যক্ত করা যাবে না।

বর্তমান যুগে কিছু ভাগ্যবান পরিবারের কথা বাদ দিলে দেখা যাবে, ঘরে ঘরে আজ ওই সমস্যা বিরাজ করছে। ছেলে-মেয়ে ভুলে গেছে তাদের পিতা-মাতার অধিকারের কথা। তাদের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনের মানসিকতার সন্তান তো আজ খুঁজেও পাওয়া যায় না। অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, বাবা-মায়ের সঙ্গে সদাচরণ করা, তাদের সন্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখা, তাদের যত্ন নেয়া, আনুগত্য করা, তাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা সন্তানদের দায়িত্বে পড়ে না।

আজ ঘরে ঘরে এ অভিযোগ শোনা যায় যে, সন্তান কথা শোনে না। যেখানেই যান, পিতা-মাতার অবাধ্যতার এ অভিযোগ শুনতে পাবেন। কিছু কিছু বয়োবৃদ্ধদের দেখা যায়, দৃষ্টি নিজেদের ওপর টেনে নিয়ে বলতে শুরু করেন যে,

---

৫. হুসনে মু'আশারাত : ৫৩ থেকে চয়িত।

আমাদের যুগে পিতা-মাতার সামনে সন্তান জোর গলায় কথা বলার দুঃসাহসই করতো না; কিন্তু বর্তমানে পরিস্থিতি খুবই খারাপ হয়ে গেছে। যুগ বদলে গেছে। অশ্লীলতা ও অনৈতিক শিক্ষা, মুক্ত চেতনার জগদ্দল পাথরের নিচে সবধরনের সভ্যতাই হারিয়ে গেছে। যার কারণে সব মহিলা এখন এটাকে ভাগ্যের পরিহাস বলে স্বাভাবিক আচরণ ধরে নিয়ে হাপিত্যেশ করছে। আর মনে করছে, এখন পিতা-মাতার করণীয় বলে কিছুই নেই।

নিষ্পাপ শিশুর করুণ ঘটনা

জাহেলী যুগের ঘটনা। বনূ তামীম গোত্রে মেয়ে সন্তানদেরকে জীবন্ত মাটির নিচে পুতে ফেলার মতো বর্বরতার ব্যাপক প্রচলন ছিলো। গোত্রটির সর্দার কায়েস ইবনে আসেম যখন মুসলমান হন তখন তিনি নিজ হাতে নিষ্পাপ কন্যাকে জীবন্ত মাটিচাপা দেয়ার কথা স্বীকার করে বলেন, 'হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমি বিদেশ সফরে বেরিয়েছিলাম। আমার অনুপস্থিতিতে স্ত্রী একটি কন্যা সন্তান জন্ম দেয়। দিনে দিনে মেয়েটির ওপর স্ত্রীর মমতা বেড়েই চলছিলো যার কারণে সে শংকা বোধ করে, সফর থেকে ফিরে এসে মেয়েটির বাবা তো তাকে মাটি চাপা দিয়ে মেরে ফেলবে। যার কারণে সে আমার ভয়ে মেয়েটিকে তার খালার বাড়িতে পাঠিয়ে দেয়। উদ্দেশ্য ছিলো, সেখানে প্রতিপালিত হয়ে মেয়েটি যখন বড় হবে তখন তার ওপর পিতার স্নেহ গড়ে ওঠবে।

বিদেশ থেকে ফেরার পর আমি শুনতে পেলাম, স্ত্রী মৃত শিশু জন্ম দিয়েছিলো। এভাবে বিষয়টির আপাতত পরিসমাপ্তি ঘটে। ওই দিকে মেয়েটি তার খালার বাড়িতে থেকে বড় হতে থাকে। ঘটনাচক্রে একদিন আমি কোনো প্রয়োজনে বাইরে চলে যাই। মেয়ের মা একে সুযোগ মনে করে সন্তানকে ডেকে পাঠালো। দুর্ভাগ্যক্রমে আমি সহসাই ঘরে ফিরে আসি। দেখি, অতীব সুন্দর একটি মেয়ে আমার ঘরে ডানাকাটা পরীর ন্যায় হেসে খেলে বেড়াচ্ছে। তার প্রতি আমার মনে অদম্য ভালোবাসা নাড়া দিয়ে ওঠলো। স্ত্রীও আমার চোখে ভালোবাসার দীপ্তি দেখে ফেললো। আমি তখন তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এতো সুন্দর মেয়েটি কার সন্তান?

সরল মনে সে তখন আমাকে গোটা বৃত্তান্ত খুলে বললো। অকৃত্রিম ভালোবাসায় আমি সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। পিতার স্নেহ পেয়ে মেয়েটিও প্রচণ্ড খুশিতে আপ্লুত হয়ে ওঠলো। সারাক্ষণ মেয়েটির মুখে 'আব্বু আব্বু' ডাক লেগেই থাকতো। ও যখন 'আব্বু' বলে আমার দিকে ছুটে আসতো, ওই সময় আনন্দের অবর্ণনীয় শিহরণ গোটা শরীরে দোল খেতো।

এভাবে কিছু দিন কেটে গেলো। মেয়েটিও আমার ভালোবাসার নিরুপদ্রব ছায়ায় প্রতিপালিত হতে লাগলো। কিন্তু মাঝে মাঝে তার দিকে তাকালে আমার শরীরে এক অজানা আশঙ্কা কাটা দিয়ে ওঠতো, এই মেয়েটির কারণে একদিন আমাকে কারো না কারো শ্বশুর হতে হবে। এই লাঞ্ছনা আমাকে বহন করতে হবে। তখন আমি মানুষের সামনে কী করে মুখ দেখাবো। আমার তিলে তিলে গড়া সম্মানের সৌধ নিমিষেই ধুলোয় মিশে যাবে। এভাবে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে একদিন আমার ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে গেলো। আমি সিদ্ধান্ত নিলাম, লাঞ্ছনার এই উপকরণটিকে একদিন সবার অজান্তে মাটি চাপা দিতে হবে। স্ত্রীকে বললাম, মেয়েকে সাজিয়ে দাও। এক নিমন্ত্রণে যেতে হবে। সে তখন তাকে ভালোভাবে গোসল করিয়ে দিলো। পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে সাজিয়ে দিলো। আব্বুর সঙ্গে বেড়ানোর আনন্দে মেয়েটিও মাঝে-মধ্যে নেচে উঠছিলো। তাকে নিয়ে আমি একটি জনমানবহীন জঙ্গলের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লাম। মেয়েটি তখন চঞ্চলা হরিণীর মতো হেলে-দুলে আমার সঙ্গে যাচ্ছিলো। ওদিকে আমি তো তখন বুকের ওপর পাথর বেঁধে লাঞ্ছনার দ্রুত পরিসমাপ্তি নিশ্চিত করার উন্মাদনায় কাতর ছিলাম।

মেয়েটি কিন্তু কিছুই জানতো না। সে কখনো আমার হাত ধরে হাঁটতো। কখনো আমার আগে আগে দৌড়ে যেতো। কখনো কাছে এসে মজার মজার কথা বলতো। এভাবে এক স্থানে পৌঁছে আমি থেমে গেলাম। সেখানে একটি যুৎসই স্থান বের করে গর্ত খোদাইয়ের কাজ শুরু করে দিলাম। মেয়েটি তখন প্রচণ্ড বিস্ময় বোধ করছিলো, এই জনমানবহীন প্রান্তরে আব্বুজান কেনো মাটিতে গর্ত খোদাই করছেন!!! আমাকে এ কথা জিজ্ঞেসও করলো, এখানে আপনি কেনো মাটি খুড়ে চলেছেন? সে জানতো না যে, পাষাণ পিতা নিজ হাতে ফুলের মতো নিষ্পাপ কন্যাকে চিরবিদায়ের তোড়জোড় পাকাচ্ছে।

গর্ত খোদাইয়ের সময় যখন আমার পায়ের ওপর বা কাপড়ের ওপর মাটির টুকরো চলে আসতো তখন ওই ছোট্ট মেয়েটি তার ছোট্ট হাত দিয়ে তা পরিষ্কার করে দিতো। বলতো, আব্বুজান! আপনার কাপড় নষ্ট হচ্ছে তো!!! গর্ত তৈরি হতেই আমি অকস্মাৎ মেয়েটিকে তুলে এনে সেই গর্তের মাঝে নিক্ষেপ করে তার ওপর মাটি ফেলতে লাগলাম। মেয়েটি প্রচণ্ড বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে চিৎকার করতে লাগলো, আব্বুজান! প্রিয় আব্বুজান! এ কী করছেন? আব্বুজান! আমি তো কিছুই করিনি!!! তাহলে কেনো আমাকে এভাবে মাটিচাপা দিয়ে চিরবিদায় দিচ্ছেন?

ওই সময় আমার কোনো হিতাহিত জ্ঞান ছিলো না। অন্ধ ও বধিরের মতো মাটি চাপা দিতে লাগলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওই সময় আমি এতোটাই নির্বিকার হয়ে গিয়ে ছিলাম যে, এভাবে নিজ হাতে নিজ মেয়েকে হত্যা করতেও আমার শরীরে সামান্যতম কাঁটা দিয়ে ওঠেনি। আমি নিশ্চিন্ত মনে বাড়ি ফিরে এলাম।'

নিষ্পাপ কন্যাসন্তানকে এভাবে জীবন্ত মাটিচাপা দিয়ে হত্যা করার লোমহর্ষক ঘটনা শুনে রাসূলুল্লাহ সা.-এর অন্তর কেঁদে ওঠলো। টপটপ করে দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। কান্নাজড়ানো কণ্ঠে তিনি শুধু এতোটুকুই বলতে পারলেন, 'এটি তো নির্মমতার নিকৃষ্ট বহিঃপ্রকাশ। যে অন্যের ওপর দয়া করে না তার ওপর আল্লাহ কী করে দয়া করবেন?'

শিক্ষণীয় কার্যবিবরণ

নবী করীম সা.-এর সামনে এক ব্যক্তি তার জাহেলী যুগের আত্মজীবনী এমনভাবে তুলে ধরলো যে, বিবরণ শুনে তিনি প্রচণ্ড ব্যাকুল হয়ে ওঠলেন। লোকটি বললো– 'হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমরা অজ্ঞ ছিলাম। সম্পূর্ণ নিরক্ষর। পাথরের তৈরি মূর্তির উপাসনা করতাম। এতোটাই নরাধম ছিলাম যে, নিজ হাতে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করতাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ সা.! আমার অতি আদরের এক কন্যা সন্তান ছিলো। আমি যখনই ডাকতাম দৌড়ে আমার কাছে ছুটে আসতো। একদিনের ঘটনা। আমি তাকে বরাবরের মতো ডেকে পাঠালাম। সঙ্গে সঙ্গে সে দৌড়ে আমার কাছে হাজির হলো। আমি তাকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম। আমি আগে আগে চলছিলাম। আর ও আমার পেছনে মহানন্দে ছুটে আসছিলো। আমার বাড়ি থেকে অনেক দূরে একটি গভীর কুয়ো ছিলো। কুয়োর পাশে হাজির হয়ে আমি থেমে গেলাম। মেয়েটিও আমার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে গেলো। এরপর ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি হাত ধরে মেয়েটিকে তুলে নিয়ে সহসাই কুয়োর ভিতরে নিক্ষেপ করলাম। নিষ্পাপ মেয়েটি কুয়োর ভিতর থেকে অনেকক্ষণ চিৎকার করে কাঁদলো। হৃদয় কাঁপানো কণ্ঠে 'আব্বু আব্বু' বলে চিৎকার করলো। হে আল্লাহর রাসূল! এটাই ছিলো তার জীবনের শেষ চিৎকার।

আল্লাহর রাসূল সা. এই মর্মান্তিক ঘটনা শুনে ভীষণ মর্মাহত হলেন। তাঁর আঁখিযুগল হতে ফোঁটা ফোঁটা অশ্রু গড়াতে লাগলো। এক সাহাবী তাকে গালমন্দ করে বললেন, তুমি অনর্থক এক করুণ আত্মকাহিনী শুনিয়ে রাসূল সা.-কে কষ্ট দিলে! রাসূল সা. বললেন, না তাকে কিছু বলো না। সে যেই বিপদে আক্রান্ত, আমার কাছে এর চিকিৎসার জন্যেই এসেছে। এরপর তাকে

লক্ষ্য করে বললেন, মিয়া! তুমি তোমার আত্মকাহিনী পুনরায় শোনাও। সাহাবী রা. পুনরায় সেই নির্মম কাহিনী শোনালেন। এবারও রাসূল সা. প্রচণ্ড কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। চোখের জলে তাঁর দাড়ি মুবারক ভিজে গেলো। এরপর তাকে সম্বোধন করে বললেন, তুমি ইসলামের ছায়াতলে এসেছ। এর বরকতে জাহেলী যুগের সকল গুনাহ মাফ হয়ে গেছে। যাও। এখন থেকে নেক কাজ করো।[৬]

আল্লাহই জানেন, তখনকার নির্মম পরিবেশে কতো নিষ্পাপ অসহায় প্রাণ সীমাহীন নিপীড়নের শিকার হয়েছিলো। কতো ফুলের মতো নিষ্কলুষ মেয়ে তার বাবা-মার হাতে জীবন্ত সমাধিস্থ হয়েছিলো। যদিও ওই যুগে কিছু দয়াপ্রবণ আল্লাহভীরু এমন মানুষ ছিলেন, যারা ওই জুলুম ও বর্বরতা থেকে তাদেরকে বাঁচাতে প্রাণান্ত চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বাস্তবতা হলো তা ছিলো একান্তই ব্যক্তিগত; যা প্রবল বেগে ধেয়ে আসা প্লাবন আটকে রাখার ক্ষেত্রে যথেষ্ট ছিলো না।

ফারাযদাকের পিতা চুরানব্বইটি শিশুকে জালিমের থাবা থেকে বাঁচিয়েছিলেন

ফারাযদাক। প্রাচীন আরবের বিখ্যাত কবি। সে গর্ব করে বলতো, তার দাদা স'স'আহ (صعصعة) ওই যুগে অসংখ্য কন্যা সন্তানকে জীবন্ত সমাধিস্থ হওয়ার কবল থেকে উদ্ধার করেছিলেন। কারণ হলো, আরবরা কোনো মেয়ে সন্তানের বাবা হওয়াকে খুবই লজ্জাষ্কর মনে করতো। স'স'আহ ওই ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন এভাবে—

'একবার আমার দু'টি উট হারিয়ে যায়। সেগুলোর সন্ধানে আমি বেরুলাম। হঠাৎ অনেক দূরে আলোর ঝলকানি লক্ষ্য করলাম। কখনো সেটি দীপ্ত জ্বলে ওঠতো। আবার খানিক বাদেই হারিয়ে যেতো। বিষয়টি আমাকে কৌতুহলী করে তুললো। ভাবলাম, হতে পারে সেখানে কোনো বিপদগ্রস্থ ব্যক্তি আগুন জ্বালিয়ে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছে। আমি তার কোনো উপকারে আসতে পারি। সম্ভব হলে আমি অবশ্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করবো। ভাবনামাফিক আমি উটের গতি তীব্র করলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই বনূ আনমার গোত্রের মহল্লায় হাজির হলাম। সেখানে দেখতে পেলাম, লম্বাচুলবিশিষ্ট জনৈক বৃদ্ধলোক ঘরের সামনে বসে আছে। চেহারায় শোকের ছাপ। বেশ ক'জন মহিলা একজন

---

৬. মুসনাদে দারেমী।

মহিলাকে ঘিরে আছে। মহিলা প্রসববেদনায় ছটফট করছে। সালাম বিনিময়ের পর জানতে পারলাম, তিন দিন হলো এ মহিলার প্রসববেদনা ওঠেছে। বৃদ্ধের সঙ্গে আলোচনাকালেই আওয়াজ এলো— বাচ্চা জন্ম নিয়েছে। বৃদ্ধ উঁচুস্বরে বললো। যদি ছেলে হয় তবে তো ভালো। আর মেয়ে হলে আমি তার কণ্ঠ শুনতে চাই না। তাকে এখুনি মেরে ফেলব।

বৃদ্ধকে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললাম, দাদা! এমনটি করবেন না, আপনারই তো মেয়ে। রুটি রুজির প্রশ্ন? আল্লাহই তো রিযিকদাতা।

বৃদ্ধ গর্জে উঠল— না। তাকে জীবিত রাখব না। তাকে হত্যাই করবো।

নরম সুরে অনেক পিড়াপীড়ি করলাম। তখন সে বললো, যদি তুমি এতটাই দয়াপ্রবণ হয়ে থাক তাহলে তুমি এর মূল্য দিয়ে নিয়ে যাও। লালন কর। আগ-পিছ না ভেবেই বললাম, ঠিক আছে। কিনে নিচ্ছি। মেয়েটিকে ক্রয় করে খুশিমনে ফিরে এলাম। আর আল্লাহ তাআলার সঙ্গে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলাম, মেয়েটিকে স্নেহ-মমতাভরে প্রতিপালন করবো। আল্লাহ তাআলার সঙ্গে এ অঙ্গীকারও করলাম— যখনই কোনো নির্দয় পাষণ্ড কোনো নিষ্পাপ মেয়েকে মারতে উদ্যত হবে; কখনো তা হতে দেবো না। মূল্য দিয়ে ছাড়িয়ে আনব। আদর-আহ্লাদে তাকে প্রতিপালন করবো।

এ ধারা চলতে থাকলো। আল্লাহ তাআলা রাসূল সা.-কে নবুওয়াত দিয়ে পাঠালেন। ততোদিনে তিনি চুরানব্বই জন মেয়েকে নিষ্ঠুর পাষণ্ড হন্তারক পিতার হাত থেকে রক্ষা করেছেন। এরপর তো রাসূল সা. চিরদিনের জন্য এ জঘন্যতম পাপের মূলোৎপাটন করেন।

ইসলাম সন্তান হত্যার সকল পৈশাচিক প্রথা রুদ্ধ করে সমাজব্যবস্থাকে পবিত্রতার বেদীতে তুলে দিয়েছে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় বান্দাগণের পরিচয় এভাবে দিয়েছেন, তারা তাদের সন্তানের জন্য দোয়া করে— আল্লাহ! তাদেরকে আমাদের চোখের প্রীতিকর বানাও। ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ

আর যারা বলে, 'হে আমাদের রব, আপনি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তানাদি দান করুন যারা আমাদের চক্ষু শীতল করবে।[৭]

---

৭. সূরা আল ফুরকান : আয়াত- ৭৪।

হযরত আলী ও ফাতেমা রা.-এর মাঝে খুনসুটি

রাসূলুল্লাহ্ সা. একদিন জামাতা হযরত আলী রা.-এর ঘরে উপস্থিত হন। ওই সময় ঘরে হযরত ফাতেমা রা. একাই ছিলেন। আলী রা. ছিলেন না। যা দেখে তিনি আদরের কন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় তোমার চাচার ছেলে'? হযরত ফাতেমা রা. বললেন, আমার ও তার মাঝে কিছু অপ্রীতিকর কাণ্ড ঘটেছে। যার কারণে তিনি আমার ওপর রাগ করে কোথাও চলে গেছেন। এমনকি তিনি দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম করতেও বাড়িতে আসেন নি।

নবী করীম সা. তখন এক ব্যক্তিকে ডেকে বললেন, একটু দেখে এসো তো আলী কোথায় গেছে'? লোকটি বললো, তিনি মসজিদের দেয়ালে হেলান দিয়ে শুয়ে আছেন? নবী করীম সা. তখন বিস্তারিত জানতে মসজিদে হাজির হয়ে দেখতে পেলেন, ঠিকই তিনি চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন। শরীর থেকে চাদর খানিকটা সরে গেছে। যার কারণে শরীরের কোথাও কোথাও মাটি লেগেছে। নবী করীম সা. তখন নিজ হাতে তাঁর শরীর থেকে মাটি ঝেড়ে দিতে দিতে বললেন, 'ওঠো হে আবু তোরাব! ওঠো হে মৃত্তিকাধারী!'

হযরত ইয়াকুব আ.-এর বিস্ময়কর আকাঙ্ক্ষা

হযরত আনাস রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ্ সা. আমাদেরকে একটি ঘটনা শোনালেন। বললেন, একবার একব্যক্তি এসে হযরত ইয়াকুব আ.-কে জিজ্ঞেস করল, হযরত! আপনি কেনো অন্ধ হলেন? আর আপনার কোমর বাঁকা হওয়ারই বা কারণ কী? হযরত ইয়াকুব আ. উত্তরে বললেন, চোখ গেছে ইউসুফের চিন্তায় কাঁদতে কাঁদতে। আর কোমর বাঁকা হয়েছে তার ভাই বিন ইয়ামীনের দুঃখে।

সঙ্গে সঙ্গে হযরত জিবরাইল আমীন আ. ইয়াকুব আ.-এর কাছে এসে বললেন, আপনি আল্লাহর নামে অভিযোগ করছেন? হযরত ইয়াকুব আ. বললেন, না, বরং আল্লাহর সকাশে নিজ দুঃখ-বেদনার কথা তুলে ধরছি। হযরত জিবরাইল আ. বললেন, আপনি যে দুঃখের বিবরণ দিলেন, তা আল্লাহ জানেন। এ কথা বলে হযরত জিবরাইল আমীন চলে গেলেন।

তখন হযরত ইয়াকুব আ. নিজ ঘরে প্রবেশ করে আল্লাহর কাছে হাত তুলে মিনতি জানিয়ে বললেন, হে আমার রব! তুমি কি এ বৃদ্ধের প্রতি দয়া করবে না? তুমিই আমার দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিয়েছ। আমার কোমর বাঁকা করেছ। হে আল্লাহ! আমার ফুল দু'টোকে আমার কাছে ফিরিয়ে দাও। একবার কেবল ঘ্রাণ নেবো। এরপর তোমার যা ইচ্ছা হয় আমার সাথে করো।

হযরত জিবরাইল আমীন পুনরায় আগমন করলেন। বললেন, হে ইয়াকুব! আল্লাহ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন। আর বলেছেন, ইয়াকুব সুসংবাদ গ্রহণ কর। যদি আপনার কোনো ছেলে মারা যেতো তবুও আপনার সম্মানার্থে তাকে জীবিত তুলে নিয়ে আসতাম। যেন তাকে দেখে আপনার দু'চোখ শীতল হয়।[৮]

মহান মায়ের দীক্ষায় বদলে গেল ভাগ্য

অনেক দিন আগের কথা। বণিকদের একটি কাফেলা বাগদাদ অভিমুখে পথ চলছে। যাত্রীদলে কমবয়সী একটি শিশুও ছিলো। যাকে তার জন্মদাত্রী মা কিছু উপদেশ সহকারে ওই কাফেলার সঙ্গে পাঠিয়ে ছিলেন। উদ্দেশ্য ছিলো, যেন আদরের সন্তান নিরাপদে অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে যায় এবং সেখান থেকে দীনি ইলম অর্জন করে আল্লাহর বান্দাদেরকে হেদায়াতের আলো দেখাতে পারে।

কাফেলাটি বেশ ভালোভাবেই পথ অতিক্রম করছিলো; কিন্তু পথিমধ্যে ডাকাত দল তাদের ওপর আক্রমণ করলো। কাফেলার সদস্যগণ তাদের জান-মাল রক্ষার্থে বিভিন্ন উপায় ও কৌশল অবলম্বন করলো; কিন্তু তাদের কোন উদ্যোগই কাজে এলো না। এমনকি তাদের আর্তচিৎকারেও ডাকাতদলের হৃদয়ে কোনো রূপ দয়ার উদ্রেক হলো না। তারা কাফেলার প্রতিটি সদস্যকে তন্ন তন্ন তালাশ করে যাবতীয় ধন-সম্পদ লুটে নিলো।

ডাকাত দল যখন তাদের লুণ্ঠনকর্ম সেরে ফিরে যাচ্ছিল তখন অসহায় এক কিশোরের ওপর তাদের চোখ পড়লো। দেখল সে ভাবলেশহীন স্থির দাঁড়িয়ে আছে। তারা তাকে জিজ্ঞেস করল— বলো, তোমার কাছে কী আছে?

কিশোর বললো— জি হ্যাঁ, আমার কাছে চল্লিশটি দিনার (স্বর্ণমুদ্রা) আছে।

ডাকাত : চল্লিশ দিনার আছে! (তাদের বিশ্বাস হচ্ছিলো না যে, এই পুরাতন কাপড় পরা দরিদ্র ছেলেটির কাছে এতোগুলো অর্থ কোত্থেকে এলো! আর যদি থেকেও থাকে তাহলে কিভাবে অকপটে আমাদের কাছে সত্য স্বীকার করছে! অবাক হয়ে তারা ছেলেটিকে সর্দারের কাছে নিয়ে এলো।)

ডাকাত— সর্দার! এ ছেলেকে দেখুন, সে বলে আমার নিকট চল্লিশ দিনার আছে।

সর্দার : মিয়া সাহেব, বাস্তবেই কি তোমার নিকট দিনার আছে?

কিশোর : জি হ্যাঁ, আমার কাছে চল্লিশ দিনার আছে।

---

৮. তারগীব ওয়াত তারহীব ৩/৩৫০।

সর্দার : ঠিক আছে। কোথায় রেখেছ? সর্দার অবাক নেত্রে তাকিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলো।

কিশোর : জি হ্যাঁ, আমার কোমরে একটি থলি বাঁধা আছে। সেখানে আছে।

সর্দার থলি খুললো। বাস্তবেই চল্লিশ দিনার ছিলো। সর্দার অবাক হলো। বিস্ময়ের ঘোরে ছেলেটির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলো। এরপর বললো, বৎস! তুমি কোথায় যাচ্ছো?

কিশোর : দীনি ইলম শেখার জন্যে বাগদাদ যাচ্ছি।

সর্দার : সেখানে তোমার পরিচিত কেউ আছে?

কিশোর : না, অচেনা শহর। আমার মা চল্লিশ দিনার দিয়েছিলেন যাতে নিশ্চিন্ত মনে ইলমে দীন শিক্ষা করতে পারি। অচেনা শহরে আমার প্রয়োজন কে পূরণ করবে আর কেনোই বা অন্যের করুণা চেয়ে হাত পাতবো?

সর্দার ভীষণ অবাক ও বিস্ময়ে কিশোরের কথাগুলো শুনছিলো। সে ভাবছিলো, এই কমবয়সী শিশু তার টাকাগুলোর কথা গোপন করলো না কেনো? যদি সে নিজ থেকে স্বীকার না করতো তাহলে তো আমাদের কেউ ঘূর্ণাক্ষরেও এ কথা জানতো না যে, হতদরিদ্র এ ছেলেটির কাছে এতোগুলো অর্থ লুকায়িত আছে। আর ওই ছেলেটিও কেনো ভাবলো না যে, আমি একটি অচেনা স্থানে যাচ্ছি। সেখানে আমার ভবিষ্যত ও জ্ঞানচর্চার পুরোটাই এ অর্থের ওপর নির্ভর করছে। এরপরও কেনো সে অর্থের বিষয়টি চেপে রাখলো না? শিশুটির সরলতা ও অকপট স্বীকারোক্তি ক্রমে ক্রমে ডাকাতসর্দারকে কুরে খাচ্ছিলো। সে জিজ্ঞেস করলো— বাবা! তুমি এই টাকাগুলোর কথা আমাদের কাছে কেনো গোপন করলে না? যদি তুমি নিজ থেকে স্বীকার না করে চেপে যেতে তাহলে তো আমরা কিছুতেই বুঝতে পারতাম না যে, তোমার কাছে এতোগুলো অর্থ আছে!!!

কিশোর বললো : ঘর হতে বের হবার সময় মা আমাকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন, 'বাবা! পরিবেশ-পরিস্থিতি অনুকূল-প্রতিকূল যেমনি হোক; কখনো মিথ্যা বলবে না।' আমি মায়ের সে কথা কিভাবে অমান্য করি!

তার কথাগুলো শুনে সর্দারের ভেতরের মনুষ্যত্ববোধ জাগ্রত হলো। সে ভাবতে লাগলো, এই কমবয়সী শিশুটি তার মায়ের এতোটাই অনুগত যে, নিজ চোখের সামনে ভবিষ্যত নষ্ট হতে দেখেও সে মায়ের নির্দেশ অমান্য করতে রাজি হলো না। অথচ আমরা দীর্ঘকাল ধরে আমাদের রবের নির্দেশ অমান্য করে চলেছি!

সে সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটিকে গলার সঙ্গে জড়িয়ে ধরলো। তার দিনারগুলো তার হাতে ফিরিয়ে দিলো। কাফেলার অন্যদের টাকাকড়িও ফেরত দিলো। এরপর আল্লাহর দরবারে সেজদাবনত হয়ে সাচ্চা মনে তাওবা-ইসতিগফার করলো।

মহান আল্লাহ তাদেরকে তাঁর দয়ার বিস্তৃত আঁচলে ঠাঁই দিলেন। ইতিহাস বলে, তারা প্রত্যেকেই পরবর্তীতে আল্লাহর অনেক বড় বুযুর্গে পরিণত হয়েছিলেন। আল্লাহর বান্দাদের সম্পদ লুণ্ঠনকারীরা হয়ে গেলো আল্লাহর দীনের দৌলত বণ্টনকারী। মহান মায়ের দীক্ষা শুধু তার স্নেহের সন্তানকেই বড় করেনি; একটি ডাকাতদলের ভাগ্যের গতিপথও বদলে দিলো। তিনি হলেন সেই মহান প্রতিভাবান ব্যক্তি; যাঁকে আজকের গোটা বিশ্ব 'আবদুল কাদের জিলানী রহ.' নামে স্মরণ করে থাকে। আজ যাঁর নাম উচ্চারিত হতেই প্রতিটি অন্তর শ্রদ্ধা ও সম্মানে ঝুঁকে যায়।

উপযুক্ত আত্মীয়তার সন্ধানে

সন্তানের বিয়েতে দেরি হওয়ার সাধারণত অন্যতম কারণ হলো, উপযুক্ত আত্মীয়তা না পাওয়া। আপনার এ চেষ্টা ও প্রচেষ্টা পুরোপুরি সঠিক যে, আপনি নিজ ছেলে-মেয়ের জন্য উপযুক্ত আত্মীয়তা খুঁজবেন। বরং এভাবে সন্ধান করা আপনার দায়িত্বও বটে। উপযুক্ত আত্মীয়তার সন্ধান করা ইসলামী শিক্ষারও দাবি।

ইসলাম কখনই এ কথা বলে না যে, আপনি ভালো-মন্দ যেমন সম্বন্ধ পাবেন বিন্দুমাত্র চিন্তা-ভাবনা না করে চোখ বন্ধ করে কবুল করবেন। বিয়ে খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি গোটা জীবনের ব্যাপার। এই সম্পর্কের কারণে শুধু দুনিয়াবি উত্থান-পতন হয়, এমন নয়, বরং বিয়ে পরকালীন যিন্দেগীর ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। কাজেই এটি খুবই জটিল বিষয়। জীবনসঙ্গী নির্বাচনের কাজটি খুবই ভেবে-চিন্তে করতে হবে।

তবে এক্ষেত্রে দেখার বিষয় হলো, আপনার বিচার-বিশ্লেষণ ও চিন্তা-ভাবনা যেন ইসলামের আলোকে হয়। চয়ন ও নির্বাচনের যেই মাপকাঠি ইসলাম ঘোষণা করেছে আপনাকে সেই মাপকাঠিতেই চিন্তা-ভাবনা করতে হবে। নিজের সন্তান-সন্ততির জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও আপনাকে শুধু ইসলাম নির্দেশিত পথই অবলম্বন করতে হবে। কোনো অর্থহীন নিরীক্ষণ করা যাবে না। আপনি যদি আপনার ছেলে বা মেয়ের জীবনসঙ্গী নির্বাচন করার ক্ষেত্রে এমন কিছু বিষয় প্রাধান্য দিয়ে থাকেন ইসলামে যার কোনো গুরুত্ব নেই। বিষয়গুলোকে স্রেফ সমাজব্যবস্থা গুরুত্ব দেয়, বিধায় আপনিও সেগুলোকে

গুরুত্ব দিলেন, আর এ কারণে আপনার ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেরি হচ্ছে তাহলে অবশ্যই সেটি নিন্দনীয় হবে। অথবা আপনি ওই সমস্ত ব্যাপারগুলো এজন্য এতো গুরুত্ব দিয়েছেন যে, এ ব্যাপারে ইসলামের শিক্ষা ও নির্দেশনা জানার চেষ্টাই করেন নি।

জীবনসঙ্গী নির্বাচনের মাপকাঠি

জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সাধারণত ৫টি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়–

১. ধন-সম্পদ
২. বংশ-আভিজাত্য
৩. রূপ-সৌন্দর্য
৪. দীনদারি ও চরিত্র
৫. শিক্ষা

এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, উপরোক্ত ৫টি বিষয় আপন স্থানে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। ধন-সম্পদের গুরুত্ব কে অস্বীকার করতে পারবে? বিশেষ করে বর্তমান যুগের প্রেক্ষিতে এটিতো খুবই প্রয়োজনীয়। কিছু কিছু কারণে বংশ ও পরিবার-পরিজনের অবস্থা বিবেচনার বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া যায় না। এমন কিছু পরিবার ও বংশ রয়েছে, যারা দীর্ঘদিন যাবত পশ্চাদপদতার শিকার। যার ফলে তাদের মাঝে কিছু সামাজিক, মানসিক ও নৈতিক দুর্বলতা রয়েছে। জীবন-যাপন পদ্ধতি, চিন্তা-ভাবনার ধরন, আচার-আচরণের ব্যবধান অনেক সময় এতোটাই প্রভাব ফেলে যে, শুধু এ কারণেই সুন্দর দাম্পত্য সম্পর্ক গড়ে ওঠতে পারে না।

পাত্র-পাত্রী বাছাই করার ক্ষেত্রে রূপ-সৌন্দর্যও অন্যতম মৌলিক বিষয়। বিশেষ করে পাত্রী নির্বাচনের ক্ষেত্রে এটিই সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় ভূমিকা পালন করে থাকে। আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিগতভাবে প্রতিটি মানুষের মাঝে সৌন্দর্যের প্রতি যে আকর্ষণ রেখেছেন, তা অস্বীকার করার কোনো উপায়-ই নেই।

শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাও সর্বজনস্বীকৃত। বর্তমান যুগে তো শিক্ষা-দীক্ষা ও ডিগ্রি-সনদ ইত্যাদি আত্মীয়তা করার ক্ষেত্রে সবিশেষ ভূমিকা পালন করে থাকে। বাস্তবতাও এ কথা বলে যে, শিক্ষা ব্যক্তির সাহসিকতাকে উচ্চতর করে, সভ্যতার উৎকর্ষে সাজিয়ে তোলে, সম্মান ও প্রতিপত্তি বয়ে আনে। এটি ব্যক্তির আর্থিক স্বচ্ছলতা ও সামাজিক মর্যাদার অনেক বড় উৎসও বটে।

বাকি থাকলো দীনদারি ও নৈতিকতার বিষয়টি। প্রত্যেক মুসলমানের কাছে এর প্রয়োজনীয়তাও অনস্বীকার্য হওয়াই উচিত। একজন মুসলমান মা

এ কথা কিভাবে মেনে নিতে পারবে যে, প্রস্তাবিত পাত্র-পাত্রীর যাবতীয় বিষয়-আশয় যাচাই করে দেখবে; কিন্তু দীনদারি ও নৈতিকতার ব্যাপারে কোনো যাচাই-বাছাই করবে না বা গুরুত্ব দেবে না?

যদি আপনার ইচ্ছে, কামনা ও প্রচেষ্টা এটাই হয় যে, আপনি আপনার ছেলে বা মেয়ের জন্যে এমন জীবনসঙ্গী খুঁজে আনবেন; যে উক্ত ৫টি মাপকাঠি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবে, তাহলে আপনার সেই ইচ্ছে পূরণ হোক। আমরা মুবারকবাদ জানাই। আপনার চেষ্টা যথাযথ, আপনার কামনা সঠিক, এটা আমরাও সত্যয়ন করবো। কে না চায়, তার আদরের সন্তানের জীবনসঙ্গী হোক উক্ত ৫টি মাপকাঠির বিচারে যথোপযুক্ত। ইসলাম কখনই আপনার সেই ইচ্ছে, কামনা ও চেষ্টার অবমূল্যায়ণ করবে না। আপনার আবেগ শরীয়তের মানদণ্ডেও যথাযথ।

যদি এমন কোনো জীবনসঙ্গী পেয়ে যান যার মাঝে উক্ত ৫টি বিষয়ের সবকটি আছে, তাহলে নিশ্চিত ধরে নিন, সেই জীবনসঙ্গী আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার জন্যে বিশেষ উপঢৌকন। তবে বাস্তবতা হলো, প্রতিটি আত্মীয়তার ক্ষেত্রে উক্ত ৫ বৈশিষ্ট্যের সবগুলোর সন্নিবেশ হওয়া খুবই দুরূহ। দোষ-গুণ মিলেই মানুষ। কাজেই কোনো বৈশিষ্ট্যের শূন্যতা পেলে ধরে নিতে হবে, এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনার পরীক্ষা হচ্ছে যে, আপনি জীবনসঙ্গী বাছাই করার ক্ষেত্রে ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গীর কতোটা অনুসরণ করেছেন? ইসলাম যে বিষয়কে প্রাধান্য দিতে বলেছে, আপনি সে বিষয়কে প্রাধান্য দিয়েছেন কি না?

রাসূলুল্লাহ সা.-এর নির্দেশনা

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, আপনি জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে সর্বাগ্রে দীনদারি ও আচার-নৈতিকতাকে প্রাধান্য দিন। যদি দীনদারি ও আখলাকের সঙ্গে সঙ্গে অন্য চারটি বিষয়ও পাওয়া যায় তাহলে তার ওপর আল্লাহর শোকর আদায় করুন। এমতবস্থায় ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে অকারণে টালবাহানা করা ঠিক হবে না। হ্যাঁ, ওই সম্পর্কটি আমার জন্য উপযুক্ত নয় যেখানে অন্যসব বৈশিষ্ট্য আছে; কিন্তু দীনদারির বিষয়টি হতাশাজনক। মুসলমান পিতা-মাতার কাছে সর্বাগ্রে দেখার বিষয় হলো, দীনদারি ও আখলাক। যদি কোনো পাত্র-পাত্রী অন্য বৈশিষ্ট্যগুলোতে উত্তীর্ণ হয়; কিন্তু দীনদারির ক্ষেত্রে পশ্চাতপদ হয় তাহলে সে কখনই আপনার আদরের ধন সন্তানের উপযুক্ত হতে পারে না। তাকে আপনার ঘরের বউ বা জামাতা কোনোটাই বানানো যাবে না। পক্ষান্তরে যদি কোনো পাত্র-পাত্রীর দীনদারি ও আখলাক সুন্দর হয়; কিন্তু অন্য কোনো

বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রে কমতি থাকে তাহলে সেটিকে মেনে নেয়া যাবে। কিন্তু অন্য বৈশিষ্ট্য শতভাগ পূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দীনদারি ও আখলাক থেকে বঞ্চিত হলে সেটিকে মেনে নেয়া যায় না। কারণ, অন্য কোনো গুণ দিয়ে এ শূন্যস্থান পূরণ হবে না। রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন–

বিয়ের ক্ষেত্রে সাধারণত মেয়েদের চারটি গুণ দেখা হয়: ১. ধন-সম্পদ, ২. বংশ-কৌলিন্য ৩. রূপ-সৌন্দর্য ৪. দীন ও আখলাক। তুমি দীনদার মেয়েকে বিয়ে করো তোমার কল্যাণ হবে।

উক্ত হাদীস আপনাকে এ কথা বলছে যে, আপনি আপনার ছেলের জন্যে এমন বউ আনবেন যে দীনদার হবে, ইসলামি চরিত্রে সুসজ্জিত হবে। এমন বউয়ের মাধ্যমে আপনার ঘর ইসলামের সূতিকাগারে পরিণত হবে। এমন বউয়ের কাছ থেকে আশা করা যায় যে, তার কোলে যে প্রজন্ম প্রতিপালিত হবে সেই প্রজন্ম ঈমান, দীনদারি ও ইসলামের জন্যে আকুলচিত্তের অধিকারী হবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ সা. ছেলের বউ ও মেয়ের জামাই নির্বাচন করার ক্ষেত্রে দীনদারি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে বুনিয়াদি বিষয় অভিহিত করেছেন।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন, যদি তোমাদের কাছে এমন কোনো ব্যক্তি বিয়ের প্রস্তাব পাঠায় যার দীনদারি ও আখলাক সন্তোষজনক তাহলে তার সঙ্গে তোমার সন্তানের বিয়ে দিয়ে দাও। যদি এমনটি না করো তাহলে পৃথিবীতে চরম দূরবস্থা দেখা দেবে।'

উক্ত হাদীস পরিষ্কার জানিয়ে দিচ্ছে, যখন আপনার কাছে এমন কোনো ছেলের পক্ষ থেকে বিয়ের প্রস্তাব আসবে যার দীনদারি ও আখলাক আপনার কাছে সন্তোষজনক, যার সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত জানেন যে, ছেলেটি খোদাভীরু, দীনদার, নামায-রোযা নিয়মিত আদায় করে, ইসলামী আখলাক তার মাঝে উপস্থিত। তাহলে কোনো ধরনের টালবাহানা না করে, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের পেছনে না ছুটে তার সঙ্গে আপনার আদরের দুলালির বিয়ে দিয়ে দিন। আর এরপর কল্যাণের কামনা করতে থাকুন। কারণ, বিয়ে–শাদির ক্ষেত্রে ইসলামের নির্দেশ হলো, আপনাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে দীনদারি ও ঈমানকে। যেই সমাজে দীনদারি ও ঈমানকে উপেক্ষা করে অন্য বিষয়গুলো প্রাধান্য দেওয়া হয়, অথবা ধন-সম্পদ ও রূপ-সৌন্দর্যকে দীন ও আখলাকের ওপর প্রাধান্য দেওয়া হয় ওই ধরনের সমাজে ফেতনা-ফাসাদের প্রলয়ঙ্কারী ঝড় ওঠবে। দুনিয়ার কোনো শক্তি সেই সমাজকে পতনের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে না।

একটু ভাবুন, মৃত্যুর আগে মৃত্যুর প্রস্তুতি নিন

১. আপনি কি ওসিয়তনামা লিখেছেন?
২. আপনি কি তাওবা করেছেন?
৩. আপনি কি দায়িত্বের সবটুকু ঋণ পরিশোধ করেছেন?
৪. আপনি কি স্ত্রীর মহর দিয়েছেন?
৫. আপনি কি আপনার সম্পদের যাবতীয় হক আদায় করেছেন?
৬. আপনি কি আপনার জানের সকল হক আদায় করেছেন?
৭. আপনার কি কোনো নামায কাযা আছে?
৮. আপনার কি কোনো রোযা কাযা আছে?
৯. আপনার যিম্মায় প্রদেয় কোনো যাকাত রয়ে গেছে কি?
১০. আপনি কি ফরয হজ পালন করেছেন?

কুরআনুল কারীমের আদব ও সম্মান

প্রশ্ন : বরাবর জনাব মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস পালনপুরী দা.বা.

সালাম মাসনূন!

কুরআনে কারীমের পুরাতন পাতাগুলোর অসম্মান করা, মসজিদে অগোছালো ও অবিন্যস্তভাবে যত্রতত্র কুরআন রেখে দেওয়া, গেলাফ ও মলাট ব্যতিরেকে অযত্নে কুরআন শরীফ পড়ে থাকতে দেখে আমাদের খুবই কষ্ট হয়। আমরা আপনার 'বিখরে মোতী' কিতাবটি প্রায় সময় পড়ে থাকি। বাস্তবতা হলো, এ কিতাবটি হাজার হাজার ঘরে নিয়মিত পাঠ হচ্ছে। আপনি যদি তার মাঝে এ জ্ঞানজিজ্ঞাসাটি উত্তর সহকারে আগামী সংস্করণে প্রকাশ করেন তাহলে উম্মতের অনেক বড় উপকার হবে। কুরআনে কারীমের সাথে অশ্রদ্ধা ও অসম্মানের পরিসমাপ্তি কিভাবে করা যায়, তার ওপর আপনি আলোকপাত করুন। আপনার উত্তরের অপেক্ষায় থাকবো।

নিবেদক
মুহাম্মদ আফজাল লাডিওয়ালে
মুম্বাই

উত্তর : আপনি আল্লাহ তাআলার মহান কালাম বিষয়ে যে প্রশ্ন করেছেন— এতে আমিও খুব মর্মাহত। বিশেষত যখন মসজিদে বা বাড়িতে কুরআনের এ অসম্মান দেখি তখন প্রচণ্ডভাবে মানসিক কষ্ট পাই। আসুন জেনে নিই, কুরআনের মর্যাদা কী? এবং এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন কেনো অতীব প্রয়োজনীয়?

পূর্ববর্তী আসমানী কিতাবগুলোকে শুধু কিতাবে এলাহী বলা হতো। কিন্তু কুরআনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো, এটি যেমন 'কিতাবে এলাহী' আবার তেমনি 'কালামে এলাহী'ও বটে। পূর্ণ কালাম সর্বপ্রথম লৌহে মাহফুযে সংরক্ষণ করা হয়। এরপর প্রয়োজন অনুপাতে তেইশ বছরে একটু একটু করে অবতীর্ণ হয়। অবতীর্ণের ধারা ছিল— আল্লাহ তাআলা হযরত জিবরাইল আ.-কে নিজ কালাম শোনাতেন। আর হযরত জিবরাইল আ. রাসূল সা.-এর কাছে ওহীর মাধ্যমে অবতীর্ণ করতেন।

এতো মর্যাদাবান ও মহিমান্বিত আসমানী কিতাব –যা আল্লাহর কালামও– আজ তার এ অবমাননার ওপর আমাদের বুক ভাসিয়ে কাঁদা উচিৎ। রাসূল সা. শেষ নবী। কুরআন আল্লাহ তাআলার সর্বশেষ প্রেরিত কিতাব। কিয়ামতের পূর্বে অন্য কোনো নবীর আগমন হবে না। অন্য কিতাবও অবতীর্ণ হবে না।

আজ আমাদের কাছে সেই সর্বশেষ কিতাব পবিত্র কুরআন বিদ্যমান। কিন্তু আমরা তার যথাযথ অধিকার প্রদান করছি না। উদাসীনতা ও শৈথিল্য প্রদর্শন করছি। বর্তমানে শুধু মৃত ব্যক্তিদের ঈসালে সাওয়াবের জন্য কুরআন পড়া হয় অথবা শপথ নেওয়ার জন্য তা হাতে নেওয়া হয়। এরপর তাকে ফেলে রাখা হয়। অথচ কুরআন অবতীর্ণ হবার উদ্দেশ্য ছিলো, তাকে নিয়ে গবেষণা করা হবে। তার আলোকে জীবন পরিচালিত হবে। যেন মানুষ তার দ্বারা স্বীয় ইহকাল ও পরকালকে আলোকিত করতে পারে।

পবিত্র কুরআন আজ মুসলমানদের হাতে নিগৃহিত। এরচে' দুঃখজনক আর কী হতে পারে? কেবল লেখার জন্যই নয়। শেখার জন্য লিখছি। বর্তমানে আমাদের অবস্থা হলো, নিজেরা উন্নত কাপড় পরিধান করে ঘুরে বেড়াই। আর কুরআন শরীফের গিলাফের প্রসঙ্গ এলে স্ত্রীকে বলি 'পুরানো কাপড় কেটে গিলাফ বানিয়ে ফেলো।' বলুন! এটি আমাদের কতটা নিচু মানসিকতার বহিঃপ্রকাশ। যেই মহান কিতাবটি আল্লাহ তাআলার কালাম এবং রাসূল সা. যার বাহক তার প্রতি অবজ্ঞা ও অবহেলা প্রদর্শন কত বড় দুঃসাহসিকতা! আল্লাহ তাআলা কি আমাদের এ জাতীয় অবজ্ঞা ও অবমাননা মেনে নেবেন?

দ্বিতীয় প্রসঙ্গ : যদি কুরআনে কারীম থেকে কোনো পাতা ছিঁড়ে যায় তাহলে কী করণীয়, সে প্রসঙ্গে আলোকপাত করছি।

সোজাকথা, আপনি কুরআন শরীফের ছিঁড়া পৃষ্ঠাগুলো মসজিদের বাইরে রাখা কোনো বক্সে একত্র করবেন। মসজিদ কর্তৃপক্ষ তা নদীতে নিক্ষেপ করবে।

আর এমনটি ঘরে হলে আরো সহজ। এর জন্য ভিন্ন একটি বাক্স রাখবে। কুরআন শরীফের ছিঁড়া পৃষ্ঠা, পত্র-পত্রিকার দীনি আলোচনা সম্বলিত পৃষ্ঠাগুলো, রমযানুল মুবারকের রোযা ও ইফতারের সময় সম্বলিত টাইমটেবিল ইত্যাদি যার ওপর কুরআনের আয়াত ও হাদীস মুদ্রিত থাকে তা ঘরে রাখা সেই বাক্সে একত্র করবেন। মাস-দু'মাসে তা যখন ভর্তি হবে তখন নিজে নদীতে ফেলে দেবেন। এতে কুরআনের অসম্মানও হবে না। আর বিধর্মীরাও বলতে পারবে না তোমরা তোমাদের ধর্মগ্রন্থ যত্রতত্র ফেলে রাখো।

বাণীটি ভাল করে বুঝুন— باادب بانصیب، بےادب بےنصیب : 'আদব সৌভাগ্য ও উন্নতির সোপান, আর বেয়াদবি দুর্ভাগ্য ও পতনের কারণ'।

পবিত্র কুরআন বা অন্য কোনো দীনি কিতাবের ছিঁড়া পৃষ্ঠার অসম্মান অবমাননা করা অনেক বড় গুনাহ। মসজিদে কুরআন শরীফ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও উন্নত গিলাফে ভরে সাজিয়ে রাখবেন। বড় সাইজের কুরআন শরীফগুলোকে আলাদা করে রাখবেন। ছোট সাইজের কুরআন শরীফের ওপর বড় সাইজের কুরআন শরীফ রাখা ঠিক নয়। কেননা এমতবস্থায় কারো অনিচ্ছাকৃত স্পর্শের কারণে কুরআনে কারীম মাটিতে পড়ে যাবার আশঙ্কা থাকে।

অনেক মুসল্লি মিম্বারে কুরআন শরীফ রাখে। এটাও ভুল। কুরআন শরীফের স্থান মিম্বার নয়। প্রতিটি মসজিদে স্বতন্ত্র তাক বা আলমারী থাকা চাই। মিম্বার হলো খতীব ও ইমামের দাঁড়ানো ও বসার স্থান এবং তা খুৎবা বা বক্তৃতা দেয়ার জন্য। তাতে কখনই কুরআন মাজিদ রাখতে নেই। অন্য কোনো দীনি কিতাবও রাখা সমীচীন হবে না।

আপনার আবেদনকে শ্রদ্ধা জানিয়ে আপনার প্রশ্নটি উত্তর সহকারে 'বিখরে মোতী'তে সংযুক্ত করছি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে তাঁর সর্বশেষ কিতাব 'কুরআনে হাকীম'-এর প্রতি যথাযথ সম্মান ও শ্রদ্ধা নিবেদনের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান করুন। কুরআনের অসম্মান ও অবমাননা থেকে আমাদের হিফাযত করুন। আমীন।

وَمَا عَلَيْنَا إِلاَّ الْبَلاَغ.

মাওলানা মুহাম্মদ ইউনুস পালনপুরী
১৩ শাওয়াল ১৪২৭ হি. ২৬ অক্টোবর ২০০৭ ঈ.

টাকায় বই কেনা যায়; বিদ্যা পাওয়া যায় না

সম্পদ দ্বারা পৃথিবীর বহু উপকার অর্জন করা যাবে; কিন্তু সব সমস্যায় সম্পদ কাজে আসে না। উদাহরণস্বরূপ,

* টাকাকড়ি দিয়ে চোখ কেনা যাবে; কিন্তু দৃষ্টিশক্তি কেনা যাবে না।

* সম্পদ দ্বারা নরম বিছানা ক্রয় করা যায়; কিন্তু সুখনিদ্রা পাওয়া যাবে না।

* সম্পদ দিয়ে আমরা অনেক বই কিনতে পারবো; কিন্তু বিদ্যা পাবো না।

* সম্পদ দ্বারা তোষামোদ পাওয়া যায়; কিন্তু ভালবাসা ও শ্রদ্ধা পাওয়া যায় না।

* সম্পদ দ্বারা অলংকার ক্রয় করা যায়; কিন্তু সৌন্দর্য ক্রয় করা যাবে না।

* সম্পদ দ্বারা বাড়িতে ভৃত্য আনা যাবে; কিন্তু সন্তান পাওয়া যাবে না।

* সম্পদ দ্বারা চুল কালো করার খেজাব (কলপ) ক্রয় করা যাবে; কিন্তু যৌবন ফিরে পাওয়া যাবে না।

সুতরাং মানুষের উচিৎ, টাকাকড়ি ও মাল-সম্পদের পেছনে না পড়ে ইলমের পেছনে পড়া। যাতে পারলৌকিক সফলতা অর্জন করা যায়।

দীনদার গরীব আল্লাহর আপনজন

হযরত উসামা ইবনে যায়েদ রা. বর্ণনা করেন, কিয়ামতের দিন ওই সকল লোক আল্লাহ তাআলার অতি নিকটবর্তী হবে যাদের বৈশিষ্ট্য হলো, তারা পৃথিবীতে দীর্ঘ সময় ক্ষুৎপিপাসা ও দুঃখ-কষ্টে কাটিয়েছে। তারা এমন যে, হারিয়ে গেলে কেউ তাদের খুঁজে বের করতো না। রাতে যখন লোকেরা বিছানায় সুখনিদ্রায় বিভোর থাকে তখন তারা রবের সকাশে কপাল ও হাঁটু পেতে অঝোরে কাঁদে। তাদের কারো ইন্তেকাল হলে জমিনও কান্না করে। কোনো শহরে তাদের দেখা পেলে বুঝবে ওইসব ব্যক্তিই ওই শহরের ঈমানের নিদর্শন।

বন্ধুকে উর্দূতে কেনো দোস্ত বলা হয়?

পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে শুনেছি, 'দোস্ত' শব্দটি চার অক্ষরের সমন্বিত রূপ। যার বিবরণ হলো—

د : দাল দিয়ে درد ব্যথা। অর্থাৎ যিনি দুঃখ বেদনা মোচনকারী হবে।

و : ওয়াও দিয়ে وفاء । অর্থাৎ যিনি জীবনভর বিশ্বস্ত থাকবে।

س : সীন দিয়ে سچ (সত্যবাদিতা)। অর্থাৎ অন্যের সঙ্গে সৎ আচরণ করবে।

ت : তা দিয়ে تابع (অনুগত)। অর্থাৎ একে অপরের কথা মানতে প্রস্তুত থাকবে।

হযরত হাসান বসরী রহ.-এর জীবনী পড়ুন

১. উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামাহ রা.-কে এক ব্যক্তি এ সুসংবাদ শোনালেন যে, তাঁর বাঁদি 'খায়রাহ' একটি ছেলেসন্তান জন্ম দিয়েছে। সুসংবাদ শুনে হযরত উম্মে সালামাহ রা. প্রচণ্ড আনন্দিত হলেন। তাঁর পবিত্র চেহারায় আনন্দের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস ফুটে ওঠলো। প্রথম সুযোগেই শিশুর নিষ্পাপ মুখখানা দেখার আবেগ উথলে ওঠলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সন্তানের মা ও সদ্য ভূমিষ্ট হওয়া সন্তানকে ঘরে ডেকে পাঠালেন। এমনিতেও তিনি তাঁর এ বাঁদিকে সীমাহীন ভালোবাসতেন। সবসময় তার ভালো-মন্দের খোঁজ-খবর রাখতেন। এ কারণেই তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছিলো, প্রসব পরবর্তী সময়গুলো সে এখানেই অতিবাহিত করুক।

২. ডাকার কিছুক্ষণের মধ্যেই বাঁদি 'খায়রাহ' নিজ হাতে সদ্যপ্রসূত শিশুকে পরম মমতায় জড়িয়ে হযরত উম্মে সালামাহ রা.-এর গৃহে চলে এলেন। নিষ্পাপ শিশুর অনিন্দ্য সুন্দর মুখখানার ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়তেই হৃদয়ে তোলপাড় শুরু হয়ে গেলো। তিনি এগিয়ে এসে শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন। আদর করলেন। বাস্তবেই শিশুটি ছিলো মহান আল্লাহর এক অমূল্য উপহার। তার চাঁদকপালে বিমুগ্ধ জ্যোতি জ্বলজ্বল করছিলো। হাসিতে হেসে ওঠছিলো পূর্ণিমার আলো। শরীর-স্বাস্থ্যও ছিলো ঈর্ষণীয়। শিশুটির চেহারা এতোটাই মায়াবি ছিলো যে, তার ওপর যার-ই দৃষ্টি পড়তো, পলকেই মুগ্ধ হয়ে যেতো।

হযরত উম্মে সালামাহ রা. জিজ্ঞেস করলেন– হে খায়রাহ! তুমি তোমার সন্তানের জন্যে কী নাম পছন্দ করেছো? উত্তরে বাঁদি বললো, 'আম্মিজান! আমি এখনো কোনো নাম ঠিক করিনি। সেই ভার আপনার ওপর ছেড়ে দিয়েছি। আপনি আপনার পছন্দের একটি নাম রেখে দিন।

বললেন– মহান আল্লাহর রহমত ও বরকতের ওপর আস্থা রেখে আমি শিশুটির নাম 'হাসান' প্রস্তাব করছি। এরপর তিনি দু'হাত তুলে শিশুটির জন্যে মহান আল্লাহর কাছে দোয়া করলেন।

৩. 'হাসান' নামের এই শিশুটির জন্মে শুধু উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালামাহ রা.-এর গৃহই উল্লাসে ভরে ওঠেনি; মদীনা মুনাওয়ারার প্রতিটি ঘর সেই উল্লাসে সমান উল্লসিত হয়ে ওঠেছিলো। যেমন, মহান ওহী লেখক হযরত যায়েদ ইবনে সাবেত রা.-এর ঘরেও সেদিন আনন্দের ফল্গুধারা বইছিলো। কারণ, এ শিশুটির পিতা হলেন তাঁরই গোলাম হযরত 'বিসয়ার' রহ.। তিনিও তাঁর এই গোলামকে অত্যন্ত সমীহ করতেন, সম্মান দিতেন ও ভালোবাসতেন।

৪. জন্মের সময় যদিও শিশুটির নাম ছিলো হাসান বিসয়ার; কিন্তু পরবর্তীতে তিনি 'হাসান বসরী' নামে জগদ্বিখ্যাত হয়ে ওঠেন। রাসূলুল্লাহ সা.-এর পুণ্যবতী স্ত্রী হযরত হিন্দ বিনতে আবী উমাইয়্যাহ (যিনি 'উম্মে সালামাহ নামে অধিক প্রসিদ্ধ) রা.-এর গৃহেই প্রতিপালিত হন।

ব্যক্তিগতভাবে হযরত উম্মে সালামাহ রা. ছিলেন তৎকালীন আরবের অন্যতম বিদুষী, খোদাভীরু, রুচিশীল, অনুভূতিপ্রবণ ও গুণবতী নারী। রূপে-গুণে তাঁর মতো কেউ ছিলো না। জ্ঞান, প্রজ্ঞা, দীক্ষা ও খোদাভীরুতার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন স্বতন্ত্র আসনে সমাসীন। তাঁর সূত্রে ৩৭৮ টি হাদীস বর্ণিত রয়েছে। জাহেলী যুগেও তিনি ছিলেন আরবের হাতেগানা অল্পক'জন শিক্ষিতা নারীদের একজন।

হযরত উম্মে সালামাহ রা.-এর সঙ্গে হযরত হাসান বসরী রহ.-এর শুধু 'বাঁদির ছেলে'-এ সম্পর্কই ছিলো না; বরং আরো গভীর ও আরো সস্নেহ সম্পর্ক ছিলো। কারণ হলো, প্রায়সময় দেখা যেতো হযরত উম্মে সালামাহ রা.-এর কোনো জরুরী প্রয়োজনীয় কাজ সম্পন্ন করার জন্যে তাঁর মা 'খায়রাহ' যখন বাইরে যেতেন আর ক্ষুৎপিপাসার কারণে শিশু হাসান কেঁদে ওঠতো তখন হযরত উম্মে সালামাহ রা. তাঁকে কোলে তুলে নিতেন। জননীর অনুপস্থিতির কারণে কান্নারত শিশুকে আশ্বস্ত করতে তিনি শিশুর মুখে স্তন লাগিয়ে দিতেন। দুধ নেমে আসতো। যা পান করে পরিতৃপ্ত হয়ে শিশু হাসান রহ. ঘুমিয়ে যেতেন।

যার ফলে তাঁর সঙ্গে হযরত হাসান বসরী রহ.-এর দু'ধরনের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১. উম্মুল মুমিনীন হওয়ার সূত্রে 'মা', ২. দুধ মা।

৫. উম্মাহাতুল মুমিনীনদের সঙ্গে স্নেহের সম্পর্ক ও তাঁদের ঘরগুলো কাছাকাছি হওয়ার কারণে সৌভাগ্যবান শিশু 'হাসান' প্রায় সকল উম্মুল মুমিনীনের ঘরে যাতায়াত করার বিরল সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যার ফলে তিনি সেই পরিবারগুলো থেকে পবিত্রতা, নৈতিকতা ও স্বচ্ছতার পবিত্র দীক্ষা লাভ করেছিলেন।

হযরত হাসান বসরী রহ. নিজেই বলেছেন, শৈশবের দিনগুলোতে নবীজির পুণ্যবতী স্ত্রীদের ঘরে আমার অবাধ যাতায়াত ছিলো। সেখানেই হাসি-খুশিতে ব্যস্ত থাকতাম। অনেক সময় লাফিয়ে আমি এক ঘরের ছাদ থেকে অন্য ঘরের ছাদে চলে যেতাম। কেউ আমাকে বারণ করতো না।

৬. তাঁর শৈশবের দিনগুলো নবীজির পুণ্যবতী স্ত্রীদের আলোকিত ঘরগুলোতে হেসে-খেলে অতিবাহিত হয়। তাঁদের হিদায়াত ও সততার পবিত্র ফোয়ারা থেকে

তিনি পরিতৃপ্তি সহকারে পান করেছেন। পরবর্তীতে তিনি মসজিদে নববীর বড় বড় সাহাবায়ে কেরামের শিষ্যত্ব লাভ করে নিজেকে ধন্য করতে সমর্থ হন। তাদের কাছ থেকে বিদ্যার্জনের কোনো সুযোগই তিনি হাত ছাড়া করেন নি।

তাঁর মহান শিক্ষাগুরুদের তালিকায় রয়েছেন হযরত উসমান ইবনে আফফান রা., হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রা., হযরত আবু মূসা আশ'আরী রা., হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর মতো বড় বড় সাহাবী। তাঁদের কাছ থেকে হাদীস বর্ণনার মহাসৌভাগ্যও তিনি লাভ করেছেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, তিনি ছিলেন আমীরুল মুমিনীন হযরত আলী ইবন আবী তালিব রা.-এর খুবই প্রিয়পাত্র। দীনি মাসআলার ক্ষেত্রে তাঁর মজবুত দলিল, ইবাদতের গভীর আসক্তি, পার্থিব সাজ-সজ্জার প্রতি তাঁর নির্লিপ্ত মনোভাব হযরত হাসান বসরী রহ.-কে খুবই প্রভাবিত করে। হযরত আলী রা.-এর যাদুমীয় ভাষণ, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাদীপ্ত আলোচনা, ছন্দ ও অন্তমিলযুক্ত কথামালা, হৃদয়ছোঁয়া হিতোপদেশ হযরত হাসান বসরী রহ.-এর মনে গভীর দাগ কেটেছিলো।

তিনি তাঁর কাছ থেকে একদিকে যেমন তাকওয়া ও খোদাভীরুতার দীক্ষা নিয়েছেন, অন্যদিকে তাঁর সাহিত্য ও অলঙ্কারের বিশাল ভাণ্ডার থেকেও উপকৃত হয়েছেন।

১৪ বছর বয়সে হযরত হাসান বসরী রহ. পিতা-মাতার সঙ্গে বসরা নগরীতে চলে আসেন। তার গোত্রের সবাই তখন এই নগরীতেই স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন। এভাবে তিনি বসরানিবাসী হয়ে যান এবং একদিন 'বসরী' নামে পরিচিতি লাভ করেন।

৭. যখন হযরত হাসান বসরী রহ. এই নগরীতে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেন তখন এ নগরীটি ছিলো তৎকালীন বিশ্বের নানা জ্ঞান ও বিদ্যার সবচেয়ে বড় চর্চাকেন্দ্র। বসরার কেন্দ্রীয় মসজিদে নিয়মিত বড় বড় সাহাবী ও তাবেয়ীদের জ্ঞানচর্চার বিশাল মজলিস আয়োজিত হতো। মসজিদ ভবন ও আঙ্গিনায় বড় বড় আসর হতো। হযরত হাসান বসরী রহ. উম্মতের সর্বশ্রেষ্ঠ আলেম ও মুফাসসির হযরত আবদুল্লাহ ইবন আব্বাস রা.-এর ইলমীমজলিসে যোগদান করেন। তাঁর কাছ থেকে তিনি তাফসীর, হাদীস ও তাজবীদ শাস্ত্রের গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। অন্য সাহাবীদের কাছ থেকে ফেক্বাহ, ভাষা ও সাহিত্যের বুৎপত্তিও লাভ করেন। এভাবে সময়ের সাথে সাথে তিনি গভীর জ্ঞানসম্পন্ন আলেমের স্তরে নিজেকে উন্নীত করতে সমর্থ হন। জ্ঞানেরগভীরতার কারণে মানুষ তাঁর কাছে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসতো। কারণ, তাঁর কাছে

তারা পেতো এমন হৃদয়ছোঁয়া উপদেশমালা– যা শুনে পাথরের মতো অন্তরও মুহূর্তেই মোমের মতো গলে যেতে বাধ্য হতো। গুনাহগারের চোখ থেকে টপটপ করে অশ্রু ঝরতো। তাঁর মুখনিসৃত প্রতিটি বাণীকেই মানুষ জীবনের পরম পুঁজি মনে করে হৃদয়ে গেঁথে নিতো। তাঁর সুমহান জীবনাদর্শ নিজের জীবনে প্রতিবিম্বিত করার কসরত সবার মাঝেই পরিলক্ষিত হতো।

৮. এক সময় হযরত হাসান বসরী রহ.-এর নাম তৎকালীন মুসলিম জাহানের সর্বত্রে পৌঁছে যায়। জ্ঞানচর্চার মজলিসগুলোতে তাঁর নাম সুনামের সঙ্গে উচ্চারিত হতে থাকে। তাঁর শারীরিক কুশলাদি জানতে পারাকে শাসকবর্গ পর্যন্ত নিজেদের জন্যে পরম সৌভাগ্যের মনে করতো। যার কারণে প্রতি মুহূর্তে তিনি কী করছেন, তা জানতে সবাই ব্যাকুল থাকতেন।

খালেদ ইবনে সাফওয়ান বলেন, আমি ইরাকের অন্যতম প্রাচীন শহর 'হীরাহ'-এ বনূ উমাইয়ার সেনাপতি ও কসতনতুনিয়া বিজয়ী অমর ব্যক্তিত্ব মাসলামাহ ইবনে আবদুল মালিকের সঙ্গে সাক্ষাত করি। তখন তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেন– 'খালেদ! আমাদের কাছে হাসান বসরী রহ.-এর পরিচিতি তুলে ধরো। আমি মনে করি, তাঁর সম্পর্কে তুমি যতটুকু জানো আর কেউ এতোটা জানে না।

আমি বললাম– আপনার জীবনে সুউচ্চ সৌভাগ্য আসুক। সাফল্য আপনার পদচুম্বন করুক। নিঃসন্দেহে আমি আপনাকে তাঁর সম্পর্কে উত্তম তথ্য দিতে পারবো। কেননা আমি একদিকে তাঁর প্রতিবেশী, অন্যদিকে তাঁর সহপাঠী। পুরো বসরা নগরীতে তাঁর সম্পর্কে আমার চেয়ে বেশী কারো জানা থাকার কথা নয়।

তিনি তখন বললেন, তাহলে তাঁর সম্পর্কে কিছু কথা আমাদেরকেও অবহিত করুন।

আমি বললাম, তাঁর ভিতরে ও বাইরে একই রকম। কথা ও কাজের মাঝে বিন্দু পরিমাণ বৈপরিত্ব নেই। তিনি কাউকে কোনো নেক কাজের আদেশ দেয়ার পূর্বে প্রথমে নিজে তার ওপর আমল করেন। আর যখন কাউকে কোনো অসৎ কাজ থেকে বারণ করেন, তো নিজে কখনই ওই অন্যায়ের ধারে-কাছেও যান না। আমি তাঁকে দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও বিত্ত-বৈভব থেকে পুরোপুরি নির্মোহ পেয়েছি। ব্যক্তিগতভাবে তিনি নিজেই জ্ঞান ও তাকওয়ার ভাণ্ডার। মানুষ তাঁর সেই ভাণ্ডার থেকে আহরণ করার জন্যে পঙ্গপালের মতো ছুটে আসে। তিনি মানুষের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

আমার মুখ থেকে কথাগুলো শুনে জেনারেল মাসলামাহ ইবন আবদিল মালিকের দু'চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরতে লাগলো। কান্নাবিজড়িত কণ্ঠে তিনি

বললেন, খালেদ! ক্ষ্যান্ত হও। এতোটুকুই যথেষ্ট। যেই জাতির মাঝে হাসান বসরী রহ.-এর মতো সুমহান চরিত্রের মনীষী জীবিত থাকবেন সেই জাতি আদৌ পথহারা হতে পারে না।

৯. হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ সাকাফী ইরাকের গভর্নর পদে চেপে বসার পর থেকে সেখানে অত্যাচার-নিপীড়নের বন্যা বইছিলো। হযরত হাসান বসরী রহ. ছিলেন তার শাসনামলের সেই মুষ্ঠিমেয় অল্প কয়েকজন মানুষের একজন– যারা সাহসিকতার সঙ্গে তার অত্যাচার-নিপীড়নের প্রতিবাদে রুখে দাঁড়িয়েছেন। তার অন্যায় কাজগুলোর নির্ভয়ে সমালোচনা করেছেন। মুখের ওপর প্রতিবাদ করার সামান্য সুযোগও তিনি হাতছাড়া করেননি।

হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ শহরের মধ্যভাগে নিজের জন্যে একটি আলীশান রাজপ্রাসাদ তৈরি করে। নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর উদ্বোধনের দিন সে লোকজনকে প্রাসাদ দেখানোর জন্যে আড়ম্বরপূর্ণ ভোজসভার আয়োজন করে। উদ্দেশ্য হলো, তারা এ প্রাসাদ ঘুরে ঘুরে দেখবে এবং উৎফুল্লচিত্তে প্রশংসা করবে।

হযরত হাসান বসরী রহ. তখন মনে করলেন, এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করা যাবে না। তিনি এ নিয়তে ঘর থেকে বেরোলেন যে, লোকদেরকে এ সুযোগে কিছু উপদেশ শুনিয়ে দেবেন, তাদেরকে দুনিয়ার অর্থ-বৈভব ছুড়ে ফেলার পাঠ শেখাবেন। এর বিপরীতে আল্লাহর পক্ষ থেকে বিভিন্ন পুরস্কার অর্জন করার কাজে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন।

তিনি যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন, অসংখ্য মানুষ হাজ্জাজের আলীশান ভবনের চারপাশে জড়ো হয়েছে। তার ভবনের নির্মাণশৈলীর উচ্ছ্বাসিত প্রশংসা করছে। তাদের চোখে-মুখে স্পষ্ট প্রভাব ও মুগ্ধতা ফুটে ওঠেছে। তিনি তখন তাদেরকে শক্ত ভাষায় বললেন— 'আমাদের জানা থাকা দরকার যে, ফেরাউনও এরচেয়ে অধিক শক্তিশালী, অধিক সুন্দর আলীশান অট্টালিকা তৈরি করেছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা ফেরাউনকে ধ্বংস করে দিয়েছেন এবং তার প্রাসাদকে ধুলিস্যাৎ করেছেন।' হায়! হাজ্জাজ যদি এ কথা জানতো যে, আকাশের অধিপতি তার ওপর ভীষণ অসন্তুষ্ট আর জমিনবাসী তাকে প্রতারণার মধ্যে রেখেছে।'

এভাবে তিনি পূর্ণ উদ্দীপনার সঙ্গে হাজ্জাজের বিরুদ্ধে নিন্দার ঝড় তুললেন তুবড়ি ছোটালেন। তাঁর মুখ থেকে কথাগুলো তীরের মতো বর্ষিত হচ্ছিলো। গোটা সভাস্থলে পিনপতন নীরবতা নেমে এলো। সবাই তাঁর অনলবর্ষী কথাগুলো সচকিত কর্ণে শুনে যাচ্ছিলো। সভাস্থলে উপস্থিত

একব্যক্তি তখন হাজ্জাজের প্রতিশোধকামী মনোবৃত্তির ভয়ে আতঙ্কিত হয়ে হযরত হাসান বসরী রহ.-কে বললেন, জনাব! এবার থামুন। যথেষ্ট বলেছেন। কেনো আপনি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ফেলছেন?

ওই সাচ্চামনের মানুষটিকে সম্বোধন করে হযরত হাসান বসরী রহ. বললেন, ভাই আমার! আল্লাহ তাআলা আলেমদের কাছ থেকে এ মর্মে অঙ্গীকার নিয়েছেন যে, তারা জালিমের মুখের ওপর নির্ভয়ে সত্য কথা প্রচার করবে। তারা এ আমানত পূর্ণ সততার সঙ্গে আদায় করবে। এটাই সর্বযুগে হকপন্থীদের স্বতন্ত্র প্রতীক। আজ আমি সেই দায়িত্বই পালন করছি।

১০. হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ ক্রোধের প্রচণ্ডতায় রক্তিম চোখে গভর্নর হাউজে হাজির হলো। সে অগ্নিশর্মা হয়ে সভাষদদের বললো, তোমাদের ওপর লক্ষ অভিশাপ! তোমরা প্রত্যেকেই কাপুরুষ, নরাধম। আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। কতো বড় আফসোসের কথা, বসরার ক্রীতদাসের ঘরের এক ক্রীতদাস ভরা মজলিসে অবলীলায় আমার বিরুদ্ধে যথেচ্ছা বলে গেছে। তোমাদের মধ্যে কারোরই এ সাহস হলো না যে, সে তাঁকে প্রতিহত করবে। লজ্জা করা দরকার। কাপুরুষের দল! পরিষ্কার শুনে নাও। আমি খোদার কসম খেয়ে বলছি, এখন আমি অবশ্যই তোমাদেরকে তাঁর খুন পান করাবো। আজ আমি তাঁকে এমন ন্যাক্কারজনক শাস্তি দেবো যে, গোটা দুনিয়া কেঁপে ওঠবে।

এ কথা বলে সে একটি তরবারি ও চামড়ার তৈরি চাদর হাজির করার নির্দেশ দিলো। সঙ্গে সঙ্গে সেগুলো তার সামনে পেশ করা হলো। এরপর জল্লাদকে নির্দেশ করলো। চোখের পলকেই জল্লাদ এসে হাজির হলো। এরপর পুলিশ বাহিনীকে নির্দেশ করলো, অনতিবিলম্বে হাসান বসরীকে গ্রেফতার করে নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণের মধ্যেই পুলিশ তাঁকে পাকড়াও করে হাজ্জাজের সামনে হাজির করলো। ওই সময়কার পরিস্থিতি ছিলো খুবই ভয়াবহ। চারদিকে প্রচণ্ড আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিলো। সবাই তখন আকাশের দিকে দৃষ্টি উঠিয়ে আর্তনাদ করছিলো। প্রত্যেকেই বিষন্ন মনে কাঁপছিলো। হযরত হাসান বসরী গভর্নর হাউজে একসঙ্গে তরবারি, চামড়ার চাদর ও জল্লাদের উপস্থিতি দেখে ঘটনা বুঝে ফেললেন। মুখের ওপর মুচকি হাসি ছড়িয়ে তেলাওয়াত শুরু করে দিলেন।

যখন তাঁকে হাজ্জাজের সামনে উপস্থিত করা হয় তখন তিনি ছিলেন পূর্ণ শান্ত ও নির্বিকার। চেহারায় সত্যিকারের মুমিনের ঈমানী দীপ্তি, নির্লিপ্ত শান্ত ভাব ও একজন দীনপ্রচারকের সবগুলো বৈশিষ্ট্য শোভা পাচ্ছিলো।

তাঁর দিকে তাকাতেই হাজ্জাজের কলিজার ভিতর মোচড় দিয়ে ওঠলো। মুহূর্তেই রাজ্যের ক্রোধ হারিয়ে গেলো। উল্টো সে নিজেই আতঙ্ক বোধ করতে লাগলো। মৃদু কণ্ঠে বললো, হে আবু সাঈদ হাসান বসরী! আপনাকে আমি এখানে অভ্যর্থনা জানাচ্ছি। আসুন! আমার কাছাকাছি আসন গ্রহণ করুন।

একটি উপযুক্ত স্থানে হযরত হাসান বসরী রহ.-কে বসতে দেখে হাজ্জাজ বললো, না, আরেকটু কাছে এসে বসুন। এরপর হাজ্জাজ নিজের আসন থেকে উঠে মাথার মুকুট খুলে হযরতের মাথায় পরিয়ে দিলো।

মানুষ অবাক চোখে হাজ্জাজের এই কর্মকাণ্ড দেখছিলো। বিস্ময়ে তারা নির্বাক হয়ে গিয়েছিলো। যখন হযরত হাসান বসরী রহ. সিংহাসনে উপনিবেশ করলেন তখন হাজ্জাজ তাঁকে বিভিন্ন দীনি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে লাগলো। হযরত হাসান বসরী রহ. পূর্ণ মনোযোগ সহকারে যাদুকরী কণ্ঠে, বিজ্ঞোচিতভাবে তাকে তার প্রতিটি প্রশ্নের উত্তর বলে দিলেন। তাঁর উত্তর শুনে হাজ্জাজ খুবই প্রভাবিত হলো। মুগ্ধকণ্ঠে বললো, 'হে আবু সাঈদ! আপনি আসলেই আলেমকুল শিরোমণি।' এরপর উৎকৃষ্ট আতর এনে তাঁর দাড়িতে মেখে দিলো। সভাশেষে তাঁকে উষ্ণতার সঙ্গে বিদায়ও জানালো।

দরবার থেকে বেরোনোর পথে হাজ্জাজের রাজপ্রাসাদের দারোয়ান তাঁর পেছনে পেছনে হাঁটতে লাগলো। নিরাপদ দূরত্বে যাওয়ার পর বললো, হযরত! হাজ্জাজ তো আজ আপনাকে অন্য উদ্দেশ্যে ডেকেছিলো। কিন্তু তার পক্ষ থেকে এমন সদাচরণ দেখে আমি তো হতবাক হয়ে গেছি। তবে আপনি আমাকে বলুন, যখন সে আপনাকে গ্রেফতার করে দরবারে হাজির করে তখন সেখানে তরবারি, জল্লাদ ও চামড়ার চাদর দেখতে পেয়ে আপনার ঠোঁট নড়ে ওঠেছিলো। বলুন, আপনি তখন কী পাঠ করছিলেন?

হযরত হাসান বসরী রহ. বললেন— আমি ওই সময় এ দোয়া করেছিলাম যে, হে আমার মাবুদ! তুমি আমার ওপর বর্ষিত সমস্ত নেয়ামতের অভিভাবক ও প্রতিটি বিপদ থেকে ত্রাণদাতা আশ্রয়। হে মাবুদ! সমস্ত সৃষ্টিজীবের অন্তর তোমার হাতে। তুমি হাজ্জাজের ক্রোধকে আমার জন্যে শীতল ও নিরাপদ করে দাও। যেভাবে তুমি নিজ বন্ধু ইবরাহীমের জন্যে আগুনকে শীতল ও নিরাপদ করে দিয়েছিলে।'

مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے
وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے

'বিবাদী যতই অনিষ্ট কামনা করুক; কী হবে তাতে,
সেটাই ঘটবে যা আল্লাহর নির্দেশে মঞ্জুর হবে।'

আল্লাহ তাআলা আমার সেই দোয়া কবুল করেন। মুহূর্তেই তিনি হাজ্জাজের ক্রোধকে ভালোবাসায় রূপান্তর করে দেন।

১১. হযরত হাসান বসরী রহ.-কে এভাবে অসংখ্যবার জালিম শাসকের কোপানলে পড়তে হয়েছিলো। কিন্তু প্রতিবারই আল্লাহ তাঁর অসীম দয়ায় তাদের সেই ক্রোধকে এমনভাবে নির্বাপিত করে দিয়েছিলেন যে, সঙ্গে সঙ্গে সেখানে তাদের মনে তাঁর প্রতি বিপুল শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার গভীর রেখাপাত ঘটে।

এধরনেরই একটি ভয়াবহ ঘটনার কথা বলছি। ইতিহাসের সুমহান খলীফা, জগৎশ্রেষ্ঠ সুবিচারক, সহজ-সরল ও প্রজাহিতৈষী শাসক হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয রহ.-এর মর্মান্তিক ইন্তেকালের পর খেলাফতের মসনদে আরোহণ করে ইয়াযিদ ইবনে আবদিল মালিক। সে তখন উমর ইবনে হুবায়রাকে ইরাকের গভর্নর পদে নিযুক্ত করে। কিছু দিন পর তার কর্তৃত্ব-ক্ষমতা বৃদ্ধি করে খোরাসান নগরীকেও তার অধীনে সঁপে দেয়।

ইয়াযিদ ইবনে আবদুল মালিক ক্ষমতার বাগডোর নিয়ন্ত্রণে আনতে এমন কর্মপদ্ধতি বেছে নিয়েছিলো যা ছিলো পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের কর্মপদ্ধতির পুরো বিপরীত। সে নিজ গভর্নর উমর ইবনে হায়বারীকে অধিক পরিমাণে চিঠি লিখতো। আর সে সব চিঠিতে এমন আদেশ জারী করত যা ছিল অধিকাংশই সত্যবিরোধী ও ন্যায়বিচ্যুত। তা তাৎক্ষণিক বাস্তবায়নের আদেশ করতো।

একদিন উমর ইবনে হুবায়রা হযরত হাসান বসরী ও আমের ইবনে শুরাহবিলকে পরামর্শের জন্য ডেকে নিবেদন করলো, আমীরুল মুমিনীন ইয়াযীদ ইবনে আবদিল মালিককে আল্লাহ তাআলা ক্ষমতার মসনদে বসিয়েছেন আপনারা তা অবগত আছেন। তিনি আমাকে ইরাক ও খুরাসানের গভর্নর নিযুক্ত করেছেন। কখনো কখনো তিনি আমাকে এমন রাষ্ট্রীয় ফরমান পাঠান যাতে এমন এমন পদক্ষেপের আদেশ করেন আমার দৃষ্টিতে যা সর্বৈব অন্যায়। এসব আদেশ পালনে দীনের দিক থেকে আমার জন্য তা পালন বৈধ কিনা?

হযরত আমের শুরাহবিল রহ. এমন পরামর্শ দিলেন যাতে ছিল খলীফার প্রতি শৈথিল্য প্রদর্শন আর গভর্নরের সুদৃষ্টি পাওয়ার বাসনা; কিন্তু হযরত হাসান বসরী রহ. চুপ করে বসে রইলেন।

গভর্নর উমর ইবনে হুবায়রা হযরত হাসান বসরী রহ.-কে সম্বোধন করে বললেন, আবু সাঈদ! এ বিষয়ে আপনার মতামত কী?

তিনি বললেন, 'ওহে ইবনে হুবায়রা! হতে পারে আকাশ হতে এক এমন ফেরেশতা নেমে আসবেন যিনি কখনোই আল্লাহ তাআলার হুকুম অমান্য করেন

না। তিনি তোমাকে সিংহাসন থেকে উঠিয়ে এ প্রাসাদ থেকে বের করে এমন সংকীর্ণ কবরে ফেলবেন— যেখানে তুমি ইয়াযিদকে পাবে না। সেখানে ওই সব আমল পাবে যা তুমি তোমার ও ইয়াযিদের রবের বিরুদ্ধে করেছিলে।

হে ইবনে হুবায়রা! তুমি যদি আল্লাহর হয়ে যাও, সর্বদা তাঁর আনুগত্যে মাথা নুয়ে দাও তাহলে নিশ্চিত তিনি তোমাকে দুনিয়া ও পরকালে ইয়াযিদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। আর যদি আল্লাহর নাফরমান ও অবাধ্য হও, ইয়াযিদের সঙ্গ দাও তাহলে আল্লাহও তোমাকে ইয়াযিদের রোষানলে ফেলবেন।

হে ইবনে হুবায়রা! ভাল করে জেনে রাখ। সৃষ্টিজগতের কারো এমন আদেশ মান্য করা যাবে না যাতে আল্লাহর অবাধ্যতা রয়েছে।'

কথাগুলো শুনে ইবনে হুবায়রা এত পরিমাণ কাঁদল যে, তার দাড়ি ভিজে গেলো। এরপর সে হযরত আমের ইবনে শুরাহবিল শাবী রহ.-কে ছেড়ে হযরত হাসান বসরী রহ.-এর দিকে ঝুকলেন। অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা বিনম্রতার আচরণ করলেন।

এ দু'বুযুর্গ গভর্নর হাউজ থেকে বের হয়ে মসজিদে প্রবেশ করলেন। লোকজন তাদের ঘিরে ধরলো। গভর্নরের সঙ্গে আলোচনার বিষয় সম্পর্কে জানার ইচ্ছা করলো। হযরত আমের রহ. জনসম্মুখে বললেন, হে লোকসকল! আমরা সবসময় আল্লাহ তাআলাকে সৃষ্টিজগতের ওপর প্রাধান্য দেবো। ঐ সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। আজ হাসান বসরী রহ. গভর্নর উমর ইবনে হুবায়রাকে এমন কোনো কথা বলেননি যা আমি জানি না। কিন্তু আমি আমার আলোচনার সময় গভর্নরের সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখেছি। আর হাসান বসরী তাঁর আলোচনায় আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির প্রতি লক্ষ্য রেখেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে গভর্নরের চোখে হেয় করেছেন আর হযরত হাসান বসরীকে তার চোখে প্রিয় বানিয়ে দিয়েছেন।

১২. হযরত হাসান বসরী রহ. ৮০ বছর জীবন পেয়েছিলেন। জীবনের এ দিনগুলোতে নিজ বিদ্যা, কর্মতৎপরতা, প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে দুনিয়াবাসীর উপকার করে গেছেন। নতুন প্রজন্মের জন্যে রেখে যান মহান উত্তরাধিকার। আর তা হলো পনেরোটি হৃদয়ছোঁয়া উপদেশ। যা চির স্মরণীয় হয়ে থাকবে কিয়ামত অবদি। এ ধারায় যতদিন হেমন্ত আর বসন্তকাল বইবে ততদিন তাঁর উপদেশমালা মানুষের হৃদয়ে ফাগুন ছড়াবে। ঝড় তুলবে। তাঁর হৃদয়ছোঁয়া উপদেশমালার প্রতিক্রিয়ায় লজ্জা ও অনুশোচনায় চোখে অশ্রুর বান বইবে। অঝোরে অশ্রু ঝরতেই থাকবে। দিশেহারা মানুষেরা পথ পাবে। অলস উদাসীনরা দুনিয়ার বাস্তবতা বুঝতে পারবে। ফলে তারা হবে সজাগ সতর্ক।

এক লোক হযরত হাসান বসরী রহ.-কে দুনিয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, আমাকে তোমরা দুনিয়া ও আখেরাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছ। শোনো, দুনিয়া ও আখেরাতের দৃষ্টান্ত হলো পূর্ব-পশ্চিমের মত। একটির দিকে তোমরা যতটা অগ্রসর হবে অপরটি ততটাই দূরে সরে যাবে।

তোমরা আমাকে দুনিয়ার গুণাগুণ বর্ণনা করতে বলছো। তোমাদের সামনে সে ঘরের কি গুণাগুণ তুলে ধরব যার সূচনা হলো ইচ্ছা ও কষ্টের ওপর। আর যার সমাপ্তি হলো ধ্বংস। এর যা হালাল তার হিসাব নেয়া হবে এবং যা হারাম তা ব্যবহারে শাস্তি দেওয়া হবে। জগতের ধনাঢ্য ব্যক্তিরা ফেতনা-ফাসাদের শিকার। আর গরীব ও মুখাপেক্ষী লোকেরা দুঃখ ও লাঞ্ছনায় নিপতিত।

অপর এক লোক তাঁকে তাঁর অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। উত্তরে তিনি বললেন— ভাই! আমার অবস্থা আর কী জিজ্ঞেস করবে? আফসোস! আমার জানকে কত কষ্ট দিয়েছি। যুলুম করেছি। করেছি আমার দীনকে দুর্বল। দুনিয়ার লোভ মোহ আমাদের মোটা করেছে। আমরা চরিত্রকে জলাঞ্জলি দিয়েছি। আর শয্যা ও পোশাককে নতুন করেছি। আমরা বাম কাতে আরামে ঘুমাই এবং অন্যের সম্পদ অবাধে গলধঃকরণ করছি।

এরপর তুমি লবণাক্ত খাবার খেয়ে মুখ মিষ্টি করতে মিষ্টান্ন খাও। ঠাণ্ডা খেয়ে গরম পান কর। শুস্ক খাবার খেয়ে ভেজা খেজুর খাও। কিছুক্ষণ পর পাপী পেটে ব্যথা উঠে বমি শুরু হয়ে যায়। তখন সারা ঘরে হৈচৈ বাঁধিয়ে ফেলো যে, আমার জন্যে দ্রুত অষুধ পথ্য আনো, যাতে পেটের খাবার হজম হয়। হে নির্বোধ-নাদান! আল্লাহর শপথ, দীন ছাড়া তুমি কিছুই হজম করতে পারবে না।

আহমক! তোমার প্রতিবেশী কোথায়? কী অবস্থায় আছে? তোমার সম্প্রদায়ের ক্ষুধার্ত ইয়াতীম কী ভাবে আছে? সে নিঃস্ব দরিদ্র যে তোমার পানে চেয়ে আছে— সে কোথায়? সে সৃষ্টিকুল কোথায় যার দেখাশোনার জন্য আল্লাহ তোমাকে অসিয়ত করেছিলেন। হায়! তুমি যদি জানতে, তুমি তো কেবল অঙ্কের খাতা মাত্র। প্রতিটি সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে তোমার জীবনখাতা থেকে একটি করে পৃষ্ঠা হ্রাস পাচ্ছে।

১৩. ১১০ হিজরীর ১লা রজব বৃহস্পতি ও শুক্রবারের মধ্যবর্তী রাতে হযরত হাসান বসরী রহ. মহান রবের ডাকে লাব্বাইক বলে নিজের প্রাণপাখি সঁপে দেন। সকালে যখন তাঁর মৃত্যুসংবাদ ছড়িয়ে পড়ে তখন পুরো বসরা শহর কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। এরপর তাঁকে গোসল দেওয়া হলো। কাফন পরানো হলো। সেই ঐতিহ্যবাহী কেন্দ্রীয় মসজিদে তাঁর জানাযা পড়া হলো;

যেখানে তিনি তাঁর জীবনের সিংহভাগ মুহূর্ত একজন দায়িত্বশীল আলেম, দাঈ ও মুবাল্লিগ হিসেবে অতিবাহিত করেছেন। বসরার সমস্ত বাসিন্দা তাঁর জানাযায় শরীক হয়। সে দিন কেন্দ্রীয় মসজিদে আসরের জামাআত অনুষ্ঠিত হয়নি। কারণ শহরে নামায পড়ার মত কেউ ছিল না।

১৪. হযরত হাসান বসরী রহ.-এর জীবন সম্পর্কে বিশদভাবে জানতে হলে পড়ুন—

১. আততাবাকাতুল কুব্‌রা : ১৭৯, ১৮২, ১৯৫, ১৯৭, ২,২০
২. আততাবাকাতুল কুবরা : ৩/২৩৩-২৩৭
৩. হুলয়াতুল আউলিয়া : ইস্পাহানী : ২/১৩১, ১৬১
৪. তারীখে খলীফা ইবনে খয়্যাত : ১২৩, ১৮৯, ২৮৭, ৩৩১, ৩৫৪
৫. ওফায়াতুল আইয়ান : ইবনে খাল্লিকান : ১/৩৫৪, ১৩৯
৬. শাযারাতুয যাহাব : ১/১৩৮-১৩৯
৭. মীযানুল ই'তিদাল : ১/২৫৪
৮. আমালিল মুরতাযা : ১/১৫২, ১৫৩, ১৫৮, ১৬০
৯. আল বয়ান ওয়াত তিব্‌ইয়ান : ২/১৭৩, ৩/১৪৪
১০. আল মাহবার : মুহাম্মদ ইবনে হাবীব : ২৩৫, ৩৭৮
১১. কিতাবুল ওয়াফায়াত : আহমদ ইবনে হাসান ইবনে আলী : ১০৮-১০৯
১২. হাসান বসরী, লেখক : ইহসান আব্বাস।

ইরানের তিন রাজকন্যা পছন্দ করলেন মদীনার তিন দীনদার যুবককে

ইরানের সর্বশেষ সম্রাট ইয়াযদিগার্দ যেদিন লাঞ্ছনাকর অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয় সেদিন তার সেনাবাহিনীর সমস্ত জেনারেল, নিরাপত্তা বাহিনী ও পরিবার-পরিজন মুসলমানদের হাতে বন্দি হয়। পরবর্তীতে তাদেরকে মদীনা মুনাওয়ারায় হাজির করা হয়। ওই সময় প্রচুর পরিমাণ মালে গনীমতও মুসলমানদের হস্তগত হয়। ইরান বিজয়ের পর যেই মালে গনীমত মদীনা মুনাওয়ারায় নিয়ে আসা হয় তার সমপরিমাণ বা কাছাকাছি পরিমাণের দ্বিতীয় কোনো মালে গনীমত মদীনায় আসেনি। ওই সময় ধৃত রাজবন্দীদের মাঝে বাদশাহ ইয়াযদিগার্দের তিন কন্যাও ছিলেন।

বন্দীদেরকে বিক্রয়ের জন্যে নিলামে তোলা হলো। মদীনাবাসীগণ ন্যায্য দামে একেক করে সবাইকে কিনে নিলো। বিক্রয়লব্ধ অর্থ বাইতুল মালেও জমা হলো। সবশেষে দেখা গেলো, ইরানের সেই তিন রাজকন্যা অবিক্রিত রয়ে

গেছেন। কারণ, তারা ছিলেন রূপ, সৌন্দর্য, লাবণ্য ও অঙ্গ-সৌষ্ঠবে অনন্যা। অন্যদিকে পৃথিবীর শীর্ষতম অভিজাত বংশের সদস্যা তারা। এজন্যে যখন তাদেরকে বিক্রয়ের জন্যে হাক ছোড়া হলো তখন তারা লজ্জার আতিশয্যে দৃষ্টি এতোটাই অবনত করে ফেললেন যে, মনে হচ্ছিলো, তারা মাটির ভিতরে ঢুকে যাচ্ছেন। চরম অনুতাপ, দীনতা ও অসহায়ত্ববোধের কারণে তাদের হরিণীর মতো চোখ থেকে টপটপ করে বেদনাশ্রু ঝরতে লাগলো। যার কারণে হযরত আলী ইবনে আবী তালিব রা.-এর মনে সহমর্মিতা জেগে ওঠলো। তিনি ভাবলেন, ওই কন্যাগুলোকে একমাত্র তাদেরকেই ক্রয় করার অনুমতি দেওয়া হোক যারা তাদের সঙ্গে সদাচরণ করবে। এটাই স্বাভাবিক। এখানে অন্যায্যতার কিছু নেই। কারণ রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেছেন, 'তোমরা পরাজিত জাতির সম্ভ্রান্ত লোকদের প্রতি সহমর্মী হও'।

হযরত আলী রা. হযরত উমর রা.কে বললেন— 'হে আমীরুল মুমিনীন! রাজকন্যাদের সঙ্গে স্বাতন্ত্রপূর্ণ আচরণ হওয়া উচিত'।

উত্তরে হযরত উমর রা. বললেন, 'আপনি যথার্থই বলেছেন; কিন্তু তার পদ্ধতি কী?'

হযরত আলী রা. বললেন, 'প্রথমত তাদের মূল্য অপেক্ষাকৃত অধিক হতে হবে। দ্বিতীয়ত তাদেরকে আপনি এ অধিকার দেবেন যে, যাকে তারা পছন্দ করবেন শুধু তার হাতে তাদেরকে তুলে দেবেন। এক্ষেত্রে কোনোভাবেই সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া যাবে না'।

প্রস্তাবনাটি হযরত উমর রা.-এর খুবই পছন্দ হলো। তিনি সঙ্গে সঙ্গে সেটি কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন।

তিন রাজকন্যার একজন পছন্দ করলেন হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর ইবনে খাত্তাব রা.-কে। অপরজন পছন্দ করলেন হযরত মুহাম্মদ ইবন আবু বকর সিদ্দীক রা.-কে। তৃতীয়জন ছিলেন রূপ-সৌন্দর্য্যে এতোটাই অনুপম যে, তাকে 'নারীসম্রাট' বললে বিন্দু পরিমাণ অত্যুক্তি হবে না।' তিনি পছন্দ করলেন নবী-দৌহিত্র হযরত হুসাইন রা.-কে।

অল্পকদিন পর ওই 'নারী-সম্রাট' আন্তরিকতার সাথেই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় চলে এলেন। নিজেকে হিদায়াতের পথে তুলে আনলেন। যার ফলে তিনি তার ক্রীতদাসীর জীবন থেকে মুক্তি পেলেন। স্ত্রীর মর্যাদাও পেয়ে গেলেন। ওই সময় তিনি মনস্থ করলেন, অতীতের সমস্ত শিরকি স্মৃতি অন্তর থেকে ফেলে দিতে হবে। এজন্যে তিনি তার পূর্বের নাম 'শাহ যিন্দা' পরিবর্তন করে 'গাযালাহ' নাম ধারণ করলেন।

'গাযালাহ' নামী এই রাজকন্যা শ্রেষ্ঠতম যুবককেই জীবনসঙ্গী হিসেবে পেয়েছিলেন। সুখময় দাম্পত্য জীবন অতিবাহিত করতে লাগলেন। আনন্দঘণ মুহূর্তগুলো খুব দ্রুতই কেটে যেতে লাগলো। এখন অপেক্ষা ছিলো, কবে কখন আল্লাহ তার কোল জুড়ে ফুটফুটে সন্তান দান করবেন। মহান আল্লাহ তার সেই স্বপ্নও একদিন পূরণ করলেন। তার কোল আলোকিত করে জন্ম নিলো চাঁদের মতো সুন্দর সন্তান। বরকতরূপে তার নাম রাখা হলো, তার শ্রদ্ধেয় দাদাজানের নামের অনুকরণে 'আলী'। দুঃখের বিষয় হলো, গাযালাহর জীবনে সেই আনন্দ খুব বেশী দিন স্থায়ী হয়নি। কারণ, সন্তান ভুমিষ্ঠ হওয়ার কিছু দিন পরেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

ফলে বাধ্য হয়ে এই সদ্যভুমিষ্ট সন্তানটির লালন-পালনের যাবতীয় দায়ভার জনৈক বাঁদির হাতে অর্পণ করা হয়। তিনি তাকে প্রচণ্ড ভালোবাসা ও স্নেহ দিয়ে প্রতিপালন করতে থাকেন। কোনোদিন তাকে মায়ের অভাব বোধ করতে দেননি। নিজের নাড়িছেড়া ধনের মতো আদর-সোহাগ দিয়ে তিনি তাকে বড় করে তোলেন। যার কারণে বড় হয়েও এ সন্তান তাকেই নিজের মা মনে করতেন।

হযরত আলী ইবনে হুসাইন রহ. শৈশব থেকেই বিদ্যানুরাগী ছিলেন। পড়াশোনার প্রতি তাঁর একান্ত মনোযোগ ছিলো। তাঁর ঘরই ছিলো তার প্রথম পাঠশালা। সন্দেহ নেই, এ পাঠশালাতে তিনি ভালো শিক্ষাই পেয়েছিলেন।

তাঁর প্রথম শিক্ষক হলেন, শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত হুসাইন ইবনে আলী রা.। যুগ-বিচারে নিঃসন্দেহে তিনি শ্রেষ্ঠ শিক্ষক।

হযরত আলী ইবনে হুসাইন রহ.-এর দ্বিতীয় পাঠশালা ছিলো মসজিদে নববী। ওই সময় এই মসজিদটি ছিলো বড় বড় সাহাবী ও তাবেঈদের পদ-পরশে সদা আলোকিত পাঠশালা। তাঁরা সেখানে হৃদয়ের সবটুকু উত্তাপ দিয়ে শিক্ষার্থীদের মাঝে আল্লাহর কিতাবের জ্ঞান বিতরণ করতেন। রাসূলের হাদীস থেকে জীবনঘনিষ্ঠ নসিহত প্রদান করতেন। তাদের সামনে দীনের প্রকৃত উদ্দেশ্য উপস্থাপন করতেন। সীরাত ও যুদ্ধের ঘটনাগুলো বয়ান করে তাদেরকে দীনের ওপর উদ্দীপ্ত করতেন। কবিদের জীবনঘেষা কবিতামালা পেশ করে সেগুলোর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ জানাতেন। এভাবে তাঁরা জাতির প্রতিটি সদস্যকে আল্লাহর ভয় ও আদেশমান্যতার দীক্ষা দিয়ে গড়ে তুলতেন। যার ফলে তারা হতেন ইলমের ওপর আমলকারী আলেম ও দীনের সত্যিকারের দাঈ।

হযরত আলী ইবনে হুসাইন রহ. ছিলেন কুরআন কারীম সংশ্লিষ্ট ইলমের একান্ত অনুরাগী। এর বাইরে অন্য কোনো জ্ঞান বা শাস্ত্রের প্রতি তিনি

আকর্ষণ বোধ করতেন না। কুরআনে উল্লিখিত ওয়াদা ও অঙ্গীকারগুলো পাঠ করার সময় তিনি গভীর আবেশে তন্ময় হয়ে যেতেন। জান্নাতের আলোচনা সম্বলিত আয়াত পাঠ করার সময় তিনি জান্নাতের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষী হয়ে ওঠতেন। আবার জাহান্নামের ভীতিপ্রদ দৃশ্যের বিবরণ সম্বলিত আয়াত পাঠ করার সময় তিনি ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এমন গভীর নিঃশ্বাস নিতেন যে, মনে হতো, এই বুঝি তাঁকে জাহান্নামের লেলিহান শিখা স্পর্শ করছে।

হযরত আলী ইবন হুসাইন রহ. যখন প্রাপ্তবয়সে উপনীত হন এবং জ্ঞানচর্চা করে উৎকর্ষের শিখরে উন্নীত হন, তখন দেখা গেলো তিনি মদীনার অন্যতম রত্নে পরিণত হয়েছেন। ইবাদত ও খোদাভীরুতার বিচারে বনূ হাশিমের যুবসমাজে তিনি অনন্য মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। জ্ঞানে-গুণে, আচার-আচরণে সবাই মুগ্ধ। যে কোনো নেক কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। তাঁর ইবাদত ও খোদাভীরুতার ছোট্ট একটি উদাহরণ হলো, তাঁকে ওযু ও নামাযের মধ্যবর্তী সময়ে সবসময় কম্পমান দেখা যেতো। ওই সময় তাঁর শরীরের লোমগুলো দাঁড়ানো থাকতো। তাঁকে একদিন এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে উত্তরে তিনি বলেন, 'তোমাদের জন্যে আমার খুবই আফসোস হয়। তোমরা কেনো জানো না যে, এখন আমি কার সামনে উপস্থিত হতে যাচ্ছি। তোমরা কেনো জানো না যে, আমি এখন কার সঙ্গে কানকথা বলতে প্রস্তুত হচ্ছি'!!!

হাশেমী বংশের এই যুবকের নেক মানসিকতা, তাকওয়া ও ইবাদতলিপ্ততা দেখে জনগণ ভালোবেসে তাঁর নাম দিলো 'যাইনুল আবেদীন'। পরবর্তীতে তিনি এ নামেই বিখ্যাত হয়ে যান। এমনকি আজ তার আড়ালে মূলনাম হারিয়ে গেছে। তাঁর প্রজ্ঞাদীপ্ত ব্যক্তিত্ব, নামায চলাকালে দুনিয়া থেকে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়া, ইবাদতের মাঝে গভীর মনোনিবেশের কারণে মদীনাবাসী তাঁকে 'ফানা ফিস সুজুদ' উপাধিতে ভূষিত করেছিলো। তাঁর অন্তকরণের পরিশুদ্ধতা ও মানসিকতার স্বচ্ছতার কারণে সবাই তাঁকে মুগ্ধচিত্তে স্মরণ করতো।

হযরত যাইনুল আবেদীন রহ. মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন যে, ইবাদতের মগজ হলো, দোয়া। তিনি কা'বা শরীফের পর্দা জড়িয়ে হাঁটু মুড়ে বসে মহান আল্লাহর দরবারে দোয়া করতেন। অসংখ্যবার তিনি বাইতুল্লাহ শরীফকে জড়িয়ে এ দোয়া করেছেন–

'হে মহান রব! তুমি আমার ওপর সীমাহীন রহমত ঢেলে দিয়েছো। আমার ওপর করুণার অফুরান বৃষ্টি বর্ষণ করেছো। যার ফলে আমি আজ নিঃশঙ্কোচে

তোমার দরবারে আকুতি জানাচ্ছি। ভালোবাসার উষ্ণতা নিয়ে তোমার দুয়ারের ভিখারি হয়েছি। তোমার দরবার থেকে আরো রহমত ভিক্ষা চাইছি। তোমার অধিকারগুলো যথাযথভাবে আদায় করার জন্যে তোমার কাছে শক্তি ও সাহস প্রার্থনা করছি। মাবুদগো! আমি তোমার কাছে গভীর পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় সাহায্য চাইছি। নিরাপদে যাকে পাড়ে পৌঁছে দেয়ার মতো তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কোনো সত্তা নেই। হে মহিয়ান! দয়া করো। আমার জীবন গুনাহের চোরাবালিতে ফেঁসে গেছে। এর তরী কূলে পৌঁছে দাও। নিঃসন্দেহে তুমিই স্বীয় সৃষ্টিজীবের প্রতি সবচেয়ে অধিক দয়াকারী।'

হযরত তাউস ইবনে কায়সান রহ. একবার দেখতে পেলেন যে, তিনি বাইতুল্লাহর ছায়ায় দাঁড়িয়ে অসুস্থ ব্যক্তির মতো কোকড়াচ্ছেন। কণ্ঠ থেকে আর্তচিৎকার বেরোচ্ছে। বিপদগ্রস্থ ব্যক্তির মতো হাহাকারের সুরে দোয়া করছেন। দূর থেকে হযরত তাউস রহ. তাঁর জন্যে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করলেন। যখন তিনি কান্নার ইতি টানলেন তখন হযরত তাউস রহ. এগিয়ে এসে বললেন, হে আল্লাহর রাসূলের দৌহিত্র! আজ আমি আপনার অবস্থা দেখে ফেলেছি। আপনার মাঝে এমন তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে, যা আপনাকে যাবতীয় ভয় থেকে উদ্ধার করবে।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, হে তাউস! বৈশিষ্ট্যগুলো কী?'

উত্তরে তিনি বললেন, প্রথমত আপনি রাসূলুল্লাহ সা.-এর দৌহিত্র। দ্বিতীয়ত আপনি আপনার নানাজানের সুপারিশ লাভ করবেন। তৃতীয়ত সবসময় আমি আপনার ওপর আল্লাহর রহমতের ছায়া দেখেছি।'

তখন হযরত যাইনুল আবেদীন রহ. বলেন, হে তাউস! কুরআনে কারীমের এ আয়াত শোনার পর থেকে আমি মনে করি, রাসূলুল্লাহ সা.-এর সঙ্গে আমার বংশীয় সম্পর্ক আমার উপকারে আসবে না। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন–

فَاِذَا نُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَآ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّ لَا يَتَسَآءَلُوْنَ○

'যখন সিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হবে, তখন তাদের মধ্যকার কোনো আত্মীয়তা বাকি থাকবে না এবং কেউ কাউকে কিছু জিজ্ঞেসও করবে না।'[৯]

নানাজানের সুপারিশের ব্যাপারে আমার সামনে কুরআনের এ আয়াত রয়েছে–

وَلَا يَشْفَعُوْنَ ۙ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى

৯. সূরা মুমিনূন : ১০১।

তারা কারো জন্য সুপারিশ করতে পারবে না, কেবল তাদের ছাড়া যাদের ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।[১০]

মহান আল্লাহর রহমতের ব্যাপারে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِنِيْنَ ○

'নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।'[১১]

তাকওয়া ও খোদাভীরুতা হযরত যাইনুল আবেদীন রহ.-এর মাঝে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য জন্ম দিয়েছিলো। যার ফলে তিনি সারাজীবন গুণ ও মর্যাদা, নম্রতা ও সহনশীলতার প্রতীক হয়ে ছিলেন। সীরাতের কিতাবগুলোতে তাঁর ওই সব আদর্শ বৈশিষ্ট্যের অসংখ্য ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। সেগুলো এখনো ইতিহাসের পাতায় সমান আলোকচ্ছটায় জ্বলজ্বল করছে।

হযরত হাসান ইবনে হাসান রহ. বলেন, একবার কোনো এক বিষয় নিয়ে চাচাতো ভাই যাইনুল আবেদীনের সঙ্গে আমার দ্বিমত হয়। তখন আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হলাম। ওই সময় তিনি মসজিদে কয়েকজন সঙ্গী সহকারে উপবিষ্ট ছিলেন। ক্রোধান্ধ হয়ে ওই সময় আমি তাঁকে যথেচ্ছা বকে দিয়েছিলাম। আমার সেই তিক্ত কথাগুলো শোনার পরও তিনি নিশ্চুপ ছিলেন। একটি কথারও উত্তর দেননি। আমি আমার ক্রোধের সবটুকু উগড়ে দিয়ে চলে এলাম। রাতের বেলায় হঠাৎ আমার ঘরের দরজার কড়া নড়ে ওঠলো। এগিয়ে এসে দেখলাম, যাইনুল আবেদীন দাঁড়িয়ে আছেন। আমি তখন নিশ্চিত ধরে নিলাম, এ মুহূর্তে সে প্রতিশোধ নিতেই হাজির হয়েছে।

কিন্তু তিনি আমাকে তখন বললেন—

'ভাই আমার! আজ সকালে আমাকে সম্বোধন করে আপনি যে কথাগুলো বলেছেন যদি সেগুলো সত্য হয় তাহলে আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিন। আর যদি আপনার কথাগুলো সত্য না হয় তাহলে আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করে দিন।'

এতোটুকু বলে তিনি সালাম জানিয়ে চলে এলেন। আমি তখন ছুটে গিয়ে তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়ালাম। নিবেদন করলাম, 'আগামীতে আমি এমন কোনো কথা বলবো না, যা আপনাকে কষ্ট দেয়। এবারের মতো আমাকে ক্ষমা করে দিন।'

তিনি তখন পূর্ণ নম্র অন্তরে বললেন— 'এটা কোনো বিষয়ই নয়। আমার ব্যাপারে কথা বলার আপনার পূর্ণ অধিকার রয়েছে।'

---

১০. সূরা আম্বিয়া : ২৮।

১১. সূরা আ'রাফ : ৫৬।

মদীনা মুনাওয়ারার জনৈক বাসিন্দার একটি মন্তব্য উল্লেখ করছি। তিনি বলেন, একবার যাইনুল আবেদীন রহ. মসজিদ থেকে বেরোতেই আমি তাঁর পেছনে হাঁটতে শুরু করলাম। অকারণে তাঁকে পেছন থেকে গালমন্দ করতে লাগলাম। আমার মুখের অশ্রাব্য গালাগাল শুনে পথের মানুষজন আমার ওপর ক্ষেপে গেলো। তারা আমাকে মারতে উদ্যত হলো। আশঙ্কা করলাম, আজ তারা আমাকে এখানেই জানে মেরে ফেলবে। যাইনুল আবেদীন রহ. তখন সবাইকে নিবৃত্ত করে বললেন— থেমে যাও। সবাই সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেলো। তিনি দেখতে পেলেন, আমি থরথর করে কাঁপছি। তখন তিনি আমার দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে অভয় দিলেন। সাহস যোগালেন। এরপর বললেন— 'আপনি আমাকে আপনার জানা তথ্যের ভিত্তিতেই বকাঝকা করেছেন। অথচ এর বাইরে এমন অসংখ্য দোষ আমার মধ্যে আছে যা আপনি জানেন না। সংখ্যায় সেগুলোই বেশী হবে।'

এরপর আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার কি এমন কোনো প্রয়োজন আছে, যা পূরণ করে আমি আপনাকে সহায়তা করতে পারি?'

আমি তখন এতোটাই লজ্জিত হলাম যে, আমার মুখে কোনো কথাই বেরচ্ছিলো না। লজ্জায় মাথা নুয়ে ফেললাম। এভাবে লজ্জিত হতে দেখে তিনি আমার শরীরের ওপর তাঁর মূল্যবান চাদর পরিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক হাজার স্বর্ণমুদ্রাও হাতে গুঁজে দিলেন।

হযরত যাইনুল আবেদীন রহ.-এর জনৈক গোলামের মন্তব্য হলো, আমি তাঁর গোলাম ছিলাম। একবার তিনি আমাকে জরুরী কাজে পাঠালেন। ফিরতে আমি অযথাই দেরি করলাম। দীর্ঘ সময় পর ঘরে ফিরতেই তিনি রাগান্বিত হয়ে আমার দিকে তেড়ে এলেন। বেত তুলে নিয়ে আমাকে প্রহার করতে লাগলেন। ওই সময় আমি কেঁদে ফেললাম। মনে মনে ক্রুদ্ধও হয়েছিলাম, ইতোপূর্বে তিনি তো কোনো দিন কারো গায়ে হাত তোলেননি।

আমি বললাম, হে আলী ইবনে হাসান! আল্লাহকে ভয় করুন। একদিকে আপনি আমার কাছ থেকে সেবা নিচ্ছেন। আমি আপনার নির্দেশ মেনে প্রতিটি কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করি। উপরন্তু আপনি আমাকে প্রহরও করছেন। এটা কিসের ইনসাফ?'

আমার এ কথা শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন। বললেন— 'এখনি তুমি মসজিদে নববীতে গিয়ে দুই রাকাত নামায পড়ো। নামাযান্তে এ দোয়া করো, হে আল্লাহ! আপনি আলী ইবনে হুসাইনকে মাফ করে দিন'। যদি তুমি এ কাজ করো তাহলে আমি তোমাকে আযাদ করে দেবো।'

নির্দেশ মেনে আমি মসজিদে গেলাম। দু' রাকাত নামায আদায় করলাম। নামায শেষে দোয়াও করলাম। এরপর ঘরে ফিরতেই তিনি আমাকে মুক্ত করে দিলেন।

মহান আল্লাহ হযরত যাইনুল আবেদীন রহ.-এর জন্যে সম্পদ ও প্রাচুর্যের ভাণ্ডার অবারিত করে দিয়েছিলেন। একদিকে তিনি ব্যবসায় প্রচুর মুনাফা করতেন, অন্যদিকে কৃষিক্ষেত্রেও প্রাচুর্যের মুখ দেখেছিলেন।

নওকর-ভৃত্যদের মাধ্যমেই তিনি এ দু'কাজ সম্পন্ন করতেন। যদিও ব্যবসা ও কৃষিকাজের মাধ্যমে তিনি প্রচুর বিত্ত-বৈভবের অধিকারী হয়েছিলেন; কিন্তু ওই বিত্ত-বৈভব তাঁকে কখনই আল্লাহভোলা বানাতে পারেনি। এগুলোও সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে তাঁর জন্যে উপকারী প্রমাণিত হয়েছিলো। গোপনে নিভৃতে দান-খয়রাত করাটা তাঁর খুবই প্রিয় ছিলো। রাত গভীর হলে দুর্বল কোমরে আটার বস্তা নিয়ে মদীনার অলি-গলিতে ঘুরে বেড়াতেন। যারা চক্ষুলজ্জায় ও আত্মমর্যাদার দরুন মানুষের সামনে হাত পাততে পারত না। তাদের জন্য এ সময় বেছে নিয়েছিলেন। নিঝুম রাতে যখন সকলে ঘুমিয়ে যেত তিনি তখন অভাবীদের ঘরের দুয়ারে খাবার রেখে আসতেন। যার কারণে মদীনার অনেক পরিবারই স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন কাটাত। যাদের জানা ছিল না এ জীবিকার উৎস কী? হযরত যাইনুল আবিদীন যখন পৃথিবী থেকে চলে গেলেন, আর তাদের ঘরে আটা আসা বন্ধ হয়ে গেল তখন বুঝতে পারল, এ আটার উৎস ছিল কোথায়?

হযরত যাইনুল আবিদীন রহ.-কে গোসল দেয়ার জন্য যখন খাটে রাখা হলো তখন গোসলদানকারীরা তাঁর পিঠের ওপর দাগের কালো চিহ্ন দেখতে পেলো। তখন তারা জিজ্ঞেস করলো, এ চিহ্ন কিসের? বলা হলো, এটা হলো আটার বস্তা টেনে বেড়ানোর চিহ্ন। মদীনার প্রায় একশ' ঘরে তিনি সেই আটা পৌঁছে দিতেন । উদার হস্তে দানকারী এভাবেই দুনিয়ার বুক থেকে বিদায় নিয়ে ছিলেন।

হযরত যাইনুল আবিদীন রহ. প্রচুর পরিমাণে গোলাম আযাদ করতেন। এভাবে তাঁর উদারহস্তে গোলাম আযাদ করার সুখ্যাতি প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিলো। দিক-দিগন্তের পথিকরা তাঁর এই মহৎ গুণের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে বেড়াতো। তবে বাস্তবতা হলো, তাঁর এই মুক্ত হস্তে অকাতর দানের পরিমাণ মানুষের কল্পনারও অধিক ছিলো। যা সাধারণ মানুষ কল্পনাও করতে পারবে না, এতোটাই তিনি দান করতেন।

কোনো গোলামকে তিনি সদাচরণকারী পেলে তৎক্ষণাৎ তাকে আযাদ করতেন। এই ভাল আচরণই হতো মুক্তির বিনিময়। আবার ওই গোলামকেও

তিনি আযাদ করে দিতেন যে অবাধ্য হতো, অতঃপর তাওবা করতো। তার তাওবাই হতো তার আযাদির বিনিময়। তাঁর সম্পর্কে বলা হয়. তিনি জীবনে এক হাজার গোলাম আযাদ করেছেন এবং তিনি কোনো গোলাম বা দাসী থেকে এক বৎসরের বেশী খেদমত গ্রহণ করেননি।

তিনি ঈদুল ফিতরের রাতে অধিক হারে গোলাম আযাদ করতেন। তাদের নিকট দাবী ছিল– তোমরা কিবলামুখী হয়ে আল্লাহ তাআলার নিকট এ দোয়া কর যে, 'হে ইলাহী! আলী ইবনে হুসাইনকে ক্ষমা করে দাও।' এ কাজে তারা দ্বিগুণ আনন্দিত হতো। একদিকে ঈদের আনন্দ আর অন্যদিকে স্বাধীনতার উচ্ছ্বাস।

আল্লাহ তাআলা মানুষের অন্তরে হযরত যাইনুল আবিদীন রহ.-এর প্রতি গভীর ভালবাসা ঢেলে দিয়েছিলেন। লোকজন তাঁকে পরম শ্রদ্ধার নযরে দেখত। সবার অন্তরে তিনি এতোটাই শ্রদ্ধার পাত্র ছিলেন যে, তাঁকে ভালোবাসা ও শ্রদ্ধার মুকুটহীন সম্রাট বললেও অত্যুক্তি হবে না। সমকালে অন্য কেউ এভাবে জনতার মন জয় করতে পারেনি। তাঁর প্রতি মানুষের ভালোবাসা ছিলো নিখাদ ও অকৃত্রিম। প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সর্বত্র তারা শ্রদ্ধাপূর্ণ আচরণ করতেন। জনতা সবসময়ই তাঁকে উৎসুক নয়নে খুঁজে বেড়াতো। ঘর থেকে বেরোবার সময়, প্রবেশের সময়, মসজিদে আসা-যাওয়ার পথে মানুষের ব্যাকুল নয়ন শুধু তাঁকেই খুঁজে বেড়াতো।

একটি স্মরণীয় ঘটনা উল্লেখ করছি। হিশাম ইবনে আবদিল মালিক হজ্বের নিয়তে মক্কায় এলেন। তিনি ছিলেন সে যুগের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী শাসক। তাওয়াফ ও হাজরে আসওয়াদ চুমু দেয়ার ইচ্ছা করলেন। রক্ষী বাহিনী ও সিপাহীগণ নানা তোড়জোড় করে, বাঁশি বাজিয়ে, হুঙ্কার ছুড়ে তার জন্যে পথ করে দিতে লাগলো। কিন্তু কেউ তার দিকে ভ্রুক্ষেপও করছে না। রাস্তা তো দিচ্ছেই না, বরং তারা একথা বলছে যে, 'এটি আল্লাহর ঘর। সবাই তাঁরই বান্দা'।

ইতোমধ্যে সেখানে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার'-এর আওয়াজ শোনা গেলো। মানুষজন বিস্ফোরিত নয়নে কণ্ঠস্বরের উৎসস্থলের দিকে তাকিয়ে দেখছিলো। সহসাই লোকজনের ভীড়ে দেখা গেলো– সুদর্শন, দীর্ঘদেহী, উজ্জ্বল চেহারাবিশিষ্ট এক ব্যক্তি ইহরাম বেঁধে অত্যন্ত ভাব-গাম্ভীর্য নিয়ে বায়তুল্লাহর দিকে আসছেন। তাঁর কপালে সিজদার চিহ্ন স্পষ্ট। লোকজন অত্যন্ত ভক্তি শ্রদ্ধা ভরে স্ব-উদ্যোগে তাঁর জন্য রাস্তা করে দিচ্ছিলো। ভক্তি-ভালবাসার দৃষ্টিতে তাঁকে দেখছিলো। তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে পৌঁছুলেন। গভীর অনুরাগে সেখানে চুমু খেলেন।

হিশাম ইবনে আবদিল মালিকের জনৈক পরিষদ তাকে জিজ্ঞেস করলো, এ ব্যক্তিটি কে? যাকে মানুষেরা এত সম্মান দেখাচ্ছে। হিশাম বললো, আমি তাকে চিনি না।

আরববিশ্বের প্রখ্যাত কবি ফিরায্দাক সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বললেন— 'হিশাম যদি তাঁকে না জানে, না চেনে তাতে কিছু আসে যায় না। তাঁকে আমি ভালো করেই চিনি। পুরোবিশ্বও তাঁকে চেনে। তিনি হলেন, হযরত হুসাইন রা.-এর ছেলে আলী। যিনি যাইনুল আবিদীন নামে পরিচিত।' এ কথা বলে তিনি প্রত্যুতপন্নমতিত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে তৎক্ষণাৎ নিম্নের কবিতাগুলো পাঠ করলেন–

هَذا الَّذي تَعرِفُ البَطْحاءُ وَطْأَتَهُ، * وَالبَيْتُ يعْرِفُهُ وَالحِلُّ وَالحَرَمُ

هذا ابنُ خَيرِ عِبادِ اللهِ كُلِّهِمُ، * هذا التَّقيّ النَّقيّ الطّاهِرُ العَلَمُ

هذا ابنُ فاطَمَةٍ، إنْ كُنْتَ جاهِلَهُ، * بِجَدِّهِ أَنْبِيَاءُ اللهِ قَدْ خُتِمُوا

وَلَيْسَ قَوْلُكَ: مَن هذا؟ بِضَائِرِهِ، * العُرْبُ تَعرِفُ من أنكَرْتَ وَالعَجمُ

كِلْتا يَدَيْهِ غِيَاثٌ عَمَّ نَفعُهُمَا، * يُسْتَوْكَفانِ، وَلا يَعرُوهُما عَدَمُ

سَهْلُ الخَلِيقَةِ، لا تُخشى بَوَادِرُهُ، * يَزِينُهُ اثنانِ: حُسنُ الخَلقِ وَالشّيمُ

حَمّالُ أثقالِ أقوَامٍ، إذا افتُدِحُوا، * حُلوُ الشّمائلِ، تَحلُو عندَهُ نَعَمُ

ما قال: لا قطُّ، إلاّ في تَشَهُّدِهِ، * لَوْلا التَّشَهّدُ كانَتْ لاءَهُ نَعَمُ

عَمَّ البَرِيّةَ بالإحسانِ، فانْقَشَعَتْ * عَنْها الغَياهِبُ والإمْلاقُ والعَدَمُ

إذ رَأَتْهُ قُرَيْشٌ قال قائِلُها: * إلى مَكَارِمِ هذا يَنْتَهِي الكَرَمُ

يُغْضِي حَياءً، وَيُغضَى من مَهابَتِه، * فَمَا يُكَلَّمُ إلاّ حِينَ يَبْتَسِمُ

يَكادُ يُمْسِكُهُ عِرْفانَ رَاحَتِهِ، * رُكْنُ الحَطِيمِ إذا ما جَاءَ يَستَلِمُ

مَن يَشكُرِ اللهَ يَشكُرْ أوّلِيّةَ ذا؛ * فالدِّينُ مِن بَيتِ هذا نَالَهُ الأُمَمُ

يُنمى إلى ذُرْوَةِ الدّينِ التي قَصُرَتْ * عَنها الأكُفُّ، وعن إدراكِها القَدَمُ

مَنْ جَدُّهُ دان فَضْلُ الأنْبِياءِ لَهُ؛ * وَفَضْلُ أُمّتِهِ دانَتْ لَهُ الأُمَمُ

مُشْتَقّةٌ مِنْ رَسُولِ اللهِ نَبْعَتُهُ، * طَابَتْ مَغارِسُهُ والخِيمُ وَالشّيَمُ

১. তিনি হলেন সেই ব্যক্তি যাঁর পায়ের শব্দ মক্কার তেপান্তরও চেনে। কা'বাগৃহও তাঁকে চেনে, হেরেম ও তার বাইরের অঞ্চলও তাঁকে চেনে।

২. তিনি হলেন আল্লাহর সকল বান্দাদের মধ্য হতে শ্রেষ্ঠতম মানুষটির দৌহিত্র। তিনি হলেন পরম মুত্তাকী, পবিত্র, স্বচ্ছ ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বের অধিকারী মহামানুষ।

৩. যদি তুমি না চেনো তাহলে পরিষ্কার শুনে নাও তিনি হলেন হযরত ফাতেমা রা.-এর দৌহিত্র। যার নানাজান হলেন, সর্বশেষ রাসূল হযরত মুহাম্মদ সা.।

৪. 'এ আবার কে?' তোমার এই মন্তব্য তাঁকে সামান্যতমও ছোট করতে পারবে না। কেননা হতে পারে তুমি তাঁকে চেনো না; কিন্তু আরব-অনারব তাঁকে ভালোভাবেই চেনে।

৫. তাঁর দু'হাতই উদার ও দানবীর। মানুষ তার মুক্তপ্রাণে অকাতরে বিলানো দানের কল্যাণে সীমাহীন উপকৃত হয়েছে।

৬. তিনি এতোটা বিনম্র আচরণের অধিকারী যে, সেখানে রুক্ষতার লেশমাত্রও নেই। কোমল সদাচরণ ও বিনম্র প্রকৃতি– এ দু'টি গুণ তাঁর মাঝে সবসময়ই শোভা পেয়ে থাকে।

৭. তিনি সবার বোঝা বহন করেন। বিপদে ত্রাণের হাত বাড়িয়ে দেন। মহান আল্লাহও তাঁকে সর্বপ্রকার নেয়ামতের মিষ্টতা আস্বাদন করিয়েছেন।

৮. একমাত্র 'তাশাহহুদ' ব্যতিরেকে অন্য কোনো সময় তাঁর মুখে 'না' শব্দ ফোটেনি। যদি এটি 'তাশাহহুদ' না হতো তাহলে এখানেও তাঁর 'না' শব্দ 'হ্যাঁ' হয়ে যেতো।

৯. আল্লাহর সকল সৃষ্টিজীবের ওপর তাঁর বদান্যতা এতোটাই ব্যাপক যে, তাঁর কারণে সমস্ত অন্ধকার, দারিদ্র ও শূন্যতা বিদায় নিয়েছে।

১০. কুরাইশের লোকজনও যখন তাঁকে দেখে তখন নিঃশঙ্কোচে স্বীকার করে, তিনিই হলেন ওই ব্যক্তি যাঁর কাছে এসে মাহাত্ম্য পূর্ণতা পেয়েছে।

১১. লজ্জার কারণে তিনি সবসময় তাঁর দৃষ্টি নত করে রাখেন। আর তাঁর প্রতাপে মানুষও তাঁর থেকে দৃষ্টি অবনত করে রাখে। যখন তিনি মুচকি হাসির আভা ছড়িয়ে তাকান তখুনি অন্যরা তাঁর সঙ্গে কথা বলার সাহস পায়।

১২. তিনি যখন চুম্বন খেতে আসেন তখন হাতিমে কা'বার রুকনে ইয়ামানিও তাঁর সুঘ্রাণে বিমোহিত হয়ে একান্তে পেতে চায়।

১৩. পৃথিবীতে যতো মানুষ আল্লাহর শোকর আদায় করে তারা তাঁর গৃহের অবদানেরও শোকর আদায় করে। কারণ, এ ব্যক্তিত্বের গৃহ থেকেই বিশ্ববাসী শ্রেষ্ঠ দীনের আলো পেয়েছে।

১৪. তিনি সম্মান ও শ্রদ্ধার সেই শীর্ষচূড়ায় উন্নীত হয়েছেন. যা আরব-অনারবের অন্য কোনো হাত অদ্যাবধি ছুঁতে পারেনি। কোনো পা সেখানে উন্নীত হতে পারেনি।

১৫. তাঁর নানাজানকে চেনো? তিনি হলেন সেই মহান ব্যক্তি. যাঁর শ্রেষ্ঠত্ব অন্য নবীগণও মেনে নিয়েছেন এবং যাঁর উম্মতের শ্রেষ্ঠত্ব অন্য সকল উম্মতও স্বীকার করেছে।

১৬. তাঁর শেকড় উৎসারিত হয়েছে আল্লাহর মহান রাসূল থেকে। তাঁর বংশ ও পরিবার উৎকর্ষতার বিচারে জগৎশ্রেষ্ঠ।[১২]

১৫. হযরত যাইনুল আবেদীন রহ.-এর বিশদ জীবনচরিত জানার জন্য নিম্নোক্ত কিতাবগুলো পড়ুন—

১. তাবাকাতে ইবনে সা'দ : ৫/২১১
২. তারীখুল বুখারী : ৬/৬২৬
৩. আলা মায়ারিফ : ২১৪
৪. আল মারিফাতু ওয়াত-তারীখ : ১/৩৬০,৫৪৪
৫. আল-জারহু ওয়াত-তাদীল : ৩/১৭৮
৬. তাবাকাকুল ফুকাহা (সিরাজী) : ৬৩
৭. তারীখে ইবনে আসাকির : ১২/৫১৫
৮. আল-আসমা ওয়াল লুগাত : ১/৩৪৩
৯. ওয়াফিয়াতুল আ'য়ান : ৩/৩৬৬
১০. তারীখে ইসলাম : ৪/৩৪
১১. আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া : ৯/১০৩
১২. আন নুজুমুয যাহিরাহ : ১/২২৯

---

১২. শ্রদ্ধেয় আব্বাজান বয়ান করার সময় ওই কবিতাগুলো মূল আরবী ও তৎসংশ্লিষ্ট উর্দূ অনুবাদ এমনভাবে আবৃত্তি করতেন যে, গোটা মজলিসে কান্নার শোরগোল পড়ে যেতো। মহান আল্লাহ তাঁকে মাগফিরাতের চাদরে জড়িয়ে নিন। জান্নাতুল ফেরদাউস দান করুন। আমীন।

হযরত সুমামা ইবনে ওয়াসিলা রা.-এর ঘটনা

হযরত মাওলানা সাহেব দা.বা.

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

সালামান্তে আমার আবেদন হলো, আপনার ওয়াজে বারবারই হযরত সুমামা ইবনে ওয়াসিলা রা.-এর ঘটনা শুনে থাকি যা কোনো কিতাবে পড়িনি। আল্লাহ্ তাআলা নিজ দয়া ও কৃপায় এ অধমকে ইলমের যৎসামান্য জ্ঞান দান করেছেন। অনুগ্রহপূর্বক সুবিন্যস্ত আকারে আলোচনা করে হৃদয়ের তৃষ্ণা নিবারণ করুন।

সালামান্তে

আপনার জনৈক দীনি ভাই

চিঠির উত্তর

৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসূল সা. চতুর্দিকে ইসলামের দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার ইচ্ছে করলেন। এ লক্ষ্যে আরব-অনারবের শাসক ও রাষ্ট্রপ্রধানের নিকট পত্র প্রেরণের ইচ্ছা করলেন। যে সকল শাসকের নিকট এ দাওয়াতীপত্র পাঠিয়ে ছিলেন; তাদের একজন ছিলেন সুমামা ইবনে ওয়াসিলা হানাফী। সুমামাকে গুরুত্বপূর্ণ এক শাসক মনে করে তাঁর নিকট দাওয়াতীপত্র প্রেরণ কোনো বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল না। কারণ হলো, তিনি অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও সমাজের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন। তিনি জাহেলী যুগে আরবের এক শাসকগোষ্ঠীর সর্দার ও ইয়ামামা অঞ্চলের এমন ব্যক্তি ছিলেন যার কোনো কথাকে অবমূল্যায়ণ করা হতো না।

রাসূল সা.-এর দূত সুমামার নিকট পৌঁছলে তার সঙ্গে খুবই খারাপ ব্যবহার ও দায়িত্বহীন আচরণ করা হলো। মিথ্যা গর্ব অহংকার ও অহমিকা তাকে ঔদ্ধত্ব আচরণে উদ্বুদ্ধ করলো। সত্যের দাওয়াত হতে কান বন্ধ করলো। এরপর শয়তান তার ওপর ভর করলো। সে রাসূল সা.-এর ওপর গোপনে আক্রমণ করে তাঁর মিশন মিটিয়ে দেবার মনস্থ করলো। আর এ অসৎ উদ্দেশ্য পূরণে যুৎসই সময়ের অপেক্ষা করছিলো। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর নবীকে অনিষ্ট থেকে রক্ষা করলেন। সুমামা যদিও রাসূল সা.-কে হত্যার সিদ্ধান্ত হতে পিছু হটল; কিন্তু সাহাবীগণকে হত্যার বিষয়ে ছিলো বদ্ধপরিকর। সবসময় ওত পেতে থাকতো। একপর্যায়ে কয়েকজন সাহাবীকে বাগে পেল এবং নির্মমভাবে তাঁদেরকে শহীদ করলো। এজন্য রাসূল সা. ঘোষণা দিলেন— 'তাকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে।'

সাহাবীগণকে হত্যা ও রাসূল সা.-এর এ ঘোষণার কিছুদিন পরই সুমামা উমরা পালনের উদ্দেশে ইয়ামান থেকে মক্কা অভিমুখে যাত্রা শুরু করলো। কিন্তু পথিমধ্যে এমন বিপদের ফাঁদে আটকা পড়লো যা সে ঘূর্ণাক্ষরেও কল্পনা করেনি। রাসূল সা.-এর পাঠানো সৈন্যবাহিনী (যারা মদীনার সীমানা পাহারায় নিযুক্ত ছিলেন) সুমামাকে পেয়ে গ্রেফতার করে নিয়ে আসেন। (তারা সুমামাকে চিনতে পারেনি) মদীনায় এনে মসজিদে নববীর এক খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখেন। অপেক্ষায় থাকলেন, রাসূল সা. এসে নিজেই বন্দী সম্পর্কে জেনে সিদ্ধান্ত নেবেন। রাসূল সা. ঘর হতে মসজিদে প্রবেশ করতেই চোখে পড়ল, সুমামাকে খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয়েছে। সাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি জানো, কাকে গ্রেফতার করে এনেছ? সাহাবায়ে কেরাম আরয করলেন— না, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা তাকে চিনি না। নবীজি বললেন— এ হলো হানাফী সম্প্রদায়ের সর্দার সুমামা ইবনে ওয়াসিলা। তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করো। তিনি বন্দীর পরিচয় করিয়ে দিলেন।

এরপর ঘরে গিয়ে ঘরের লোকজনকে বললেন, তোমাদের কাছে যতোটুকু খাবার আছে তা একত্র করে সুমামার নিকট পাঠাও। এরপর রাসূল সা. বললেন, আমার উটনীর দুধ দোহন করে সকাল-সন্ধ্যায় তাকে দেবে। তারপর সুমামাকে ইসলামের দিকে আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে তার নিকট গেলেন। জিজ্ঞেস করলেন, সুমামা! তোমার খেয়াল কী? তুমি আমাদের কাছে কোন ধরনের আচরণ আশা করো?

সুমামা বললো— 'আমি আপনার সম্পর্কে সুধারণা ও আপনার নিকট সদয় আচরণের আশাবাদী। কিন্তু আমার ব্যাপারে যদি হত্যার সিদ্ধান্ত হয় তাহলে এমন এক ব্যক্তিকেই হত্যা করা হবে যে সত্যিকার অপরাধী। আর দয়াপরবশ হয়ে মুক্তি দিলে একজন কৃতজ্ঞ ব্যক্তির ওপরই দয়া করা হবে। আর যদি সম্পদ চান তাও বলুন। যে পরিমাণ বলবেন সেটাই দেওয়া হবে'।

এ আলোচনার পর রাসূল সা. সুমামাকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দিলেন। দু'দিন পর্যন্ত আর কোনো প্রশ্ন করেননি। এসময় নিয়মমাফিক খাবার পৌঁছত। দু'দিন পর রাসূল সা. তার নিকট আবার গেলেন। পুনরায় সে প্রশ্নই করলেন। 'সুমামা তোমার মতামত কী? আমার কাছে কোন ধরনের আচরণ প্রত্যাশা করো।'

সে বললো— আমার কথা তাই; যা পূর্বে বলেছিলাম। যদি আমার প্রতি সদয় হন তাহলে এমন ব্যক্তিকে দয়া করবেন যে এর মূল্যায়ন করবে। আর আমার হত্যার সিদ্ধান্ত হলে তা সঠিক বলেই বিবেচিত হবে। কেননা আমি

আপনার লোকজনকে হত্যা করে এর উপযুক্ত হয়েছি আর সম্পদ চাইলে বলুন, যা বলবেন তাই দেওয়া হবে।

এ সময়ও রাসূল সা. বাড়তি কিছু বলেননি। বরং তাকে রেখে চলে এলেন। তবে পরদিন আবার তার নিকট পুনরায় সে প্রশ্নই পুনরাবৃত্তি করলেন, সুমামা! তুমি কী আচরণ প্রত্যাশা কর?

সে পূর্বের জবাবই দিলো। 'যদি আমার প্রতি ইহসান করেন তাহলে একজন কৃতজ্ঞশীল ব্যক্তিকেই ইহসান করা হবে। আর হত্যার সিদ্ধান্ত নিলে তাও যথার্থ। আর যদি সম্পদের প্রয়োজন হয় তাহলে বলুন, আপনার চাহিদা অনুযায়ী পেশ করা হবে।

এ কথপোকথনের পর রাসূল সা. সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে বললেন— 'সুমামাকে ছেড়ে দাও'। আদেশ অনুযায়ী শেকলমুক্ত করা হলো। মুক্তি পেয়েই মসজিদ হতে বের হয়ে বাকীর নিকটবর্তী এক খেজুরবাগানে গেলেন, যেখানে একটি কুপ ছিলো। সাওয়ারীকে কুপের পাশে বসিয়ে কুপের পানি দিয়ে ভাল করে গোসল করলেন। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে সে পথেই মসজিদে ফিরে এলেন। মসজিদে এসে মুসলমানগণের এক মজলিসের নিকটবর্তী হয়ে উচ্চস্বরে কালিমা শাহাদাত পড়ে নিজে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিলেন। এরপর রাসূল সা.-এর দিকে তাকিয়ে বললেন— হে মুহাম্মদ সা.! আল্লাহর শপথ, ভূপৃষ্ঠে আপনার চেহারার চে' ঘৃণিত ও নিকৃষ্ট কোনো চেহারা আমার নিকট ছিল না। কিন্তু এখন আমার নিকট আপনার চেহারাই সবচে' আপন ও প্রিয়। আল্লাহর শপথ! আপনার ধর্মই ছিল আমার সবচে' ঘৃণিত। কিন্তু এখন এ ধর্মই আমার সবচে' প্রিয়, পছন্দনীয়। আল্লাহর শপথ! আপনার শহরই ছিল আমার কাছে সবচে' নিকৃষ্ট, কিন্তু এখন এ শহরই আমার সবচে' প্রিয়।

কিছুক্ষণ চুপ থেকে পুনরায় বললেন— আপনার কয়েকজন সাথীকে হত্যা করেছি। এর প্রতিকার হিসাবে আমার ওপর কী ধার্য করবেন? রাসূল সা. বললেন, সুমামা! এ কারণে তোমার ওপর না কিসাস, না কোনো রক্তপণ। কেননা ইসলাম পূর্বের সকল সীমালঙ্ঘন ও অন্যায় মিটিয়ে দেয়।

এরপর রাসূল সা. তাঁকে ইসলাম গ্রহণের জন্য জান্নাতের সুসংবাদ দেন। তাঁর চেহারায় আনন্দের ঝলক পরিলক্ষিত হয়। বলতে শুরু করলেন, আল্লাহর শপথ! আপনার যে ক'জন সাহাবীকে হত্যা করেছি তারচে' কয়েকগুণ বেশী মুশরিক হত্যা করবো। আমি নিজেকে, নিজ তরবারিকে ও সে সবলোককে যারা আমার অধিনস্থ; আপনার ও আপনার দীনের সাহায্য-সহযোগিতায় তাদেরকে ওয়াকফ করছি

কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললেন— হে আল্লাহর রাসূল! আপনার সৈন্যবাহিনী আমাকে সে সময় গ্রেফতার করেছিল যখন আমি উমরার উদ্দেশে বের হয়েছিলাম। আপনার মতে আমার এখন কী করণীয়? রাসূল সা. বললেন— তুমি মক্কায় গিয়ে উমরা আদায় কর। তবে এখন উমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদর্শ অনুসারে করবে। এরপর রাসূল সা. হজ ও উমরা সম্পর্কে শিক্ষা দিলেন।

হযরত সুমামা ইবনে ওয়াসিলা রা. উমরা পালনের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। মক্কা উপত্যকায় পৌঁছে দাঁড়িয়ে উচ্চস্বরে তালবিয়া পড়তে শুরু করলেন :

لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لاَ شَرِيكَ لَكَ.

হাজির। আল্লাহ! আমি হাজির। আমি হাজির। তোমার কোনো শরীক নেই। আমি হাজির। সকল প্রশংসা ও সকল নেয়ামত তোমারই জন্য। ক্ষমতা তোমারই। তোমার কোনো শরীক নেই।

তিনিই বিশ্বের প্রথম মুসলমান যিনি সর্বপ্রথম তালবিয়া পড়তে পড়তে বায়তুল্লায় প্রবেশ করেন। মক্কাবাসী আকস্মিক অবাঞ্ছিত আওয়াজ শুনে ভীতু হয়ে পড়লো। ক্রোধান্বিত হয়ে ছুটে বের হলো, তারা তরবারি কোষমুক্ত করে আওয়াজের উৎসের দিকে দ্রুত অগ্রসর হলো। যাতে তার ওপর হামলে পড়া যায়। যেন তারা তার দিকে ধেয়ে যাচ্ছিলো। তাদের দৃষ্টি সুমামার দিকে পড়তেই সে আরো উঁচুস্বরে তালবিয়া পড়তে শুরু করলো। পরওয়াহীন নির্ভয় চোখে তাদের দেখছিলো। এক কুরাইশী যুবক তীর মেরে শহীদ করতে উদ্যত হলো। কিন্তু অপর এক ব্যক্তি বললো, এমন করো না। তুমি ধ্বংস হও, জানো ইনি কে? ইনি হলেন ইয়ামামার বাদশা সুমামা ইবনে ওয়াসিলা। তার কোনো ক্ষতি হলে তার সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের শস্য-দানার আমদানী বন্ধ করে দেবে। তখন আমরা দুর্ভিক্ষে মারা যাব। এরপর ঐ ব্যক্তি তরবারি কোষবদ্ধ করে হযরত সুমামার সামনে পৌঁছে বললো— সুমামা! তোমার কী হয়ে গেলো? তুমি বিধর্মী হয়ে গেলে? পিতৃপুরুষের ধর্ম ছেড়ে দিলে?

'না আমি বিধর্মী হইনি। বরং সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম মুহাম্মদ সা.-এর ধর্মকে বেছে নিয়েছি'। হযরত সুমামা জবাব দিলেন।

এরপর বললেন— এ ঘরের মালিকের শপথ! আমার প্রত্যাবর্তনের পর ইয়ামামার একটি শস্য-দানাও তোমাদের কাছে পৌঁছবে না যতক্ষণ না তোমরা মুহাম্মাদ সা.-এর অনুসারী হবে। হযরত সুমামা রা. কুরাইশের সামনেই রাসূল সা.-এর বাতলে দেয়া পদ্ধতিতে উমরা সম্পন্ন করলেন। মূর্তির জন্য নয়, বরং আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি লাভের জন্যই কুরবানী করে

স্বদেশে ফিরে এলেন। মক্কায় শস্য-দানা রপ্তানী বন্ধের আদেশ করলেন। সম্প্রদায়ের লোকেরা আদেশ মান্য করলো। রপ্তানী বন্ধ করে দিলো।

কুরাইশের বিরুদ্ধে সুমামার এই অর্থনৈতিক অবরোধ দিন দিন অসহনীয় হয়ে উঠলো। শস্য-দানার বাজারমূল্য বেশ চড়া হলো। মানুষের ক্রয়সীমার বাইরে চলে গেলো। লোকজন অনাহারে দিনাতিপাত করতে শুরু করলো। তাদের দুঃখ কষ্ট বেড়ে গেলো। অবস্থা ভয়াবহ রূপ নিলো। এমনকি ক্ষুধার যন্ত্রণায় শিশু-সন্তানরা মরে যাবার উপক্রম হলো। তখন তারা রাসূল সা.-কে লিখলো, আমরা আগ থেকেই আপনার সম্পর্কে জানি। আপনি আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখেন। অন্যকেও এর প্রতি গুরুত্বারোপ করেন। কিন্তু বর্তমানে আমরা যে অবস্থার সম্মুখীন তা হলো, আপনি আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করেছেন, আপনি আমাদের বাপ-দাদাগণকে তরবারি দ্বারা হত্যা করেছেন, আর সন্তানগণকে অনাহারে মৃত্যুর মুখে ফেলেছেন। সুমামা ইবনে ওয়াসিলা আমাদের সঙ্গে পণ্য আমাদানী রপ্তানী বন্ধ করেছে। আমরা এতে কঠিন বিপদে পড়েছি। যদি আপনি সঙ্গত মনে করেন তাহলে তাঁকে একটু লিখে দিন সে যেন অর্থনৈতিক অবরোধ উঠিয়ে নেয়।

রাসূল সা. সুমামা ইবনে ওয়াসিলা রা.-কে লিখলেন, সে যেন কুরাইশদের ওপর আরোপিত আমদানী-রপ্তানীর অবরোধ উঠিয়ে নেয় এবং বাজার উন্মুক্ত করে দেয়। তিনি রাসূল সা.-এর আদেশ মাথা পেতে নিলেন। অবরোধ তুলে নিলেন। কুরাইশদের সঙ্গে আমদানী রপ্তানী শুরু হয়।

হযরত সুমামা ইবনে ওয়াসিলা রা. সারা জীবন নিজ ধর্মের পূর্ণ বিশ্বাসী এবং রাসূল সা.-এর সঙ্গে কৃত প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন। যখন রাসূল সা. ইন্তেকাল করেন এবং আরববাসী সম্মিলিত ও একাকীভাবে দীন ত্যাগ করছিল, অন্যদিকে মুসাইলামাতুল কাযযাব হানাফী গোত্রে মিথ্যা নবুওয়াতের দাবী করে নিজের প্রতি ঈমান আনার দাওয়াত দিতে শুরু করল তখন হযরত সুমামা রা. তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তাঁর জাতিকে বুঝালেন, হানীফা সম্প্রদায়! খবরদার! এ পথভ্রষ্টের ডাকে সাড়া দিয়ো না। যাতে হিদায়েতের আলোর কোনো লেশমাত্র নেই। আল্লাহর শপথ! এ হলো সেই হতভাগ্য –যাকে আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর বিপদরূপে চাপিয়ে দিয়েছেন। যারা তাকে গ্রহণ করেছে, তারা নিশ্চিত কঠিন বিপদে পড়েছে। যারা তাকে অস্বীকার করবে তা হবে তাদের জন্য অগ্নিপরীক্ষা। তিনি আরো বললেন— হানীফা সম্প্রদায়! একই সময় দু'নবী হতে পারে না। মুহাম্মদ সা. সর্বশেষ নবী। তাঁর পর কোনো নবী নেই। তাঁর নবুওয়াতে কারো অংশ নেই।

এরপর বলেন, দেখুন মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন–

حم ○ تَنْزِيْلُ الْكِتَابِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ ○ غَافِرِ الذَّنْبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطَّوْلِ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيْرُ○

হা মীম। এ কিতাব অবতীর্ন হয়েছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে। যিনি মহাক্ষমতাবান ও সর্বজ্ঞানের অধিকারী। যিনি গুনাহ ক্ষমাকারী, তাওবা কবুলকারী, কঠিন শাস্তিদাতা ও অত্যন্ত শক্তিমান। তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত আর কেউ নেই। তাঁরই সকাশে সকলকে ফিরে যেতে হবে।[১৩]

কোথায় মহান আল্লাহর এই বড়ত্বপূর্ণ কথা আর কোথায় মুসাইলামাতুল কাযযাবের কথা–

يَا ضِفْدَعُ! نَقِّي مَا تُنَقِّيْنَ. لاَ الشَّرَابَ تَمْنَعِيْنَ وَلاَ الْمَاءَ تُكَدِّرِيْنَ.

হে ব্যাঙ! তুমি যতই ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙর কর। তুমি তোমার এই ঘ্যাঙর-ঘ্যাঙরের মাধ্যমে লোকজনকে পানি পান করা থেকে বিরত রাখতে পারবে না। আবার পানিকেও ময়লা করতে পারবে না।

নিজ সম্প্রদায়ের সে সব ব্যক্তি তখন ইসলামের ওপর অটুট অবিচল ছিলেন হযরত সুমামা রা. তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে তাঁর দীনকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন।

আল্লাহ তাআলা হযরত সুমামা ইবনে ওয়াসিলা রা.-কে ইসলাম ও মুসলমানের পক্ষ হতে প্রভুত কল্যাণ দান করুন। তাঁকে মুত্তাকীগণের জন্য প্রতিশ্রুত জান্নাত দিয়ে ধন্য করুন। আমাদেরও জান্নাতুল ফিরদাউস নসীব করুন। আমীন।

গোপনে ঋণ পরিশোধকারী দু'টি বিশেষ নেয়ামত পাবে

মুসনাদে আবু ইয়ালাতে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি তিনটি কাজ ঈমানের সাথে পালন করবে সে জান্নাতের সকল দরজা দিয়েই প্রবেশের ইচ্ছাধিকার পাবে। যে দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করবে এবং মনের মত যে কোনো হুরকে বিবাহ করতে পারবে।

১. যে ব্যক্তি তার হত্যাকারীকে ক্ষমা করে।

২. কারো ঋণ গোপনে পরিশোধ করে।

৩. প্রত্যেক ফরয নামাযের পর দশবার সূরা ইখলাস পাঠ করে।

---

১৩. সূরা মুমিন : ৩১।

হযরত আবু বকর রা. জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যে ব্যক্তি এ তিনটির একটি পালন করলো? রাসূল সা. বললেন— একটি পালন করলেও সেই সাওয়াব পাবে।[১৪]

মুসলমান প্রথাপালনে আগ্রহী ও সুন্নতে অনাগ্রহী

ইলেক্ট্রিক যন্ত্রপাতির এ যুগে মানুষও যন্ত্রের মতো জীবন যাপন করছে। কর্মব্যস্ততা আর জীবনোপকরণ নিয়েই মহাব্যস্ত। প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপনের যাবতীয় উপকরণ থাকা সত্ত্বেও প্রশান্তি নেই; এ অভিযোগ সর্বত্র। একদিকে বস্তুবাদের উন্নতি তাকে মোহাবিষ্ট করে রেখেছে। অন্যদিকে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের কাছে এতটাই নিজেকে সঁপে দিয়েছে যে, ইলমে দীনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা হৃদয় থেকে বের হয়ে যাচ্ছে। মুখে বলছে, দীন-দুনিয়া বরাবর আর কার্যক্রম ও জীবন যাপনে দুনিয়াদারের ছবিই পরিলক্ষিত হচ্ছে। রুসম ও প্রথা পালনে মরিয়া আর সুন্নতে নববী স্পর্শ করতে যেন ব্যক্তিত্বে বাধ সাধে। মুসলিম যুবকেরা ফিরিঙ্গী কৃষ্টি-কালচারে এতটাই আমদিত যে, পোশাক, খাবার-দাবার উঠা-বসা সর্বত্রই ফিরিঙ্গী কালচারের জয়জয়কার। একেই উন্নতির সিঁড়ি মনে করছে। কাফের বিধর্মীরা মুসলমানদের জীবন যাপনে তাদের কালো থাবা বিস্তার করেছে যখন তারা আধুনিক জেনারেল শিক্ষার জ্বালানী সরবরাহ করছে।

আকবর ইলাহাবাদীর ভাষায়—

خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے　　لب خندہ سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ
ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم　　کیا پتہ تھا کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ

যুবকদের উন্নতি দেখে আমরাও অনেক খুশি-উচ্ছ্বসিত।

কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিমর্ষ ঠোঁট থেকে ফরিয়াদও বেরিয়ে আসছে।

মনে করেছিলাম, শিক্ষা-দীক্ষা পেয়ে আমার ছেলে মানুষের মতো মানুষ হবে।

আমি কি জানতাম, শিক্ষার পাশাপাশি সে নাস্তিকতাও বয়ে আনবে?

বর্তমান যুগের মুসলিম শিশুরা মায়ের কোলেই ইংরেজী ভাষার বিভিন্ন পারিভাষিক শব্দ এমনভাবে শিখছে যেভাবে অতীতের লোকেরা কালিমা তাইয়্যিবা ও কুরআনের আয়াত শিখত। যখন সন্তানের মাতৃকোলই এমন তখন কি আর অভিযোগ? কিইবা বলার আছে? এ শিশুই বড় হয়ে পিতা-মাতার অবাধ্য হবে।

---

১৪. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৫/৬১৬।

طفل سے بو آئے کیا ماں باپ کے اطوار کی
دودھ ڈبوں کا ہے اور تعلیم ہے سرکار کی

'শিশুদের মাঝে কীভাবে বাবা-মার প্রতিচ্ছবি পড়বে,
দুধ খাচ্ছে পট থেকে, শিক্ষা পাচ্ছে সরকার থেকে।'

কোনো কোনো নারী মনে করে, শাসন-বারণের দরকার নেই। ছেলে-মেয়েরা বড় হলে নিজেরাই ঠিক হয়ে যাবে। তাই বাচ্চার খারাপ আচার-আচরণ দেখে কেউ শাসন করতে গেলে মা নিজেই ধমক দেয়। পিতাকে কঠোর হতে নিষেধ করে। অথচ বাচ্চাদের এ বিকৃত অভ্যাস যৌবনেও পিছু ছাড়ে না। বাচ্চারা হলো তরল পারদের মতো। তাকে যে কাঠামোয় রাখা হবে, সে কাঠামো অনুসারেই গড়ে ওঠবে। তারা শিশুকালে যে মানসিকতায় গড়ে ওঠে, জীবনভর সে মানসিকতাই লালন করে। যারা আজ কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে পড়া-লেখা করছে, তাদেরকে দেখা যায়, তারা নিজে 'মানা'র পরিবর্তে 'মানানো'র মন-মানসিকতায় অভ্যস্ত হয়ে যায়। বাবা-মা যদি তাদেরকে কোনো কিছু বুঝাতে যায় তখন তারা তাদেরকে 'সেকেলে' 'পুরাতন মানসিকতার' ভাবতে শুরু করে। বাবাকে তো তারা 'পাপ'-এর মতো ঘৃণা করে। কবির ভাষায়–

ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں
جن کو پڑھ کر بچے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں

'ওই সমস্ত বই-পুস্তককে আমি বাজেয়াপ্তের যোগ্য মনে করি
যেগুলো পড়ে সন্তান তার বাবাকে সেকেলে ভাবতে শুরু করে।

অধিকাংশ যুবক-যুবতীদের অবস্থা হলো, তারা যখন ইউনিভার্সিটির শিক্ষা সমাপন করে বের হয় তখন তারা দীনের প্রতিটি মাসআলাকে জ্ঞান-বুদ্ধি ও যুক্তির নিরিখে মাপা শুরু করে। তখন এটিই হয়ে যায় তাদের প্রিয় কাজ। এরপর যদি বিদেশ হতে ডিগ্রি নেয়ার সুযোগ পেয়ে যায় তাহলে তো ظُلُمَاتٌ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ : অন্ধকার আর অন্ধকার। এসব লোকেরা নিজেদের সংশোধনের পরিবর্তে দীন সংশোধনের চিন্তায় বিভোর থাকে। স্বামী-স্ত্রী দু'জনই যদি এমন শিক্ষিত হন তখন দেখা যায়, নিজেদেরকে দীনের কাঠামোয় পরিচালিত করার পরিবর্তে দীনকে তাদের নিজেদের অনুগামী করতে উঠে পড়ে লাগে।

কবির ভাষায়–

خدا کے فضل سے میاں بی بی دونوں مہذب ہیں
اُنہیں غصہ نہیں آتا، اُنہیں غیرت نہیں آتی

'আল্লাহর কৃপায় স্বামী-স্ত্রী দু'জনই অতিকায় ভদ্র
তারা রাগ করেন না, তাদের আত্মসম্মানেও বাঁধে না।'

সত্যিকার দীনদরদীর জন্য সর্বক্ষণিক চিন্তার বিষয় হলো— সন্তানের প্রতিপালন কেমন হবে তা চিন্তা করা। যেসব ঘরে ছেলে-মেয়েদের সুশিক্ষার জন্য চেষ্টা করা হয় সেখানেও দেখা যায়, কাঙ্ক্ষিত সুফল পাওয়া যাচ্ছে না। তাদের জন্যে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন হলো, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন উলামায়ে কেরাম থেকে প্রয়োজনীয় জ্ঞানগত সহায়তা গ্রহণ করা।

ব্রাশ দ্বারা মিসওয়াকের সাওয়াব হয় না

একটা কথা মন দিয়ে শুনি। তাহলো, শরীয়ত আমাদেরকে দাঁত পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার নির্দেশ দিয়েছে। এখন এর জন্যে আমরা যাই ব্যবহার করি তা দিয়ে কিন্তু দাঁত পরিষ্কার হবে। কাজেই এর দ্বারা সাধারণ পরিচ্ছন্নতার নির্দেশ পালনের সাওয়াব পাওয়া যাবে। কিন্তু হাদীসে মিসওয়াকের যেই সাওয়াবের কথা এসেছে যে, এর দ্বারা নামাযের সাওয়াব ৭০ থেকে ৭৫ গুণ বেড়ে যায়, এই ফযীলতসহ পরকালীন অন্য যেসব সাওয়াবের কথা হাদীসে এসেছে তা একমাত্র মিসওয়াক ব্যবহার করলেই পাওয়া যাবে। সাথে সাথে মিসওয়াকের মাধ্যমে দাঁত পরিষ্কার রাখার সাওয়াবও অর্জিত হবে।

এ যুগে বিশেষত জেনারেল শিক্ষিত লোকজন ও যুবক শ্রেণীর অধিকাংশই ব্রাশ ও পেস্ট ব্যবহারে অভ্যস্ত। এ দ্বারা দাঁতের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা তো লাভ হবে কিন্তু মিসওয়াকের সুন্নত ও তার সাওয়াব থেকে বঞ্চিত থাকবে। আফসোসের কথা হলো, বর্তমানে মাদরাসার পরিবেশেও মিসওয়াকের পরিবর্তে টুথপেস্টকে গ্রহণ করার রেওয়াজ চালু হয়েছে। আমরা ইসলামী কৃষ্টি-কালচার ছেড়ে পশ্চিমাদের পদাঙ্ক অনুসরণে মত্ত। এর উদ্দেশ্য এ নয় যে, ব্রাশ-টুথপেস্ট ব্যবহার করা নিষেধ। কিন্তু সুন্নতের সাওয়াব যে ছুটে যাচ্ছে। নবীগণের পথ এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। ফাতাওয়ার কিতাবেও এর গুরুত্ব পাওয়া যায়। ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়ার বক্তব্য হলো— আঙ্গুল দ্বারা দাঁত মাজা যদিও রাসূল সা.-এর আমল ও বাণী দ্বারা প্রমাণিত; তবুও তা মিসওয়াকের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। সেখানে ব্রাশ ইত্যাদি কি করে হতে পারে? এজন্য গাছের ডালের মিসওয়াক হলো সুন্নাত।[১৫]

---

১৫. তাওযীহুল মাসায়েল: ৩৫; ফাতাওয়ায়ে রহিমিয়া: ১/১২৬।

মিসওয়াকের ফযীলত সম্পর্কে বিবৃত হয়েছে যে, 'মাজন ব্যবহার জায়েয; কিন্তু মাজন ব্যবহারে মিসওয়াকের ফযীলত পাওয়া যাবে না।[১৬]

সি'আয়াহ্ গ্রন্থে হিদায়ার টিকায় জৈনপুরীর উদ্বৃতি রয়েছে যে, 'মিসওয়াক থাকাকালে আঙ্গুল দিয়ে দাঁত মললে সুন্নাত আদায় হবে না।'[১৭]

এ সকল মনীষীর বক্তব্য থেকে বুঝে আসে— পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা এক জিনিস। আর সুন্নাতের সাওয়াব ভিন্ন জিনিস। মাজন-পেস্ট ব্যবহারে সাধারণ পবিত্রতা লাভ হবে; কিন্তু মিসওয়াকের সাওয়াব পাওয়া যাবে না। এ কারণে সুন্নাতের সাওয়াব ও এর গুরুত্বকে সামনে রেখে মুসলমানদের দায়িত্ব হলো সুন্নাত না ছাড়া। মাজন-পেস্টের পাশাপাশি বিশেষত নামাযের সময় মিসওয়াকের ব্যাপারে গুরুত্ব দেবে। যাতে নবীর রেখে যাওয়া আদর্শ সমাজে চালু থাকে।

মিসওয়াক করার সময় এ নিয়ত করুন

ইমাম গাযালী রহ. লেখেন, মিসওয়াক করার সময় এ নিয়ত করবে যে, আল্লাহ তাআলার যিকির ও তেলাওয়াতের জন্য মুখ পরিষ্কার করছি। তাঁর কালজয়ী রচনা ইয়াহ্ইয়া উল উলূমে আছে— কেবল দুর্গন্ধ দূর করার নিয়ত করবে না, সে সাথে যিকির ও তেলাওয়াতের নিয়ত করবে যাতে তারও সাওয়াব পাওয়া যায়।[১৮]

মিসওয়াক করার সুন্নাত পদ্ধতি

আল্লামা ইবনে নাজীম রহ. 'আল-বাহরুর রায়েক'-এ লিখেন— 'মিসওয়াক করার পদ্ধতি হলো, মিসওয়াক দাঁতের উপরি ভাগ, নিচের ভাগ ও তালুতে মলবে। ডান দিক থেকে শুরু করবে। এরপর বাম পার্শ্বে যাবে। উপরিভাগ ও নিচভাগে কমপক্ষে তিনবার মলবে। ডান হাতে মিসওয়াক ধরে লম্বা আড়াআড়িভাবে মলবে।'

'তাহতাবী আলাল মারাকী' গ্রন্থে সুন্নাত পদ্ধতি লেখা হয়েছে— দাঁতের ভিতর ও বহির্ভাগ উভয় দিকে মলবে। মুখের উপরিভাগেও মলবে।[১৯]

আল্লামা শামী রহ. লেখেন— মেসওয়াক দাঁতের বহিরাংশে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করবে। চতুষ্কোণ বিশিষ্ট দাঁতের উপরিভাগে এবং দু'দাঁতের মাঝখানের জোড়ায়ও করবে।[২০]

---

১৬. ফাযায়েলে মিসওয়াক : ৭৩।
১৭. ফাযায়েলে মিসওয়াক : ১১৭।
১৮. ইতহাফুস সাদাহ : ২/৩৪৮৭।
১৯. তাহতাবী আলাল মারাকী : ৩৮।
২০. শামী : ১/১১৪।

মিসওয়াক ধরার সুন্নাত পদ্ধতি

মিসওয়াক ধরার সুন্নাত পদ্ধতি হলো, ডান হাতের কনিষ্ঠ আঙ্গুলকে নিচে রাখবে। অনামিকা ও শাহাদাত আঙ্গুল উপরিভাগে এবং বৃদ্ধাঙ্গুলী মিসওয়াকের মাথার নিচে রাখবে। আর মিসওয়াক ডান হাত দিয়েই ধরবে।[২১]

মিসওয়াক কতোটা মোটা হবে?

মিসওয়াক কনিষ্ঠ আঙ্গুল পরিমাণ পুরু হতে হবে।[২২]

উদ্দেশ্য হলো এ পরিমাণ হওয়া যা সহজে চিবানো যায় এবং নরম হয়। এরচে' পুরু বেশী হলেও নিয়ে নেবে। তা দিয়েই মিসওয়াক করা যাবে।

মিসওয়াক কতোটা লম্বা হবে?

এক বিঘত। এর বেশী নয়। এর বেশী হলে শয়তান তাতে বসবে। হ্যাঁ, মিসওয়াক করতে করতে ছোট হলে কোনো সমস্যা নেই।[২৩]

মিসওয়াক দাঁড় করিয়ে রাখার ফযীলত

মিসওয়াককে শুইয়ে রাখবে না। দাঁড় করিয়ে রাখবে।[২৪]

মিসওয়াক ধুয়ে রাখবে। আবার মিসওয়াক করার সময় ধুয়ে নেবে। মাটিতে রাখবে না। পাগল হয়ে যাওয়ার আশংকা রয়েছে, বরং তাক বা কোনো উঁচু স্থানে দাঁড় করিয়ে রাখবে।[২৫]

হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রা. বলেন, যে ব্যক্তি মিসওয়াক মাটিতে রাখার কারণে পাগল হলো সে যেন নিজেকে ছাড়া অন্য কাউকে দোষারোপ না করে। কেননা এটি তার নিজেরই ভুল।

মিসওয়াক করার সময় লক্ষ্যণীয় বিষয়

* মিসওয়াক মুষ্টিবদ্ধ করে ধরবে না। তাহলে অর্শ্বরোগ হবে।[২৬]

* মিসওয়াক কাত করে রাখবে না। তাহলে তলানী পড়বে।[২৭]

* মিসওয়াক চুষবে না। তাহলে অন্ধত্ব ও দৃষ্টিশক্তি লোপ পাবে। হ্যাঁ, মিসওয়াক নতুন হলে প্রথমবার চোষা যায়।[২৮]

---

২১. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত। আস সিয়ায়াহ : ১১৮, উমদাতুল কারী : ৩/১৭৫।

২২. আস-সিয়ায়াহ: ১১৮; উমাদাতুল কারী: ১৮৫।

২৩. আস সিয়ায়াহ : ১১৯।

২৪. আস-সিয়ায়াহ: ১১৯; শামী: ১১৫।

২৫. শামী : ১/১১৫।

২৬. আস-সিআয়াহ : ১১৯।

২৭. তাহাবী : ৩৮।

২৮. আস-সিআয়াহ : ১৯৯।

* মিসওয়াক প্রথমবার চুষণে শ্বেত ও কুষ্ঠরোগ প্রতিহত হয়। এটি মৃত্যু ব্যতীত সকল রোগের প্রতিষেধক। এরপর চুষণে বিস্মৃতি তথা ভুলে যাওয়ার রোগ দেখা দেয়।[২৯]

অন্যের মিসওয়াক ব্যবহার করা মাকরুহ

মিসওয়াক করার পূর্বে ধুয়ে নেবে। শেষেও ধুবে। নয়তো শয়তান ওই মিসওয়াক ব্যবহার করবে।[৩০]

মিসওয়াক সবসময় নিজ পকেটে রাখা উত্তম। যাতে নামাযের সময় হলেই মিসওয়াক করার ফযীলত লাভ করা যায়।[৩১]

দীনদারদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা যাবে না

মসজিদের কোনো মুয়াযযিন, খাদেম, ঝাড়ুদার এসব ব্যক্তির প্রতি আমরা কখনই বিদ্বেষ রাখবো না। বিশেষত তারা যদি এ সকল দায়িত্ব শুধুমাত্র সাওয়াবের নিয়তে পালন করে তবে তো তারা আরো বেশী সম্মান ও শ্রদ্ধার পাত্র। যদিও এ নিয়মটি সকল মুসলমানের ক্ষেত্রে পালনীয়; তবে এ সকল ব্যক্তির ক্ষেত্রে আরো অধিক গুরুত্বের দাবিদার। আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও ইজ্জতের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখা উচিৎ নয়। তারা আল্লাহর দরবারের খাদেম। এদের মাঝে সবচে' মর্যাদাশীল হলেন মুয়াযযিন। কেননা সে অধিকাংশ সময় ভোরের আযানের জন্য সুবহে সাদিকের পূর্বে ঘুম থেকে জেগে ওঠে। আর শেষ রাতে আল্লাহর সৈনিকদের সঙ্গে বিশেষ দরবারে উপস্থিত থাকে।

নফসের ক্ষুদ্র ধোঁকা থেকেও বাঁচুন

যতক্ষণ পর্যন্ত নিজ নফসের ছোট ছোট ধোঁকার ব্যাপারে অধিকতর খোঁজ-খবর না নেবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনো মুসলমানের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ ও কথাবার্তা বন্ধের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করবে না। কেননা অধিকাংশ সময় এমন হয় যে, সম্পর্কচ্ছেদ করা হয় প্রবৃত্তির তাড়নায় আর নফস মনে করে আমি আল্লাহর জন্যই সম্পর্ক ছিন্ন করেছি। এ বিষয়ে সে তখন অনেকগুলো যুক্তি-প্রমাণও দাঁড় করায়। যদি একটু ভাবি যে, সম্পর্ক ছিন্ন করা কবীরা গুনাহ। এ কারণে আমার কোনো আমল আকাশে পৌঁছবে না; তাহলে দেখা যাবে– সম্পর্কচ্ছেদের ব্যাপারে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিতে আমার নিজের অন্তরই ভীত হবে।

---

২৯. ইতহাফুস সাদাহ : ৫৩১; শামী : ১/১১৫।

৩০. তাহতাবী : ৩৭।

৩১. ফাযায়েলে মিসওয়াক : ৭৯।

প্রতিপক্ষের কল্যাণকামী হোন

আমাদের প্রতিপক্ষ যেই হোক এবং সে আমাদের যতোই অকল্যাণকামী হোক, আমাদের দায়িত্ব হলো– আমরা সবসময় তার কল্যাণ কামনা করবো। তার সঙ্গে সদাচরণ করবো। আল্লাহ তাআলা আমাদের সঙ্গে যেমন আচরণ করে থাকেন, আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে আমাদেরকেও ঠিক তেমনই আচরণ করতে হবে। আমরা দিন-রাত আল্লাহ তাআলার অবাধ্যতায় ডুবে থাকি, এতদ্সত্ত্বেও আমাদের ওপর তাঁর দয়া ও করুণা কখনই বাধাগ্রস্থ হয় না। আমাদেরকে আল্লাহর বান্দাদের সঙ্গে ঠিক সে আচরণটাই করতে হবে।

বুঝা গেলো, আল্লাহর দিকে দাওয়াত দানকারীর সার্বক্ষণিক দায়িত্ব হলো, সে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া সাথীদের সঙ্গে ভদ্রোচিত আচরণ করবে। তার মাঝে কোনো ত্রুটি থাকলে নম্রতা ও কোমলতার সঙ্গে তার চিকিৎসা করবে। তার সঙ্গে সবসময় সদাচরণ করবে। কেননা সে একজন রাখাল। আর প্রতিটি রাখালকে তার অধীনস্থদের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে। আল্লামা আবদুল ওয়াহহাব শা'রানী রহ. বলেন, আমার কাছে যে সকল যিকিরকারী থাকতো একবার কেনো যেন তাদের প্রতি আমার মনে বিরক্তি সৃষ্টি হলো। আমি তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার ইচ্ছা করলাম। সেদিন দিবাগত রাতেই আমি স্বপ্নে সাইয়্যেদ আলী খাওয়াস রহ.-এর যিয়ারত পেলাম। তিনি আমাকে স্বপ্নেই বললেন— তোমাকে আল্লাহর রাসূল সা. একটি নির্দেশ করেছেন। তাহলো, আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে তাকিয়ে মানুষের সংশ্রবের ওপর ধৈর্য ধারণ করো এবং তাদেরকে সবসময় সু-পরামর্শের মাধ্যমে তত্ত্বাবধান করো। তুমি ওই ব্যক্তির মতো হয়ো না, যার বকরির পাল দুর্গম এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেছে আর তাদের ওপর রাগ করে তুমি তাদেরকে জঙ্গলের বাঘের জন্য ছেড়ে চলে এলে।

যখন কোনো জালিম আমাদের ওপর জুলুম করবে তখন মনে করবে, আমি এরচেয়েও অধিক জুলুম প্রাপ্তির যোগ্য। যে ব্যক্তি আগুনে প্রজ্জলিত হওয়ার যোগ্য তাকে যদি অল্প সময়ের জন্য কয়লার ওপর রেখে সন্ধি করে নেওয়া হয় তখন তো ওই ব্যক্তি খুশিতে বাগবাগ হয়ে যায় যে, আল্লাহ আমাকে ছোট বিপদের মাধ্যমে বড় বিপদ থেকে পরিত্রাণ দিয়েছেন।

যখন আল্লাহ তাআলা মানুষের সামনে আমাদের দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেবেন তখনও আমাদেরকে আল্লাহর শোকর আদায় করতে হবে। যখন তিনি আমাদেরকে জনতার সামনে লাঞ্ছিত করবেন, তখন আমাকে এ কথা মনে

করতে হবে যে, আল্লাহ তাআলা আমার ওপর সন্তুষ্ট। এমন প্রজ্ঞার কারণেই তিনি এমনটা করেছেন, যার ধারে-কাছেও আমাদের বুদ্ধি পৌঁছায় না। কাজেই ব্যাপারটিকে আল্লাহর ওপর ছেড়ে দেবে। নিজেকে বলবে, আল্লাহর শোকর। তিনি আমাদের দোষ-ত্রুটি মানুষের সামনে প্রকাশ করে দেয়ার মাধ্যমে মূলত আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে, আমরা যেন তাথেকে ফিরে আসি এবং আগামীর জন্যে সতর্ক হয়ে যাই। কেননা মানুষের অভ্যাস হলো, যখন জনতার সামনে তার কোনো দোষ নিয়ে চর্চা হয়, তখন আগামীতে সে প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে ওই দোষ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সচেষ্ট হয়।

দ্বিতীয় কথা হলো, এমটি ঘটলে কখনই অন্যদেরকে দোষারোপ করা যাবে না। কেননা বাস্তবে আমি নিজেই দোষারোপের যোগ্য। আমি নিজেই তো আল্লাহ তাআলা থেকে উদাসীন হয়ে এমন কাণ্ড বাঁধিয়েছি, যা আজ আমার দুর্নাম ও নিন্দার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সর্বক্ষণ দেখছেন। যদি তাকে পুরোপুরি লজ্জা করতাম তাহলে কখনই নির্জনে এমন কাজ করার সাহস করতাম না। আল্লাহ তাআলা সর্বক্ষণ আমাদেরকে দেখছেন, এটা জানা সত্ত্বেও যখন আমি নিজেই ওই মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকিনি। এজন্যে আল্লাহ মাখলুকের কাছে আমার গোপন অবস্থা ফাঁস করে দিয়েছেন এ উদ্দেশ্যে যে, যেন আগামীর জন্য আমি সংশোধিত হই। কাজেই এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে আমার জন্য এক প্রকার ধমকি যে, আমরা কেনো মাখলুকের পরোয়া করছি, অথচ আল্লাহর পরোয়া করছি না।

হাকিম তিরমিযীর বিস্ময়কর স্বপ্ন

হাকিম তিরমিযী রহ.-কে আল্লাহ তাআলা দীনেরও হাকিম (প্রজ্ঞাবান) বানিয়েছিলেন, আবার দুনিয়ারও হাকিম (জ্ঞানী) বানিয়েছিলেন। তিনি 'তিরমিয' নগরীতে বাস করতেন। 'আমু' নদীর পাড়েই তাঁর মাযার অবস্থিত। তিনি তাঁর সমকালে শীর্ষস্থানীয় মুহাদ্দিস ছিলেন। আবার প্রাজ্ঞ চিকিৎসকও ছিলেন। এর সাথে সাথে মহান আল্লাহ তাঁকে বাহ্যিক রূপ-লাবণ্যও এ পরিমাণ দান করেছিলেন যে, তাঁর ওপর যারই দৃষ্টি পড়তো মুগ্ধ হয়ে যেতো। শুধু তাই নয়, তাঁর ভিতরের মনটাও ছিলো সুন্দর ও পুতঃপবিত্র। যার কারণে তিনি ছিলেন তাঁর এলাকার সবচেয়ে জনপ্রিয় ও বহুলচর্চিত পুরোধা।

তাঁরই যৌবন বয়সের ঘটনা। একদিন তিনি তাঁর চিকিৎসালয়ে বসে ছিলেন। ইত্যবসরে সেখানে এক নারী উপস্থিত হলো। মুখোমুখি হয়েই সে তার মুখের ওপর থেকে নেকাব ফেলে দিলো। ওই নারীও ছিলো প্রচণ্ড রূপসী। প্রেমের আকুতি নিয়ে সে নিবেদন করলো, আমি আপনার প্রেমে

পাগল হয়ে গেছি। বহু দিন যাবত সুযোগের সন্ধানে ছিলাম। আজ সেই কাঙ্ক্ষিত নির্জনতা পেয়ে গেছি। আপনি আমার খায়েশ পূরণ করুন।

সঙ্গে সঙ্গে হযরত হাকিম রহ.-এর মনে আল্লাহর ভয় এতোটাই উদ্বেলিত হয়ে ওঠলো যে, তিনি কেঁদে ফেললেন। তাঁর প্রবল কান্না দেখে নারীটি বিফল মনোরথে ফিরে গেলো। এরপর অনেক দিন পেরিয়ে গেলো। তিনি সেই ঘটনাটির কথা বেমালুম ভুলেও গেছেন।

দিনে দিনে হাকিম তিরমিযী রহ. বুড়ো হয়ে গেছেন। চুল-দাড়িতে পাক ধরেছে। কাজ-কর্মও ছেড়ে দিয়েছেন। একদিনের ঘটনা। তিনি জায়নামাযে বসে আছে। হঠাৎ মনের মধ্যে এ খেয়াল এলো যে, যৌবনকালে এক নারী আমার কাছে নিজেকে সঁপে দিয়েছিলো। কতোইনা ভালো হতো, যদি সেদিন তাকে উপভোগ করে পরে তাওবা করে নিতাম। এই ভাবনা মনের মাঝে উদিত হওয়া মাত্রই তিনি কেঁদে ফেললেন। দু'হাত তুলে আল্লাহর কাছে মিনতি করলেন, হে মহান রব! যৌবন বয়সে তো আমার এ অবস্থা ছিলো যে, গুনাহের নাম শোনামাত্রই আমি এতোটা কেঁদেছি যে, আমার কান্না দেখে ওই নারী অনুতপ্ত হয়ে চলে গেছে। আজ আমি বার্ধক্যে উপনীত হয়েছি। আমার চুল সাদা হয়ে গেলেও অন্তর কালো হয়ে গেছে। হে আল্লাহ! এমতবস্থায় আমি কোন মুখে তোমার সামনে দাঁড়াবো? বার্ধক্যের কারণে যেখানে আমার চলাফেরার শক্তি পর্যন্ত নেই, এমন অবস্থায়ও কিভাবে অন্তরে গুনাহ করার ইচ্ছা জাগ্রত হয়েছে?

এভাবে কাঁদতে কাঁদতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে রাসূলুল্লাহ সা.-এর যিয়ারত নসিব হলো। নিবেদন করলেন, হে প্রিয় রাসূল সা.! যৌবনকালে যখন শরীরে যৌন উত্তেজনা ছিলো, চোখে-মুখে উন্মাদনা ছিলো, তখনো আমার মনে আল্লাহর এতোটাই ভয় ছিলো যে, গুনাহের প্রস্তাব শুনে প্রচণ্ড কেঁদেছিলাম। যার কারণে প্রস্তাবকারীণী নারী নিজেই অনুতপ্ত হয়ে ফিরে যায়। কিন্তু এখন বার্ধক্যে এসে যখন শরীরের সকল পশম সাদা হয়ে গেছে তখন আমার অন্তর এতোটাই কালো হয়ে গেছে যে, মনের ভিতর গুনাহের সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করার আফসোস জাগছে। ভাবছি, সেদিন গুনাহ করে পরে তাওবা করে ফেললে তো মন্দ হতো না। এই পেরেশানি এখন আমাকে কুঁড়ে খাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা তখন তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন– এটি তোমার দুর্বলতা বা অপরাধ নয়। তুমি যখন যুবক ছিলে তোমার সেই সময়টি ছিলো তুলনামূলকভাবে আমার যুগের নিকটবর্তী। তার বরকতেই তোমার অবস্থা এতোটা ভালো ছিলো যে, গুনাহের দিকে তোমার মন ধাবিত হয়নি। কিন্তু এখন যদিও তুমি বুড়ো হয়ে গেছো; কিন্তু

সময়কালটি তদাপেক্ষা আমার যুগ থেকে দূরে। এজন্যে এখন তোমার মনে গুনাহ্ করার খায়েশ জেগেছে।

ঘরে প্রবেশের সময় 'সূরা ইখলাস' পড়লে রিযিকে বরকত হয়

তাবরানী শরীফে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ঘরে প্রবেশের সময় সূরা ইখলাস পাঠ করবে মহান আল্লাহ্ ওই ঘর ও তার প্রতিবেশীদের থেকে দারিদ্র দূর করে দেবেন।[৩২]

আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক রহ.-এর ইন্তেকাল

উসতাযুল মুহাদ্দিসীন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক রহ.-এর কাছে হাদীস পড়ার জন্যে হাজার হাজার ছাত্র ছুটে আসতো। যেভাবে আমরা নামাযের বড় জামাআতে 'মুকাব্বির' দেখতে পাই, তদ্রূপ তাঁর হাদীসের মজলিসেও 'মুকাব্বির' থাকতো। যারা তাঁর থেকে শ্রুত হাদীস সামনের শিষ্যদের উদ্দেশে নকল করতো। তাঁর একেকটি মজলিসে 'মুকাব্বিরের সংখ্যা হতো ১১০০। এথেকে বুঝে নিন, সেই মজলিস কতো বড় হতো। একবার তাঁর এক মজলিসের দোয়াতের সংখ্যা গোনা হয়েছিলো। দেখা গেলো, সেখানে ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) দোয়াত রয়েছে। এতো বড় মজলিসে তিনি হাদীসের দরস দিতেন। তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তের চিত্র তুলে ধরছি। বিছানায় পড়ে আছেন। একটু পর পর শরীরের অবস্থা পরিবর্তন হচ্ছিলো। তখন তিনি জনৈক শিষ্যকে বললেন, আমাকে এখান থেকে উঠিয়ে মাটিতে শুইয়ে দাও। শিষ্য তো পেরেশান, কী করবে! ওই যুগে তো আর মর্মর বা টাইলসের (ফ্লোর) মেঝে হতো না। স্রেফ মাটির মেঝে হতো।

তিনি দ্বিতীয়বারের মতো নির্দেশ দিলেন, আমাকে এখান থেকে তুলে মাটিতে শুইয়ে দাও। অগত্যা শিষ্য নির্দেশ পালন করলো। তাঁকে পরিষ্কার মাটির ওপর শোয়ানো হলো। দেখা গেলো, এতো বড় শায়েখ মাটির সঙ্গে গাল ঘষে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলছেন, 'হে আল্লাহ! আপনি আবদুল্লাহর বার্ধক্যের ওপর দয়া করুন।'

প্রিয় বন্ধুগণ! যে মানুষটি আজীবন হাদীসে রাসূলের খেদমত করেছেন তিনি যদি মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে মহান আল্লাহর কাছে এভাবে কাতর কণ্ঠে আকুতি জানান তাহলে আমাদেরকে কী পরিমাণ অক্ষমতা ও দীনতা প্রকাশ করতে হবে! আমাদের কাছে তো যৎসামান্যও আমল নেই। আমরা তো বাস্তবেই তাঁর দয়ার কাঙাল। হে আল্লাহ! আপনি আমাদের অবস্থার ওপর দয়া করুন। আমীন।

---

৩২. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৫/৬১৬।

আল্লাহর নিকটবর্তী করে এমন কাজই উত্তম

সাহাবায়ে কেরাম রা. ওই বিষয়টি গভীরভাবে অবলোকন করতেন যে, আমাদের ওপর পেরেশানী আসছে কি আসছে না। তাঁরা এসব বিপদকে আল্লাহর ভালোবাসার নিদর্শন মনে করতেন। ক্ষুধা ও দূর্ভিক্ষ নেমে এলে তাঁরা খুবই খুশি হতেন। কারণ, এটি এমন নেয়ামত– যা আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকেই দান করে থাকেন। দুঃশ্চিন্তা-পেরেশানি এলে খুশি হতেন, মহান আল্লাহ আমাকে আপন মনে করেছেন। এজন্যেই তিনি এ বিপদ পাঠিয়েছেন।

জনৈক সাহাবীর ঘটনা। তিনি ঘরে শুয়ে ছিলেন। এক সময় পানির তৃষ্ণা পেলো। স্ত্রীকে বললেন, পানি পান করাও। স্ত্রী বললো, নিয়ে আসছি। স্ত্রী উঠে পানির পেয়ালা নিয়ে এলো। এসে দেখে, স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছেন। আল্লাহর এই বান্দী পানির পেয়ালা হাতে সারা রাত শিয়রের পাশে অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইলো। এ আশায় যে, চোখ মেলতেই পানির পেয়ালাটি বাড়িয়ে দেবেন। এভাবে সকাল হয়ে গেলো। স্বামীর ঘুম ভেঙ্গে গেলো। তিনি দেখতে পেলেন, স্ত্রী এখনো পানির পেয়ালা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

এ দৃশ্য দেখে তিনি খুবই খুশি হলেন। বললেন, আচ্ছা! আজ আমি তোমার ওপর এতোটাই খুশি যে, তুমি যাই চাবে আমি তোমার সেই চাওয়া অবশ্যই পূরণ করবো।

স্ত্রী বললো, আচ্ছা! তাহলে আপনার কাছে আমার চাওয়া হলো, আপনি আমাকে তালাক দিয়ে দিন।

এ কথা শুনে স্বামী তো খুবই পেরেশান। কারণ, যে স্ত্রী এতো ভালোবাসে, সেবা করে, বিশ্বস্ত এবং নেককার, সে কিনা তালাক চাচ্ছে। ওদিকে তাকে আমি কথাও দিয়ে ফেলেছি। তিনি তখন জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেনো তালাক চাইছো?

স্ত্রী বললো, আপনি নিজেই তো বলেছেন, আমি যা চাইবো আপনি পূরণ করবেন। এখন আপনি আপনার কথা রাখুন। আমাকে তালাক দিন।

স্বামী বললো, সকালবেলা আমরা নবী করীম সা.-এর দরবারে হাজির হয়ে আমাদের সমস্যাটি তুলে ধরবো।

স্ত্রী বললো, ঠিক আছে।

ফজরের নামাযের পর তারা রওয়ানা হলেন। পথিমধ্যে হঠাৎ স্বামী বেচারা পাথরে হোঁচট খেয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন। যার ফলে তার শরীর থেকে রক্ত বেরোতে লাগলো। স্ত্রী সঙ্গে সঙ্গে ওড়না দু'ভাগ করে তা দিয়ে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ করে দিলেন। এরপর বললেন, চলুন 'এখন

আর মাসআলা জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই। কেননা এখন আপনার কাছ থেকে আর আমার তালাক নেয়ার প্রয়োজন নেই।'

স্বামী বললো, ঘটনা কী? যখন তুমি তালাক চেয়েছিলে তখনো আমার বিষয়টি বুঝে আসেনি। এখন কেনো তালাকের দাবি ছেড়ে দিচ্ছো তাওতো বুঝে আসছে না। রহস্যটা খুলে বলো দেখি।

স্ত্রী বললেন, ঘরে চলুন। সেখানে গিয়ে বলবো।

ঘরে বসেও স্বামী তার কৌতূহল চেপে রাখতে পারলেন না। আবারও জিজ্ঞেস করলেন, ঘটনা খুলে বলো।

স্ত্রী বললেন, আপনিই তো আমাকে নবী করীম সা.-এর এ হাদীস শুনিয়েছিলেন, যখন আল্লাহ তাআলা কাউকে ভালোবাসেন তখন তার দিকে পেরেশানি এমনভাবে দৌড়ে আসে, যেভাবে উঁচু স্থান থেকে পানির স্রোত নিচের দিকে গড়িয়ে আসে। আমি আপনার স্ত্রী। দীর্ঘ দিন যাবত আপনার সঙ্গে বসবাস করছি। আমি আপনার ঘরে ধন-সম্পদের প্রাচুর্য দেখেছি, সুখ দেখেছি, আরাম দেখেছি, খুশি দেখেছি; কিন্তু কখনো চিন্তা-পেরেশানি দেখিনি। আমার অন্তরে তাই এ ভাবনা দানা বেঁধেছে যে, আপনার মনে কি কপটতা বাসা বেঁধেছে? কারণ, মহান আল্লাহ আমাদের সাথে কেনো তাঁর প্রিয় বান্দাদের মতো আচরণ করছেন না? আমি মনকে বুঝালাম যে, রাসূল সা.-এর হাদীস-ই সত্য। অন্য যা কিছুই দেখছি তা মিথ্যা হতে পারে। এজন্যে আমি আপনার কাছ থেকে তালাক নেওয়ার ইচ্ছে করেছিলাম। কিন্তু যখন পথিমধ্যে আপনি আহত হলেন, পেরেশানি এলো তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেললাম, না! আপনার ঈমান নিয়ে সন্দেহ করা ঠিক হচ্ছে না। কাজেই এখন থেকে আমি সারাজীবন আপনার স্ত্রী হয়ে আপনার সেবা করে যাবো।

রব তো সবার একজনই

হযরত মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী রহ. তাঁর বয়ানে একটি বিস্ময়কর কথা বলতেন। তিনি বলেন, একবার আমি বাজারে যাচ্ছিলাম। সেখানে এক বুযুর্গের সঙ্গে দেখা হলো। তার কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম দিলাম। তিনি সালামের উত্তর দিলেন এবং চিনতে পেরে জিজ্ঞেস করলেন, আহমদ আলী! মানুষ কোথায় বসবাস করে?

আমি অবাক হয়ে বাজারের লোকসমাগমের দিকে ইঙ্গিত করে বললাম, হযরত! এরা তো সবই মানুষ।

যখন একথা বললাম, তখন তিনি অবাক হয়ে এদিক ওদিক দেখলেন এবং অত্যন্ত অনুতাপের সাথে বললেন, এরা সকলেই মানুষ!

তাঁর মনোযোগের প্রভাব এমন ছিল যে, যখন তাঁর কথার পর আমার দৃষ্টি লোকসমাগমের ওপর দ্বিতীয়বার পড়লো, তখন আমি বাজারে কুকুর, বিড়াল ও শুকর চলাফেরা করতে দেখলাম। যখন ওই অবস্থা থেকে আমি বের হয়ে আসলাম, ততক্ষণে ওই বুযুর্গ চলে গেলেন। হযরত এ ঘটনা তাঁর বয়ানে শোনানোর পর এ কবিতা আবৃত্তি করতেন–

مالک توسب کا ایک، مالک کا کوئی ایک ہزاروں میں نہ ملے گا لاکھوں میں تو دیکھ

জি হ্যাঁ, লক্ষ মানুষের মধ্য হতে হয়তো এমন একজনই পাওয়া যাবে যে তার মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত সর্বাঙ্গ মহান রবের কাছে সঁপে দেয় এবং বলে দেয়- আল্লাহ! আমি তোমার বান্দা। তোমার হুকুম মতই আমার আগত জীবন অতিবাহিত করবো। এটাকেই বলে اُدْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَآفَّةً 'তোমরা পুরোপুরিভাবে ইসলামে প্রবেশ করো।'

কিন্তু আমার বন্ধুগণ! আমি তো নিজের ইচ্ছার মালিক সেজে ঘুরে বেড়াই। আমরা তো বন্ধুদের মাঝে বসে বলি, 'আমি তো একমাত্র সে কাজটাই করবো যা আমার মন বলে।' একথা বলেও আল্লাহর কাছে বিশেষ রহমত কামনা করছে। মনে রাখবেন, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা নিজেদেরকে মহান আল্লাহর সমীপে অর্পণ না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত তাঁর পক্ষ থেকে আমাদের ওপর বিশেষ রহমত বর্ষিত হবে না।

কুকুরের দশটি বৈশিষ্ট্য

প্রাণী তার মালিকের প্রচণ্ড বিশ্বস্ত হয়ে থাকে। অথচ মানুষ তার রবের ততোটা বিশ্বস্ত হয় না। হযরত হাসান বসরী রহ. বলতেন, কুকুরের মাঝে এমন ১০টি গুণ আছে, যদি তার একটি গুণও মানুষের মাঝে পাওয়া যায় তাহলে সে আল্লাহর ওলী হয়ে যাবে। গুণগুলো হলো–

১. কুকুরে মাঝে অল্পেতুষ্টি আছে। সে যা পায় তার ওপর সন্তুষ্ট থাকে। এটি হলো قانعين তথা অল্পেতুষ্ট ও صابرين তথা ধৈর্যশীলদের পরিচয়।

২. কুকুর অধিকাংশ সময় ক্ষুধার্ত থাকে। এটি صالحين তথা নেককারদের পরিচয়।

৩. অন্য কুকুর যদি শক্তি দেখিয়ে তার ওপর জয় লাভ করে তখন সে নিজ স্থান ত্যাগ করে অন্যত্র চলে যায়। এটি راضين তথা সন্তুষ্ট লোকদের পরিচয়।

৪. তার মালিক যদি মারেও তারপরও সে মালিককে ছেড়ে যায় না। এটি صادقين তথা সত্যবাদীদের পরিচয়।

৫. যদি মালিক বসে খাবার খায় তখন সে শক্তি-সামর্থ থাকা সত্ত্বেও ওই খাবারের ওপর হামলে পড়ে না। ছিনিয়ে নেয় না। দূরে বসে দেখতে থাকে। এটি مساكين তথা মিসকিনদের আলামত।

৬. যখন মালিক গৃহে থাকেন তখন সে দূরে জুতোর পাশে বসে থাকে। ক্ষুদ্র জায়গাতেই সন্তুষ্ট হয়ে যায়। এটি متواضعين তথা বিনম্রদের আচরণ।

৭. যদি মালিক তাকে মারে তখন সে অল্প সময়ের জন্য দূরে চলে যায়। এরপর যদি মালিক তার দিকে খাবারের টুকরো বাড়িয়ে দেয় সঙ্গে সঙ্গে সে ছুটে এসে খাবার খেয়ে নেয়। অসন্তুষ্ট হয় না। এটি خاشعين তথা আল্লাহভীরুদের পরিচয়।

৮. দুনিয়াতে থাকার জন্যে তার কোনো ঘর নেই। এটি متوكلين তথা আল্লাহর ওপর নির্ভরকারীদের পরিচয়।

৯. রাতের বেলা সে খুবই কম ঘুমায়। এটা محبين তথা আল্লাহপ্রেমীদের পরিচয়।

১০. যখন মারা যায় তখন কোনো পরিত্যাক্ত সম্পত্তি থাকে না। এটি زاهدين তথা দুনিয়া বৈরাগীদের পরিচয়।

লক্ষ্য করুন, উক্ত গুণাবলীর কোনো একটিও কি আমাদের মাঝে আছে?

ہم نے تو جہنمی کی بہت کی تدبیر ☆ لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا

জীবনভর করেছি জাহান্নামে যাওয়ার ফন্দি,
কিন্তু তোমার রহমত তা পছন্দই করেনি।

গুনাহ্ করার চারটি কারণ

সাধারণত গুনাহ করার চারটি কারণ হয়। মহান আল্লাহ কুরআনে কারীমে সেই চারটি কারণের উত্তর বলে দিয়েছেন।

প্রথম কারণ হলো : মানুষ মনে করে– গুনাহ করার সময় আমাকে কেউ দেখতে পাচ্ছে না। আল্লাহ তার উত্তর দিচ্ছেন যে,

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ

'অবশ্যই তোমার প্রতিপালক ঘাটিতেই আছেন।'

শিকারী যখন শিকার টার্গেট করে তখন সে কিছুক্ষণের জন্যে তার পূর্ণ মনোযোগ শিকারের ওপর নিবদ্ধ রাখে। ওই প্রকৃতির মনোযোগ নিবদ্ধ করাকেই 'মিরসাদ' বলে। যেন আল্লাহ তাআলা সেই শিকারীর মতো মানুষকে দেখছেন।

দ্বিতীয় কারণ হলো : মানুষ গুনাহ করার সময় মনে করে, আমার কাছে তো কেউ নেই। এর উত্তরে আল্লাহ বলছেন, যখন তোমরা তিন ব্যক্তি একত্র হও চতুর্থ আমি থাকি।

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ.

'তিনি তোমাদের সঙ্গেই তোমরা যেখানেই থাক।'[৩৩]

তৃতীয় কারণ হলো : গুনাহ করার সময় মানুষের মনে এ অনুভূতি হয় যে, আমার কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তো কারো জানা নেই। তখন আল্লাহ বলেন,

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ○

'চক্ষুসমূহের খেয়ানত এবং অন্তরসমূহ যা গোপন রাখে তিনি তা জানেন।'[৩৪]

চতুর্থ কারণ হলো : গুনাহ করার সময় মানুষ বলে, আমি যদি এ গুনাহ করিও, তাহলে আমার কে কী করতে পারবে? জ্বি হ্যাঁ, মানুষ যখন বিদ্রোহী হয়ে যায় এবং গুনাহ করার সাহসিকতা বেড়ে যায় তখন সে নির্লজ্জ হয়ে নোংরা কথা বলে ফেলে। আল্লাহ তাআলা তার উত্তরও বলেছেন–

إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ○

'নিশ্চয় তাঁর পাকড়াও খুবই মারাত্মক, অত্যন্ত কঠোর।'[৩৫]

وَلاَ يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ○

'আর তাঁর বন্ধনের মত বন্ধন কেউ দিবে না।'[৩৬]

فَإِنِّي أُعَذِّبُهُ عَذَابًا لاَّ أُعَذِّبُهُ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ○

'নিশ্চয় তাকে আমি এমন শাস্তি দেবো, যে শাস্তি সৃষ্টিকুলের অন্য কাউকে দেবো না।'[৩৭]

গুনাহের এই কারণগুলোর উপযুক্ত জবাব কুরআন মাজীদে জানিয়ে দেয়ার অর্থ হলো, মানুষ যেন এর মাধ্যমে নিজেকে গুনাহ থেকে বিরত রাখে এবং পরওয়ারদেগারের অনুগত বান্দা হয়ে যায়। শয়তান তো সবসময় এ চেষ্টা করে বেড়ায় যে, সে সর্বক্ষণ মানুষকে গুনাহের কাজে লিপ্ত রাখবে। পক্ষান্তরে রহমানের চেষ্টা হলো, মানুষকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য সর্বপ্রকার গুনাহ থেকে নিবৃত্ত রাখা। এখন বান্দার দায়িত্ব হলো, সে আল্লাহর আহ্বানে সাড়া দিয়ে গুনাহের জীবন ত্যাগ করে নেককারের জীবন ধারণ করবে।

---

৩৩. সূরা হাদীদ: ৪।
৩৪. সূরা মুমিন : ১৯।
৩৫. সূরা হুদ : ১০২।
৩৬. সূরা ফাজর : ২৬।
৩৭. সূরা মায়েদাহ : ১১৫।

জুনাইদ বাগদাদী রহ. স্বেচ্ছায় হেরে গেলেন

প্রথম জীবনে হযরত জুনাইদ বাগদাদী রহ. ছিলেন সমকালের শ্রেষ্ঠ কুস্তিগীর। একবার সে যুগের বাদশাহ ঘোষণা করলেন যে, আমাদের এই কুস্তিগীরকে যে হারাতে পারবে তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। ওই যুগে সাইয়্যেদ বংশের জনৈক সদস্য দুর্বল ও আর্থিকভাবে প্রচণ্ড অস্বচ্ছল ছিলেন। সে যখন বাদশার এ ঘোষণা শুনতে পেলো, তখন সে ভাবলো যে, জুনাইদকে তো এ যুগের রুস্তম স্বীকার করা হয়। তাকে পরাভুত করার শক্তি আমার নেই। তবে এ সময় আমার ঘরে প্রচণ্ড অভাব বিরাজ করছে। পেরেশানির অন্ত নেই। ওদিকে সাইয়্যেদ হওয়ার কারণে মানুষের কাছে গিয়ে নিজের দূরবস্থার কথা বলতেও পারছি না। কাজেই তার সঙ্গে লড়াই করার চেষ্টা করে দেখি। সুতরাং সে জুনাইদ রহ.-এর সাথে প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণ করার ঘোষণা করলো। তা দেখে বাদশাহ খুবই অবাক হলো যে, এতো বড় পালোয়ানের সাথে এ ব্যক্তি? বাদশাহ বললো, তুমি লড়াইয়ে হেরে যাবে। সে বললো, না। আমি অবশ্যই সফল হবো।

কুস্তিযুদ্ধের জন্যে দিন-ক্ষণ চূড়ান্ত হলো। কুস্তি দেখার জন্যে বাদশাহও উপস্থিত হলেন। দু'জনই যখন শক্তি পরীক্ষায় অবতীর্ণ হলেন, তখন ওই সাইয়্যেদ সাহেব তাঁর কানের কাছে গিয়ে বললেন, জুনাইদ! তুমি তো এ যুগের রুস্তম। সবাই তোমাকে সমীহ করে। তুমি বাদশার পক্ষ থেকে মাসোয়ারা পাও। কিন্তু আমি সাইয়্যেদ বংশের সন্তান। অভাবী মানুষ। আমার ঘরে এ মুহূর্তে প্রচণ্ড অভাব ও অস্বচ্ছলতা বিরাজ করছে। আজ যদি তুমি হেরে যাও তাহলে হয়তো তোমার সম্মানের ওপর সাময়িকভাবে আঘাত আসবে; কিন্তু এর বিনিময়ে আমার পেরেশানি দূর হয়ে যাবে।' এতোটুকু বলেই সে কুস্তি লড়তে শুরু করলো।

জুনাইদ তো অবাক। তিনি চাইলে বাঁ হাতের এক আঘাতেই তাকে ধরাশায়ী করতে পারেন। কিন্তু লোকটি নবীজির আত্মীয়তার দোহাই দিয়ে ছিলো। এটি প্রিয় নবী সা.-এর সম্পর্ক ছিলো। যার কারণে জুনাইদ রহ. খুবই ভাবিত হলেন। মনে মনে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন যে, জুনাইদ! এ মুহূর্তে নিজের সম্মানের দিকে তাকানো যাবে না। এর বিনিময়ে তুমি দোজাহানের সর্দারের কাছে সম্মানিত হবে। তোমার জন্য এটাই যথেষ্ট। যথারীতি তিনি তার সঙ্গে কিছুক্ষণ দস্তাদস্তী করে এক সময় স্বেচ্ছায় ধরাশায়ী হয়ে গেলেন।

সঙ্গে সঙ্গে ওই দুর্বল লোকটি বুকের ওপর চেপে বসে বলতে লাগলো যে, আমি তাঁকে ধরাশায়ী করেছি।

বাদশাহ বললেন, না! এমনটি তো হতে পারে না। তিনি দ্বিতীয়বার কুস্তি যুদ্ধের নির্দেশ দিলেন। আবার কুস্তিযুদ্ধ হলো। এবারো জুনাইদ স্বেচ্ছায় হেরে গেলেন। প্রতিপক্ষ বুকের ওপর চেপে আনন্দধ্বনি ছুড়তে লাগলো।

এ দৃশ্য দেখে বাদশাহ জুনাইদের ওপর খুবই অসন্তুষ্ট হলেন। বকাঝকা করলেন। এ কথাও বলে ফেললেন যে, মনে চাচ্ছে– তোমার গলায় জুতোর মালা পরিয়ে গোটা শহরে প্রদক্ষিণ করাতে। কিভাবে তুমি এমন একজন দুর্বল ব্যক্তির কাছে হেরে গেলে!?

হযরত জুনাইদ রহ. নীরবে সমস্ত অপমান ও লাঞ্ছনা সহ্য করলেন। ঘরে ফিরে দেখলেন, স্ত্রী সহ পরিবারের সবাই মুহ্যমান। সবার মুখে একটাই কথা যে, আজ তো তুমি আমাদের মান-মর্যাদা ধুলিস্যাৎ করে ফেললে।

কিন্তু হযরত জুনাইদ রহ. তাদের কারো কথার উত্তর না দিয়ে শান্ত রইলেন। এই বিরল বৈশিষ্ট্যের কল্যাণে হযরত জুনাইদ রহ. আল্লাহর কাছে এতোটাই প্রিয় হয়ে গেলেন যে, তিনি তাঁকে ওলী বানিয়ে দিলেন। তাঁর মাধ্যমে গোটা বিশ্বে দীনের প্রভুত কাজ আঞ্জাম পেয়েছে।

তোমাকে নিজের বান্দা মনে করে ক্ষমা করে দিলাম

এক ব্যক্তির স্ত্রী একবার কোনো কাজে ভুল করে বসলো। যার ফলে তার ক্ষতি হলো। সে ব্যক্তি ইচ্ছা করলে তাকে শাস্তি দিতে পারত। ইচ্ছা করলে তালাক দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিতে পারত। কেননা এটাই ছিল যথোপযুক্ত। তবে ঐ ব্যক্তি ভাবল, আমার স্ত্রী তো ভুল করে বসেছে। ক্ষতিও হয়েছে ঠিক। যাক আল্লাহর বাঁদী মনে করে ক্ষমা করে দিলাম।

কিছুদিন পর ঐ লোক ইন্তেকাল করল। কোন এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখল। জিজ্ঞেস করল, বলুন আপনার সাথে কেমন আচরণ করা হয়েছে? সে বললো, আল্লাহ আমার ওপর মেহেরবানী করেছেন। জিজ্ঞেস করলো, কীভাবে? বললো, একবার আমার স্ত্রী ভুল করে ছিলো। এতে আমার ক্ষতিও হয়েছিলো। ইচ্ছে করলে তাকে শাস্তি দিতে পারতাম। কিন্তু আমি আল্লাহর বাঁদী মনে করে মাফ করে দিয়েছিলাম। পরওয়ার দিগার বললেন, তুমি তাকে আমার বাঁদী মনে করে মাফ করে দিয়েছ। যাও, আমি তোমাকে আমার বান্দা মনে করে মাফ করে দিলাম।

স্বপ্নে ক্ষেতে লবণাক্ত পানি দেখা ও তার ব্যাখ্যা

প্রশ্ন : হযরত মাওলানা সাহেব সমীপে

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ

সালামবাদ, আরয হলো– স্বপ্নে দেখলাম, আমার ক্ষেত লবণাক্ত পানিতে ভরপুর। স্বপ্নের এই চিত্র আমার জন্য ক্ষতিকর না উপকারী? অনুগ্রহ করে জানিয়ে আমার মনের অস্থিরতা দূর করবেন।

উত্তর : স্বপ্নে নিজের ক্ষেত এ অবস্থায় দেখা ক্ষতিকর। কেননা লবণাক্ত পানি ফসল উৎপাদনের যোগ্য নয়। ফলে ক্ষেতটি আসমানী বিপদ ও দুর্যোগের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা আছে। খারাপ স্বপ্ন দেখা থেকে বাঁচার জন্য সুন্নতের প্রতি অধিক গুরুত্ব দিন।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

উপরোক্ত আয়াতটি গুরুত্ব দিয়ে মনোযোগ সহকারে পড়ুন এবং সর্বদা অযু অবস্থায় থাকার জন্য সচেষ্ট হোন।

উকবা ইবনে আমির রা.-কে রাসূল সা.-এর উপদেশ

মুসনাদে আহমদে বর্ণিত আছে, হযরত উকবা ইবনে আমির রা. বলেন, একদিন রাসূল সা.-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো। আমি দ্রুত তাঁর হাত মুবারক ধরে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মুমিনের নাজাত বা মুক্তি কোন আমলের ওপর নির্ভরশীল? রাসূল সা. বললেন, হে উকবা! যবান সংযত রাখো। নিজের ঘরে বসে থাক। নিজের গুনাহর জন্য কান্নাকাটি কর।

দ্বিতীয়বার যখন রাসূল সা.-এর সাথে আমার সাক্ষাত হলো, তখন রাসূল সা. স্বয়ং নিজেই আমার হাত ধরে বললেন, উকবা! আমি কি তোমাকে তাওরাত, ইঞ্জিল, যাবূর ও কুরআনে অবতীর্ণ সকল সূরার মধ্য থেকে সবচেয়ে উত্তম তিনটি সূরার কথা বলবো?

বললাম, হুযূর! অবশ্যই বলুন। আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গ করুন। তখন তিনি আমাকে সূরা ইখলাস, ফালাক ও সূরা নাসের কথা বললেন। এরপর বললেন, দেখ উকবা! এ সূরাগুলো কখনো ভুলে যাবে না। প্রতি রাতেই এ সূরাগুলো পড়বে।

হযরত উকবা রা. বলেন, এরপর না আমি এগুলো ভূলেছি আর না কোনো রাত এগুলো না পড়ে অতিবাহিত করেছি। এরপর আমি আবার সাক্ষাত করলাম এবং দ্রুত হাত মুবারক ধরে নিবেদন করলাম, হে আল্লাহর

রাসূল! আমাকে উত্তম আমলগুলো বলে দিন। রাসূল সা. বললেন– শোন, যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সম্পর্ক রক্ষা করো। যে তোমাকে বঞ্চিত করে তাকে প্রাপ্য অধিকার প্রদান করো। যে তোমার প্রতি অবিচার করে তাকে মাফ করে দাও।[৩৮]

'আল্লাহর রঙে রঙিন হও' এ কথার উদ্দেশ্য কী ?

প্রশ্ন : বরাবর জনাব হযরত মাওলানা সাহেব দা.বা.

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

সালামবাদ! 'আল্লাহর রঙে রঙিন হও' একথার দ্বারা উদ্দেশ্য কী? যেমনটি কুরআন মাজীদে আছে–

صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً.

(বলো,) আমরা আল্লাহর রঙ গ্রহণ করলাম। আর রং এর দিক দিয়ে আল্লাহর চেয়ে কে অধিক সুন্দর? [সূরা বাকারা : ১৩৮]

উত্তর : উল্লেখিত আয়াতে দুটি জিনিস ব্যক্ত করা উদ্দেশ্য। ১. নাসারাদের একটি প্রথাকে অবলুপ্ত করা। ২. মুমিনের ব্যক্তিসত্ত্বায় ও কাজ-কর্মে ঈমানের নিদর্শন প্রকাশ পাওয়া উচিত।

১. নাসারাদের মাঝে এই প্রথার প্রচলন ছিল যে, সদ্যভুমিষ্ট বাচ্চাকে সপ্তম দিনে এক ধরনের বিশেষ রঙের পানিতে গোসল করানো হতো। খতনা করা ছাড়াই এ গোসলকে তারা বাচ্চার পবিত্রতা ও নাসরানী ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার বড় মানদণ্ড মনে করত। তাদের নিকট এ প্রথার নাম ছিল 'ব্যাপ্টিস্টামো'। এ কাজ করা তাদের নিকট এমন আত্যাবশ্যকীয় ছিল যে, যা ছাড়া তারা কারো পবিত্রতার কোনো চিন্তাও করত না। এ আয়াত ঘোষণা করছে যে, এ পানির রঙ ধুয়ে শেষ হয়ে যায়। পরবর্তীতে এর কোনো প্রভাব থাকে না। তা ছাড়া খতনা না করার দরুন যে ময়লা ও নাপাকী শরীরে রয়ে যায় তা থেকেও এই রঙ মুক্ত করতে পারে না। মূল রঙ হলো দীন ও ঈমানের রঙ। যা বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ পবিত্রতার যামানত। আর এটা সবসময় অক্ষয় থাকে।

২. ঈমানের আলামত মুমিনের ব্যক্তিসত্ত্বা ও কাজ-কর্মে প্রকাশ পাওয়া চাই। দীন ও ইসলামের রঙ বলে এ কথার দিকে ইঙ্গিত করা হচ্ছে : রঙ যেভাবে চোখে দেখা যায় অনুরূপ মুমিনের ঈমানের আলামত তার চেহারা শরীরে ও সকল কাজে-কর্মে, আচার-অভ্যাসে প্রতিফলিত হওয়া চাই।[৩৯]

---

৩৮. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৫/৬১৬।

৩৯. তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন : ১/৩৫৬।

একশ'টি ছড়ানো মুক্তা

১. সাথীগণের উচিৎ তারা শেষ রাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠবেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর রা.-এর বাণী— 'রাতের শেষ ভাগে জেগে ওঠার ক্ষেত্রে যদি মোরগ তোমার অগ্রগামী হয়, তবে এটি তোমার জন্য লজ্জাস্কর।'

২. রাতে ওঠো। কারণ, প্রেমিকরা রাতে আবেদন নিবেদন করে। বন্ধুর দরজা ও ছাদের চারপার্শ্বে উড্ডয়ন করে। সব ঘরে রাতের বেলা দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়, তবে বন্ধুর দরজা রাতে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

৩. পূর্ণ একাগ্রতার সাথে চার রাকাত, আট রাকাত বা বারো রাকাত তাহাজ্জুদ পড়ো। হযরত খাজা আবু ইউসুফ হামদানী রহ.-এর অভ্যাস ছিলো, প্রথম দু'রাকাতে আয়াতুল কুরসীর রুকু ও সূরা বাকারার শেষ রুকু তেলাওয়াত করতেন। এরপর আট রাকাতে দশ দশ আয়াত করে সূরা ইয়াসীন পড়তেন। শেষ দু' রাকাতে তিনবার করে সূরা ইখলাস পড়তেন।

৪. আল্লাহর ভাণ্ডারে চারটি জিনিস নেই— ১. না ২. প্রয়োজন ৩. ওজর ৪. গুনাহ।

৫. **প্রশ্ন : ইস্তিগফার আগে পড়বো না দরূদ শরীফ?**

উত্তর : শাইখুল আরব ওয়াল আযম হযরত মাওলানা আবদুল গফুর রহ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, ইস্তিগফার আগে না দরূদ শরীফ? বললেন, ইস্তিগফারের উপমা হলো এটি কাপড় ধোয়ার সাবানের মত। আর দরূদ শরীফের উপমা হলো কাপড়ে লাগানো আতরের মত। এখন আপনি বলুন, কাপড়ে আগে আতর মাখবেন না সাবান দিয়ে ধোবেন? প্রশ্নকারী বললো, হযরত প্রথমে সাবান লাগানো উচিত, এরপর আতর লাগানো উচিত। বললেন, ব্যাস, তদ্রূপ প্রথমে খুব অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়েই ইস্তিগফার পড়বে যেন অন্তর পরিষ্কার হয়ে যায়। এরপর ভক্তি ও মুহাব্বতের সাথে দরূদ শরীফ পড়বে যেন সুগন্ধি লাগে এবং রাসূল সা.-এর সুগন্ধি প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যেন অনুপ্রবেশ করে।

৬. এক ব্যক্তি রাবেয়া বসরী রহ.-এর নিকট দুনিয়ার অনিষ্টতার কথা আলোচনা করল। তিনি বললেন, ভবিষ্যতে তুমি আর আমার কাছে আসবে না। তোমার দুনিয়ার প্রতি অনেক ভালোবাসা রয়েছে।

৭. কোনো এক ব্যক্তি যুন্নূন মিসরী রহ.-কে বললো, অমুক দল আনন্দে মত্ত। আপনি তাদের জন্য বদ দোয়া করুন। তিনি বললেন, হে আল্লাহ! দুনিয়ায় যেমনিভাবে আপনি তাদেরকে আনন্দ দিয়েছেন। পরকালেও তেমনি আনন্দ দান করুন।

৮. যদি কেউ কোনো দুনিয়াদারকে সম্মান করে তাহলে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। মানুষ তো সাপ বিচ্ছু দেখেও দাঁড়িয়ে যায়।

৯. **প্রশ্ন : ইসমে আযম কী?**

উত্তর : যদি অন্তর গায়রুল্লাহ থেকে মুক্ত এবং পেট হারাম থেকে মুক্ত হয় তাহলে প্রত্যেক নামই ইসমে আযম হয়ে যাবে।

১০. লোকমান হাকীম আ. বলেন, 'আমি চাঁদ ও সূর্যের আলোতে প্রতিপালিত হচ্ছি। কিন্তু হৃদয়ের আলো থেকে উপকারী কাউকে পাইনি।'

১১. অন্তর কালো হলে উজ্জ্বল চোখও কোনো কাজে আসে না।

যে হৃদয়ে কোনো দুশ্চিন্তা নেই

১২. যে ঘরে শান্তি নেই তা নষ্ট হয়ে যায়। যে হৃদয়ে চিন্তা-ভাবনা থাকে না সে হৃদয়ও বিনষ্ট হয়ে যায়।

হৃদয়ও হাড়ির মতো

১৩. ইয়াহইয়া ইবনে মুয়াবিয়া রহ. বলেন, হৃদয় হলো হাড়ির মতো। আর জিহ্বা হলো চামচের মতো। চামচ ঐ জিনিসই বের করে যা হাড়িতে আছে।

১৪. একজন মুমিনের মন জয় করা এতো মূল্যবান হবে যে, কিয়ামতের দিন কোনো পণ্যের মূল্য এতো হবে না।

১৫. অমনোযোগী ব্যক্তি নামায পড়াকে এতোটাই কষ্টকর মনে করে যেমন চামড়ার কারখানায় কর্মরত ব্যক্তি আতরের দোকানে গিয়ে বলে, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।

১৬. এক ব্যবসায়ী তেইশ বছর এভাবে রোযা রেখেছেন যে, ঘরের মানুষজন মনে করতো দুপুরে খাবার দোকানে খেয়ে নেয়, আর দোকানের লোকজন মনে করতো ঘরে গিয়ে খাবার খেয়ে আসে। কোনদিন কাউকে কিছু বুঝতে দেয়নি। একেই বলে "ইখলাস"।

১৭. যে ইবাদতে দুনিয়াতে কোনো স্বাদ পাওয়া যায়নি, ওই ইবাদত আখেরাতে কী কাজে আসবে?

ওলী, গুনাহগার এবং শয়তান

১৮. গুনাহের কাজ করে যে অনুতপ্ত হবে তাকে ওলী মনে করবে। গুনাহ করে যে এর পরওয়া করে না তাকে গুনাহগার মনে করবে। আর যে গুনাহের কাজ করে দাম্ভিকতা দেখায় তাকে শয়তান মনে করবে।

১৯. গুনাহের দিকে তাকিয়ো না যে, এটা কত ছোট বরং আল্লাহর বড়ত্বের প্রতি লক্ষ্য করো যে, তুমি কার অবাধ্যতা করছ?

সত্যকে আড়াল করো না

২০. যদি তুমি দোষ গোপন করার জন্য দরজা বন্ধ করো তবুও সত্য বাইরেই রয়ে যাবে।

২১. আল্লাহর দরবারে ওই পাপ— যা তোমাকে মর্মাহত করে তা ওই নেকি থেকে উত্তম যে নেকি তোমাকে অহংকারী করে তোলে।

ইখলাস কাকে বলে?

২২. হযরত ইবরাহীম তাইমী রহ. বলেন, ইখলাস হলো, নিজের নেক আমলকে এমনভাবে গোপন করো যেমনিভাবে নিজের বদ আমলকে গোপন করে থাকো।

২৩. সঙ্গীদের উচিৎ হলো, মানুষকে আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে যাতে তারা শুকরিয়া আদায় করে। নিজেদের গুনাহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে যাতে তারা তাওবা করে। নফস ও শয়তানের শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়ে দেবে যাতে তাথেকে বাঁচতে পারে।

২৪. এক উদাসীন ব্যক্তি কোনো শায়েখকে বললো, আপনার শিষ্য অহংকার মূলক যিকির করে। তিনি বললেন, তার কাছে তো নিভূ নিভূ প্রদীপ আছে সুতরাং ক্ষমার আশা করা যায়, আপনার কাছে তো তাও নেই।

২৫. ওই ব্যক্তিকে আল্লাহর দয়াপ্রাপ্ত মনে করো যে তার জীবনকে আমলী জীবন বানাতে পেরেছে। হৃদয়ের প্রশান্তি তো সে এমনিতেই পেয়ে যায়।

২৬. হযরত হাজী ইমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী রহ. বলেন, যে ব্যক্তি বায়'আত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পেশ করে তাকে আমি এজন্য মুরীদ করে নেই, যাতে কিয়ামতের দিন সে তার পীরকে জাহান্নামে যেতে দেখে দয়াপরবশ হয়। হয়ত এর বরকতে ক্ষমা পেয়ে যাবো।

২৭. জনৈক ব্যক্তি কোনো এক বুযুর্গকে হাদিয়া দিয়ে দোয়ার আবেদন করলো। তখন বুযুর্গ বললেন, হাদিয়া নিয়ে যাও। এটা দোয়ার দোকান না।

২৮. শায়েখ গুনাহগার মুরীদকে এমন মনে করবেন যেমন অনিন্দ্য সুন্দর চেহারায় কালি লেগে গেছে। যদি তা পরিষ্কার করা হয় তাহলে চাঁদের মতো সুন্দর চেহারাটি বেরিয়ে আসবে।

২৯. তাকওয়া হলো, কিয়ামতের দিন যেন কেউ তোমার কলার না ধরে বসে।

৩০. আমরা এমন যুগে জন্মেছি যে, সালফে সালেহীনগণ তাঁদের ইলম ও তাকওয়া থাকা সত্ত্বেও এ থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিলেন।

৩১. শায়েখ উসমান খায়রাবাদী গ্রাহককে অচল টাকার বিনিময়েও সদাই দিয়ে দিতেন। মৃত্যুর সময় তিনি দোয়া করেছিলেন : হে আল্লাহ! আমি তো মানুষের অচল টাকাও গ্রহণ করেছি। তুমি দয়া করে আমার অচল আমলগুলো কবুল করে নাও!

৩২. শায়েখ শিহাবুদ্দীন খতীব রহ. দোয়া করতেন : হে আল্লাহ! মৃত্যুর সময় কেউ যেন আমার পাশে না থাকে, না আপন, না পর, না মালাকুল মাউত। শুধু তুমি আর আমি থাকবো।

৩৩. আবুল হাসান নূরী রহ.-এর দোয়া এমন হতো : হে আল্লাহ! যদি তুমি আমাকে ক্ষমা করতে না চাও, তাহলে আমাকে দিয়ে জাহান্নাম পূর্ণ করে দাও, আর অবশিষ্ট মানুষকে যদি ক্ষমা না করো তবুও জাহান্নাম আমাকে দিয়েই পূর্ণ করে দাও, আর আবশিষ্ট মানুষকে ক্ষমা করে দাও।

৩৪. দোয়ার একটি উপকারিতা এটাও যে, কিয়ামতের দিন বলবে, হে আল্লাহ! আমি তো দোয়া করেছিলাম- আমাকে নেক্কার বানাও। ফলে তখন তাকে অপারগ মনে করা হবে।

৩৫. মনের মাঝে যার কারো প্রতি হিংসা হয় তার উন্নতির অগ্রগতির জন্য দোয়া করা হলো ওই হিংসার উত্তম চিকিৎসা।

৩৬. চেষ্টা সাধনা আমাদের হাতে। ভাগ্য আল্লাহর হাতে। আমাদের সে কাজটিই করা উচিত যা আমাদের হাতে আছে।

৩৭. বেকার মানুষ মৃত মানুষের চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা মৃত মানুষ অল্প জায়গা আটকে রাখে।

এক বুযুর্গের সুপারিশ নামা

৩৮. কাযী বায়যাবী রহ. সিরাজ শহরের বিচারপতি হওয়ার জন্য কোনো বুযুর্গ থেকে সুপারিশনামা দিতে বললেন, সেই বুযুর্গ সুপারিশনামায় লিখলেন, এ ব্যক্তি নেককার আলেম ও অভিজ্ঞ। জাহান্নামে এক জায়নামায পরিমাণ জায়গা চাচ্ছে।

৩৯. যেভাবে মানুষকে দেখানোর জন্য আমল করা অহংকার, অনুরূপ মানুষের জন্য আমল ছেড়ে দেয়াও অহংকার।

৪০. হযরত উমর রা. বলেন, আমাদের বাজারে বেচাকেনা তারাই করবে যারা ফকীহ। সুবহানাল্লাহ! তিনি পুরো বিশ্বকে পাঠশালা বানিয়ে দিয়েছেন।

৪১. নফসের ঔদ্ধত্যকে চুরমার করা إِمَاطَةُ الأَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ. (পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে ফেলা) এ হাদীসের অন্তর্ভুক্ত।

৪২. বর্তমানে সাধারণ আত্মিক ব্যাধি হলো :

يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوْتِيَ قَارُوْنُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيْمٍ.

হায়! কারুনকে যে ধনভাণ্ডার দেয়া হয়েছে অনুরূপ যদি আমাদেরও থাকত! নিশ্চয়ই সে মহা ভাগ্যবান।[৪০]

৪৩. যার প্রতি ভালবাসা থাকে তার নাম আসতেই রক্ত চলাচল দ্রুত হয়ে যায়। এটাই وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ -এর অর্থ।

৪৪. فَمَنْ يَّعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُوْنَ. (অর্থ : সুতরাং যে ব্যক্তি মুমিন হয়ে সৎ কাজ করবে তার প্রচেষ্টাকে অগ্রাহ্য করা হবে না এবং আমি সেটা লিখে রাখি)'।[৪১]

এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা নেকী লেখার সম্বোধন নিজের দিকে করেছেন। প্রাণ উৎসর্গ হোক এ সম্মানের ওপর।

৪৫. কষ্ট ব্যতীত যদি কোনো নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয় তাহলে এরচে' উত্তমটা পাওয়া যায়। এর প্রমাণ হলো : مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا (আমি যখনই কোনো আয়াত রহিত করি বা তা ভুলিয়ে দেই তখন এরচে' উত্তম বা অনুরূপ আয়াত নিয়ে আসি)।[৪২]

৪৬. কোনো এক লোক খাজা বায়জীদ বোস্তামী রহ.-কে বললো, আপনি ক্ষুধার এত প্রশংসা করেন কেন? তিনি বললেন, যদি ফিরাউন ক্ষুধার্ত থাকত তাহলে أَنَا رَبُّكُمُ الأَعْلَى (আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রভু) বলত না।

৪৭. আলেমদের দরসে নেযামীর নেসাব হয় আট বৎসরের। এর সূত্র হলো, হযরত শুআইব আ.-এর খেদমতে হযরত মূসা আ. আট বৎসর থাকার অঙ্গীকার করেছিলেন। এর দলীল হলো : فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. (আর যদি তুমি দশ বৎসর পূর্ণ কর তাহলে সেটি তোমার নিজ এখতিয়ার)।[৪৩]

৪৮. পূর্ববর্তি কোনো কোনো বুযুর্গের প্রদীপের তেল খরচ হতো বেশী আর খাবারের খরচ হতো কম।

---

৪০. সূরা কাসাস : ৭৯।
৪১. সূরা আম্বিয়া : ৯৪।
৪২. সূরা বাকারা : ১০।
৪৩. সূরা কাসাস : ২৭।

৪৯. একবার হযরত শাইখুল ইসলাম ইয্যুদ্দীন ইবনে সালাম রহ.-কে এক ব্যক্তি বললো, আপনি বাদশাহর হাতে চুমু খান। হযরত বললেন, আল্লাহর কসম! আমি তার হাতে চুমু খাবো তো দূরের কথা, সে আমার হাতে চুমু খাবে, আমি তো এটাও পছন্দ করবো না।

৫০. হযরত মির্যা মাযহার জানেজানা রহ.-কে তৎকালীন বাদশাহ বড় এক জমিদারী দিতে চাইলো। তখন তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা পুরো পৃথিবীকে مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ. (দুনিয়ার ভোগ সামগ্রী খুবই অল্প)[৪৪] বলেছেন। সে অল্প থেকে সামান্য একটি অংশ আপনি পেয়েছেন। এখন সে সামান্য থেকে একটি অংশ আমাকে দিতে চাচ্ছেন। আমার তো এই সামান্য অংশ নিতেও লজ্জা হচ্ছে।

৫১. এক কাকরী (শশা) বিক্রেতা আওয়াজ দিল عَشَرَةُ خِيَارٍ بِدَانِقٍ (এক আনায় দশ শশা) আরবীতে শশাকে খেয়ার বলে। হযরত শিবলী রহ. চিৎকার করে বলে উঠলেন। যখন দশটি কাকরীর মূল্য এই হয় তাহলে আমার মতো পাপীর মূল্য কী হবে?

৫২. মুর্খদের কথা সহ্য করা হলো জ্ঞানের যাকাত।

৫৩. অধিক খেয়ে অসুস্থ হওয়া লোকের সংখ্যা অভুক্ত থেকে অসুস্থ হওয়া লোকের সংখ্যার চেয়ে বেশী।

৫৪. প্রতিটি শিশুর জন্মই এ কথার প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ তাআলা এখনো বান্দাদের থেকে নিরাশ হননি।

৫৫. সত্যের পথে চলমান পথিকদের প্রতিটি কদম শয়তানের সিনার ওপর পড়ে।

৫৬. বিস্ময়কর হলো, মানুষ হাত পাতে দুনিয়ার সামনে। কিন্তু অভিযোগ করে আল্লাহর কাছে।

৫৭. বদ অভ্যাসের প্রভাব তখনই অনুমান করা যায়, যখন তা ছাড়ার চেষ্টা করা হয়।

৫৮. যে পরিমাণ কষ্ট করে মানুষ জাহান্নাম খরিদ করে তার চেয়ে অর্ধেক পরিশ্রম করে জান্নাত পাওয়া যায়।

৫৯. তাবলীগ ছাড়ার জন্য শ্রোতার অপছন্দনীয় হওয়া কোনো বাহানা হতে পারে না।

---

৪৪. সূরা নিসা : ৭৭।

أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا إِن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ ○

'আমি কি তোমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে এ কিতাব প্রত্যাহার করে নেব এ কারণে যে, তোমরা এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়?[৪৫]

দোযখেও ঈমানের বরকত হলো, গুনাহগার মুমিনগণের জাহান্নামে কষ্ট অনুভব হবে না।

৬০. হযরত আবু সাঈদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সা. বলেন— সাধারণতঃ জাহান্নামী ব্যক্তি জাহান্নামের অবর্ণনীয় শাস্তির কারণে মারাও যাবে না, আবার জীবিতও হবে না। কিন্তু তোমাদের মধ্য থেকে কিছু (মুমিন) লোক স্বীয় গুনাহের কারণে জাহান্নামে যাবে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এক বিশেষ ধরনের মৃত্যু দেবেন। (যার ফলে তারা কষ্ট অনুভব করবে না) এমনকি যখন তারা জ্বলে কয়লায় পরিণত হবে তখন (রাসূল সা. বা অন্যান্য জান্নাতীগণকে) তার পক্ষে সুপারিশ করার অনুমতি দেয়া হবে। ফলে তাদের বিক্ষিপ্ত অঙ্গগুলো ভিন্ন ভিন্ন টুকরিতে নিয়ে আসা হবে। এরপর জান্নাতের ঝরনায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হবে। জান্নাতীগণকে বলা হবে তাদের ওপর অমৃতজল ঢালো। ফলে তারা এতো দ্রুত জীবন ফিরে পাবে যেভাবে কাদামাটিতে ঘাস উদ্গত হয়।[৪৬]

নোট : ডাক্তারের অপারেশন রোগীর জন্য যেমন কষ্টদায়ক হয় না। অনুরূপ পাপী মুমিনগণ জাহান্নামের কষ্ট অনুভব করবে না।

৬১. ইংরেজী শিখে দীনদার হওয়া আরবী শিখে বেদীন হওয়া থেকে উত্তম।

৬২. অভিজ্ঞতার কথা হলো, যে শিশু সূরা ইউসুফ প্রথম মুখস্ত করবে তার কুরআন শরীফ দ্রুত মুখস্ত হয়ে যাবে।

৬৩. পীরের দোয়ার প্রভাব অনেক বেশী হয়ে থাকে। হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূল সা.-এর ইন্তেকালের মাত্র তিন বছর পূর্বে ঈমান এনেছেন। কিন্তু স্মৃতিশক্তি এত প্রখর ছিল যে, সবচে বেশী সংখ্যক হাদীস বর্ণনা করেছেন। কারণ, রাসূল সা. তাঁর জন্য দোয়া করেছিলেন।

৬৪. যেমনিভাবে অবৈধভাবে যৌন চাহিদা পূরণ করা হারাম, তেমনিভাবে অস্থানে রাগ করাও হারাম।

---

৪৫. সূরা যুখরুফ : ৫।

৪৬. মুসলিম শরীফ, কিতাবুল ঈমান : ৪৫৯।

৬৫. বুযুর্গদের কথা নকল করলে কী হয়? দেখো, তোতা পাখী কিভাবে মানুষের মতো করে কথা বলে। তাই বলে সেও কী মানুষ হয়ে যায়? কখনো নয়।

৬৬. সত্যের প্রদীপ যেখানেই জ্বলতে দেখো সেখান থেকেই উপকৃত হওয়ার চেষ্টা করো। এটা দেখো না যে, প্রদীপ কে জ্বালিয়েছে?

৬৭. মুসলমানদের উপকার করতে না পারো; ক্ষতি করো না। সুখি করতে না পারো তো দুঃখ দিয়ো না। প্রশংসা করতে না পারো তো গীবত করো না।

৬৮. শত বছরের জীবনে এক মুহূর্তের ভুল মানুষের জীবনের গতি পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে পাল্টে দেয়।

৬৯. ভুলের পর নিজের চেহারাকে বাহানার চাদর দ্বারা আবৃত করো না। কেননা চাদর চেহারার চেয়ে বেশী ময়লাযুক্ত।

৭০. অসভ্য লোকের সঙ্গে বন্ধুত্ব করো না। কেননা গরম কয়লা হাত ঝলসে দেয়। আর ঠাণ্ডা কয়লা হাত কালো করে দেয়।

৭১. প্রাণীর মধ্যে সবচে বেশী লোভী হলো মাছি। আর মাকড়সা হলো অল্পে তুষ্ট প্রাণী। ফলে আল্লাহ তাআলা মাছিকে মাকড়সার খাদ্য বানিয়ে দিয়েছেন।

৭২. যদি মানুষের চিন্তা-ভাবনা শরীয়তের সাক্ষ্য হতো তবে অনেক ভালো মানুষ অসভ্য হতো।

৭৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. নসীহত করেন : কুদৃষ্টি ছেড়ে দাও তাহলে একাগ্রতার তৌফিক হবে। অনর্থক কথা বলা ছেড়ে দাও তাহলে বিচক্ষণতা লাভ করতে পারবে।

৭৪. অশ্লীল কথা বলার কারণে এক যুবককে কোনো এক বুযুর্গ বললেন, দেখো তো, তুমি আল্লাহর নামে কেমন পত্র প্রেরণ করছ ?

৭৫. যদি অহংকার কোনো ইলম হতো তাহলে এটাও কোনো ডিগ্রী হতো।

৭৬. তুমি যদি আল্লাহ তাআলার ওপর সন্তুষ্ট থাকো তবে এটা এ কথার প্রমাণ যে, তিনি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট।

৭৭. বিনয়ের সাথে চলো নয়তো হোঁচট খেয়ে পড়ে যাবে।

৭৮. হযরত মূসা আ. দোয়া করলেন, হে আল্লাহ! মানুষের যবানকে আমাকে কিছু বলা থেকে বাধা প্রদান করুন। আল্লাহ বললেন : যদি আমি এমনটি করতাম তাহলে নিজের জন্যই করতাম।

৭৯. মনের চাওয়া-পাওয়া ছাড়া যে হাদিয়া পাওয়া যায় তাতে বরকত হয়।

৮০. পোশাক তিন প্রকার :

০১. জীবন যাপনের জন্য। এটি আবশ্যকীয়।

০২. সৌন্দর্যের জন্য। এটি জায়েয।

০৩. দেখানোর জন্য। এটি নিষিদ্ধ।

৮১. শাহ সুজা কিরমানী রহ.-এর ৪০ বছর রাত জেগে ইবাদত করার অভ্যাস ছিল। একরাতে ঘুমিয়ে পড়লেন। স্বপ্নে আল্লাহর সাক্ষাত লাভ হলো। নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ! আমি তো জেগে তোমায় খুঁজেছি, অথচ তুমি ঘুমে দেখা দিলে। আল্লাহ বললেন, জাগার বরকতেই ঘুমে আমার সাক্ষাত লাভ করতে পেরেছ।

৮২. হে বন্ধু! তুমি তোমার মূল গন্তব্যের দিকে যাচ্ছ। তবে ধীর গতিতে। আপন গন্তব্যের দিকে তো জানোয়ারও দ্রুত যায়।

৮৩. ইমাম আবু হানীফা রহ. ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-কে উপদেশ দিলেন : কেউ পেছন থেকে ডাক দিলে তার জবাব দেবে না। সাধারণত: রাখালরা পালের পশুকে পেছন থেকে ডাকে।

৮৪. যে নেয়ামতের মূল্যায়ন করবে না, অজানা পদ্ধতিতে তা ছিনিয়ে নেওয়া হবে।

৮৫. ওয়ায করার সময় অহংকার চলে আসলে লিখে ওয়ায করবে। এভাবে লোকজন দেখে বলবে, বেচারা দেখে দেখে ওয়ায করছে।

৮৬. স্বেচ্ছায় ও স্বপ্রণোদিত হয়ে কারো অনিষ্টতার ও কষ্ট দেওয়ার চিন্তা করা হলো বিদ্বেষ। যদি কারো কথায় কষ্ট পেয়ে থাকো তাহলে হয়তো না তার সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে হবে না তখন এটা দূর করার জন্য দোয়া করবে।

৮৭. হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম রহ.-এর নিকট কেউ অভিযোগ করলে তিনি বলতেন— তুমি দারিদ্রের মূল্য কী জানো? রাজ্যের বিনিময়ে তা ক্রয় করেছি। এ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো।

৮৮. মহিলাদের জন্য পোশাক ও অলংকারের আসক্তি সীমিত করার পদ্ধতি হলো, নিজ ঘরে উন্নত পোশাক পরিধান করবে। অন্য কোথাও গেলে সাধারণ কাপড় পরিধান করবে।

৮৯. ইবনে আতা সিকান্দারী রহ.-এর মনে আল্লাহ এ কথা ঢেলে দিলেন যে, হে আতা! আমি এমন রাযযাক (রিযিক দাতা) যদি তুমি রিযিক না নেওয়ার দোয়া কর, তারপরও দেবো। আর যদি কেঁদে কেঁদে চাও তাহলে কেনো দেবো না?

৯০. নদী আর চোখের পানির মাঝে ব্যবধান হলো কেবল আবেগ।

৯১. আমাদের এশিয়া মহাদেশের মহিলারা সাধারণত স্বামীভক্ত হয়ে থাকে এবং অন্যের বিষয়-সম্পত্তিতে দৃষ্টিপাত করে না। মহিলারা সৃষ্টিগতভাবে পুরুষের অধিনস্থ হয় কিন্তু পুরুষ ভালবাসার কারণে মহিলাদের অধিনস্থ হয়ে থাকে।

৯২. বৃদ্ধ মানুষ হলো সকালের প্রদীপ। আর যুবক হলো সন্ধ্যার প্রদীপ।

৯৩. নিজের সন্তান কাঁদলে অন্তরে ব্যাথা লাগে। আর অন্যের সন্তান কাঁদলে মাথা ব্যথা করে।

৯৪. তাহাজ্জুদের সময় চোখ খুলে গেলে মনে করবে আসমান থেকে ফোন এসেছে।

৯৫. যিকিরমুক্ত কথা অর্থহীন। আর শিক্ষামুক্ত দৃষ্টি তামাশা। আর চিন্তামুক্ত নীরবতা হলো ভুল।

৯৬. হযরত আবু ইউসুফ মহিউদ্দীন ইয়াহইয়া মাদানী রহ. বলেন, 'সাবধান! কোনো আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির সঙ্গে বেয়াদবী করবে না। অন্যথায় তোমার জীবন বিস্বাদ হয়ে যাবে।

৯৭. অসুস্থ আত্মার আলামত হলো চারটি :

০১. আনুগত্যে মিষ্টি অনুভব করবে না।

০২. তার মাঝে আল্লাহর ভয় থাকবে না।

০৩. দুনিয়ার জিনিসকে শিক্ষণীয় দৃষ্টিতে দেখবে না।

০৪. যে ইলম শুনে তা বুঝে না।

৯৮. হযরত উসমান আল খায়রী রহ.-কে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করল, আল্লাহকে মুখে স্মরণ করি– কিন্তু অন্তর তার সাথে সায় দেয় না। উত্তরে তিনি বললেন— শুকরিয়া আদায় করো যে, আল্লাহর স্মরণে অন্তত একটি অঙ্গ অনুগত। দ্বিতীয়টিও (অনুগত) হয়ে যাবে।

৯৯. গুনাহ থেকে বেঁচে থাকলে দীন ও দুনিয়ায় কেবল স্বাদ আর স্বাদ।

১০০. দুনিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্ব সকল অনিষ্টের মূল।

মসজিদে প্রবেশকালে এ দোয়া পড়ুন

হযরত আমর ইবনে আস রা. বলেন, নবী করীম সা. মসজিদে প্রবেশকালে এ দোয়া পড়তেন—

اَعُوْذُ بِاللهِ وَوَجْهِهِ الْكَرِيْمِ وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ.

"আমি মহান আল্লাহ, তাঁর সম্মানিত সত্ত্বা এবং তাঁর চিরস্থায়ী রাজত্বের কাছে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

মানুষ যখন এ দোয়া পড়ে তখন শয়তান বলে, ওই ব্যক্তি পুরো দিনটির জন্য আমার অনিষ্টতা থেকে নিরাপদ হয়ে গেল।[৪৭]

রাসূল সা.-এর ভালোবাসার বিস্ময়কর ঘটনা

হুনাইন যুদ্ধে এক অদ্ভূত পরিস্থিতির অবতারণা হলো। সৈন্যসংখ্যা ছিলো অনেক। ফলে ভীড়ও ছিলো প্রচুর। এক সাহাবী মোটা জুতা পরিহিত ছিলেন। ঘটনাক্রমে তার পা রাসূলুল্লাহ সা.-এর পা মুবারককে পদদলিত করল। রাসূল সা.-এর হাতে ছিল চাবুক। তিনি ওই চাবুকের এক পাশ দিয়ে সাহাবীকে আঘাত করলেন। বললেন, أَوْجَعْتَنِيْ. 'আমাকে কষ্ট দিয়েছো।' ঐ সাহাবী বলেন, فَبِتُّ بِلَيْلَةٍ كَمَا يَعْلَمُ اللهُ 'রাতটা কোনোভাবে পার করেছি।'

সকাল হলে দেখতে পেলাম এক ব্যক্তি আমার নাম ধরে উঁচুকণ্ঠে ডাকছে অমুক কোথায়? বললাম, এই যে আমি এখানে।

সে আমাকে বললো, রাসূল সা. তোমাকে ডেকেছেন। فَانْطَلَقْتُ وَأَنَا مُتَخَوِّفٌ. আমি ভয়ে ভয়ে তাঁর কাছে গেলাম। তিনি বললেন, তুমি তোমার জুতা দিয়ে আমার পায়ে পাড়া দিয়েছিলে আর তোমাকে আমি চাবুক মেরেছিলাম। তাই এই আশিটি উট তুমি এর বিনিময় স্বরূপ নিয়ে যাও। আর যে ব্যথা পেয়েছো তা ক্ষমা করে দাও।

উল্লিখিত ঘটনা নিয়ে একটু ভাবুন। সাহাবীগণের প্রতি রাসূল সা. কী পরিমাণ দয়ার্দ্র ছিলেন! সামান্য এক চাবুকের আঘাতের এই অনুভূতি হলো যে, আশিটি উট দিয়েদিলেন! অনুমান করুন, রাসূল সা. সাহাবীগণের মনোতুষ্টির প্রতি কী পরিমাণ লক্ষ্য রাখতেন! তাদের খুশি রাখতে চেষ্টা করতেন! আমাদের অধীনস্থদের সঙ্গে আমাদেরও এমন আচরণ করা চাই যে,

---

৪৭. হায়াতুস সাহাবা : ৩/৩৯৪।

যদি অবচেতনভাবেও কাউকে কষ্ট দিয়ে ফেলি তাহলে তার মন খুশি করে দেওয়ার চেষ্টা করবো।[৪৮]

রোগীর সেবা-শুশ্রূষায় রাসূল সা.-এর আগ্রহ

রাসূল সা.-এর অভ্যাস ছিল, তিনি অসুস্থ মানুষের সেবা-শুশ্রূষা করতেন। চাই সে যেই হোক না কেনো? সম্মানিত, ভদ্র ও সাধারণ; সকলেরই সেবা শুশ্রূষায় এগিয়ে যেতেন। এমনকি অমুসলিমদের সেবা-শুশ্রূষা ও তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। যেই নরাধম রাসূল সা.-কে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছে এমনকি যে সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনে উবাই; তিনি তার সেবা-শুশ্রূষাও করেছেন।

হাদীসে আছে, এক ইহুদী বালক রাসূল সা.-এর খেদমতে হাজির হতো। কখনো কখনো রাসূল সা. তার দ্বারা টুকিটাকি কাজ নিতেন। সে অসুস্থ হলে রাসূল সা. তার সেবা করতে গেলেন। পাশে বসলেন। বালকটির তখন অন্তিম সময় ছিল। রাসূল সা. দয়াপরবশ হয়ে এবং রিসালাতের দায়িত্ব পালনার্থে সে বালককে ইসলাম গ্রহণ করার দাওয়াত দিলেন। বালক তার ইহুদী পিতার দিকে তাকাল। পিতা সত্যিকার অর্থে মুহাম্মদ সা.-এর দীন সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন। তাই তাকে ইসলাম গ্রহণ করার অনুমতি দিলেন। সে বালক ইসলাম গ্রহণে ধন্য হলো। ইসলামের ওপর তার ইন্তেকাল হলো। রাসূল সা. অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে বললেন :

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ أَنْقَذَهُ مِنَ النَّارِ.

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি তাকে জাহান্নাম থেকে রক্ষা করেছেন।'

মোটকথা, রাসূল সা.-এর অভ্যাস ও জীবনচরিত আলেমগণের কাছে জেনে সে অনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালনা করা চাই। নবী সা.-এর এক একটি সুন্নত ও তাঁর প্রতিটি কাজ আল্লাহর খুবই প্রিয়। যে এর অনুসরণ করবে কুরআনের ঘোষণা অনুসারে নিশ্চিতরূপে সে আল্লাহর প্রিয় বান্দা বলে পরিগণিত হবে। فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ 'তোমরা আমার অনুসরণ করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন।' আল্লাহ আমাদের আমলের তাওফীক দান করুন।

---

৪৮. মাসিক আল মাহমূদ ১৪১৯ হি. / ১৯৯৭. পৃ : ১০।

নেয়ামতের উভয় দিকই লক্ষ্য করবে

আমাদের থেকে অঙ্গীকার নেয়া হয়েছে, প্রত্যেক নেয়ামত ও বিপদের উভয় দিকই দেখে নেবে। কোনো নেয়ামত বা বিপদের কেবল বাহ্যিক দিকটা দেখবে না। কেননা কোনো কোনো সময় বিপদের আকৃতিতে নেয়ামত আসে। আবার কখনো নেয়ামতের আকৃতিতে বিপদ হাজির হয়।

যদি আমরা নেয়ামতের অভ্যন্তরীণ দিকটি লক্ষ্য করি তাহলে তাকে বিভিন্ন রকম পরীক্ষায় পরিবেষ্টিত পাবো। অন্তত একটি বিপদ তো এমন যে, আল্লাহ তাআলা নেয়ামতপ্রাপ্ত ব্যক্তি থেকে এই দাবী করবেন যে, এ নেয়ামতকে কখনই যেন কোনো সৃষ্টির দিকে সম্পৃক্ত না করে। অর্থাৎ যেন এ কথা না বলে যে, অমুকের কারণে এ নেয়ামত পেয়েছি। বরং কেবল আল্লাহর দিকেই সম্পৃক্ত করবে। আল্লাহ তাআলা তার কাছে এটাও দাবী করেন যে, এ নেয়ামতকে সে এমন স্থানেই ব্যয় করবে যেখানে ব্যয় করাটা আল্লাহ তাআলা পছন্দ করেন। নেয়ামতের শুকরিয়া কেবল মুখেই নয়, বরং কাজ-কর্মেও আদায় করবে। এখন যে ব্যক্তি নেয়ামতের মাঝে বিপদ পর্যবেক্ষণ করবে সে তাথেকে স্বাদ উপভোগ করার অবসর কখন পাবে?

অনুরূপ যদি দুঃখ ও কষ্টের অভ্যন্তরে দৃষ্টিপাত করি তখন তার নিজের মাঝে অন্যের বড় নেয়ামত প্রাপ্তি হয়েছে বলে সে বুঝতে পারবে। কেননা তা থেকে তুচ্ছ ও বিনয়ীভাব তার মধ্যে সৃষ্টি হবে। তার বাহু নড়ে ওঠবে। দাম্ভিকতা দূর হতে থাকবে।

আল্লাহর ঘোষণা :

كَلَّآ إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَطْغَىٰٓ ○ أَن رَّآهُ اسْتَغْنَىٰٓ ○

'আদৌ নয়, অবশ্যই মানুষ অবাধ্য। যখন সে নিজেকে অমুখাপেক্ষী ভাবে।'

ওই দুঃখ-কষ্টের ফায়দা এটাও যে, এর দ্বারা মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। কিন্তু এর কারণে আনুগত্য, ইবাদত, জ্ঞান ও অভিজ্ঞানে কখনো আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি হয় না।

মানুষকে বিপদাপদ দিয়ে তখনই পরীক্ষা করা হয় যখন তাকে আল্লাহর নেয়ামতগুলো আল্লাহর দরবারের দিকে মনোযোগী না করে। যখন নেয়ামত তাকে আল্লাহর দিকে মনোযোগী না করে তখনই তাকে আল্লাহ তাআলা বিপদে ফেলেন। আল্লাহ তাআলা নিজেই বলেন :

وَبَلَوْنَاهُم بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ○

'আমি তাদেরকে সুখ-দুঃখ দিয়ে পরীক্ষা করি যাতে তারা ফিরে আসে।'

অর্থাৎ প্রথম তাদের শান্তি ও নেয়ামতে রাখি এরপরও যখন তারা ফিরে না আসে তখন বিপদে ও পরীক্ষায় ফেলে দিই।

আর সাইয়্যিদ তাজুদ্দীন ইবনে আতা উল্লাহ রহ.-এরচেয়েও বিস্ময়কর কথা বলেছেন। তিনি বলেন, যে গুনাহ হীনতা ও বিনয়ী সৃষ্টি করে সেটা ওই আনুগত্য থেকে উত্তম যে আনুগত্য গর্ব ও অহংকার সৃষ্টি করে।

দীনি কাজের দ্বারা প্রসিদ্ধি লাভ করা অন্যায়

দুনিয়াতে অবৈধ হস্তক্ষেপ ও কারামতের দ্বারা কখনো নিজের যশ-খ্যাতি লাভ করতে চেয়ো না। কেননা যার মনে এ ইচ্ছা জাগে তার দীন ধ্বংস হয়ে যায়। আখেরাতে সে শূন্য হাতে ওঠবে। আর যদি কেউ আল্লাহর ইচ্ছায় নিজ থেকে না চেয়ে প্রসিদ্ধি লাভ করে যেমনটি ওলীগণের ক্ষেত্রে প্রকাশ পেয়ে থাকে, তাহলে ভিন্ন কথা। সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রহ. বলেন, যদি কামেল ওলীগণের মাঝে প্রসিদ্ধি লাভের ইচ্ছা থাকত তাহলে কেউ তাদেরকে চিনত না।

সাইয়্যিদ ইবরাহীম মাতবুলী রহ. বলেন, পৃথিবীতে দরবেশের অবস্থা হলো এমন, যেমন কেউ বাথরুমে বসে আছে। এখন যদি সে নিজ থেকেই আগে সামনের দরজা বন্ধ করে বসে তাহলে আড়ালে সে তার প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে। আর যদি সে দরজা খুলে বসে তাহলে তার দোষ প্রকাশ পেয়ে যাবে আর তার শরীরের গোপন অংশ দেখা যাবে। তখন সবাই তাকে গালমন্দ করবে।

সাইয়্যিদী মুহাম্মদ উমরী রহ. বলতেন, প্রকাশ ও প্রসিদ্ধি কামনা কোমর ভেঙ্গে দেয়। স্মরণ রেখো, দুনিয়ার এ খেলাঘরে কোনো ওলী ও আলেম এমন নেই, যার হৃদয় যশ-খ্যাতির পঙ্কিলতা থেকে মুক্ত। খ্যাতি লাভের পর সে সেই আত্মার সতেজতার একেকটি কণা খুঁজে বেড়ান এবং আফ্সোস করেন যে, খ্যাতি লাভের পূর্বে আত্মার মাঝে যেভাবে আল্লাহকে খুঁজে পেতেন এখন আর সেভাবে পান না। এজন্য আল্লাহর সকল ওলীই নিজেদের প্রাথমিক অবস্থার প্রতি আগ্রহী হয়ে থাকেন। এ কথাটি ভালোভাবে বুঝে নিন।[৪৯]

আমরা সুন্নাত ছেড়ে দেই অবহেলা করে

সাহাবায়ে কেরাম মাঝে-মধ্যে শরীয়ত প্রদত্ত রুখসত (ছাড়)-এর ওপর খুব আগ্রহ নিয়ে আমল করতেন। নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করার জন্য এবং আল্লাহর তাআলার ভালোবাসার মর্যাদা লাভের জন্য। কেননা আমাদের জন্যে রুখসত (ছাড়)-এর সুযোগও আল্লাহ তাআলার কাছে পছন্দনীয় বিষয়।

---

৪৯. মাসিক আল মাহমূদ ১৪১৯ হিজরী, ১৯৯৭ ইং. পৃ : ১৯।

রাসূল সা. বলেছেন :

إِنَّ اللهَ تَعَالَىٰ يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ رُخَصُهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تُؤْتَىٰ عَزَائِمُهُ.

"আল্লাহ তাআলা রুখসতের ওপর আমল করাকেও পছন্দ করেন যেভাবে আযিমত (মূল প্রত্যয়ী বিধান) পালন করাকে পছন্দ করেন।"

কিন্তু রুখসত (ছাড়)-এর ওপর আমল করার সময় তার শর্তের দিকে লক্ষ্য রাখাও জরুরী। শর্তটি হলো : মূল হুকুম পালন করার ক্ষেত্রে কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা থাকতে হবে। তাই যতক্ষণ পর্যন্ত ইবাদত করা সহজ বলে মনে হবে ততক্ষণ করাই শ্রেয়। কেননা যে ব্যক্তি নিজ নফসের দূর্বলতা ও অক্ষমতা প্রকাশ করে আল্লাহ তাআলা তাকে ভালবাসেন এবং তার ওপর দ্রুত আল্লাহর রহমত নাযিল হয়।

হারও মিলল; হারওয়ালীকেও পাওয়া গেল

মক্কা মুকাররমায় ইবাদতগুজার একজন হাজী সাহেব ছিলেন। তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। যেতে যেতে পথে একটি রেশমী থলে পেলেন। এর মাঝে মূল্যবান হার ছিল। হিরা জাওহার মুক্তা জড়ানো খুবই মূল্যবান একটি হার ছিল। তিনি ভাবলেন, অনেক দামী, লুকিয়ে নিয়ে গেলেই হয়। কিন্তু তার মাঝে আল্লাভীতি প্রবল হয়ে উঠলো যে, আল্লাহ তো দেখছেন। যদি এটি লুকিয়ে নিয়ে যাই তবে না জানি আল্লাহ কোথায় গ্রেফতার করেন এবং জাহান্নামে দিয়ে দেন। তখন আমি কী করবো? তাই গোপন করার পরিবর্তে সিদ্ধান্ত নিলেন, যদি এর মালিক পাই তাহলে এটি তাকে বুঝিয়ে দেবো। ঘটনাক্রমে মালিকও পাওয়া গেল; যে তা খুঁজে বেড়াচ্ছে। ভাই! আমার হার হারিয়ে গেছে। তিনি বললেন, ভাই! আমার কাছে একটি থলি আছে। দেখো তো এটি তোমার কি না? সে দেখল এবং দেখেই চিনে ফেলল। বললো : হ্যাঁ, এটিই আমার থলি। আর এটি আমার হার। সে খুব খুশি হলো। সে ব্যবসায়ী পাঁচশ' আশরাফি (স্বর্ণমুদ্রা) বের করে তাকে পুরস্কার দিল। তিনি বললেন, আমার পুরস্কারের দরকার নেই। আমি যা কিছু করেছি তা তো আল্লাহকে রাযি খুশি করার জন্য করেছি। তোমার কাছে পুরস্কার পাওয়ার আশায় নয়। সে অনেক পীড়াপীড়ি করল। বললো, দেখুন আমি নিয়ত করেছিলাম, যদি হারটি পাই তাহলে সন্ধানদাতাকে পাঁচশ' আশরাফি দেবো। তাই এগুলো আপনাকে দিতে চাচ্ছি।

তিনি বললেন, না, আমার আশরাফির কোনো প্রয়োজন নেই।

এরপর ব্যবসায়ী লোকটি চলে গেলো। নিজ এলাকায় পৌঁছে বললো, এমন এক সৎ যুবক পেয়েছি, যদি এমন কোনো যুবক আমাদের এলাকায়

পেতাম তাহলে আমার মেয়েকে তার সঙ্গে বিবাহ দিতাম। স্মর্তব্য, লোকটি নিজ এলাকার একজন বড় ব্যবসায়ী ছিলেন।

আল্লাহর কী কুদরত দেখুন! এ যুবক ছিল মক্কার নিবাসী। একবার তার সফরের প্রয়োজন দেখা দিল। সামুদ্রিক সফর। সফরে বের হলেন। হঠাৎ ঝড় তুফান শুরু হলো। নৌকা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেল। তিনি তক্তা আঁকড়ে ধরে থাকলেন আর তক্তা ভেসে চলল। সফরসঙ্গী সবাই এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেলো। জানা নেই, কে নিহত হয়েছে? কে বা বেঁচে আছে? এ তক্তা ভাসতে ভাসতে সামনে যেতে লাগল। একসময় চলতে চলতে তা এক পাড়ে এসে ভিড়ল।

সেখানে একটি জনবসতি ছিলো। এলাকার লোকজন ঘটনাক্রমে সেখানে এসে উপস্থিত। যখন তারা দেখল তক্তার ওপর একলোক ভাসমান। তখন তারা তাকে পাড়ে উঠাল এবং নিজেদের বসতিতে নিয়ে গেল। বসতিতে গিয়ে তিনি হুশ ফিরে পেলেন। তারা খাওয়া দাওয়া করাল। বিশ্রাম করতে দিল। কয়েক দিন এভাবেই কেটে গেলো। তারা তার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলে জানতে পারল, এ ব্যক্তি অনেক বড় আলেম, অনেক দক্ষতাও রয়েছে তার। হাফেয আলেম। অত্যন্ত ভালো মানুষ। সুতরাং তাকে এখানকার ইমাম বানানো হোক। তারা তাকে নিজেদের বাচ্চাদের শিক্ষক হিসেবে নিযুক্ত করলো। ভাতাও নির্ধারণ করে দিলো। সবাই তাকে নিজেদের শায়েখও বানিয়ে নিল। নিজেদের সমস্ত কর্মকাণ্ড তার পরামর্শেই করতে লাগলো।

এলাকাবাসী ভাবল, এমন একজন ভালো মানুষ পেয়েছি। এতবড় আলেম তিনি যেন কিছুতেই এখান থেকে চলে না যান। সুতরাং এর জন্য এমন ব্যবস্থা নেওয়া চাই যাতে করে তিনি আমাদের এলাকার স্থায়ী নিবাসী হন। আমাদের জনপদ থেকে এমন নেককার ব্যক্তি চলে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু তা কিভাবে হতে পারে? একমাত্র ব্যবস্থা হলো বিবাহ করিয়ে দেওয়া। বিয়ের জন্য চিন্তা করে দেখা গেল অমুকের মেয়েই তার জন্য উপযুক্ত। একজন বড় ব্যবসায়ী মারা গেছে। তার এক অনিন্দ্য সুন্দরী কন্যা আছে। তার বিবাহের জন্য উপযুক্ত পাত্র প্রয়োজন। বলা হলো, তাকে অমুকের সাথেই আত্মীয়তা করিয়ে দেওয়া হোক। মেয়েকে জিজ্ঞেস করা হলো। মেয়েও রাজি হলো। বাড়ির লোকজনকে বলা হলে তারাও প্রস্তুত। যখন দু'জনের বিবাহ সম্পন্ন হলো। তিনি রাতে কনের বাড়িতে গেলেন। স্ত্রীর সাথে সাক্ষাত হলে তার গলায় ওই হারটি দেখতে পেলেন যে হারটি তিনি মক্কা মুকাররমায় কুড়িয়ে পেয়েছিলেন এবং ব্যবসায়ীকে ফেরত দিয়েছিলেন। পুরষ্কার দিতে চেয়েছিলেন,

তিনি নিতে অস্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন। ঐ ব্যবসায়ী বলেছিল, এমন সৎ যুবক আমাদের এলাকায় পেলে তার সঙ্গে আমার মেয়ের বিবাহ দিতাম। আল্লাহ তাআলা সে নেক কাজের বরকতে, তাকওয়া ও পরহেজগারীর বিনিময়ে এভাবে পুরস্কৃত করলেন যে, তুমি আমার ভয়ের কারণে যে হার ফিরিয়ে দিয়েছিলে; এখন আমি তোমাকে হারও দিচ্ছি, হারের মালিককেও দিয়েছি। সুতরাং আল্লাহ তাআলা তাকে হারও ফেরত দিলেন, তার মালিককেও দান করলেন। অতিরিক্ত তাকে বাড়ি-ঘর, ব্যবসা ও স্থাবর সম্পত্তিও দান করেছেন। ওই ব্যবসায়ীর সকল মালিকানাও তাকে দান করেছেন।

এ হলো, আল্লাহভীতি। যার অন্তরে আল্লাহ তাআলার ভয় থাকে, আল্লাহ তাআলা তাকে দুনিয়াতেও এমন পুরস্কার দান করেন। আরে ভাই, এ তো দুনিয়ার পুরস্কার, আল্লাহ তাআলা আখেরাতেও দান করবেন। ভাই! আমাদের দুনিয়াতে থেকে আল্লাহর ভয় অর্জন করতে হবে। তাঁর আনুগত্য করতে হবে। অবাধ্যতা থেকে বিরত থাকতে হবে। এসব নেক আমলের বদৌলতেই আল্লাহর সাহায্য আসে।

মতভিন্নতা ঐক্য নষ্ট করে দেয়

আপনার দায়িত্ব হলো, আপনি সবার মাঝে সম্প্রীতি গড়ে তুলবেন। আমাদের এই চেষ্টা থাকা উচিত, যেন দু'ব্যক্তির মাঝে শত্রুতা ও বিদ্বেষ কোনোভাবেই অবশিষ্ট না থাকে। যার পদ্ধতি হলো, একজনের সামনে অন্য জনের ভাল দিক বর্ণনা করবে। একে অন্যের সম্বন্ধে এই বার্তা পৌঁছাবে যে, সে তো জনসম্মুখে তোমার প্রশংসা করে। এ বিষয়ের প্রতিও গুরুত্ব দেবে যাতে একে অন্যকে হাদিয়া আদান-প্রদান করে।

মানুষ প্রশংসা করলে নীরব থাকবো

যখন কোনো মজলিসে কেউ তোমার প্রশংসা করবে তখন নীরব থাকবে। তখন এভাবে বলবে না যে, আমি তো সকলের চেয়ে নিকৃষ্ট, অথবা মানুষের জুতার মাটিতুল্য ইত্যাদি। কেননা এ ধরনের কথাবার্তা মনোরঞ্জনের জন্য বলা হয়ে থাকে। এসব কথার দ্বারা মনের উদ্দেশ্য এই হয় যে, মানুষ ওই সময়ের নীরবতা থেকে আমার সম্বন্ধে এই ধারণা না করে যে, নিজের প্রশংসা শুনে আমার ভালো লেগেছে। আর যদি সে নীরবতা পালন করে তাহলে তার মধ্যে বেশী মঙ্গল। যে ব্যক্তি আত্মার ওপর বিজয়ী হতে পারে তার এমনটাই করা উচিত।

হ্যাঁ, যদি আল্লাহ তাআলা কোনো বান্দার ওপর অনুগ্রহ করেন যে, নফস তার নিয়ন্ত্রণে তাহলে তার ইচ্ছা। ইচ্ছে হলে জবাব দিবে নয়তো চুপ থাকবে।

একত্রিশটি গুরুত্বপূর্ণ উপদেশ

০১. রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অবাধ্যতার লাঞ্ছনা থেকে বের হয়ে আনুগত্যের সম্মানের দিকে ধাবিত হয় আল্লাহ তাআলা তাকে ১. সম্পদ ছাড়াই ধনী বানিয়ে দেন ২. সৈন্য ছাড়া তার সাহায্য করেন ৩. বংশ ছাড়া তাকে সম্মান দান করেন।

বর্ণিত আছে, একদিন রাসূল সা. সাহাবাগণের কাছে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কোন অবস্থায় তোমাদের সকাল হয়েছে? তাঁরা বললেন, আমাদের এ অবস্থায় সকাল হয়েছে যে, আমরা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখি। রাসূল সা. আবার জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের ঈমানের নিদর্শন কী? তাঁরা উত্তরে বললেন,

- আমরা কষ্ট ও বিপদে ধৈর্যধারণ করি।
- সুসময়ে শুকরিয়া আদায় করি।
- ভাগ্যের ওপর সন্তুষ্ট থাকি।

রাসূল সা. বললেন, কাবার রবের শপথ! নিঃসন্দেহে তোমরা মুমিন।

০২. আল্লাহ তাআলা কোনো কোনো নবীর প্রতি এ ধরনের ওহী প্রেরণ করেছেন:

- যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে সাক্ষাত করে এ অবস্থায় যে, সে আমাকে ভালোবাসে তাহলে আমি তাকে আমার জান্নাতে প্রবেশ করাবো।
- যে ব্যক্তি এ অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাত করবে যে, সে আমাকে ভয় করে তাহলে তাকে আমি আমার জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবো।
- যে ব্যক্তি এ অবস্থায় আমার সাথে সাক্ষাত করে যে, সে আমাকে লজ্জা পায়। তাহলে আমি কিরামান কাতিবীন ফিরিশতাকে তার গুনাহের কথা ভুলিয়ে দেবো।

০৩. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত :

- আল্লাহ তাআলা তোমাদের ওপর যা ফরয করেছেন তা যদি আদায় কর তাহলে তোমরা মানুষের মাঝে সবচেয়ে বড় ইবাদতকারী বান্দায় পরিণত হবে।
- আল্লাহ যে সমস্ত বস্তু হারাম করেছেন তা থেকে বেঁচে থাকো তাহলে সবচেয়ে বড় ধর্মভীরু হয়ে যাবে।
- আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে যা কিছু দান করেছেন তার ওপর সন্তুষ্ট থাকো তাহলে সর্বোত্তম ধনী হতে পারবে।

০৪. হযরত সালেহ মারকাদী রহ. সম্পর্কে বর্ণিত, তিনি কয়েকটি বাড়ির পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে (বাড়ির দিকে সম্বোধন করে) বলতেন,

- তোমাদের পূর্বের মালিক কোথায় চলে গেছে?
- তোমাদের পূর্বে বসতী স্থাপনকারী কোথায় চলে গেছে?
- তোমাদের মাঝে অবস্থানকারী পূর্ববর্তীরা কোথায়?

অদৃশ্য থেকে আওয়াজ এলো :

- তাদের চিহ্ন মিটে গেছে।
- তাদের শরীর মাটির নিচে পঁচে গলে গেছে।
- তাদের আমলগুলোকে তাদের গলার হার বানিয়ে পরিয়ে দেয়া হয়েছে।

০৫. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত :

- অন্যের প্রতি দয়া করো, এ দয়া তোমাকে তার মনিব বানিয়ে দেবে।
- কারো কাছে হাত পেতো না। নয়তো তুমি তার গোলাম হয়ে পড়বে।
- যার থেকে ইচ্ছা অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করো তাহলে তুমিও তার মতো ধনী হতে পারবে।

০৬. বিপদে ঘাবড়ে যেওনা। কেননা তারকা অন্ধকারেই চমকায়।

০৭. হযরত ইবরাহীম ইবনে আদহাম থেকে বর্ণিত, একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কোন কারণে যুহদের (বৈরাগ্যতার) পথ বেছে নিলে? তিনি বললেন, তিন কারণে :

- আমি দেখলাম, কবর হলো ভয়ংকর জায়গা। অথচ আমার পাশে অন্ত রঙ্গ বন্ধু নেই।
- আমি দেখলাম, পথ অনেক দীর্ঘ। অথচ আমার সাথে কোনো পাথেয় নেই।
- আমি দেখলাম, সিদ্ধান্ত দানকারী মহামহিয়ান আল্লাহ অথচ আমার কাছে (আমার মুক্তির জন্য) কোনো প্রমাণ নেই।

০৮. হযরত শিবলী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- যারা আল্লাহর বড় ওলী তারা (মুনাজাতে) বলে থাকেন :

- ইলাহী! আমি মুখাপেক্ষী ও দুর্বল সত্ত্বেও পছন্দ করি যে, আমি আমার সকল পূণ্য তোমাকে দিয়ে দেই। সুতরাং হে আমার মনিব! তাহলে আপনি কিভাবে আমার সকল গুনাহ ক্ষমা করতে পছন্দ করবেন না? অথচ আপনি আমার সর্দার। আমার থেকে অমুখাপেক্ষী।
- তার থেকে এ কথাও বর্ণিত আছে, যদি তুমি আল্লাহর থেকে ভালোবাসা অর্জন করতে চাও তাহলে নিজের নফস থেকে নির্জনতা অবলম্বন কর।

• এ কথাও বর্ণিত আছে, তুমি যদি সাহচর্যের স্বাদ পেয়ে থাকো তাহলে বিচ্ছেদ-বেদনা বুঝতে পারবে। মতলব হলো, যে ব্যক্তি বন্ধুত্বের স্বাদ অনুভব করেনি সে কি করে বুঝবে বিরহের জ্বালা?

কবির ভাষায় :

جس نے اسے یار پایا تا زیست نہ پھر قرار پایا

এমন ব্যক্তিকে বন্ধু রূপে যে পাবে,
মৃত্যুর আগ পর্যন্ত সে স্থির হতে পারবে না।

০৯. হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. থেকে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ তাআলার সঙ্গে ভালোবাসা কী জিনিস? তিনি বললেন : ১. কোনো সুদর্শন চেহারা ২. সুমধুর স্বর ৩ ও সুমিষ্ট ভাষায় বন্ধুত্ব অর্জন করো।

১০. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, زهد-এর তিনটি হরফ। ১. ز ২. ه ৩. د

• সুতরাং ز দ্বারা উদ্দেশ্য হলো زاد المعاد পরকালের পাথেয়।

• ه দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, (هدایت) দীনের হিদায়াত।

• د দ্বার উদ্দেশ্য হলো, সর্বদা আনুগত্য।

অন্য এক জায়গায় বলেন, زهد এর তিনটি হরফ :

• ز দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ترك زينت লৌকিক সৌন্দর্য ত্যাগ করা।

• ه দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ترك خواہش نفس প্রবৃত্তির ইচ্ছা ত্যাগ করা।

• د দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, ترك دنيا দুনিয়া ত্যাগ করা।

১১. হযরত হামেদ রহ. থেকে বর্ণিত। তাঁর নিকট এক লোক এলো এবং তাঁকে অসীয়ত করার আবেদন করলো। তিনি জবাব দিলেন, নিজের দীনের জন্য গিলাফ বানিয়ে নিও। যেভাবে কুরআন শরীফের গিলাফ বানানো হয়। জিজ্ঞেস করা হলো, দীনের গিলাফ কী? তিনি জবাবে দিলেন, ১. প্রয়োজন ছাড়া কথা না বলা ২. প্রয়োজনের অধিক দুনিয়া বর্জন করা ৩. মানুষের সঙ্গে প্রয়োজন পরিমাণ মেলামেশা করা।

ফায়দা : উদ্দেশ্য হলো, কুরআন শরীফ রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যেমন গিলাফ প্রয়োজন। অনুরূপ দীনের হিফাযতের জন্যও গিলাফ প্রয়োজন। সে গিলাফ হলো এ তিন বিষয়। এ তিন বিষয়কে একেবারেই ত্যাগ করবে, কারণ এই তিনটি বিষয় দ্বারাই দীনের ক্ষতি হয়। শুধু প্রয়োজন অনুপাতে যা

না হলেই নয় তা অবলম্বন করা যেতে পারে। আর জেনে রাখো, সত্যিকারের বুযুর্গী হলো এই তিনটি বিষয় :

- ছোট-বড় সর্বপ্রকার হারাম থেকে বেঁচে থাকা।
- সহজ-কষ্টকর সর্বপ্রকার ফরয আদায় করা।
- দুনিয়াকে পুরোপুরি দুনিয়াবাসীর জন্য ছেড়ে দেওয়া।

১২. হযরত লোকমান হাকীম আ. থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর ছেলেকে নসীহত করে বলেন– বৎস! মানুষের তিনটি অংশ;

- এক অংশ আল্লাহর জন্য। এটি হলো তার রূহ।
- এক অংশ তার নফসের জন্য। এটি হলো, তার আমল।
- এক অংশ হলো, পোকামাকড়ের জন্য। এটি হলো, তার শরীর।

১৩. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি জিনিস মুখস্ত শক্তিকে বৃদ্ধি করে ও শ্লেষ্মা দূর করে : ১. মিসওয়াক ২. রোযা ৩. কুরআন তেলাওয়াত।

১৪. হযরত কাব ইবনে আহবার রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- শয়তান থেকে বাঁচার জন্য মুমিনের তিনটি দুর্গ :

১. মসজিদ ২. যিকির ৩. কুরআন তেলাওয়াত।

১৫. জনৈক জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তিনটি জিনিস আল্লাহর ভাণ্ডারে আছে। সেগুলো আল্লাহ তাঁর প্রিয় বান্দাদের দান করেন :

- দারিদ্র (এর কারণে মানুষ অনেক গুনাহ ও পার্থিব কষ্ট থেকে নিরাপদ থাকে)।
- অসুস্থতা (যার কারণে অনেক গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়)।
- ধৈর্য (যা মর্যাদাবৃদ্ধির কারণ হয়)।

১৬. হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, উত্তম দিন কোনটি? উত্তম মাস কোনটি? উত্তম আমল কোনটি?

তিনি উত্তর দিলেন; উত্তম দিন হলো, জুমআর দিন। উত্তম মাস হলো, রমযান। উত্তম আমল হলো, পাঁচ ওয়াক্ত নামায সঠিক সময় আদায় করা।

এ খবর হযরত আলী রা. পেলেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনিও একই উত্তর দিলেন। হযরত আলী রা. বললেন, পূর্ব-পশ্চিমের সকল আলেম হাকীম ও জ্ঞানী ব্যক্তিকে এ প্রশ্ন করা হলে তারা ইবনে আব্বাসের দেয়া উত্তরই দেবেন।

তবে তিনি আরো বলেন :

- উত্তম আমল হলো ঐ আমল যা আল্লাহ কবুল করেন।
- উত্তম মাস হলো যে মাসে তুমি আল্লাহর কাছে পরিপূর্ণ তওবা করে থাকো।
- উত্তম দিন হলো যেদিন তুমি ঈমান নিয়ে দুনিয়া থেকে আল্লাহর নিকট যাবে।

কবি বলেন :

کیا تو نہیں دیکھتا کس طرح ہم کو روز و شب

آزما رہے ہیں-اور ہم ظاہر و باطن میں کھیلنے میں مشغول ہیں

তুমি কী দেখো না কিভাবে দিন রাত আমাকে পরীক্ষা নিচ্ছে?

আর আমি প্রকাশ্যে ও গোপনে খেলায় মত্ত আছি।

কিছুতেই দুনিয়া ও তার নেয়ামতের প্রতি ঝুঁকে পড়বে না। এ জন্য যে, এ বাড়ি আসল বাড়ি নয়। মৃত্যুর আগে আগে- নিজের জন্য আমল করে নাও। ভাই-বেরাদার ও বন্ধুদের আধিক্য তোমায় যেন ধোঁকায় না ফেলে।

অমীয় বাণী

আল্লাহ তাআলা যখন কোনো বান্দা থেকে ভালো কাজ নেওয়ার ইচ্ছা পোষণ করেন তখন-

- আল্লাহ তাআলা তাকে দীনের বুঝ দান করেন।
- দুনিয়াবিমূখ করে দেন।
- স্বীয় দোষ-ত্রুটি দেখার যোগ্যতা দিয়েদেন।

১৭. হযরত উমর ফারূক রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

- মানুষের সাথে ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ হলো অর্ধেক আমল।
- সুন্দর প্রচেষ্টা হলো, অর্ধ জীবন।
- সুন্দর প্রশ্ন হলো, অর্ধ ইলম।

১৮. হযরত উসমান গণী রা. থেকে বর্ণিত :

- যে ব্যক্তি দুনিয়া পরিত্যাগ করে আল্লাহ তাআলা তাকে পছন্দ করেন।
- যে ব্যক্তি গুনাহ পরিত্যাগ করে ফিরিশতারা তাকে পছন্দ করেন।
- যে ব্যক্তি মুসলমানদের কাছ থেকে লোভ পরিত্যাগ করে মুসলমানগণ তাকে পছন্দ করেন।

১৯. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত :

- পার্থিব নেয়ামত থেকে ইসলামের নেয়ামতই যথেষ্ট।
- দুনিয়াবি কর্মব্যস্ততার চেয়ে ইবাদতের ব্যস্ততাই যথেষ্ট।
- শিক্ষণীয় বিষয়গুলোর মধ্য হতে মৃত্যুই শিক্ষাগ্রহণের জন্য যথেষ্ট।

২০. হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন-

- এমন অনেক লোক আছে যারা নেয়ামত পেয়ে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়। যদি আল্লাহ আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হতেন তবে এ নেয়ামত ছিনিয়ে নিতেন। জানা গেলো যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের এ অবস্থার ওপর সন্তুষ্ট আছেন। এ কারণে ওই অসভ্যরা গুনাহে লিপ্ত থাকে।
- এমন অনেক লোক রয়েছে যারা অন্যের মুখের প্রশংসা শুনে আত্মপ্রবঞ্চনার শিকার হয়। অর্থাৎ চাটুকার প্রকৃতির লোকেরা যে প্রশংসা করে তার কারণে সে এই ভুল বুঝে যে, যদি আমি কোনোরূপ যোগ্যই না হতাম তাহলে মানুষ কেন আমার প্রশংসা করবে? তাই ওই সমস্ত অসভ্য প্রকৃতির লোকেরা নিজের মন্দ স্বভাববের ওপর বিদ্যমান থাকে। যার ফলে নিজের সংশোধনের কোনো চেষ্টাই করে না।
- এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের দোষ-ত্রুটি আড়াল করার কারণে ধোঁকায় লিপ্ত হয়েছে। সে এটা বুঝে না যে, আল্লাহ তাদের গুনাহ ঢেকে রাখার কারণে মানুষ তাকে সম্মান করছে। উল্টো এ কারণে সে নিজেকে আল্লাহর কাছে গ্রহণীয় মনে করছে। সে বুঝে না যে, যদি আল্লাহ তার গুনাহ ঢেকে না রাখতেন তাহলে মানুষ তার সাথে কথা বলতেও পছন্দ করতো না।

২১. হযরত দাউদ আ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, যাবূরে ওহী পাঠানো হয়েছে এ মর্মে যে, জ্ঞানীর জন্য আবশ্যক হলো, তারা যেন তিনটি বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে লিপ্ত না হয়-

১. পরকালের সম্বলের জন্য প্রস্তুতি, ২. জীবনোপকরণ অর্জন ৩. হালাল বা বৈধ উপায়ে সুখ-অন্বেষণ।

২২. হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেন : ১. তিনটি বিষয় নাজাত দিতে পারে ২. তিনটি বিষয় ধ্বংস করতে পারে ৩. তিনটি বিষয় মর্যাদা বৃদ্ধির উপায় ৪. তিনটি বিষয় কৃত গুনাহের কাফ্ফারা স্বরূপ।

যে তিনটি বিষয় মুক্তি দান করে

• গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ ভীতি। (অর্থাৎ জনসম্মুখে ও একাকী অবস্থায় আল্লাহর নাফরমানী করবে না)

• স্বচ্ছল ও অসচ্ছল সর্বাবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। অর্থাৎ এমন না হয় যে, স্বচ্ছল অবস্থায় অপচয় করতে থাকবে।

• কারো ওপর সন্তুষ্ট-অসন্তুষ্ট যাই থাকো না কেনো সুবিচার করবে। (এমন যেন না হয় যে, কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হবে আর তার ব্যাপারে ইনসাফ করা হবে না। যেমনটি সাধারণত হয়ে থাকে।)

যে তিনটি বিষয় ধ্বংস বয়ে আনে

• অতি কার্পণ্য। (অর্থাৎ ন্যায্য প্রাপ্য পরিশোধ না করা।)

• প্রবৃত্তির অনুসরণ। (অর্থাৎ কিছুলোক প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে শরিয়তের সীমালঙ্ঘন করতেও কোনোরূপ পরোয়া করে না।)

• আত্মম্ভরিতা। (অর্থাৎ অন্যকে হেয় মনে করা।)

যে তিনটি বিষয় মর্যাদা বৃদ্ধি করে

• সালামের ব্যাপকতা। (অর্থাৎ পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলমানকেই সালাম করবে।)

• খাবার খাওয়ানো। (সাধ্যমত)

• রাতে যখন সবাই ঘুমিয়ে পড়ে তখন নামাযে দাঁড়িয়ে যাওয়া। (অর্থাৎ তাহাজ্জুদ আদায় করা)।

ফায়দা : সালাম করার দ্বারা :

• অন্তরের বক্রতা দূর হয়।

• পরস্পরের মাঝে মুহাব্বত ও আন্তরিকতা সৃষ্টি হয়।

• অহংকার শেষ হয়।

• অহংকারের দরুন সৃষ্ট দোষগুলোও ধ্বংস হয়।

সালাম একটি পূর্ণাঙ্গ দোয়া। সালামের ব্যাপকতায় পরস্পরের জন্য দোয়ার ধারাবাহিকতা ব্যাপক হয়ে যায়।

খাবার খাওয়ানোর দ্বারা

• মনোবেদনা দূর হয়।

• পরস্পরে অন্তরঙ্গতা সৃষ্টি হয়।

• কৃপণতা দূর হয়।

• কৃপণতার দরুণ সৃষ্ট দোষাক্রটি দূর হয়। (অর্থাৎ ন্যায্য প্রাপ্য পরিশোধ না করার ইত্যাদি যে দোষসমূহ তা দূর হয়ে যায়।

তাহাজ্জুদ নামাযের দ্বারা

- ইখলাস সৃষ্টি হয় যা প্রতিটি আমলের প্রাণ।
- আল্লাহর সাথে ভালোবাসা সৃষ্টি হয়। যার দরুন সকল নেককাজে আগ্রহ এবং গুনাহের প্রতি ঘৃণা জন্মায়।
- যে তাহাজ্জুদ নামাযের গুরুত্ব দেয় সে অন্য নামাযেরও গুরুত্ব দেয়।

তিনটি বিষয় পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে

- শীতের সময় পূর্ণাঙ্গ পদ্ধতিতে অযু করা।
- জামাআতের সাথে নামায পড়ার জন্য যাওয়া।
- এক নামাযের পর অন্য নামাযের অপেক্ষা করা।

হযরত জিবরাঈল আ.-এর উপদেশ

২৩. হযরত জিবরাঈল আ. রাসূল সা.-কে তিনটি বিষয়ের কথা বলেছেন,

- যতটুকু ইচ্ছা বেঁচে থাকুন। অবশেষে মৃত্যু বরণ করতে হবে।
- যার সাথে ইচ্ছা বন্ধুত্ব করুন। অবশেষে তার থেকে বিচ্ছিন্ন হতে হবে।
- যা ইচ্ছা আমল করুন। অবশেষে এর প্রতিদান পাওয়া যাবে।

ফায়দা : উদ্দেশ্য হলো, সর্বশেষ যখন মরতেই হবে তাই সে জন্য প্রস্তুতি নেওয়া উচিত। আর যখন পৃথিবীর সকল বন্ধুদের থেকে বিচ্ছিন্ন হতেই হবে তখন ওই সত্তার সাথে সম্পর্ক করা উচিত যাঁর সাথে কখনো বিচ্ছিন্ন হবে না। অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা।

আল্লামা আরেফ রুমী বলেন :

عشق بامردہ بناشد پائیدار عشق را با حی وقیوم دار

মানুষ নামের এই অস্থায়ী জিনিসের সঙ্গে ভালোবাসা গড়লে
তোমার ভালোবাসাও একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে।
তুমি চিরঞ্জীব, চিরন্তন আল্লাহর সঙ্গে ভালোবাসা গড়ে তোলো,
তোমার ভালোবাসাও অমর হবে।

আর যখন প্রতিটি আমলের প্রতিদান পাওয়া যাবে। অর্থাৎ ভালো কাজের জন্য উত্তম প্রতিদান আর মন্দ কাজের জন্য খারাপ প্রতিদান পাওয়া যাবে তখন নেককাজ করতেই সচেষ্ট হওয়া উচিত এবং মন্দকাজ করা থেকে বিরত থাকা উচিত।

২৪. হযরত ইবরাহীম আ.-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহ তাআলা আপনাকে কোন বিষয়ের কারণে খলীল বানালেন? তিনি বললেন, তিন বিষয়ের কারণে—

- অন্যের আদেশের পরিবর্তে আল্লাহর আদেশকে গ্রহণ করেছি।
- যে বিষয়ের দায়িত্ব আল্লাহ আমার জন্য নিয়েছেন তা নিয়ে আমি কোনো চিন্তা করিনি।
- মেহমান ছাড়া সকাল অথবা সন্ধ্যায় কখনো খাবার খাইনি।

কোনো কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি থেকে বর্ণিত, তিনটি জিনিস দুশ্চিন্তা দূর করে— ১. আল্লাহর জিকির ২. ওলীগণের সাথে সাক্ষাত ৩. জ্ঞানীদের কথা।

২৫. হযরত হাসান বসরী রহ. থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন—

- যার মাঝে আদব নেই তার ইলম নেই।
- যার মাঝে ধৈর্য নেই তার দীন নেই।
- যার মাঝে পরহেযগারী নেই তার জন্য আল্লাহর নৈকট্য নেই।

ফায়দা : এ কথার মর্ম হলো, ইলমের দাবী হলো আদব বা শিষ্টাচার। প্রত্যেকের সাথে তার উপযুক্ত আদব রক্ষা করে চলতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তির ইলম থাকা সত্ত্বেও আদব না থাকে তাহলে বুঝতে হবে তার মাঝে খাঁটি ইলম নেই।

অনুরূপ তাকওয়া পরহেযগারী অনুপাতে আল্লাহর নৈকট্য লাভ হবে। যদি কারো মাঝে পরহেযগারী না থাকে তাহলে তার আল্লাহর নৈকট্য অর্জন হবে না।

বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের একলোক ইলম অর্জনের জন্য বের হলো। এ খবর সে যুগের নবীর কাছে পৌঁছল। তিনি তাঁকে ডাকলেন। সে লোকটি আসলে তিনি তাকে বললেন, হে যুবক! তোমাকে তিনটি জিনিসের নসীহত করছি। এতেই রয়েছে শুরু ও শেষ ইলম। তা হলো—

- গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করতে থাকবে।
- নিজ জিহবা মানুষের ক্ষেত্রে সংযত রাখবে। কল্যাণ ছাড়া কোনো কথা বলবে না।
- খাবার সময় খেয়াল রাখবে তা হালাল কিনা?

ফলে সে যুবক যাত্রা বন্ধ করে দিল।

ফায়দা : অর্থাৎ এই তিন জিনিসের মাঝেই সকল ইলম একত্রিত হয়ে গেছে। তাহলে সে আর কেনো অনর্থক সময় নষ্ট করবে।

বর্ণিত আছে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি আশি সিন্দুক ইলম একত্র করল। অথচ সে ইলম দ্বারা কোনো উপকার গ্রহণ করল না। অর্থাৎ আমল করল না। আল্লাহ তাআলা ওই যুগের নবীর নিকট ওহী পাঠালেন। তুমি যত পারো ইলম একত্র করে নাও তবে যতক্ষণ পর্যন্ত তিনটি বিষয়ের ওপর আমল না করবে ততক্ষণ তোমার কোনো লাভ হবে না। সেই তিনটি বিষয় হলো—

- দুনিয়ার মায়া ত্যাগ করবে। কেননা তা মুমিনের ঘর নয়।
- শয়তানের সঙ্গ দেবে না। কেননা সে মুমিনের বন্ধু নয়।
- কাউকে কষ্ট দেবে না। কেননা এটি মুমিনের শোভা নয়।

২৬. আবু সুলাইমান দার্‌রানী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি মুনাজাতে বলতেন—

- ইলাহী! যদি তুমি আমার কাছে গুনাহের কথা জিজ্ঞেস করো তাহলে আমি তোমার কাছে ক্ষমার আবেদন করবো।
- তুমি যদি আমার কৃপণতার কথা জিজ্ঞেস করো তাহলে আমি তোমার নিকট তোমার দানশীলতা দাবী করবো।
- যদি তুমি আমাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাও তাহলে আমি জাহান্নামীদেরকে সাবধান করে দেবো যে, তোমার সাথে আমার ভালবাসা আছে। যাতে জাহান্নামীদের মনে আল্লাহর সাথে ভালোবাসা থাকা বান্দার এ অবস্থা দেখে কিছুটা সান্ত্বনা চলে আসে।

বাণী : যে ব্যক্তি তিনটি জিনিস লাভ করল সে সৌভাগ্যবান— ১. জ্ঞানী অন্তর ২. ধৈর্যশীল শরীর ৩. নিজের হাতে যা আছে এর ওপর থাকা।

২৭. হযরত ইবরাহীম নাখয়ী রহ. থেকে বর্ণিত, পূর্ববর্তীগণ ধ্বংস হয়েছে তিনটি বিষয়ের কারণে— ১. অতিকথন ২. বেশী আহার ৩. অধিক ঘুম।

ফায়দা : যখন অনর্থক কথাবার্তা হয় তখন তাতে গীবত, চোগলখুরী ইত্যাদি চলে আসে। বেশী খাওয়ার কারণে অতিরিক্ত কামভাব সৃষ্টি হয়। আর বেশী ঘুমানোর কারণে অলসতা সৃষ্টি হয়।

২৮. হযরত ইয়াহইয়া ইবনে মুয়ায রাযী রহ. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- ঐ লোকের জন্য মুবারকবাদ যে এই তিনটি কাজ করে—

- যে ব্যক্তি দুনিয়া ছাড়ে, দুনিয়া তাকে ছাড়ার পূর্বে।
- যে ব্যক্তি কবরে প্রবেশের পূর্বে নেক আমলের দ্বারা কবরকে সজ্জিত করে।
- স্বীয় রবের সাথে সাক্ষাতের পূর্বে তাঁকে সন্তুষ্ট করে।

২৯. হযরত আলী রা. থেকে বর্ণিত, যার নিকট তিনটি জিনিস নেই তার কিছুই নেই। সে তিনটি জিনিস হলো—

১. আল্লাহর আদেশ ২. রাসূল সা.-এর সুন্নাত ৩. ওলীগণের পথ।

জিজ্ঞেস করা হলো, আল্লাহর আদেশ কী? তিনি বললেন, রহস্য গোপন করা। প্রশ্ন করা হলো, রাসূল সা.-এর সুন্নাত কী? বললেন, লোকজনের সঙ্গে নম্র ও দয়ার আচরণ করা। জিজ্ঞেস করা হলো, ওলীগণের পথ কী? বললেন, মানুষের দেয়া কষ্ট সহ্য করা।

পূর্ববর্তী যুগে মানুষ একে অপরকে তিনটি জিনিসের অসীয়ত করতেন এবং পরস্পর একে অপরকে লিখে দিতেন, সে তিনটি জিনিস হলো—

- যে ব্যক্তি নিজের আখেরাতের জন্য আমল করে, আল্লাহ তাআলা দীন ও দুনিয়া উভয়টি তার জন্য যথেষ্ট করে দেন।
- যে ব্যক্তি তার নিজের ভিতরকে শুদ্ধ করে নেয়, আল্লাহ তাআলা তার বাহিরকেও ঠিক করে দেন।
- যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে লেনদেন ঠিক করে, আল্লাহ তাআলা তার ও মানুষের সাথে লেনদেনও ঠিক করে দেন।

৩০. হযরত আলী রা বর্ণনা করেন :

- আল্লাহর কাছে সবার মধ্য থেকে তুমি উত্তম হয়ে থাকো।
- নিজের নফসের কাছে সবার থেকে তুমি নিজেই নিকৃষ্ট হয়ে থাকো।
- মানুষের কাছে একজন সাধারণ ব্যক্তি হয়ে থাকো।

বাণী: হযরত উযায়ের আ.-এর নিকট আল্লাহ তাআলা এই মর্মে ওহী পাঠালেন—

- হে উযায়ের! যখন তুমি ছোট গুনাহ কর, তাকে ছোট করে দেখ না। বরং লক্ষ্য করো তুমি কার গুনাহ করেছ?
- যখন তোমার কাছে সাধারণ কল্যাণ পৌঁছে তা হালকাভাবে দেখ না। বরং তাকে দেখ, যে তোমাকে সেটা দান করেছেন?
- যখন তুমি কোনো কষ্ট পাও, আমার সৃষ্টির কাছে অভিযোগ কর না। যেমনিভাবে তোমার কোনো গুনাহ যখন আমার কাছে পৌঁছে তখন আমি আমার ফেরেশতাদের কাছে তোমার অভিযোগ করি না।

৩১. হযরত হাতেম আসাম রহ.-এর বাণী: প্রতিদিন সকালে শয়তান আমাকে বলে: ১. তুমি কী খাবে? ২. তুমি কী পরিধান করবে? ৩. কোথায় থাকবে?

আমি তার উত্তরে বলি: ১. মৃত্যুকে খাব, ২. কাফন পরব, ৩. কবরে থাকব।

ছয় লক্ষ সিটের উড়োজাহাজ

তাফসীরে ইবনে কাসীরে আছে, হযরত সুলাইমান আ.-এর আসন যা বাতাসে উড়ে চলত তার বিবরণ হলো, সুলাইমান আ. কাঠের প্রশস্ত একটি সিংহাসন বানিয়েছিলেন যাতে তিনি ও তাঁর রাজত্বের সকল উপকরণ, সৈন্য ও যুদ্ধাস্ত্রসহ সব কিছু আরোহণ করতো। এরপর বাতাসকে আদেশ করতেন। তখন বাতাস ওই বিরাট আকৃতির সিংহাসনকে উড়িয়ে নির্দেশিত জায়গায় পৌঁছে দিত। এ উড়ন্ত সিংহাসন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত এক মাসের দূরুত্ব অতিক্রম করত। আর দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এক মাসের দূরুত্ব। অর্থাৎ একদিনে দু'মাসের দূরত্ব বাতাসে উড়ে অতিক্রম করতো।

ইবনে আবী হাতেম হযরত সাঈদ ইবনে জুবাইর রহ. থেকে বর্ণনা করেন, এ সুলায়মানী সিংহাসনে ৬ লক্ষ চেয়ার রাখা ছিল। যার প্রথম সারিতে সুলাইমান আ.-এর সাথে মুমিন ব্যক্তিরা বসতেন। এর পেছনের সারিতে বসত মুমিন জিন। এরপর পাখীদেরকে আদেশ করতেন সিংহাসনকে ছায়া দেয়ার জন্য যেন সূর্যের তাপে কষ্ট না হয়। এরপর বাতাসকে আদেশ করা হতো যেন এই সমবেত মাখলুক আরোহিত বিশাল সিংহাসনকে উঠিয়ে নির্দেশিত জায়গায় পৌঁছে দেয়।

কোনো কোনো বর্ণনায় পাওয়া যায়, এ পুরো আকাশ ভ্রমণে হযরত সুলাইমান আ. অবনত মস্তকে আল্লাহর যিকির ও শুকরিয়া আদায়ে মগ্ন থাকতেন। ডানে বামে কিছুই দেখতেন না। এভাবে নিজ আমলের দ্বারা বিনয় ও নম্রতা প্রকাশ করতেন।[৫০]

দাওয়াতি কাজ ফরয, ওয়াজিব না সুন্নাত?

প্রশ্ন : হযরত মাওলানা সমীপেষু;

আস-সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ!

সালামবাদ, আরয হলো, দাওয়াতের কাজ করা কি ফরয, ওয়াজিব না সুন্নাত?

উত্তর : যদি উম্মতের মাঝে ফরয ছুটতে দেখা যায় তাহলে দাওয়াতের কাজ করা ফরয। যদি ওয়াজিব ছুটতে দেখা যায় তাহলে দাওয়াত দেওয়া ওয়াজিব। আর সুন্নাত ছুটতে দেখা গেলে দাওয়াতের কাজ করা সুন্নাত। এখন আপনিই সিদ্ধান্ত নিন, উম্মতের মাঝে এ সময়ে কী ছুটে যাচ্ছে? আর আপনার বিবেকের কাছেই ফাতাওয়া তালাশ করুন।

---

৫০. তাফসীরে ইবনে কাসীর, মা'আরিফুল কুরআন সূত্রে : ৬/২১২।

জান্নাতের প্লেনে স্বর্ণের চেয়ার থাকবে

হাদীসে আছে, রাসূল সা. বলেন, ঐ সত্তার শপথ! যাঁর কুদরতী হাতে আমার জীবন। যখন জান্নাতীরা তাদের কবর থেকে উত্থিত হবে তখন তাদেরকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হবে। তাদের জন্য ডানা বিশিষ্ট শ্বেত-শুভ্র উষ্ট্রী নিয়ে আসা হবে। যার ওপর স্বর্ণের হাওদা থাকবে। পায়ের ক্ষুরের তীক্ষ্ম ফলাগুলোয় নূর চমকাতে থাকবে। সে উষ্ট্রীগুলোর এক একটি পদক্ষেপ মানুষের দৃষ্টি সীমার ওপরে গিয়ে পড়বে। সেগুলো জান্নাতী একটি গাছের নিকট গিয়ে পৌঁছবে, যার নীচ দিয়ে দুটি নহর প্রবাহিত থাকবে।

একটি নহর থেকে পানি পান করবে যার দ্বারা তার পেটের সমস্ত উচ্ছিষ্ট পরিষ্কার হয়ে যাবে।

আর অপর নহরে গিয়ে সে গোসল করবে তখন আর কখনো তার শরীর ময়লা হবে না। তাদের চুল গন্ধযুক্ত হবে না। তাদের শরীর ও চেহারা উজ্জ্বল থাকবে। এখন সে জান্নাতের দরজায় আসবে। দেখবে যে, স্বর্ণের তখতের ওপর লাল বর্ণের ইয়াকুত পাথরের কড়া শোভা পাচ্ছে। সেই কড়াটাকে হেলাবে তখন অদ্ভুত এক সুর মূর্ছনা ধ্বনিত হবে। এ সুর শোনামাত্রই প্রত্যেক হুর বুঝে ফেলবে- তাদের স্বামী এসে গেছে। তখন তারা জান্নাতের তত্ত্বাবধায়ককে বলবে যাও দরজা খুলে দাও। সে দরজা খুলে দেবে।

এই ব্যক্তি ভিতরে পা রাখতেই ওই জান্নাতের দারোয়ানের নূরানী চেহারা দেখে সেজদায় লুটিয়ে পড়তে চাইবে। কিন্তু সে বাঁধা দিয়ে তাকে বলবে, মাথা ওঠাও আমি তো তোমারই অধীনস্ত। তখন সে তাকে সাথে নিয়ে চলতে থাকবে।

যখন সে ওই দুররে ইয়াকুতের তাবুর কাছে পৌঁছবে— যেখানে তার হুর আছে— তখন সেই হুর ব্যাকুল হয়ে দৌড়ে তাবু থেকে বেরিয়ে আসবে এবং তাকে জড়িয়ে ধরে বলবে, তুমি আমার ভালোবাসা আর আমি তোমার প্রেয়সী। আমি এখানে চিরকাল থাকবো, আমার মৃত্যু হবে না। আমি নেয়ামতের অধিকারিণী, আমাকে দরিদ্র নাগাল পায় না। আমি আপনার প্রতি সর্বদাই সন্তুষ্ট থাকবো, কখনো অসন্তুষ্ট হবো না। আমি সর্বদা আপনার সেবায় নিয়োজিত থাকবো, অন্য কোথাও যাবো না।

অতঃপর সে বাসভবনে প্রবেশ করবে। এই ভবনের ফ্লোর থেকে ছাদের উচ্চতা হবে এক লক্ষ হাত। তার সমস্ত দেয়াল নানা রঙের মতি দ্বারা সজ্জিত হবে। ওই ঘরে সত্তরটি শাহী আসন থাকবে এবং প্রতিটি রাজকীয় বিছানার

সত্তরজন হুর থাকবে। তাদের সবার শরীরের গোশ্তের নিচে হাড়ের মজ্জা দেখা যাবে। তাদের সহবাসের স্থায়িত্ব হবে পূর্ণ একটি রাত। তাদের বাগান ও বাড়ির নিচে নহর প্রবাহিত হতে থাকবে। যার পানি কখনো দূর্গন্ধ হবে না। তা হবে মতির মতো পরিষ্কার।

আরো থাকবে দুধের নহর। যার স্বাদ কখনো পরিবর্তন হবে না। যে দুধ কোনো জন্তু জানোয়ারের স্তন থেকে বের হয়নি। শরাবের নহর হবে, যা খুবই সুস্বাদু। খাঁটি মধুর নহর হবে, যা কোনো মৌমাছির উদর থেকে তৈরি মধু না। চতুর্পাশ্বে রকমারী ফল বিশিষ্ট গাছ থাকবে। গাছের ফল তার দিকে ঝুকে থাকবে, সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিতে ইচ্ছে করলে তাও পারবে। বসে বসে ফল ছিড়তে চাইলে তখন ডাল এতটাই ঝুঁকে পড়বে যে, সে বসেই পাড়তে পারবে। আবার শুয়ে শুয়ে ফল ছিঁড়তে চাইলে ডাল এ পরিমাণ ঝুকে যাবে যে, শুয়েই পাড়তে পারবে। এরপর রাসূল সা. এ আয়াত পড়লেন, وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا অর্থাৎ 'জান্নাতের গাছের ছায়া তাদের ওপর নামানো থাকবে এবং তার ফলমূল সম্পূর্ণরূপে তাদের আয়ত্বাধীন করে দেওয়া হবে'।

সে খাবার খেতে ইচ্ছা করলে সাদা অথবা সবুজ রঙের পাখি জান্নাতীর কাছে এসে পাখির পালক উঁচু করে দেবে, সে যে অংশ তার থেকে খেতে চাইবে তা সে খাবে। অতঃপর পাখিটি জীবিত যেমন ছিল ঠিক তেমনি উড়ে চলে যাবে।

ফেরেশতারা তার কাছে এসে সালাম দিয়ে বলবে- এ হলো, জান্নাত। যা তুমি নিজ আমলের বিনিময়ে উত্তরাধিকারী হয়েছ। যদি ওই জান্নাতের কোনো হুরের একটি চুল পৃথিবীতে এসে পড়ে তাহলে সে তার উজ্জ্বলতায় গোটা পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়ে আলো ঝলমল করবে।[৫১]

শেকড় থেকে দু'টি নহর বের হবে

ইবনে আবী হাতিম হযরত আলী রা. থেকে বর্ণনা করেন, জান্নাতের দরজায় পৌঁছে জান্নাতী একটি গাছ দেখতে পাবে যার শেকড় থেকে দুটি প্রস্রবণ বের হবে। একটিতে সে গোসল করবে। যার ফলে তার শরীর এতোটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে যে, তার শরীর ও চেহারা চমকাতে থাকবে। তার চুল পরিপাটি ও তৈলাক্ত হবে। পরে আর কখনো আঁচড়ানোর প্রয়োজন হবে না। শরীরের রং ও রূপে কোনো ভাটা পড়বে না। এরপর সে অপর নহরে যাবে। যেন তাকে বলা হবে, তা থেকে পানি পান করতে। এতে

---

৫১. তাফসীরে ইবনে কাছীর : ৪/৪৪৭।

করে ঘৃণা উদ্রেক হওয়ার সকল বিষয় থেকে সে পাক-পবিত্র হয়ে যাবে। জান্নাতের ফেরেশতা তাকে সালাম দেবে। স্বাগত জানাবে। তাকে জন্নাতে প্রবেশ করতে বলবে। তখন সে আনন্দিত হবে। তাকে বলা হবে, আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য বিভিন্ন ধরনের নেয়ামতরাজি প্রস্তুত করে রেখেছেন। সেখান থেকে তখন সে একটু দ্রুত পায়ে এগিয়ে যাবে।

যেসব হুর ঐ জান্নাতীর জন্য নির্ধারিত তারা তাকে বলবে, মোবারকবাদ নিন! অমুক সাহেব এসে গেছেন। নাম শুনেই আনন্দে সে জিজ্ঞেস করবে, তুমি কি নিজেই তাকে দেখেছ? সে বলবে, হ্যাঁ, স্বচোখে দেখে এসেছি। খুশিতে আত্মহারা হয়ে ফটকে এসে দাঁড়াবে। জান্নাতী নিজ প্রাসাদে এসে যখন দেখবে আসনগুলো ঠিকঠাক গুছানো। পানপাত্রও রাখা আছে। গালিচা বিছানো। এসব মনোমুগ্ধকর বিছানা পত্র দেখে যখন সে দেয়ালে চোখ তুলে তাকাবে তখন লাল সবুজ সাদা এবং নানা ধরনের মতিনির্মিত দেখতে পাবে। এরপর ছাদের দিকে তাকাবে। তখন তা এতোটাই স্বচ্ছ ও পরিষ্কার দেখবে যেন নূরের ঝলকানি আলোকিত হচ্ছে। যার আলো চোখের আভা ম্লাণ করে দেবে। যদি তা আল্লাহ স্থির না রাখেন। এরপর সে নিজের বিবিদের মাঝে অর্থাৎ জান্নাতী হুরদের ওপর ভালোবাসার দৃষ্টিতে তাকাবে। এরপর স্বীয় আসনের মধ্য থেকে যেখানে তার মন চাইবে বসবে। আর বলবে, আল্লাহর শোকর; যিনি আমাকে হিদায়াত দান করেছেন। যদি আল্লাহ আমাকে এ পথ না দেখাতেন তাহলে কখনো তাকে খুঁজে পেতাম না।[৫২]

কালিমাটি পড়ে ছয়টি ফযীলত লাভ করুন

لا إِلَهَ إِلا اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ، وَسُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ، وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ الأَوَّلِ وَالآخِرِ وَالظَّاهِرِ وَالْبَاطِنِ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ يُحْيِي وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

রাসূল সা. হযরত উসমান রা.-কে বলেন, হে উসমান! যে ব্যক্তি সকালে এ দোয়াটি দশবার পড়বে আল্লাহ তাকে ছয়টি ফযীলত দান করবেন—

১. সে শয়তান ও তার বাহিনী থেকে রক্ষা পাবে।

২. সে এক কিনতার (প্রায় সোয়া সের সোনা) পরিমাণ প্রতিদান পাবে।

৩. জান্নাতে তার এক স্তর মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।

---

৫২. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪/৪৪৭।

৪. ডাগর ডাগর চোখ বিশিষ্ট হুরের সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হবে।

৫. তার কাছে বারোজন ফেরেশতা আসবে।

৬. তাকে এই পরিমাণ সাওয়াব দেওয়া হবে যে, গোটা তাওরাত, যবূর, ইঞ্জিল ও কুরআন পাঠ করলে যে পরিমাণ সওয়াব পাওয়া যায়, তার সমান সাওয়াব পাবে। সাথে সাথে একটি কবূল হজ্ব ও কবূল উমরার সওয়াব দেওয়া হবে। আর সেদিন মারা গেলে শাহাদাতের মর্যাদা পাবে।[৫৩]

রাসূল সা.-এর পারিবারিক জীবন

রাসূল সা.-এর জন্য আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত হোক- তাঁর জীবনের প্রতিটি দিকই মানবজাতির জন্য উদাহরণ ও উত্তম আদর্শ। এ জন্য আল্লাহর ইচ্ছানুসারে এ ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, রাসূল সা.-এর জীবনের প্রতিটি কর্মকাণ্ড এমনভাবে সংরক্ষণ করা হয়েছে যেন আয়নার মত স্বচ্ছ ও পরিষ্কার।

পৃথিবীর তাবৎ মানুষই নিজের পারিবারিক বিষয়কে গোপন করতে চায়। কিন্তু এর পরিপ্রেক্ষিতে মুহাম্মদ সা.-এর এই মুজিযা হলো তাঁর পক্ষ থেকে গোপন বিষয়কে প্রকাশ করার ব্যাপারে সাধারণ অনুমতি তো আছেই, বরং এ আগ্রহ ছিলো যে, নবী সা.-এর ঘরের ব্যক্তিগত অবস্থাকেও যেন সাধারণ মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয় এবং তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা হয়। এই কারণেই রাসূল সা.-এর ব্যক্তিগত জটিল বিষয়গুলো এমন বিস্তারিতভাবে রক্ষিত আছে, যা অন্য কারো সম্বন্ধে এভাবে সংরক্ষিত থাকাটা অসম্ভব।

রাসূল সা.-এর ঘরোয়া জীবন এমন মনোমুগ্ধকর, চিত্তাকর্ষক, উচ্চতর মানবতাবোধ সম্পন্ন ও উত্তম আদর্শের প্রতিচ্ছবি ছিলো যেমনটি তাঁর বাইরের জীবন ছিলো। তিনি ঘরেও দয়া ও মমতার মূর্ত মিনার ছিলেন। যেমন ছিলেন তাঁর সাহাবীগণের সাথে, ঘরেও ছিলেন তেমনি। চারিত্রিক শিক্ষক ও মুরব্বি ছিলেন, যেমনটি ছিলেন নিজের ওয়ায ও মজলিসে। মুহাম্মদ সা.-এর চিন্তা-চেতনা ও প্রজ্ঞার যে অবস্থা ঘরে দেখা যেতো বাইরেও কোনো অংশে তা ব্যতিক্রম ছিলো না। তিনি তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের যে কর্মপদ্ধতি, উত্তম চরিত্রমাধুরী ও গুণাবলি শিক্ষা দিতেন নিজের ঘরের নির্জন পরিবেশেও এর পূর্ণ রূপে শিক্ষা দিতেন। এজন্যই তাঁর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনও আমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়; যেমনিভাবে তাঁর সামাজিক জীবন আমাদের জন্য অনুপম আদর্শ ও উদাহরণ স্বরূপ।

---

৫৩. তাফসীরে ইবনে কাসীর : ৪/৪৩৯।

এক সহজ সরল জীবন

রাসূল সা.-এর পারিবারিক জীবন একেবারেই সাদামাটা ও লৌকিকতামুক্ত ছিলো। আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে নবী সা. যে মহান মর্যাদা লাভ করেছিলেন এবং আল্লাহর মাখলুকের হৃদয়ে তাঁর যে সম্মান ও ভালোবাসা ছিলো, তা সত্ত্বেও তিনি ঘরে একেবারেই সাদামাটা ও বিনয়ীভাবে থাকতেন। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-কে কেউ রাসূল সা.-এর ঘরের অভ্যন্তরীণ আচরণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন—

كَانَ بَشَرًا مِنَ الْبَشَرِ، يَفْلِي ثَوْبَهُ، يَحْلِبُ شَاتَهُ، وَيَخْدِمُ نَفْسَهُ.

'রাসূল সা. একজন সাধারণ মানুষের মতই ঘরে থাকতেন। পারিবারিক সকল কাজ –যা সাধারণ মানুষ করে থাকে– তিনিও তা করতেন। এমনকি কাপড়ে পোকা-মাকড় ওঠলে তা নামিয়ে নিতেন। বকরির দুধ দোহন করতেন। ব্যক্তিগত কাজ নিজেই সেরে নিতেন।

হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. নিজ হাতেই কাপড়ে তালি লাগিয়ে নিতেন। জুতা ঠিক করে নিতেন।[৫৪] পরিবারের কাজে সহযোগীতা করতেন। নামাযের সময় হলে বের হয়ে যেতেন।[৫৫] ঘরে প্রবেশকালে নিজে সালাম দিয়ে ঘরে প্রবেশ করতেন। পরিবারের সদস্যগণের সঙ্গে সদয় ও কোমল আচরণ করতেন।

স্ত্রীগণের সঙ্গে সদাচরণ

রাসূল সা. বিবিগণের সাথে সদাচরণ করার ওপর বেশ গুরুত্ব দিয়েছেন। তাদের সৃষ্টিগত ও স্বভাবগত দুর্বলতার প্রতি সদয় হওয়ার আদেশ দিয়েছেন। অসংখ্য বর্ণনায় এ কথা পাওয়া যায় যে, সৃষ্টিগত কারণেই মহিলাদের মেযাজ কিছুটা বাঁকা হয়ে থাকে। ফলে একেবারে সোজা করা সম্ভব নয়। তাদের সাথে জীবনাচারের পদ্ধতি হলো, তাদের স্বভাবগত দুর্বলতা মেনে নিয়ে তাদের সাথে অতি উত্তম আচরণ করতে হবে।[৫৬] রাসূল সা. এই সদাচরণকে ঈমানের পূর্ণতার কারণ বলেছেন।[৫৭]

---

৫৪. মুসনাদে আহমদ।

৫৫. বুখারী শরীফ : কিতাবুস্-সালাত।

৫৬. বুখারী, কিতাবুন্-নিকাহ, বাবুল ওয়াসায়া বিন-নিসা।

৫৭. তিরমিযী-কিতাবুল–ঈমান।

রাসূল সা. নিজে এই কর্মকাণ্ডের দিক-নির্দেশনার ওপর পরিপূর্ণ অভ্যস্থ ছিলেন। আর এমন ছিলেন যে, যার উপমা খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। তিনি সাহাবীগণকে এ কথা বলতেন, خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ 'তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম সে, যে তার পরিবারের নিকট উত্তম।' সেখানে তিনি এ কথাও বলেছেন وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي. 'আর আমি তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আমার পরিবারের নিকট উত্তম।'[৫৮]

পূণ্যবতী স্ত্রীগণ যদিও বিশ্বজগতের মহিলাদের মধ্যে উত্তম এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর প্রিয় রাসূলের জীবনসঙ্গিনী হিসেবে নির্বাচিত ছিলেন। কিন্তু ছিলেন তো নারীই। এজন্য (আল্লাহ উনাদের মর্যাদা উঁচু করে দিন) তাঁদের মাঝেও স্বভাবত মেয়েলি দুর্বলতা কিছুটা হলেও ছিলো। কখনো কখনো এর বহিঃপ্রকাশও ঘটতে দেখা যেতো। কিন্তু রাসূল সা. সবসময় ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখতেন ও সদাচরণই করতেন। এমনকি স্ত্রীগণ তাঁর সঙ্গে দিনভর রাগ করে থাকতেন। আর তিনি তার ওপর ধৈর্য ধরে ক্ষমার আচরণই করতেন।[৫৯]

একবার হযরত আয়েশা সিদ্দীকা রা. রাসূল সা.-এর সঙ্গে রাগ করে উঁচুস্বরে কথা বলছিলেন। ঘটনাক্রমে তাঁর পিতা হযরত আবু বকর রা. উপস্থিত হলেন। তখন তিনি হযরত আয়েশা রা.-কে মারতে উদ্যত হলেন 'তুমি রাসূল সা.-এর সঙ্গে উচ্চস্বরে কথা বলো!' কিন্তু রাসূল সা.-ই তাঁকে বাঁচিয়ে নিলেন।[৬০]

একবার হযরত আয়েশা রা.-কে রাসূল সা. বললেন, 'যখন তুমি আমার ওপর অসন্তুষ্ট থাক তখনো তা বুঝতে পারি। আর যখন সন্তুষ্ট থাক তখনো বুঝতে পারি'। বললেন, কিভাবে?

রাসূল সা. বললেন, 'যখন তুমি সন্তুষ্ট থাকো তখন বলো, মুহাম্মাদের রবের শপথ! আর যখন অসন্তুষ্ট থাক তখন বলে থাক, ইবরাহীমের রবের শপথ!'

হযরত আয়েশা রা. বললেন, কিন্তু হে আল্লাহর রাসূল সা.! আমার রাগ শুধু নাম নেওয়া পর্যন্তই হয়ে থাকে, অন্তর থেকে অসন্তুষ্ট হইনা।

---

৫৮. তিরমিযী, মানাকিব : ৬৩; ইবনে মাজাহ : নিকাহ : ৫০।

৫৯. বুখারী, কিতাবুন্-নিকাহ, বাবু মাউইজাতুর রজুলি ইবনাতুল হালী জাওযীহা।

৬০. আবূ দাউদ, কিতাবুল আদব, বাবুল ফিল মিযাহ।

রাসূল সা. আয়েশা সিদ্দীকা রা.-কে বললেন– হিসাব কিতাব বরাবর হয়ে গেল

স্ত্রীগণের সঙ্গে সদাচরণ ও দয়া-মায়ার এমন এমন ঘটনা হাদীসের কিতাবে উল্লেখ রয়েছে। যদি রাসূল সা. থেকে তা প্রমাণিত না হতো তাহলে মানুষ হয়ত নিজের বুযুর্গীর পরিপন্থি মনে করতো। উদাহরণত হাদীসের কিতাবে রাসূল সা. ও আয়েশা সিদ্দীকা রা.-এর এক বিস্ময়কর ঘটনা উল্লেখ রয়েছে। এক সফরে রাসূল সা. ও হযরত আয়েশা রা.-এর মাঝে খালি পায়ে দৌড় প্রতিযোগিতা হলো। হযরত আয়েশা রা. জয় লাভ করলেন। এরপর অন্য এক সফরে তেমনি প্রতিযোগিতা হলো। এবার উম্মুল মুমিনীন রা. হেরে গেলেন। রাসূল সা. বললেন, আয়েশা হিসাব সমান সমান হয়ে গেল।

হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. যেহেতু খুব অল্প বয়সেই নবী কারীম সা.-এর সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন, সেহেতু তাঁর মাঝে বাচ্চাদের মন-মানসিকতা তখনো বিদ্যমান ছিলো। নবী কারীম সা. তাঁর মনোরঞ্জনে জন্য তার ইচ্ছা এবং বৈধ আবদার ও চাহিদাগুলো পূরণ করার প্রতি পুরোপুরি খেয়াল রাখতেন। তাঁর খেলার সাথীরা নবী কারীম সা.-এর ঘরে এসে তাঁর সাথে খেলতো ও গাইতো। নবী কারীম সা.-এর পক্ষ থেকে তার অনুমতি ছিল। বরং যদি সঙ্গীদের নবী কারীম সা.-এর কারণে খেলাধুলা করতে কষ্ট হতো তাহলে নবী সা. নিজেই বাইরে চলে যেতেন এবং তাদেরকে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা রা. এর কাছে পাঠিয়ে দিতেন।

হযরত আয়েশা রা.-এর শখ পূরণ করে দেয়ার একটি ঘটনা হাদীসের বিভিন্ন কিতাবাদীতে আছে। একবার ঈদের দিন মসজিদে নববীর আঙ্গিনায় কিছু হাবশী লোক মল্লযুদ্ধ খেলছিল। হযরত আয়েশা রা.-এর সেই খেলা দেখার খুব শখ হলো। নবী সা. তাকে এ খেলা দেখানোর ব্যবস্থা এভাবে করলেন যে, তিনি নিজে ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন এবং নিজের পিছনে (সম্ভবত পর্দার কথা ভেবে) হযরত আয়েশা রা.-কে নবী সা.-এর আঁড়ালে দাঁড়িয়ে কাঁধ ও কানের মধ্যখান দিয়ে দীর্ঘক্ষণ যাবত খেলা দেখছিলেন। আর নবী কারীম সা. তাঁর খুশির জন্য সেখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকলেন। [বুখারী শরীফ]

স্ত্রীদের সাথে উত্তম আচরণ করা এবং তাদের মন খুশি রাখার এটি একটি অসাধারণ উদাহরণ। এর অনুসরণ করাও সুন্নাতের অনুসরণই। এতে ঐসব লোকদের জন্য বিশেষ শিক্ষা রয়েছে- যাদের কাছে এই কর্মকাণ্ড বুযুর্গী ও উঁচু মর্যাদার পরিপন্থি।

রাসূলুল্লাহ সা.-এর জীবনচরিতে নবুওয়াতের মহান দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও সূক্ষ্ম অনুভূতি ও আবেগের দীপ্তি বিচ্ছুরিত ছিলো, যা এক সংযমী মানবীয় স্বভাবের চাহিদা। নবী কারীম সা. নিজের প্রিয়জন ও ঘরের অধিবাসীদের সাথে মুহাব্বত ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ব্যক্তি ছিলেন।

হযরত খাদীজা রা.-এর প্রতি নবী কারীম সা.-এর অশেষ মুহাব্বত ছিল। ফলে তিনি ঘরে কোনো জন্তু যবেহ করলে তার কিছু গোশত খাদীজা রা.-এর বান্ধবীদের কাছেও পাঠিয়ে দিতেন। নবী কারীম সা. তাঁর ইন্তেকালের পর তাঁর কথা অনেক স্মরণ করতেন। এমনকি অন্য স্ত্রীগণও বিষয়টি নিয়ে ঈর্ষা করতেন। একবার হযরত আয়েশা রা. এ ধরনের কিছু একটা প্রকাশ করলেন। নবী করীম সা. বললেন, আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে তাঁর প্রতি মুহাব্বত দিয়েছেন। [মুসলিম শরীফ]

অন্য স্ত্রীদেরকেও নবী কারীম সা. অনেক মুহাব্বত করতেন। তবে হযরত আয়েশা রা.-কে তাঁর অসাধারণ মেধা ও ইলমী মেযাজ এবং দীনি দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সবিশেষ সস্নেহ ও প্রীতিময় চোখে দেখতেন।

সন্তানদের প্রতি স্নেহ-ভালবাসা

এখন তো ঘরে সন্তানদের যত্ন-আত্তি করার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু জাহেলী যুগে তারা যে যত্ন পাবার উপযুক্ত এটা মনেই করা হতো না। কিন্তু রাসূল সা. সন্তানদেরকেও নিজের বিশেষ মায়া-মমতা ও স্নেহ-ভালোবাসায় সিক্ত করেছিলেন। এ বিষয়ে কথা ও কাজে তিনি এমন আদর্শ পেশ করে গেছেন যার দৃষ্টান্ত পুরো মানবেতিহাসেও খুঁজে পাওয়া যায় না।

রাসূল সা. সন্তানদের সম্পর্কে বলেন— এরা হলো আল্লাহ তাআলার বিশেষ নেয়ামত। তাদেরকে শিক্ষা-দীক্ষা ও শিষ্টাচার-ভদ্রতার গুণে গুণান্বিত করে গড়ে তোলা বাবা-মার একটি অপরিহার্য দায়িত্ব। সন্তানদের অধিকার বাবা-মা ও ঘরের অন্যান্য বড়রাও তার সাথে স্নেহ ও ভালোবাসাপূর্ণ আচরণ করবে। সন্তান যদি মেয়ে হয় তাহলে তার সাথে উত্তম ব্যবহার ও আচরণের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার পার্থক্য করা যাবে না। স্বয়ং নবী সা.-এর আচরণও কন্যা সন্তানদের বেলায় এমন আচরণই ছিল। নিজের মেয়েদের সাথে তার তো গভীর ভালোবাসা ছিলো। তিনি কেবল তাদেরকে স্নেহই করতেন না, বরং তাদের সঙ্গে সম্মানজনক আচরণও করতেন। কলিজার টুকরো হযরত ফাতেমা রা. সম্পর্কে হাদীসের কিতাবে এ ঘটনা উল্লেখ রয়েছে, যখন তিনি রাসূল সা.-এর খেদমতে উপস্থিত

হতেন তখন রাসূল সা. এগিয়ে এসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতেন এবং তাকে নিজের কাছাকাছি বসাতেন।[৬১]

তাঁর মর্যাদা সম্পর্কে রাসূল সা. থেকে অনেক বর্ণনা পাওয়া যায়। অন্য মেয়েদের সাথেও রাসূল সা. অনুরূপ আচরণ করতেন। তাঁদের ব্যাপারেও রাসূল সা.-এর স্নেহ ও মমতার কথা হাদীসের কিতাবে পাওয়া যায়।

বাড়ির ছোট বাচ্চাদের সাথে তাঁর আচরণ ছিল অত্যন্ত স্নেহসুলভ ও পরম মমতাপূর্ণ। (এটাই হলো পূর্ণতার মাপকাঠি।) তাঁর দুই দৌহিত্র হযরত হাসান রা. ও হুসাইন রা. তাঁর কোলেই লালিত-পালিত হয়েছেন। নবুওয়াতের সকল দায়িত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি তাঁদের বিন্দু পরিমাণ অধিকার থেকেও বঞ্চিত করেননি। তিনি তাঁদেরকে কোলে নিতেন। কাঁধে উঠাতেন। আদর-সোহাগ করতেন। তাঁদের ঘ্রাণ শুঁকতেন এবং তাঁদের সম্ভাবনাময় সুন্দর আগামী সম্পর্কে আলোচনা করতেন। তাঁদেরকে দোয়াও দিতেন এবং নিজের সাথে নিয়ে সাওয়ারীতে আরোহণ করাতেন।[৬২]

সাহাবী হযরত আকরা ইবনে হাবিস রা. একবার দেখলেন, রাসূল সা. নিজ নাতি হযরত হাসান রা.-কে চুমু খাচ্ছেন। তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার দশজন ছেলে। আমি তো কখনো তাদেরকে চুমু খাইনি। রাসূল সা. বললেন, যে দয়া করে না তার প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে দয়া করা হয় না।[৬৩]

অর্থাৎ বাচ্চাদের আদর-সোহাগ করাও আল্লাহর রহমত লাভের উপায়। রাসূল সা. হযরত হাসান হুসাইন রা. ছাড়াও বংশের অন্য বাচ্চাদের সাথেও ভালোবাসা ও স্নেহেপূর্ণ আচরণ করতেন। একবার রাসূল সা. খুতবা দিচ্ছিলেন; হযরত হাসান ও হুসাইন রা. ঘর থেকে বের হয়ে এলো। সবেমাত্র হাঁটতে শিখেছে। হাটি হাটি পা পা করে সামনে এগুচ্ছিলো। ভালোবাসার সহজাত গুণ নবীজীকে বসে থাকতে দিলো না। তিনি খুতবা স্থগিত রেখে মিম্বার থেকে নেমে এলেন। সামনে এগিয়ে এসে তাঁকে কোলে তুলে নিলেন, বললেন, আল্লাহ সত্যই বলেছেন। সন্তানের প্রতি মানুষ দুর্বল। দেখলাম, এরা দুজন নিজ কাপড়ে পেঁচিয়ে কাঁপছে। আমার ধৈর্যচ্যুতি হলো। খুতবার মাঝেই মিম্বর থেকে নেমে এসে তাঁদের কোলে তুলে নিলাম।[৬৪]

---

৬১. মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল, বাবু ফাযলি ফাতিমাতা রা.।

৬২. তিরমিযী, বাবু ফি রাহমাতিল ওলাদি।

৬৩. সহীহ বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু রাহমাতিল ওলাদি।

৬৪. নাসায়ী, কিতাবুল জুমুআ, বাবু নুযুলিল ইমাম।

কখনো এমনও হয়েছে, নামাযের মধ্যে কোনো নাতি এসে কাঁধে বা পিঠে চড়ে বসেছে। রাসূল সা. নামায অব্যাহত রেখেছেন। রুকু সিজদার সময় নামিয়ে দিতেন।[৬৫] সন্তানদের সাথে রাসূল সা.-এর খুব মুহাব্বত ছিল। হযরত আনাস রা. বলেন, রাসূল সা.-এর চে' বেশী সন্তানের প্রতি দয়া ও স্নেহপরায়ণ আর কাউকে দেখিনি।[৬৬]

যদি তারা কষ্ট পেতেন তাহলে তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। একবার তিনি সবার সামনে ঘোষণা করলেন— 'ফাতেমা আমার। আমি ফাতেমার। ফাতেমার কষ্ট আমার কষ্ট'।[৬৭]

বদর যুদ্ধে রাসূল সা.-এর জামাতা হযরত যায়নব রা.-এর স্বামী আবুল আস বন্দী হলেন। তার নিকট মুক্তিপণ ছিলো না। হযরত যায়নাব রা.-কে বলে পাঠাল, মুক্তিপণ পাঠাও। হযরত যায়নাব রা.-এর কাছে হযরত খাদীজা রা.-এর দেয়া একটি মূল্যবান হার ছিল। বিবাহের সময় তিনি এটা উপহার স্বরূপ পেয়েছিলেন। যখন নগদ মূল্য দেওয়া সম্ভব হলো না তখন গলার হার খুলে পাঠিয়ে দিলেন। রাসূল সা.-এর সকাশে যখন ঐ হার পেশ করা হলো, তখন জানা নেই কতো কী স্মৃতি তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল। তিনি সেসব স্মৃতির অতলে হারিয়ে গেলেন? তিনি অস্থির হয়ে কেঁদে ফেললেন। মন খুবই বিষণ্ন ও ভারাক্রান্ত হলো। সাহাবীগণকে বললেন, যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, তাহলে মেয়েকে মায়ের দেয়া স্মৃতিময় হার ফিরিয়ে দেবো। সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর সম্মতিতে তিনি সে হার ফিরিয়ে দিলেন।[৬৮]

রাসূল সা.-এর ছেলে ইবরাহীম রা. মদীনা থেকে একটু দূরে গ্রামে মায়ের সাথে থাকতেন। রাসূল সা. সাহাবীগণকে সাথে নিয়ে যেতেন। ছেলেকে দেখে চলে আসতেন। আল্লাহ তাআলার ফায়সালা অনুসারে শৈশবেই তিনি মারা যান। ততক্ষণে তিনি বার্ধক্যে পৌঁছেছিলেন। আর ইবরাহীম রা. ছিলেন তাঁর একমাত্র ছেলে সন্তান। মৃত্যুক্ষণে রাসূল সা. তার নিকট পৌঁছলেন। রাসূল সা.-এর কোলে মাথা রেখে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। নবী সা.-এর আঁখি যুগল প্রচণ্ড কষ্টে প্রবাহিত ছিলো। কিন্তু তখনও নবী সা. একজন মানুষ হওয়ার সাথে

---

৬৫. বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু রহমাতিল ওয়ালাদ। মুসনাদে আহমাদ : ৩/৪৯৩-৪৯৪। নাসায়ী শরীফ, কিতাবুস সালাত।

৬৬. মুসলিম, কিতাবুল ফাযাইল।

৬৭. মুসলিম, তিরমিযী বাবু ফাযলি ফাতিমা।

৬৮. আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ : বাবু ফিদাইল আসীর বিল-মাল।

সাথে নবীও ছিলেন। এ অবস্থায়ও আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা খেয়াল ছিলো। পূর্ণ ধৈর্য সহকারে মুখ থেকে তিনি ঈমানদীপ্ত এই বাক্য উচ্চারণ করলেন—

إِنَّ الْعَيْنَ تَدْمَعُ، وَالْقَلْبَ يَحْزَنُ، وَلا نَقُولُ إِلا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُنُونَ.

'চোখ অশ্রু বর্ষণ করছে। হৃদয় দুঃখে ভারাক্রান্ত। কিন্তু যে কথায় আল্লাহ সন্তুষ্ট আমি কেবল তাই বলব। আল্লাহর শপথ, তোমার বিচ্ছেদে হে ইবরাহীম! আমরা খুবই শোকাহত।'

খাদেম ও সেবকদের সাথে আচরণ

ঘরের সদস্যদের মধ্যে কাজের লোকেরাই সবচে দুর্বল হয়ে থাকে। আর যদি এরা দাস-দাসী হয় তাহলে তো তাদের অক্ষমতা ও অসহায়ত্বের সীমা থাকে না। জাহেলী যুগে তাদের অবস্থা পশুর চেয়েও জঘন্য ছিলো। রাসূল সা. তাদেরকে এ লাঞ্ছনা-অবমাননার অবস্থান থেকে উদ্ধার করে এনে স্বাধীন ব্যক্তিদের সাথে প্রায় সম কাতারে দাঁড় করিয়েছেন। গোলামদের মালিকগণকে লক্ষ্য করে বলেছেন, 'এরা তোমাদের ভাই। আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন। মালিকের দায়িত্ব হলো, তারা নিজ গোলামের সাথে অত্যন্ত সুন্দর আচরণ করবে। নিজেরা যা খাবে তা তাদেরকেও খাওয়াবে। নিজেরা যে ধরনের পোশাক পরবে তাদেরকেও তা পরাবে। সাধ্য ও সামর্থের বাইরে তাদের ওপর কোন কাজ চাপিয়ে দেবে না। যদি কোনো কারণে তাদেরকে ভারি কোনো কাজ দাও তাহলে নিজেরাও সে কাজে শরীক হবে এবং তাদেরকে সাহায্য করবে।[৬৯]

গোলামদের সঙ্গে সদয় আচরণ করা এবং তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার প্রতি রাসূল সা. খুবই গুরুত্ব দিয়েছন। এর জন্য তিনি নিজে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন যে, সাহাবীগণের মাঝে মনিব-গোলামের কোনো বৈষম্য থাকতে দেননি।

রাসূল সা. আপন ফুফাতো বোন হযরত যায়নাব রা.-কে হযরত যায়েদ রা.-এর সাথে বিবাহ দিয়েছিলেন। তিনি তাঁর আযাদকৃত গোলামই ছিলেন। নবী সা. তাঁর সাথে ও তাঁর ছেলে হযরত উসামা রা.-এর সঙ্গে এমন হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণ করতেন যার ফলে সাহাবীগণ তাদেরকে মাহবূবে 'রাসূল সা.-এর' উপাধীতে ভূষিত করেছিলেন।

---

৬৯. বুখারী শরীফ, কিতাবুল ঈমান।

একবার কিছু সাহাবী একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাসূল সা.-এর কাছে সুপারিশ করতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর গাম্ভির্য ও ব্যক্তিত্বের কারণে কারো পক্ষে কিছু বলার সাহস হচ্ছিলো না। তাঁরা পরস্পরে পরামর্শ করে বললেন, কেবল উসামার পক্ষেই এই সুপারিশ করা সম্ভব। যিনি রাসূল সা.-এর প্রিয় এবং তাঁর প্রিয় মানুষের ছেলে। [বুখারী]

রাসূল সা.-এর সাধারণ অভ্যাস ছিল, যে গোলামই নবী সা.-এর কাছে আসতো তাকে তৎক্ষণাত মুক্ত করে দিতেন। সে স্বাধীন হয়ে যেত। কিন্তু ওই গোলাম নিজে নবী সা.-এর দয়া ও অনুগ্রহের বন্দিদশা থেকে স্বাধীন হতে পারত না। হযরত যায়েদ রা.-কে রাসূল সা. আযাদ করে দিয়ে ছিলেন। তার পিতা তাঁকে নিয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিল। কিন্তু আল্লাহর রাসূল সা.-এর ভালবাসা ও সম্পর্ক তাঁকে যেতে দেয়নি।

রাসূল সা. জীবনে কখনো কোনো নারী বা খাদেমের গায়ে হাত তুলেননি।[৭০]

হযরত আনাস রা. রাসূল সা.-এর বিশেষ খাদেম ছিলেন। তিনি বলেন, আমি লাগাতার দশ বৎসর তাঁর খেদমত করেছি। একবারের জন্যেও তিনি আমাকে উফ পর্যন্ত বলেননি। আর না কখনো বলেছেন, এমনটা কেনো করলে বা এমনটা কেনো করলে না?[৭১]

রাসূল সা.-এর অভ্যাস

রাসূল সা. যে সময়টুকু ঘরে অতিবাহিত করতেন তা তিনভাগে ভাগ করতেন। একভাগ আল্লাহর ইবাদতের জন্য। দ্বিতীয়ভাগ পরিবার-পরিজনের অধিকার পূরণে। তৃতীয়ভাগ নিজের আরাম ও বিশ্রামের জন্য। তিনি নিজের বিশ্রামের সময়টুকুতে নিজের উম্মতকেও অংশীদার করে নিতেন। যার পদ্ধতি ছিলো, সে সময়ে শুধু বিশেষ সাহাবীগণের আসার অনুমতি ছিলো। তাদের মাধ্যমে ইলম ও দিক-নির্দেশনা জনসাধারণ পর্যন্ত পৌঁছত। যদিও এ সময়টুকু সবার জন্য উন্মুক্ত ছিলো না। কিন্তু এর প্রভূত কল্যাণ থেকে জনসাধারণ বঞ্চিত থাকত না। বিশেষ সাহাবীগণ সেসময় নিজের বা অন্যদের সমস্যা নিয়ে হাজির হতেন। রাসূল সা. তা সমাধা করে দিয়ে বলতেন, 'যে ব্যক্তি কোনো কারণে নিজের প্রয়োজনের কথা আমাকে বলতে পারে না, তোমরা তার সমস্যা ও প্রয়োজনের কথা আমার কাছে পৌঁছে দিও।' আর এও বলতেন- 'এ কল্যাণকর কাজের বিনিময় আল্লাহ তাআলা তাকে দীনের ওপর অবিচল রাখবেন।'[৭২]

---

৭০. শামায়েলে তিরমিযী।

৭১. বুখারী, কিতাবুল আদব, বাবু হুসনিল খালকিস সাখা।

৭২. শামায়েলে তিরমিযি।

আসরের পর স্ত্রীগণের ঘরে যেতেন। তাঁদের খোঁজ-খবর জিজ্ঞেস করতেন।[৭৩]

রাতের আমলসমূহ হাদীসের কিতাবে সবিস্তারে বিবৃত রয়েছে। এশার পর স্ত্রীগণের মধ্য থেকে যার ঘরে নবী সা.-এর থাকার কথা থাকতো, সমস্ত স্ত্রীগণ তার ঘরে একত্রিত হতেন এবং কিছু সময় আলোচনা চলতো।[৭৪]

এশার পর রাতজাগা রাসূল সা.-এর অপছন্দ ছিলো। কিন্তু কখনো যদি কোনো বিষয়ে পরামর্শ করার দরকার হতো তাহলে বড় বড় সাহাবীগণকে সঙ্গে নিয়ে ওই সময় পরামর্শ করতেন।[৭৫]

অর্ধরাতে ইবাদত করতেন। হযরত আনাস রা. বলেন, 'আল্লাহর রাসূল সা.-কে কেউ যদি রাতে ঘুমানো অবস্থায় দেখতে চাইতো তাহলে দেখতে পারতো। আর যদি কেউ তাঁকে নামাযপড়া অবস্থায় দেখতে চাইতো তাহলে তাও দেখতে পারতো।'

নবীগৃহের দুনিয়াবিমুখ পরিবেশ

রাসূল সা.-এর পরিপূর্ণ ভালোবাসা ছিলো। নবী সা. তাদের পরিপূর্ণ খেয়াল রাখতেন। নবী সা. নিজে কষ্ট পেরেশানীতে কাটিয়ে দিতেন, কিন্তু স্বীয় পরিবারের জন্য অন্তত কিছু না কিছু তো সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা করেই দিতেন। যদিও স্বাভাবিক হলো, একজন মানুষের পক্ষে তার নিজের পেরেশানী সহ্য করা সহজ, কিন্তু স্বীয় পরিবার ও সন্তানের চেহারায় অভাবের ছায়াও দেখতে পারে না। কিন্তু এ ব্যাপারে রাসূল সা.-এর কর্মপদ্ধতি ছিলো একেবারেই ভিন্ন এবং নবী সা.-এর শানে নবুওয়াত অনুযায়ী। তাঁর ঘরের পরিবেশ এবং সাধারণ দৃশ্য তেমনই ছিল—

"اللّٰهُمَّ لَا عَيْشَ اِلاَّعَيْشَ الْاٰخِرَةِ" ও "الدُّنْيَا مَلْعُوْنَةٌ، مَلْعُوْنٌ مَا فِيهَا اِلاَّ ذِكْرُ اللهِ وَمَا وَالاَهُ."

'পরকালের জীবন-ই আসল জীবন। এ দুনিয়া অভিশপ্ত। তবে আল্লাহর যিকির ও তৎসম্পর্কিত বিষয় ছাড়া।'

---

৭৩. শরহুল যাওয়াহির লিয-যুরকানি।

৭৪. আবু দাউদ।

৭৫. তিরমিযি, কিতাবুস্-সালাত।

রাসূল সা. কখনো এ চিন্তা করেননি যে, তাঁর পরিবারবর্গ দুনিয়াতে স্বচ্ছলতা লাভ করুক। বরং তিনি এ দোয়াই বেশী বেশী করতেন— اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتًا. : 'হে আল্লাহ! মুহাম্মদ সা.-এর পরিবারকে প্রয়োজন মাফিক রিযিক দান করুন।'[৭৬]

উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা. রাসূল সা.-এর খুবই আদরের স্ত্রী ছিলেন। তিনি বলতেন, 'আমাদের ঘরে ধারাবাহিকভাবে কয়েক দিন চুলা জ্বালানোর সুযোগ হতো না'। জিজ্ঞেস করা হলো, উম্মুল মুমিনীনগণ কিভাবে দিনাতিপাত করতেন? বললেন, শুধু 'খেজুর আর পানি খেয়েই'। [বুখারী]

পূণ্যবতী স্ত্রীগণের কাছে কেবল এক জোড়া কাপড়ই থাকত।[৭৭]

ঘরে আটার রুটি বানানো হতো চালা ব্যতীত। কখনো চাপাতি রুটি বানানোর সুযোগ আসতো না। আর রাতে ঘরে বাতি জ্বলত না।[৭৮]

রাসূল সা.-এর বিছানা ছিল এমন চাটাইয়ের তৈরি; যার ওপর শয়ন করলে শরীর মুবারকে দাগ পড়ে যেতো।[৭৯]

কখনো চামড়ার ভিতরে ছোবা ভরে গদি বানানো হতো। ব্যাস, এটাই বিছানা হয়ে যেত।[৮০]

একবার হযরত উমর রা. ঘরের অভ্যন্তরে চোখ বুলালেন। ঘরের সামগ্রী হিসেবে সর্বসাকুল্যে দেখতে পেলেন কিছু জব আর চামড়ার কয়েকটি টুকরো। তিনি রাসূল সা.-এর সহায় সম্বলহীন নিঃস্ব জীবনের এই ত্যাগ দেখে কেঁদে ফেললেন। বললেন, আল্লাহর রাসূল! আপনার এ অবস্থা! কায়সার ও কিসরা আল্লাহর সাথে বিদ্রোহ করে কেমন শাহী জীবন-যাপন করছে? এ কথা শুনে রাসূল সা.-এর চেহারা মুবারক লাল হয়ে গেলো। উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন, উমর! কোনো সন্দেহ আছে? তারা তাদের সকল ভোগ বিলাস দুনিয়ায়ই ভোগ করে নিচ্ছে।[৮১]

নবী সা.-এর ঘর ছিল কাঁচা ইট দিয়ে নির্মিত। কয়েকটি কামরা ছিলো খেজুরের ডাল-পালার বেড়া দিয়ে বানানো। ছাদ এত নীচু ছিলো যে, দাঁড়িয়ে

---

৭৬. বুখারী, কিতাবুর রিকাক।
৭৭. বুখারী, কিতাবুল হায়েয।
৭৮. বুখারী, কিতাবুস সালাত।
৭৯. তিরমিযি, কিতাবুয যুহদ।
৮০. বুখারী কিতাবুর রিকাক।
৮১. তবাকাতে ইবনে সাদী।

ছোঁয়া যেত। লম্বায় দশ হাত পাশে ছয়/সাত গজ। দরজায় পর্দা যেমনটি হওয়ার কথা সেটা সম্ভব ছিলো না। জীর্ণশীর্ণ কম্বলই ঝুলিয়ে রাখতেন।

পূণ্যবতী স্ত্রীগণও রা. এমন জীবন-যাপনে খুবই সন্তুষ্ট ছিলেন। ধৈর্য ও কৃতজ্ঞচিত্তে জীবন অতিবাহিত করতেন। যখন আল্লাহর পক্ষ থেকে বিজয় লাভের পর খাদ্য, সামগ্রী ও ধন-সম্পদ কিছুটা জমা হলো তখন তাঁরা আশান্বিত হলেন যে, সাধারণ মানুষের মতো রাসূল সা. নিজ পরিবারের অবস্থা কিছুটা হলেও উন্নত করবেন। কমপক্ষে দু'বেলা রুটির ব্যবস্থা তো হয়েই যাবে; এ আশা করে ছিলেন। তাই তাঁরা এ আবেদন করলেন। কিন্তু রাসূল সা. এ বিষয়টাকে এতটাই অপছন্দ করলেন যে, টানা একমাস ঘরে যাওয়া থেকে বিরত রইলেন। আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে এ হুকুম দেয়া হলো, আপনি আপনার স্ত্রীগণকে পরিষ্কার বলে দিন— আল্লাহর রাসূল সা.-এর সান্নিধ্য তো এমনই আর সেটা দারিদ্রতার সাথেই সম্ভব। ওই ঘরের অবস্থা তো এমনই থাকবে। তোমাদের মধ্যে কারো যদি দুনিয়ার ভোগ-বিলাসের মোহ থেকে থাকে তাহলে আমার থেকে সে সুন্দর ও শালীনভাবে বিচ্ছিন্ন হতে পারো। আর যদি তোমাদের নিকট আল্লাহর সন্তুষ্টি ও রাসূল সা.-এর সান্নিধ্য ও পরকাল অধিক প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাদের জন্য মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। এ আদেশ কুরআনের আয়াতের আকৃতিতে অবতীর্ণ হয়েছে।[৮২]

রাসূল সা. স্ত্রীগণকে এ সিদ্ধান্তের কথা অবগত করলেন। তাঁরা সকলে এককণ্ঠে আল্লাহর রাসূলের সান্নিধ্য বেছে নিলেন।[৮৩]

ইতোঃপূর্বে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই দারিদ্র ও অসহায় অবস্থা তখনও ছিলো যখন রাসূল সা.-এর নিকট ধন-সম্পদের স্তুপ আসতে শুরু করছিল। যেদিন কোনো সম্পদ আসত, সেদিন রাসূল সা. সেগুলো বণ্টন না করা পর্যন্ত ঘরে যেতেন না। ফেদাক (সরকারী বাগান) থেকে কিছু শস্য এলো, হযরত বিলাল রা. তা থেকে কিছু বিক্রি করে ঋণ পরিশোধ করলেন। যা রাসূল সা. দীনি কোনো প্রয়োজনে এক ইহুদীর কাছ থেকে নিয়েছিলেন। রাসূল সা. হযরত বিলাল রা.-কে (যিনি নবী সা.-এর ঘরের বিষয়াবলি তদারকি করতেন) জিজ্ঞেস করলেন, কিছু অবশিষ্ট রয়ে যায়নি তো? তিনি বললেন, হ্যাঁ, কিছু রয়ে গেছে। নবী সা. বললেন, যতক্ষণ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ আমি ঘরে যেতে পারি না। তিনি আবেদন করলেন— হে আল্লাহর রাসূল সা.! কী করবো? কোনো আবেদনকারীও তো নেই।

---

৮২. সূরা আহযাব : ২৮-২৯।

৮৩. মুসলিম, কিতাবুত তালাক।

রাসূল সা. রাতে মসজিদেই অবস্থান করলেন। দ্বিতীয় দিন হযরত বেলাল রা. জানালেন- আল্লাহর রাসূল! আল্লাহ আপনার বোঝা হালকা করে দিয়েছেন। যা ছিলো তা সব বণ্টন করে দেয়া হয়েছে। রাসূল সা. আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলেন অতঃপর ঘরে গেলেন।[৮৪]

হযরত ফাতেমা রা.-এর সঙ্গে তাঁর যে সম্পর্ক ও হৃদ্যতা ছিলো তার কিছু আলোচনা পূর্বে করা হয়েছে। তাঁর অবস্থা এমন ছিলো যে, ঘরের যাবতীয় কজ-কর্ম করতে করতে কাপড় ধুলা-বালিতে একাকার হয়ে যেত। চাক্কি পেষণ করতে করতে হাতে শক্ত আবরণ পড়ে যেত। মশক বহন করার কারণে কাঁধে দাগ পড়ে গিয়েছিলো। একবার এক জায়গা হতে কিছু গোলাম-বাদী আসলো। হযরত আলী রা. হযরত ফাতেমা রা.-এর এ অবস্থা রাসূল সা.-কে জানালেন এবং একজন খাদেমের জন্য আবদেন জানালেন।

তখন রাসূল সা. হযরত ফাতেমা রা.-কে সম্বোধন করে বললেন— ফাতেমা! আল্লাহকে ভয় করো। ঘরের কাজ নিজে করো। আল্লাহর হক, ফরয সমূহ আদায় করো। আর ঘুমানোর সময় ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ ৩৩ বার আলহামদু লিল্লাহ এবং ৩৪ বার আল্লাহু আকবার বলে শোবে। এটা তোমার জন্য বাদী থেকে উত্তম।

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বললেন, বদরের এতিমদের হক তোমার চেয়ে অগ্রগণ্য।

অন্য রেওয়ায়েতে এ কথাও আছে রাসূল সা. এটাও বলেছেন যে, সুফফাবাসী ক্ষুধার যন্ত্রণায় ছটফট করছে, তাদের রেখে আমি তোমাদেরকে কিভাবে দেবো? [৮৫]

হযরত উমর রা.-এর লিখিত ফাতাওয়া

ইমাম আহমদ রহ. কিতাবুয যুহদে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর রা. থেকে লিখিত ফাতাওয়া নেয়া হলো, আমীরুল মুমিনীন! ঐ ব্যক্তি— যার আল্লাহর অবাধ্য হওয়ার ইচ্ছা-ই হয় না। আর না সে আল্লাহর কোনো অবাধ্যতা করে। আর ঐ ব্যক্তি যার ইচ্ছা হয় কিন্তু সে গুনাহ করে না। এদের মাধ্যে উত্তম কে?

তিনি উত্তরে লিখলেন, যার গুনাহ করার ইচ্ছা হয়, এরপর নাফারমানী থেকে বিরত থাকে এরাই সেই লোক যাদের অন্তরকে আল্লাহ তাআলা

---

৮৪. আবু দাউদ।

৮৫. আবু দাউদ, কিতাবুল খিরাজ।

পরহেজগারীর জন্য পরীক্ষা নিয়ে নিয়েছেন; তাদের জন্য ক্ষমা ও অনেক বড় পুরস্কার রয়েছে।

নওমুসলিম মহিলার বিস্ময়কর কাহিনী

আমি একজন আমরিকান মহিলা। আমি আমেরিকার প্রাণকেন্দ্র 'নিউইয়র্কে' জন্মগ্রহণ করেছি। আমার যৌবন একজন আমেরিকান যুবতী মেয়ের মতই কেটেছে। আমার একটাই শখ ছিলো যে, আমেরিকার মতো বড় শহরের আড়ম্বরপূর্ণ ও চাকচিক্যময় জীবনের দৌড়ে আমিও অংশ নেবো। আমি ফ্লোরিডা রাজ্যের মিয়ামি শহরের এক উপকূলে বসবাস করতে লাগলাম। এরপর সময় অতিবাহিত হতে লাগলো। আর আমার মধ্যে শান্তি ও স্বস্তির পরিবর্তে অস্বস্তি বেড়েই চললো। যতই আমার মেয়েলী আকর্ষণ বৃদ্ধি পেতো এবং (বাহ্যিক) সফলতার পথ অতিক্রম করতাম ততই আমার ভিতরে শূন্যতা এবং অবিশ্বস্ততা বৃদ্ধি পেতো। আমি নিজেকে প্রচণ্ড রকমের ঘৃণা ও লাঞ্ছনার মাঝে নিমজ্জিত অনুভব করতাম। আমি ফ্যাশনের গোলাম হয়ে গিয়েছিলাম। আর আমার ব্যস্ততা কেবল এটাই ছিলো যে, আমি অন্যের চোখ ও মন খুশী করা।

আমার জীবনের মর্যাদা যতই উঁচু হত, আমার আস্থা ততটাই নিচু হয়ে যেত। আমি এই বাস্তবতা থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে চাইতাম। কিন্তু এই পলায়নের সকল মোড়েই আবার আমাকে ফিরিয়ে আনার উপকরণ বিদ্যমান থাকতো। অবশেষে আমি নিজ থেকে দমে গেলাম। আমি নেশার আশ্রয় নিলাম। ক্লাব ও পার্টিতে গিয়ে নিজের মন ভোলাতে চাইতাম। কিন্তু সবই অর্থহীন। আমি আত্মিক ধ্যানের মাধ্যমে নিজের অস্থিরতার চিকিৎসা করতে চাইতাম। যখন এসব চিকিৎসাও ব্যর্থ হলো তখন ধর্ম পরিবর্তন করলাম।

আমি একটিয়াজম এর আশ্রয় নিলাম। অর্থাৎ সফলতা ও সামাজিক আন্দোলনে অংশ নিলাম। কিন্তু অসুস্থতা বেড়ে চললো। আর আমার জীবন ব্যবস্থা যেভাবে উন্নত হচ্ছিল তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাতে আমার ভিতরকার অনাস্থার আগুন আমাকে জ্বালিয়ে দিচ্ছিলো।

আমি দেখতে পেলাম, ইসলাম ও ইসলামের সম্মান ও সভ্যতার বিরুদ্ধে চতুর্দিক থেকে ভয়াবহ হামলা হচ্ছে। অতঃপর খারাপ ও বদনাম স্বরূপ নব ক্রুসেড যুদ্ধেরও ঘোষণা দেওয়া হচ্ছে। এখন আমি ইসলাম নামক এক নতুন বিষয়ের প্রতি মনোযোগী হলাম। এতদিন পর্যন্ত তো ইসলাম বলতে আমার ধারণা ইসলামের নামে শুধু এমন কিছু ছবির চিত্র ছিলো যেখানে জীবন কাটে তাবুর নিচে। পুরুষরা নারীদের মারধর করে। ঘরের পেছনের অন্দরমহলে যেখানে জঙ্গি ও সন্ত্রাসের প্রজননকেন্দ্র।

আমি একটি সমাজসংঘের সদস্য ছিলাম। যারা নারীদের স্বাধীনতার জ্ঞান দেওয়া এবং দুনিয়াতে মানুষের উন্নততর জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য কিছু করতে চাচ্ছিলো। এ কাজ করতে গিয়ে আমার একজন সিনিয়রের সাথে সাক্ষাত হয়, যিনি এ বিষয়ে ভালো কাজ করছিলেন। তিনি কোনোরূপ বাছ-বিচার ছাড়া সমস্ত মানুষের জন্য ন্যায় ও সফলতার প্রবক্তা ছিলেন। ঐ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাত হওয়ার পর -আমি অনুভব করি যে, ইনসাফ, স্বাধীনতা ও সম্মান এগুলো খুবই উঁচু স্তরের বিষয় এবং সকল মানুষেরই এসব অধিকার পাওয়া উচিত। কেবল মুষ্টিমেয় কিছু মানুষ পাবে তাই নয়। এখন আমার অনুভব হলো, সকল মানুষের কল্যাণ চিন্তা করা কেবল নিষ্ঠা থাকলেই সম্ভব। প্রথম আমি তো কেবল কিছু মানুষের কথা চিন্তা করতাম; কিন্তু এখন আমি কোনোরূপ বাছ-বিচার ব্যতীত সকল মানুষের প্রাপ্য সম্পর্কে চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎ একদিন আমার সামনে মহাগ্রন্থ আল কুরআন এলো। পশ্চিমারা যার খুবই নেতিবাচক প্রভাব জনমনে সৃষ্টি করে রেখেছে। প্রথম তো কুরআনের শৈলী ও বাক্যের ঢং আমাকে এর প্রতি আকৃষ্ট করলো। এরপর সারা পৃথিবী, মানুষ ও মানবজীবন, জীবনের বাস্তবতা, বান্দা ও রবের সম্পর্ক ইত্যাকার বিষয় সম্পর্কে তার আলোচনাগুলো আমাকে মুগ্ধ করলো। আমি দেখতে পেলাম, কুরআন তার প্রজ্ঞাপূর্ণ সম্বোধন সবসময় মানুষ ও তার রূহকে কেন্দ্র করেই করছে এবং সে কোনো পাদ্রী ও পুরোহিতের মাধ্যম ব্যতীত মানুষকে আল্লাহর দিকে আহ্বান করছে।

অবশেষে ঐ শুভ মুহূর্ত উপস্থিত হলো যখন আমি সত্যকে গ্রহণ করে নিলাম। আমি যে গন্তব্যে পৌঁছার জন্য অধীর ছিলাম এবং যে শান্তির জন্য আমি অস্থির ছিলাম- আমার পূর্ণ বিশ্বাস হয়ে গেলো যে, এটা কেবল ইসলাম গ্রহণ করেই অর্জন হতে পারে। আমার অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা ও দুর্ভাবনার উপশম কেবল ঈমানই হতে পারে। আর আমার সমস্যাগুলোর মূল সমাধান কেবল সত্যিকার মুসলমান হওয়ার মাঝেই নিহিত।

আমি একটি বোরখা এবং মাথা ও গর্দান ঢাকার জন্য স্কার্ফ ক্রয় করলাম। যা একজন মুসলিম মহিলার শরয়ী পোশাক। এখন আমি এই ইসলামী গাম্ভির্যপূর্ণ পোশাক পরে ঐসব রাস্তায় এবং ঐসব দোকানে যেতে লাগলাম আগে যেখানে জাকজমকপূর্ণ পশ্চিমা পোশাক পরে আমার যাতায়াত হতো। সবকিছু তেমনই চলতো যেমন প্রথমে চলতো। তবে একটি জিনিস পরিবর্তন হলো, অর্থাৎ আমি ও আমার অভ্যন্তরীণ স্বস্তি ও শান্তি এবং আস্থা ও নিরাপত্তাবোধের অনুভূতি। এ অনুভূতি আমার প্রথমবার হলো। আমার অনুভব

হলো যে, সকল জিঞ্জির ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। আমার ঘাড়ের শৃঙ্খল ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। আর আমি স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আমি খুবই খুশি ছিলাম যে, যে সব চোখে এখন আশ্চর্য ও বিস্ময়ের ছাপ পড়তে দেখা যায়, যেগুলো পূর্বে আমাকে এভাবে দেখতো যেমন শিকারী তার শিকারকে দেখে আর বাজপাখি চড়ুইকে। পর্দা আমার কাঁধ থেকে একটি বিরাট বোঝা নামিয়ে হালকা করে দিলো। আমাকে এক বিশেষ ধরনের গোলামী ও লাঞ্ছনা থেকে বের করে আনলো। এখন আমি আর অন্যদের মন ভুলানোর জন্য ঘণ্টার পর ঘণ্টা মেকাপ করি না। এখন আমি এ গোলামী থেকে মুক্ত।

এখন পর্যন্ত পর্দা বলতে আমি কেবল নিজের গরদান ঢাকতাম এবং বোরকা পরিধান করতাম। কিন্তু আমি নেকাবের প্রতি মনোযোগী হলাম। কেননা আমি দেখেছিলাম যে, পশ্চিমা মুসলিম মহিলাদের মাঝে নেকাবের রেওয়াজ চালু আছে। আমি আমার স্বামীর (যাকে আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর বিবাহ করেছিলাম) সাথে পরামর্শ করলাম। তার সিদ্ধান্ত ছিলো, চেহারা ঢাকা উত্তম। আবশ্যক নয়। অবশ্য চেহারা ব্যতীত সারা শরীর ঢাকা আবশ্যক। এতদিন পর্যন্ত আমার পর্দা ছিলো এই যে, আমি কেবল হাত ও চেহারা খোলা রেখে বাকী সারা শরীর ঢেকে রাখতাম। আমি কেবল একটা স্কার্ফ ও ঢিলেঢালা বোরখা ব্যবহার করতাম। দেড় বৎসর এভাবেই কেটে গেলো। এরপর আমি আমার স্বামীকে বললাম! আমি আমার চেহারা ঢাকতে চাই। কেননা আমার কাছে মনে হচ্ছে, এটা আমার আল্লাহকে আরো বেশী রাযী খুশী করবে। সে আমাকে একটা দোকানে নিয়ে গেলো। সেখান থেকে আমি একটি اسدال (মাথা থেকে পা পর্যন্ত সকল অঙ্গ ঢেকে রাখে এমন আরবীয় বোরখা) ক্রয় করলাম। যা দিয়ে কেবল চোখ খুলে রাখা যায়; অন্য কিছু নয়।

হেদায়াত প্রাপ্তির এ সফর আমার চলমান ছিলো। খবর আসতে শুরু করলো যে, নারী স্বাধীনতার প্রবক্তা এবং নামসর্বস্ব মানবাধিকারের কর্মীরা হিজাব ও নেকাবের বিরুদ্ধে আওয়াজ ওঠাতে শুরু করলো। কেউ বলতে লাগলো : পর্দা নারীর ওপর জুলুম করার আলামত। কেউ কেউ আপত্তি তুললো যে, পর্দা ঐক্য ও সাম্যের পথে অন্তরায়। এখন মিসর থেকে কেউ কেউ এ সুরে সুর মিলিয়ে বলতে শুরু করেছে যে, পর্দা অসামাজিকতার প্রতীক। এটা কেমন মুনাফেকী বা কপটতা যে, যদি কোনো রাষ্ট্র মহিলাদের পোশাকের জন্য কোনো আইন বানিয়ে দেয় তবে পশ্চিমারা বলে যে, এটা মানুষের স্বাধীনতা ও মানবতা বিরোধী পদক্ষেপ। এখন যদি কোনো মহিলা নিজের ইচ্ছায় এ পর্দাকে গ্রহণ করে তবে তারা তার এ অধিকার ছিনিয়ে

নিতে উঠে পড়ে লাগে। তাকে শিক্ষা-দীক্ষা ও চাকরি থেকে বঞ্চিত করে। এই জুলুম কেবল তিউনিস ও মরক্কোর মত স্বাধীন রাষ্ট্রগুলোতেই হচ্ছে না; বরং ফ্রান্স, হল্যান্ড ও বৃটেনের মতো রাষ্ট্রগুলোতেও হচ্ছে।

এখন আমিও Feminist (নারীর অধিকার রক্ষার প্রবক্তা) কিন্তু একজন মুসলিম Feminist হবে যে মুসলমান নারীদেরকে দাওয়াত দেয়, তারা যেন তাদের ঈমানী দায়িত্বগুলো পূরণ করে। নিজের স্বামীদেরকে একজন সাচ্চা মুসলমান বানানোর ব্যাপারে সাহায্য করে। নিজের বাচ্চাদেরকে এমনভাবে লালন-পালন করে, যাতে করে তারা দৃঢ়তার সাথে দীনের ওপর জমে থাকে এবং বিপন্ন মানবতার জন্য আলোর মিনারা হতে পারে।

আমি আপনাকে এ দাওয়াত দিচ্ছি যে, আপনি সকল কল্যাণের ধারক হোন এবং সকল অন্যায় কর্মকাণ্ড থেকে বেঁচে থাকুন। হক ও সত্যের আওয়াজকে উঁচু করুন এবং অন্যায়ের প্রতিরোধে কোমর বেঁধে নামুন। আমরা নেকাব ও পর্দার পক্ষে লড়বো এবং আল্লাহকে রাযী করবো। আমি চাই যে, আমরা পর্দাকারিণী মহিলারা আমাদের ঐসব বোনকে পর্দার উপকারিতার ব্যাপারে বলবো যারা দূর্ভাগ্যবশত এটা জানে না যে, পর্দা কত কল্যাণকর বিষয়? আমরা তাদেরকে বলবো, পর্দা আমাদের কাছে কতটা প্রিয়? আর আমরা কেনো তাকে এতো গর্ব ও ভালোবাসার সাথে আপন করে নিয়েছি ?

আমি যেসব সম্মানিতা মহিলার কথা জানি, তারা কেবল হিজাবের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং নেকাব দিয়ে চেহারা ঢেকে নিয়েছেন। তাদের অধিকাংশরাই হলেন পশ্চিমা নওমুসলিমা মহিলা। তাদের মধ্যে কিছু তো অবিবাহিতা কুমারীও আছেন। হিজাব পরার কারণে তাদের অধিকাংশেরই সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তাদের সোসাইটি, বংশ ও পরিবারের লোক তাদের বিরোধীতা করে।

এটা স্বাধীনতা নির্বাচনের পক্ষকে অস্বীকার করারই একটি প্রক্রিয়া যে, সামাজের সকল ক্ষেত্রে মিডিয়ার মাধ্যমে নারীদেরকে উলঙ্গ হওয়ার ও উত্তেজনা মূলক কাপড়কে আকৃষ্ট করার জন্য উদাত্ত আহ্বান করা হয়। আর কার্যত তাদেরকে এমনটা অবলম্বন করতে বাধ্য করা হয়। আমার কথা হলো, মেয়েদেরকে হিজাব বা পর্দাসংস্কৃতির ব্যাপারে জানারও সমান সুযোগ দেওয়া উচিত। যাতে করে তারা এই পবিত্র ও স্বস্তিদায়ক সংস্কৃতির সৌন্দর্য জানতে পারে এবং তারাও এটা উপলব্ধি করতে পারে যা আমি উপলব্ধি করতে পেরেছি। আমি গতকালও নগ্নতাকে আমার স্বাধীনতার নিদর্শন মনে করতাম। অতঃপর

আমার কাছে স্পষ্ট হলো যে, সেটা একটি লৌহবেষ্টনী স্বাধীনতা ছিলো। যেটা আমাকে আমার পরিচয় এবং ব্যক্তিগত আস্থা থেকে দূরে সরিয়ে রেখে ছিলো এবং আমার আত্মাকে অস্থিরতার আগুনে নিক্ষেপ করে দিয়েছিলো।

আমি আমার অশ্লীল পোশাক খুলে ফেলে ও পশ্চিমাদের জীবনধারা পরিত্যাগ করে নিজের স্রষ্টার পরিচয় ও তাঁর বন্দেগীমূলক একটি মর্যাদাপূর্ণ জীবন গ্রহণ করার দ্বারা যে আনন্দ ও শান্তি আমার অনুভব হয়েছে আমি এর কোনো উপমা দিতে পারবো না। এমন খুশি আমি আর কখনো হইনি। এ কারণে চেহারা ঢাকা এবং নেকাব পরার প্রতি আমার এত আগ্রহ! পর্দা আমার অধিকার, যা আমি কোনো মূল্যেই ছাড়তে পারবো না। এর জন্যে প্রয়োজনে আমি যুদ্ধ করে জীবন দেবো; কিন্তু কোনো ভাবেই পর্দাকে ছাড়ব না।

পর্দা বর্তমানে নারীর স্বাধীনতার একটি সম্মানজনক নিদর্শন। যা তাকে অশ্লীল মানুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারে। নেকাব পরে নারী বুঝতে পারে সে কে? তার জীবনের উদ্দেশ্য কী? তাকে নিজের স্রষ্টা আল্লাহর সাথে কি ধরনের সম্পর্ক ও সংযোগ করতে হবে।

যেসব নারী পর্দার মাহাত্মপূর্ণ ও আত্মসম্ভ্রমবোধ এর বিরুদ্ধে পাশ্চাত্যের প্রোপাগান্ডার শিকার হয়েছে, তাদেরকে উদ্দেশ্য করে বলতে চাই :

তোমাদের জানা নেই, তোমরা কত উচু মর্যাদা সম্পন্ন নেয়ামত থেকে বঞ্চিত।

আর সভ্যতার দূর্ভাগা ঠিকাদার ও ভিত্তিহীন ক্রুশ পূজারীদের ব্যাপারে আমার বক্তব্য হলো : তোমরাও পর্দাপ্রথা গ্রহণ করো। এরই মধ্যে তোমাদের মুক্তি মিলবে।[৮৬]

স্বপ্নের আদব

১. ভাল স্বপ্ন পছন্দ হওয়া ও তার ওপর খুশি হওয়া।

২. বড়রা ছোটদের কাছ থেকে স্বপ্নের কথা জেনে নেওয়া

৩. মসজিদে স্বপ্নের কথা বলা।

৪. মসজিদে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া।

৫. ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় দোয়ায়ে মাছুরা পড়া।

৬. ফজরের পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া।

---

৮৬. মাসিক আল ফুরকান, মার্চ : ২০০৭ মুতাবিক ১৪২৮ হি. পৃ : ২৩।

৭. স্বপ্নের ব্যাখ্যা কোনো নেককার, যে রায় দেওয়ার ক্ষমতা রাখে ও ব্যাখ্যা দেওয়ার যোগ্যতা রাখে এমন ব্যক্তি থেকে নেওয়া।

৮. কোনো নেককার বা হিতাকাঙ্ক্ষীকে স্বপ্নের কথা বলা।

৯. ভালো স্বপ্ন দেখে আল হামদুলিল্লাহ বলা

১০. দুঃস্বপ্ন দেখে আউযুবিল্লাহ পড়া।

১১. দুঃস্বপ্ন দেখলে নামায পড়া।

১২. দুঃস্বপ্নের কথা কাউকে না বলা।

স্বপ্নের কথা জিজ্ঞেস করা

হযরত সামুরা ইবনে জুনদুব রা. বলেন, রাসূল সা.-এর অভ্যাস ছিলো, স্বীয় সাহাবী রা. থেকে খুব বেশী এ কথা জিজ্ঞাসা করতেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ কি স্বপ্নে কিছু দেখেছ?" সুতরাং যে স্বপ্নে দেখেছে সে তা বর্ণনা করতেন।[৮৭]

ফায়দা : মুমিনের স্বপ্ন আল্লাহর সুসংবাদ এবং নবুওয়াতের একটি অংশ। হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, যেহেতু রাসূল সা. স্বপ্নের ভালো ব্যাখ্যা দিতেন। এ জন্য রাসূল সা. জিজ্ঞাসা করতেন। আর তাঁর এই জিজ্ঞাসা ফজর নামাযের পরই হতো।[৮৮]

স্বপ্ন উপস্থাপন করা

হযরত ইবনে উমর রা. বলতেন, যে ব্যক্তি স্বপ্ন দেখতেন সে নবী সা.-এর কাছে তা উপস্থাপন করতেন। সুতরাং আমিও (এ আশা যে কোনো স্বপ্ন দেখবো এবং তা রাসূল সা.-এর নিকট পেশ করবো) বললাম, হে আল্লাহ! কোনো কল্যাণ থেকে থাকলে আমাকেও স্বপ্ন দেখাও যেন আমি এর ব্যাখ্যা নবী সা. থেকে জেনে নিতে পারি। সেমতে একদিন আমি স্বপ্ন দেখলাম।[৮৯]

হযরত ইবনে উমর রা. বলেন, নবুওয়াতের যুগে সাহাবীগণ কোনো স্বপ্ন দেখলে তা রাসূল সা.-এর সামনে পেশ করতেন। তখন তিনি বলতেন, মাশাআল্লাহ। তখন আমি যুবক ছিলাম। বিয়ের আগে মসজিদে ঘুমাতাম। মনে মনে বলতাম যদি আমার মধ্যে কল্যাণকর কিছু থাকে তাহলে স্বপ্নও দেখতে পেতাম। একরাতে ঘুমালাম তখন বললাম, হে আল্লাহ! আপনি যদি মনে করেন, আমার মাঝে কোনো কল্যাণ আছে তাহলে আমাকেও কোনো স্বপ্ন দেখান।[৯০]

---

৮৭. মুখতাসারুল বুখারী : ৩/১০৪৩।

৮৮. বুখারী শরীফ : ২/১০৪৩।

৮৯. মুখতাসারুল বুখারী : ২/১০৪১।

৯০. মুসনাদে তায়ালাসী : ১/৩৫০; বুখারী শরীফ : ২/১০৪১।

স্বপ্ন পছন্দ করা

হযরত আবু বকর সাকাফী রহ. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. ভালো স্বপ্ন খুবই পছন্দ করতেন। তিনি লোকদেরকে স্বপ্ন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতেন। এরপর ব্যাখ্যা দিতেন।[৯১]

ফজরের পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানা

ইবনে যামীল জুহানী রা. বলেন, রাসূল সা.-এর যখন ফজরের নামায পড়া শেষ হতো তখন পা বের করে একটু আরাম করে বসতেন। ৭০ বার ইস্তেগফার পড়তেন। বলতেন, এই সত্তুর হলো সাতশ' বরাবর। ঐ ব্যক্তির মাঝে কোনো কল্যাণ নেই যার একদিনের গুনাহ সাতশ'র চেয়ে বেশী হয়ে যায়। এরপর তিনি লোকমুখী হতেন। রাসূল সা. স্বপ্ন খুবই পছন্দ করতেন। তাই জিজ্ঞেস করতেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে কেউ কি স্বপ্ন দেখেছো'? বর্ণনাকারী ইবনে যামীল বলেন, তখন আমি আমার স্বপ্নের কথা বললাম।[৯২]

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. যখন ফজরের নামায শেষ করতেন তখন জিজ্ঞেস করতেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি স্বপ্ন দেখেছো? তিনি আরো বলতেন, আমার পরবর্তিতে নবুওয়াত বাকী থাকবে না তবে ভাল স্বপ্ন বাকী থাকবে।[৯৩]

ফায়দা : নবী কারীম সা.-এর পবিত্র অভ্যাস ছিলো, তিনি ফজরের নামায জামাআতে আদায় করার পর মানুষদের মুখোমুখি হয়ে বসে স্বপ্নের কথা জিজ্ঞাসা করতেন। কখনো সাহাবায়ে কিরাম স্বপ্নের কথা বর্ণনা করতেন। কখনো নবী সা. নিজের দেখা স্বপ্নের কথা সাহাবায়ে কিরামকে শোনাতেন।

ফজরের পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া

হযরত সামুরা রা. বলেন, রাসূল সা. অনেক সময় সাহাবীগণকে জিজ্ঞেস করতেন, কেউ কি স্বপ্ন দেখেছো? যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা। অর্থাৎ আল্লাহ যাকে স্বপ্ন দেখিয়েছেন সে যেন তার স্বপ্নের কথা বলে। তখন যিনি স্বপ্ন দেখেছেন, তিনি স্বপ্নের কথা বলতেন, আর রাসূল সা. তার ব্যাখ্যা দিতেন।[৯৪]

রাসূল সা.-এর অভ্যাস ছিলো, তিনি ফজরের পর স্বপ্নের কথা জেনে নিতেন এবং তখনই তার ব্যাখ্যা দিতেন।

---

৯১. আবু দাউদ তায়ালিসী : ১/৩৫০।
৯২. সিয়ার : ৪১১; মাজমা : ৬/১৮৩।
৯৩. আবু দাউদ : ৫৮৪।
৯৪. বুখারী, সংক্ষিপ্ত : ২/১০৪৩।

ফজরের পর স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া সুন্নত ও উত্তম। সুতরাং ইমাম বুখারী রহ. সহীহ বুখারীতে একটি অধ্যায় রচনা করেছেন—

تَعْبِيْرُ الرُّؤْيَا بَعْدَ صَلٰوةِ الصُّبْحِ.

আল্লামা আইনী রহ. উমদাতুল কারীতে এবং হাফেয ইবনে হাজার রহ. ফাতহুল বারীতে লিখেছেন, সূর্যোদয়ের পূর্বে স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া মুস্তাহাব। ফজরের নামাযের সময় স্বপ্ন ও তার ব্যাখ্যা দেওয়া এজন্য উত্তম, রাত নিকটতর হওয়ার দরুণ স্বপ্ন স্মৃতিতে তাজা থাকে, সংরক্ষিত থাকে। পুরো স্বপ্ন বা তার কোনো অংশই ছুটে যায় না। এ ছাড়াও আরো কিছু উপকার রয়েছে।

প্রথম ব্যাখ্যাই ধর্তব্য

হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, যে প্রথম ব্যাখ্যা দেবে তার ব্যাখ্যাই কার্যকর হবে।[৯৫]

ফায়দা : যার কাছে সর্বপ্রথম স্বপ্নের কথা বলা হয় এবং ব্যাখ্যা নেওয়া হয় তার ব্যাখ্যাই অধিক গ্রহণযোগ্য। এজন্য হুকুম হলো, যার তার কাছে স্বপ্নের কথা না বলা। হাফেয ইবনে হাজার রহ. উল্লেখ করেছেন, মুসনাদে আব্দুর রায্যাক কিতাবে হযরত আবু কিলাবাহ রহ.-এর একটি মন্তব্য বর্ণিত আছে। তিনি বলেছেন- 'যেমন ব্যাখ্যা দেওয়া হবে তেমনই ঘটবে'।[৯৬]

স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়ার সময় কী পড়বে?

হযরত যাহহাক জুহানী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. স্বপ্ন শোনার সময় পড়তেন—

خَيْرًا تَلْقَاهُ وَشَرًّا تَوَقَّاهُ، وَخَيْرٌ لَنَا وَشَرٌّ لِأَعْدَائِنَا، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

তোমাদের কল্যাণ হোক। অকল্যাণ থেকে বেঁচে থাক। কল্যাণ আমাদের জন্য। অকল্যাণ আমাদের শত্রুদের জন্য। সকল প্রশংসা আল্লাহ তাআলার; যিনি জগতসমূহের প্রতিপালক।[৯৭]

মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের একটি অংশ

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, আমি রাসূল সা.-কে এ কথা বলতে শুনেছি, ভালো স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।[৯৮]

---

৯৫. ইবনে মাজাহ : ২৭৯।
৯৬. ফতহুল বারী : ১২/৪৩২।
৯৭. সিয়ার : ৭/৪১১।
৯৮. বুখারী শরীফ : ৩/১০৫৩।

হযরত আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশতম অংশ।[৯৯]

ফায়দা : খাত্তাবী রহ.-এর সূত্রে হাফেয ইবনে হাজার রহ. বর্ণনা করেন, ভালো স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের অংশ এভাবে যে, রাসূল সা. নবুওয়াতের পূর্বে ছয় মাস পর্যন্ত সুস্বপ্ন দেখতেন। এরপর ওহীর ধারা শুরু হয়। যা ২৩ বছর পর্যন্ত অব্যাহত ছিলো। আর প্রতিটি বছরকে ছয় মাস হিসেবে ভাগ করলে দুই অংশ হয়। সুতরাং ২৩ বছরে মোট ৪৬ অংশ। এ হিসাবে ছয় মাস যা ছিলো সুস্বপ্ন ও ভালো স্বপ্ন দেখার যুগ; তা নবুওয়াতের ৪৬ অংশে যুক্ত হলো। কেউ কেউ বলেন, আমাদের এ গূঢ় তত্ত্ব ও বাস্তবতা জানা নেই। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সা.-ই ভালো জানেন।

সুস্বপ্ন মুমিনের জন্য সুসংবাদ

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী করীম সা. বলেন, নবুওয়াতের ধারা থেকে এখন সুসংবাদ ছাড়া অন্য কিছু বাকি নেই। প্রশ্ন করা হলো, সুসংবাদ কী? রাসূল সা. বললেন, সুস্বপ্ন।[১০০]

হযরত ইবনে উমর রা. কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, রেসালাত ও নবুওয়াতের সমাপ্তি ঘটেছে। আমার পরে না কোনো নবী আছে, আর না কোনো রাসূল। তবে সুসংবাদ রয়েছে। জিজ্ঞাসা করা হলো, সেই সুসংবাদ কী? তিনি বললেন, সুস্বপ্ন যা মুমিন দেখে বা তাকে দেখানো হয়।[১০১]

উবাদা ইবনে সামিত রা. কর্তৃক বর্ণিত। তিনি রাসূল সা.-কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তাআলার বাণী : لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (পার্থিব জীবনে রয়েছে তাদের জন্য সুসংবাদ) এর উদ্দেশ্য কী? রাসূল সা. বললেন, তা হলো সুস্বপ্ন যা মুমিন দেখে বা তাকে দেখানো হয়।[১০২]

হযরত আবু দারদা রা. কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন : সুস্বপ্ন মুমিনের জন্য দুনিয়াতে সুসংবাদ স্বরূপ।[১০৩]

ওহী বন্ধ ও স্বপ্ন অব্যাহত থাকার উদ্দেশ্য সম্পর্কে হাফেয ইবনে হাজার বলেন– রাসূল সা.-এর তিরোধানের পর অহীর ধারা (যার মাধ্যমে ভবিষ্যতে

---

৯৯. বুখারী শরীফ : ২/১০৩৫।
১০০. বুখারী শরীফ : ২/১০৩৫।
১০১. তিরমিযী : ২/৫১।
১০২. ইবনে মাজাহ : ২৭৮।
১০৩. তাবারানী, কানযুল উম্মাল : ১৫/৩৯৩।

ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যায়।) চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। তবে সুস্বপ্ন দ্বারা ভবিষ্যতে ঘটিতব্য বিষয় সম্পর্কে অবগত হওয়া যাবে। এ পথ এখনও বাকী আছে।

ভাল স্বপ্ন দেখলে কী করবে?

আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, যদি তোমাদের মধ্য থেকে কেউ সুন্দর স্বপ্ন দেখ, তাহলে সেটা আল্লাহর পক্ষ থেকেই। সুতরাং এর জন্য আলহামদু লিল্লাহ বলবে এবং স্বপ্নটি বর্ণনা করবে।[১০৪]

অর্থাৎ এ নেয়ামতের শুকরিয়া আদায় করবে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে নবুওয়াতের একটি কল্যাণ দিয়ে ধন্য করেছেন। হযরত আবু কাতাদাহ রা. বলেন, আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, স্বপ্ন তিন প্রকার :

ক. মন ও মস্তিষ্কের কথা। এর কোনো বাস্তবতা (ব্যাখ্যা) নেই।

খ. যেটা শয়তানের পক্ষ থেকে হবে। খারাপ স্বপ্ন দেখলে তখন শয়তান থেকে আশ্রয় কামনা করবে এবং বাম দিকে থু থু ফেলবে। এরপর কোনো ক্ষতি হবে না।

গ. যা আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ হবে; মুমিনের স্বপ্ন নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ। এটি কোনো হিতৈষী হিতাকাঙ্ক্ষীর নিকট বর্ণনা করবে। যিনি এর সুন্দর ব্যাখ্যা দেবেন এবং ভালো কথা বলবেন।[১০৫]

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, স্বপ্ন তিন প্রকার : ১. আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ ২. কাল্পনিক কথাবার্তা ৩. শয়তানের পক্ষ থেকে ভীতিপ্রদ স্বপ্ন।[১০৬]

হযরত আউফ ইবনে মালিক রা. রাসূল সা. থেকে বর্ণনা করে বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, স্বপ্ন তিন ধরনের হয় : ১. কিছু হলো শয়তানের পক্ষ থেকে মানুষকে ভীতসন্ত্রস্ত করার জন্য আসে। যার মাধ্যমে সে মানুষকে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ করে। ২. কিছু হলো, যা মানুষ জাগ্রত অবস্থায় কল্পনা করে ও ভাবে। ৩. আর কিছু হলো, নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের একভাগ অর্থাৎ সত্য স্বপ্ন, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে।[১০৭]

---

১০৪. বুখারী শরীফ : ১০৪৩।

১০৫. আবু ইসহাক, সীরাত ৭/৪০৭।

১০৬. ইবনে মাজাহ : ২৭৯।

১০৭. ইবনে মাজাহ : ২৭৯।

ফায়দা : অনেক সময় মানুষ জাগ্রত অবস্থায় যা করে বা যা ভাবে সেগুলোও স্বপ্নে এসে যায়। এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। এগুলো কল্পনার-ই প্রতিচ্ছবি। অতএব ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে এ দিকটি অবশ্যই খেয়াল রাখা চাই যে, স্বপ্নটি কোন ধরনের স্বপ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত? কেবল এক প্রকার স্বপ্নের কিছু ব্যাখ্যা হতে পারে। যাকে সুসংবাদ নামে অভিহিত করা হয়েছে। কুরআন শরীফে لَهُمُ الْبُشْرٰى বলে সেদিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। এটিই হলো নবুওয়াতের ছেচল্লিশ ভাগের এক ভাগ।

ফায়দা : হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, স্বপ্ন বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। হাদীসের মধ্যে যে তিন প্রকারের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তা সীমাবদ্ধকরণের জন্য নয়, বরং এর বাইরে স্বপ্নের আরো প্রকার রয়েছে। যেমন, জাগ্রত বিষয়ের কথা হুবহু স্বপ্নে দেখা। যেমন, কারো অভ্যাস হলো নির্ধারিত সময়ে খাবার গ্রহণ করা; সুতরাং সে সময়ে-ই সে স্বপ্নে খাবার খেতে দেখছে।

শয়তানের স্বপ্ন

হযরত আবু কাতাদাহ রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে হয়।

ফায়দা : শয়তান মানুষকে পেরেশান করার জন্য এবং অস্থিরতায় ফেলার জন্য ভীতিকর স্বপ্ন দেখায়।

খারাপ স্বপ্নের কথা কাউকে বলবে না

হযরত আবু কাতাদাহ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, যদি তোমাদের কেউ ভালো স্বপ্ন দেখে তাহলে সে যেন তা হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ছাড়া কাউকে না বলে। আর যখন খারাপ স্বপ্ন দেখবে তখন কাউকে বলবে না। তাহলে কোনো ক্ষতি হবে না।[১০৮]

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, খারাপ স্বপ্ন দেখলে মনে করবে এটি শয়তানের পক্ষ থেকে। তার অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় কামনা করো। কাউকে এ স্বপ্নের কথা বলবে না, তাহলে কোনো সমস্যা হবে না।[১০৯]

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি রাসূল সা.-এর খেদমতে হাজির হয়ে বললো, আমি স্বপ্ন দেখেছি যেন আমার মাথা কেটে গেছে। রাসূল

---

১০৮. বুখারী শরীফ : ২/১০৪৩।

১০৯. বুখারী শরীফ : ২/১০৪৩।

সা. হাসতে লাগলেন এবং বললেন, শয়তান যখন তোমার সাথে খেলা করে তা কাউকে বলো না।[১১০]

ফায়দা : যে স্বপ্ন মনগড়া বা কল্পিত অর্থাৎ শয়তানের পক্ষ থেকে পেরেশান করার জন্য হয়ে থাকে তার কোনো ব্যাখ্যা নেই। হয়ত রাসূল সা. অহীর মাধ্যমে জানতে পেরেছেন যে, এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। ব্যাখ্যাকারীগণ এমন স্বপ্নের ব্যাখ্যা রাজত্ব বা নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়ার দ্বারা দিয়ে থাকেন।[১১১]

খারাপ স্বপ্ন দেখলে কী করবে?

হযরত আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যখন তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখে তখন সে যেন বামপার্শ্বে কাত হয়ে যায়। আল্লাহর নিকট কল্যাণ কামনা করে। আর এর অনিষ্ট থেকে মুক্তি চায়।[১১২]

হযরত জাবের রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ খারাপ স্বপ্ন দেখো তখন বাম দিকে থু থু ফেলবে এবং শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ [আউযুবিল্লাহি মিনাশ্-শায়ত্বনির রাজীম] পড়ে পার্শ্ব পরিবর্তন করবে।[১১৩]

হযরত জাবের রা. কর্তৃক ইবনে মাজাহর উল্লিখিত বর্ণনায় ৩ বার থুথু ফেলার কথা রয়েছে। হযরত আবু কাতাদা রা. থেকে বর্ণিত বর্ণনায় আছে যে, রাসূল সা. বলেছেন, ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর খারাপ স্বপ্ন দেখলে বিতাড়িত শয়তান থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবে। أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পড়বে এবং প্বার্শ পরিবর্তন করে শোবে।[১১৪]

স্বপ্নের দরুন অসুস্থ

হযরত আনাস রা. বলেন, এক ব্যক্তি রাসূল সা.-এর দরবারে এসে বললো, আমি এমন ভয়ংকর স্বপ্ন দেখি যে, অসুস্থ হয়ে পড়ি। রাসূল সা. বললেন, ভালো স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয় আর খারাপ স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ থেকে। যদি তোমাদের কেউ এমন স্বপ্ন দেখে তবে বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে আউযুবিল্লাহি মিনাশ শায়ত্বনির রাজীম পড়বে। তাহলে আর কোনো ক্ষতি হবে না।[১১৫]

---

১১০. মিশকাত শরীফ : ৩৯৫।
১১১. তিবী, মিশকাত শরীফ : ৩৯৫।
১১২. ইবনে মাজাহ : ২৭৯, সীরাত : ৩৪০৮।
১১৩. আবু দাউদ শরীফ : ৬০৫।
১১৪. ইবনে মাজাহ : ২৭৯।
১১৫. মাজমা : ৭/১৭৬।

ফায়দা : উল্লেখিত হাদীস থেকে জানতে পারলাম যে, এমন কিছু শয়তানি স্বপ্ন রয়েছে যার করণে মানুষ অসুস্থ হতে পারে।

ইমাম বুখারী রহ. আবু সালামা রা. এবং আবু কাতাদাহ রা. সম্পর্কে বর্ণনা করেন যে, তাঁরা স্বপ্ন দেখে অসুস্থ হয়ে পড়তেন।[১১৬]

তাই, যদি এ ধরনের স্বপ্ন দেখার পর উল্লেখিত আমল করা হয় তাহলে অনিষ্ট থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে।

ফায়দা : ইমাম বুখারী রহ. ইবনে সীরীন রহ.-এর বর্ণনায় বলেন, যদি খারাপ স্বপ্ন দেখো তাহলে উঠে নামায পড়বে আর তা কাউকে বলবে না।[১১৭]

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, যদি খারাপ স্বপ্ন দেখো তাহলে তার আদব হলো :

১. أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ পড়বে।
২. বাম দিকে থুথু ফেলবে।
৩. কাউকে বলবে না।
৪. পার্শ্ব পরিবর্তন করবে।
৫. উঠে নামায পড়বে।

কেউ কেউ এ সময় আয়াতুল কুরসীও পড়তে বলেছেন।[১১৮]

আল্লামা কুরতুবী রহ. বলেন, খারাপ স্বপ্ন দেখার পর নামায পড়া সকল আদবের সমষ্টি।[১১৯]

ইবরাহীম নাখয়ী রহ. থেকে খারাপ স্বপ্ন দেখার পর এ দোয়া পড়ার কথা বর্ণিত আছে :

أَعُوذُ بِمَا عَاذَتْ بِهِ مَلَائِكَةُ اللهِ وَرُسُلِهِ مِنْ شَرِّ رُؤْيَا هذِهِ أَن يُصِيْبَنِيْ فِيْهَا مَا أَكْرَهُ فِيْ دِيْنِيْ وَ دُنْيَايَ.

'আমি এ স্বপ্নের মাঝে আমার দীন দুনিয়ার কষ্টদায়ক সমূহ বিপদের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। যেভাবে আল্লাহর ফেরেশতা ও তাঁর রাসূল সা. আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।'[১২০]

---

১১৬. বুখারী শরীফ : ২/১০৪৩।
১১৭. বুখারী শরীফ : ২/১০৪৩।
১১৮. ফাতহুল বারী : ১২/৩৭০।
১১৯. ফাতহুল বারী : ৩৭১।
১২০. সাঈদ ইবনে মানসুর, ফাতহ : ১২/৩৭১।

ভোরের স্বপ্ন খুব বেশী সত্য হয়

হযরত আবু সাঈদ রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. বলেন, সকালের স্বপ্ন অধিক সত্য হয়।[১২১]

ফায়দা : হাফেয ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন, সাহরীর সময়ে দেখা স্বপ্নের বাস্তবায়ন দ্রুত প্রতিফলিত হয়। বিশেষ করে সুবহে সাদিকের সময়। এ ছাড়া দুপুরের স্বপ্নের বাস্তবায়নও দ্রুত সংঘটিত হয়।[১২২]

দিন ও রাতে নারীর-পুরুষের স্বপ্নের হুকুম একই।[১২৩]

অর্থাৎ পুরুষের স্বপ্ন যেভাবে সঠিক ও ব্যাখ্যার দাবীদার অনুরূপ নারীরও।

সত্যবাদীর স্বপ্ন সত্য হয়

হযরত আবু হুরায়রা রা. কর্তৃক বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, সত্যবাদী ব্যক্তির স্বপ্ন সত্য হয়।[১২৪]

ফায়দা : মিথ্যাবাদীর স্বপ্নও মিথ্যা হয়। এ দ্বারা প্রত্যেক ব্যক্তি অনুমান করতে পারে তার স্বপ্ন কেমন হবে? বর্তমানে মিথ্যা বলা মহামারীর মতো সর্বত্র বিস্তার ঘটেছে। অনেক সময় মানুষ অহেতুক মিথ্যা বলে। যে যতটুকু সত্যবাদী হবে তার স্বপ্ন ততটুকুই সত্য হবে। এজন্য নবীগণের স্বপ্ন সত্য হতো। যে ব্যক্তি ন্যায় নিষ্ঠায় দুর্বল তাদের অধিকাংশ স্বপ্ন কল্পনাপ্রসূত। সেগুলো খুব কমই সত্য হয়। কাজেই তা ব্যাখ্যার যোগ্য নয়।

স্বপ্ন কার কাছে বলবে?

আবু রাযীন উকাইলী রহ. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, স্বপ্ন নবুওয়াতের ৪৬ ভাগের এক ভাগ। ব্যাখ্যা করার আগ পর্যন্ত স্বপ্ন ঝুলন্ত থাকে। নিজ বন্ধু হিতাকাঙ্ক্ষী বুদ্ধিমান ছাড়া অন্য কাউকে স্বপ্নের কথা বলবে না।

এক বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ পর্যন্ত স্বপ্নের ব্যাখ্যা দেওয়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত তা ঝুলন্ত থাকে। যখন ব্যাখ্যা দেয়া হয় তখন তা প্রতিফলিত হয়ে যায়। স্বপ্নের কথা হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু এবং সিদ্ধান্ত প্রদান করতে পারে এমন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কাউকে না বলা।[১২৫]

---

১২১. তিরমিযি : ১/৩৯৭।
১২২. ফাতহুল বারী : ১২/৩৯০।
১২৩ ফাতহুল বারী : ১২/৩৯২
১২৪. ইবনে মাজাহ : ২৮০; ফাতহুল বারী : ৩৬৩।
১২৫. মিশকাত : ৩৯৬।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, স্বপ্ন কোনো আলেম, বিদ্যান বা হিতাকাঙ্ক্ষী ছাড়া অন্য কাউকে বলবে না।[১২৬]

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, যখন তোমাদের কেউ স্বপ্ন দেখে তখন তা যেন একমাত্র হিতাকাঙ্ক্ষী বা আলিমের কাছে বর্ণনা করে।[১২৭]

ফায়দা : উদ্দেশ্য হলো, যার তার কাছে স্বপ্নের কথা বলা উচিৎ নয়। যাতে অপছন্দনীয় ভুল ব্যাখ্যা না দেয়, বরং কোনো দীনদার ধার্মিক ব্যক্তির সামনে উপস্থাপন করবে এবং তার থেকে ব্যাখ্যা নেবে। অনেক ক্ষেত্রে যা ব্যাখ্যা করা হয় বাস্তবে তাই ঘটে। এ কথাও অধিক মনে রাখা চাই, প্রতিটি স্বপ্নই ব্যাখ্যার উপযুক্ত নয়। কাজেই স্বপ্নের ব্যাখ্যার জন্য পেরেশান হতে হবে এমন নয়।

স্বপ্ন নিজের ভালো বন্ধুকে বলবে

হযরত আবু কাতাদাহ রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, যখন কেউ ভালো স্বপ্ন দেখবে তখন তা নিজের ভালো বন্ধু ছাড়া অন্য কাউকে বলবে না।

ফায়দা : হাফেয ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন, রাসূল সা. বন্ধু ছাড়া অন্য কারো কাছে স্বপ্নের কথা বলতে নিষেধ করেছেন। কারণ হলো, অনেক সময় অন্য কেউ হিংসা ও বিদ্বেষপ্রসূত অকল্যাণকর কোনো ব্যাখ্যা যেন দিয়ে না দেয়। হতে পারে তার বলার কারণে এটাই বাস্তবায়িত হয়ে যাবে।[১২৮]

রাসূল সা. থেকে এ ব্যাপারে অসংখ্য হাদীস বর্ণিত আছে যে, যে কাউকে স্বপ্নের কথা বলবে না, বরং আলেম, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু, বিবেকবান –যিনি রায় দেয়ার ক্ষমতা রাখে– এমন ব্যক্তির কাছে বলবে। হাফেয ইবনে হাজার রহ. লিখেছেন, আলেম যথাসম্ভব ভালো ব্যাখ্যা দেয়ার চেষ্টা করবেন। তিনি কল্যাণের দিক বেছে নেবেন। বন্ধু ভালো মনে করলে ব্যাখ্যা দেবে। কোনো সংশয় সন্দেহ থাকলে চুপ থাকবে।[১২৯]

স্বপ্ন বলার আদব

হাদীস থেকে ভালো স্বপ্ন বর্ণনা করার তিনটি আদব পাওয়া যায় : ১. আল হামদুলিল্লাহ বলবে ২. তা বর্ণনা করবে ৩. এর ব্যাখ্যা কোনো হিতাকাঙ্ক্ষী আলেম থেকে জেনে নেবে (যিনি স্বপ্নের ব্যাখ্যা বিষয়ে অভিজ্ঞ)।[১৩০]

---

১২৬. মাজমাউয যাওয়ায়েদ : ৭/১৮২।
১২৭. কানযুল উম্মাল : ১৯/২৬২।
১২৮. ফাতহুল বারী : ১২/৪৩১।
১২৯. ফাতহুল বারী : ১২/৩৬৯।
১৩০. ফাতহুল বারী। ১২/৩৭০

ব্যাখ্যা প্রতিফলিত হয়

রাসূল সা. হযরত আয়েশা রা.-কে বলেন, যখন তুমি ব্যাখ্যা দেবে তখন ভালো ব্যাখ্যা দাও। ব্যাখ্যাকারীর ব্যাখ্যা অনুযায়ী স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়।[১৩১]

স্বপ্ন ব্যাখ্যার মূলনীতি

ফায়দা : এ হাদীস দ্বারা প্রতীয়মান হলো, না বুঝে ও না ভেবে এবং ব্যাখ্যার করার নীতিমালা জানা ব্যতীত ব্যাখ্যা দেওয়া উচিত নয়। যেহেতু ব্যাখ্যা দেওয়া একটি সূক্ষ্ম বিষয়। যে ব্যক্তি আলেমে রাব্বানী, মুত্তাকী আল্লাহভীরু ইসলামী জ্ঞান বিজ্ঞানে প্রাজ্ঞ, রূহ জগতের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রহস্য সম্পর্কে অবগত, সে ব্যক্তিই ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবে। 'খাসায়েলে নববী' নামক গ্রন্থে আছে, স্বপ্নের ব্যাখ্যা নিয়ে ভাবা চাই। নবী করীম সা. সাহাবীগণ ও তাবেঈগণ থেকে অসংখ্য স্বপ্নের ব্যাখ্যা বর্ণিত রয়েছে। স্বপ্নের ব্যাখ্যাদান শাস্ত্রের উলামা লিখেছেন, ব্যাখ্যা দানকারীর জন্য আবশ্যকীয় হলো, তাকে একজন বোধসম্পন্ন, মুত্তাকী, পরহেযগার এবং কুরআন ও সুন্নাতে রাসূল সা. সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকতে হবে।[১৩২]

নবীজী সা. প্রদত্ত কিছু স্বপ্নের ব্যাখ্যা

চাঁদের ব্যাখ্যা

হযরত আবু বকর রা. বলেন, রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে কেউ কি স্বপ্ন দেখেছো? তখন হযরত আয়েশা রা. বললেন, আমি দেখতে পেলাম, তিনটি চাঁদ আমাদের ঘরে পড়েছে। রাসূল সা. বললেন, যদি তোমার স্বপ্ন সত্য হয় তাহলে আমার মতে এ ঘরে সর্বোত্তম তিন জান্নাতী সমাহিত হবেন। ইতিহাস বলে রাসূল সা., আবু বকর রা. ও হযরত উমর রা. ওই ঘরে সমাহিত হয়েছেন।[১৩৩]

দুধ পান করার ব্যাখ্যা

হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. একটি স্বপ্ন বর্ণনা করলেন যে, আমার সামনে দুধ আনা হলো। আমি তা পান করলাম। তা পান করে এতটাই তৃপ্ত হলাম যে, আমি দেখলাম অধিক তৃপ্তির কারণে আঙ্গুলের মাথা দিয়ে দুধ বের হচ্ছে। এরপর অবশিষ্টটুকু উমরকে দিলাম। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কী ব্যাখ্যা করেছেন? রাসূল সা. বললেন, এর ব্যাখ্যা হলো ইলম।[১৩৪]

---

১৩১. ফাতহুল বারী : ১২/৪৩২।
১৩২. ফাতহুল বারী : ১২/৩৯২।
১৩৩. মাজমাউয যাওয়াইদ : ৭/১৮৫।
১৩৪. বুখারী শরীফ : ২/১০৩৭।

ফায়দা : হাফেয ইবনে হাজার রহ. লেখেন, দুধের ব্যাখ্যা হলো, কুরআন ও সুন্নতের ইলম। সুতরাং যে ব্যক্তি যতটুকু দুধ পান করতে দেখবে ঐ ব্যক্তি ততটুকু ইলম দ্বারা উপকৃত হবে। ছাগলের দুধ পূর্ণ সুস্থতা ও খুশীর প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। গরুর দুধ দেশের সুখ-সমৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। তবে হিংস্রপশুর দুধ দেখা ভাল না।[১৩৫]

ফুঁ মেরে উড়িয়ে দেওয়ার ব্যাখ্যা

হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. নিজ স্বপ্নের কথা বর্ণনা করে বলেন, আমি (একবার) শুয়ে ছিলাম। তখন দেখলাম, আমার হাতে সোনার কঙ্কন রেখে দেয়া হয়েছে যা আমাকে অস্থির করে। আমাকে চিন্তায় ফেলে দেয়। স্বপ্নেই আমাকে বলা হলো, আমি যেন ওটাতে ফুঁ দিই। সুতরাং আমি ফুঁ দিলাম, (তখন দুটুই উড়ে গেল)। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, দুইজন মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদারের আত্মপ্রকাশ হবে। একজন আসওয়াদ আনাসী। যাকে ইয়ামানে ফায়রুজ হত্যা করেছে। আর অপরজন হলো, মুসাইলামাতুল কায্যাব। যাকে ইকরামা রা. জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন।[১৩৬]

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বলেন, স্বপ্নে যে ব্যক্তি দেখতে পেলো যে, সে উড়ছে। যদি সিঁড়ি ছাড়া আকাশ পানে হয় তাহলে ক্ষতির দিকে ইঙ্গিত করছে। আর যদি দেখে আকাশে উড়ে অদৃশ্য হয়ে গেছে তাহলে মৃত্যুর দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। যদি ফিরে আসে তাহলে সুস্থতার প্রতি ইঙ্গিত বহন করে। আর যদি চৌরাস্তায় উড়তে দেখে তাহলে এটা ভ্রমণের প্রতি ঈঙ্গিত করে।[১৩৭]

মধু ও ঘি-এর ব্যাখ্যা

হযরত ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত, তিনি স্বপ্নে দেখলেন, তাঁর এক আঙ্গুলে মধু আর অন্য আঙ্গুলে ঘি। তিনি দুটোই চাটছেন। রাসূল সা. এর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বললেন, যদি বেঁচে থাক তাহলে দুটি কিতাব তথা তাওরাত ও কুরআন পড়বে। অর্থাৎ এ দুটি কিতাবের আলেম হবে। ইতিহাস বলে, তিনি উভয় কিতাবেরই আলেম হয়েছিলেন।

ফায়দা : মধু ও ঘি-এর ব্যাখ্যা হলো ইলম ও কল্যাণ।[১৩৮]

---

১৩৫. ফতহুল বারী : ১২/৩৯৩।

১৩৬. বুখারী শরীফ: ২/১০৪১।

১৩৭. ফাতহুল বারী : ১২/৪৩০।

১৩৮. আবু ইয়ালা, সীরাত : ৭/৪১০।

মাথা কাটার ব্যাখ্যা

আবু মাজলাদ রহ. বলেন, একলোক রাসূল সা.-এর দরবারে এসে বললেন, আমি স্বপ্নে দেখি যে, আমার মাথা কেটে ফেলা হয়েছে। আর আমি তা দেখছিলাম। রাসূল সা. মুচকি হেসে বললেন, যখন তোমার মাথা কেটে দেয়া হলো তখন তুমি কোন চোখ দিয়ে দেখছিলে? এর কিছুদিন পরই লোকটির ইন্তেকাল হয়ে গেল। এখানে মাথা কাটার ব্যাখ্যা তার মৃত্যু দ্বারা আর দেখার ব্যাখ্যা সুন্নাতের অনুসরণ দ্বারা দিয়েছেন।[১৩৯]

স্বপ্ন যেন বাস্তব

হযরত খুযাইমা ইবনে সাবিত রা. স্বপ্নে দেখলেন, তিনি রাসূল সা.-এর কপালে সিজদা করছেন। তখন তিনি রাসূল সা.-এর কাছে একথা আলোচনা করলেন। স্বপ্ন শুনে রাসূল সা. শুয়ে পড়লেন, তখন হযরত খুযাইমা রা. তাঁর কপালে সিজদা করলেন।[১৪০]

ফায়দা : রাসূল সা. স্বপ্নকে বাস্তবে উপস্থাপন করলেন। যদ্বারা স্বপ্ন সত্য হওয়া পরিষ্কার হলো। মোল্লা আলী কারী রহ. এ হাদীস থেকে এ মূলনীতিটি বের করেছেন যে, স্বপ্নে ভালো কোনো কিছু করতে দেখলে জাগ্রত হয়ে সে কাজ করে নেওয়া মুস্তাহাব। [১৪১]

সাদা পোশাকের ব্যাখ্যা

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, একদিন হযরত খাদিজা রা. রাসূল সা.-এর কাছে ওরাকা ইবনে নওফেল সম্পর্কে জানাতে চাইলেন। হযরত খাজীদা রা. বললেন, সে তো আপনাকে সত্যায়ন করেছিলো, কিন্তু নবুওয়াত প্রকাশ হওয়ার পূর্বেই তার ইন্তেকাল হয়ে গেছে। রাসূল সা. বললেন, যখন আমাকে স্বপ্নে দেখানো হলো, তখন তার ওপর সাদা পোশাক ছিলো। যদি সে জাহান্নামী হত তাহলে তার পোশাক ভিন্ন হত।[১৪২]

সাদা পোশাক পরিহিত হওয়ার দরুন রাসূল সা. তাকে নাজাতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয়, সাদা পোশাকে দেখতে পেলে তা মুক্তিপ্রাপ্তদের নিদর্শন বলে গণ্য হবে।

---

১৩৯. সীরাত : ৭/৪১৭।

১৪০. মাজমাউয যাওয়াইদ : ১/১৮২।

১৪১. মিরকাত শরহে মিশকাত : ৪/৫৫০।

১৪২. মিশকাত : ৩৯৬।

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের ব্যাখ্যা

হযরত উম্মুল ফযল রা. বলেন, আমি রাসূল সা.-এর কাছে বর্ণনা করলাম যে, আমি ঘরে রাসূল সা.-এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গসমূহ থেকে কোনো অঙ্গ দেখলাম। রাসূল সা. বললেন, ভালো স্বপ্ন দেখেছ। ফাতেমার সন্তানগণকে তুমি দুধ পান করাবে।[১৪৩]

অঙ্গ দ্বারা ইঙ্গিত হলো, সন্তানের দিকে। ঘরে দেখার অর্থ হলো, তোমাদের ঘরে তার অবস্থান হবে। প্রকাশ থাকে যে, বাচ্চার লালন-পালন ও দুধ পানের জন্যই এ পন্থা অনুসৃত হয়ে থাকে।

কয়েকটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা

হাফেয ইবনে হাজার রহ. বুখারীর ব্যাখ্যা গ্রন্থে হাদীস থেকে নির্বাচিত কয়েকটি স্বপ্নের ব্যাখ্যা উল্লেখ করেছেন। আমরা সেখান থেকে কয়েকটি ব্যাখ্যা বর্ণনা করছি :

১. স্বপ্নে প্রাসাদ দেখা। দীনদার ব্যক্তি দেখলে কল্যাণকর কাজের প্রতি ইঙ্গিতবহ। অধার্মিক দেখলে বন্দিত্ব ও অভাব গ্রস্থতার ইঙ্গিতবহ। প্রাসাদে প্রবেশ হতে দেখলে এটি বিবাহের ইঙ্গিত।[১৪৪]

২. স্বপ্নে অযু করতে দেখা, কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ সমাধা হওয়ার প্রতি ইঙ্গিত। অযু পূর্ণ করলে সে কাজ সমাপ্ত। আর যদি অসম্পূর্ণ ছেড়ে দিতে দেখে তাহলে সে কাজ অসম্পূর্ণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

৩. স্বপ্নে কাবা শরীফ তাওয়াফ করতে দেখা, হজ্ব ও বিবাহের প্রতি ইঙ্গিতবহন করে।[১৪৫]

৪. পিয়ালা দেখা, মহিলা বা মহিলার পক্ষ থেকে সম্পদ প্রাপ্তির প্রতি ইঙ্গিত করে।[১৪৬]

৫. স্বপ্নে যে ব্যক্তি বড় তরবারি দেখবে, আশংকা আছে যে, সে কোনো ঝামেলায় আক্রান্ত হবে। তলোয়ার পাওয়ার দ্বারা ইঙ্গিত হলো, রাষ্ট্রীয় কোনো দায়িত্ব বা ক্ষমতা বা উচ্চপদস্থ কোনো দায়িত্ব লাভের প্রতি। তরবারি কোষবদ্ধ করা বিবাহের প্রতি ইঙ্গিত।[১৪৭]

---

১৪৩. ইবনে মাজাহ : ২৮০।
১৪৪. ফাতহুল বারী : ১২/৪১৬।
১৪৫. ফাতহুল বারী : ১২/৪১৭।
১৪৬. ফাতহুল বারী : ১২/৪২০।
১৪৭. ফাতহুল বারী : ১২/৪২৭।

৬. স্বপ্নে পোশাক পরা, দীনের প্রতি ইঙ্গিত। জামা যে পরিমাণ বড় ও লম্বা দেখবে সে পরিমাণ দীন ও নেক আমলের আধিক্যের প্রতি ইঙ্গিত হবে।[১৪৮]

৭. বাগ-বাগিচার ব্যাখ্যা, দীন ইসলামের প্রতি, আর কখনো শষ্য-শ্যামল বাগানের ব্যাখ্যা ইলমী কিতাবের ইঙ্গিতবহন করে।[১৪৯]

৮. মহিলাদের দেখা দীন পাওয়া এবং কখনো রিযিকের প্রশস্ততার প্রতি ইঙ্গিত হয়ে থাকে।[১৫০]

অনেক সময় নারীদের দেখা, কামভাব চরিতার্থ করা এগুলো শয়তানের পক্ষ থেকে দেখানো হয়। এর কোনো ব্যাখ্যা নেই। যেমনটি সাধারণত কিশোর-যুবকদের হয়ে থাকে।

রাসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখার কথা

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল, সে যেন আমাকে-ই দেখল। শয়তান আমার আকৃতি বা রূপ ধারণ করতে পারে না।

হযরত আবু কাতাদাহ রা. বলেন, রাসূল সা. বলেছেন, যে ব্যক্তি আমাকে স্বপ্নে দেখল সে যেন সত্যিকার অর্থে সজাগ অবস্থায় আমাকেই দেখল।[১৫১]

আবু বকর ইস্পাহানী রহ. বর্ণনা করেন, সাদ ইবনে কায়েস রহ. তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণনা করেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি রূহসমূহের মধ্য হতে মুহাম্মদ সা.-এর রূহের ওপর, শরীরসমূহের মধ্য হতে মুহাম্মদ সা.-এর শরীরের ওপর, কবরসমূহের মধ্য হতে রাসূল সা.-এর কবরে দরূদ পড়বে সে আমাকে স্বপ্নে দেখবে। আর যে আমাকে স্বপ্নে দেখবে কিয়ামতের দিন সে আমাকে দেখবে। আর কিয়ামতের দিন যে আমাকে দেখবে আমি তার জন্য সুপারিশ করবো। আর আমি যার জন্য সুপারিশ করবো সে আমার হাউজে কাউসার থেকে পানি পান করবে। আল্লাহ জাল্লা শানুহু তার শরীরকে জাহান্নামের জন্য হারাম করে দেবেন।[১৫২]

ফায়দা : রাসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখা খুবই বরকতময় বিষয়। প্রত্যেক মুমিন বান্দা মনের মাঝে এই গুরুত্বপূর্ণ কর্মটির আগ্রহ লালন করে থাকে। এমন কত

---

১৪৮. ফাতহুল বারী : ১২/৩৯৫।

১৪৯. ফাতহুল বারী : ১২/৩৯৭।

১৫০. ফাতহুল বারী : ১২/৪০০।

১৫১.দারেমী ও কানযুল উম্মাল: ১৯/২৭৪।

১৫২. আল কাউলুল বাদী', ইমাম সাখাবী: ৪২।

বান্দা রয়েছে যারা নবী সা.-কে স্বপ্নে দেখার আশা নিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন। কিন্তু তাদের এই নেয়ামত অর্জিত হয়নি। স্মর্তব্য যে, স্বপ্নে রাসূল সা.-এর সাক্ষাত হওয়া অবশ্যই ভালো, ঈর্ষণীয় ও প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু স্বপ্নে সাক্ষাত না হওয়ার মানে এই নয় যে, এটা দীনের ক্ষতি ও সমস্যার কারণ।

হাদীসে বর্ণিত অবয়বে রাসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখলে তো সে সরাসারি রাসূল সা.-কে-ই দেখল। আর যদি সামান্য পরিবর্তনসহ দেখতে পায় তাহলে এটা রাসূল সা.-এর সঙ্গে ওই ব্যক্তির সাদৃশ্যতার পরিমাণের ওপর নির্ভর করে হয়েছে। এ ধরনের স্বপ্নকে কল্পনাপ্রসূত মনে করে ঘাবড়ানো উচিত হবে না।[১৫৩]

যদি এমন অবস্থায় দেখে যা রাসূল সা.-এর বিপরীত ছিলো তাহলে এটা স্বপ্ন দেখা ব্যক্তির ঈমানের দুর্বলতা। যেমন সুন্নাত বিরোধী পোশাকে দেখল। আল্লামা তীবী রহ. বলেন, রাসূল সা.-কে যে অবস্থায়-ই দেখুক না কেনো স্বপ্নটা সুসংবাদের উপযুক্ত।[১৫৪]

যদি সে রাসূল সা.-কে সুন্নাত ও শরীয়তবিরোধী কোনো হুকুম করতে দেখে তাহলে তা স্বপ্ন দেখা ব্যক্তির সমস্যা। আর স্বপ্নের হুকুম বা নির্দেশ শরীয়তের বাহ্যিক মূলনীতির আলোকে সেটা সুন্নাত বা শরীয়ত বিরোধী বলে গণ্য হবে। যেমন, কেউ দেখলো, নবীজি নির্দেশ করছেন- কোর্ট টাই পরতে, অমুককে হত্যা করতে বা মদপান করতে, তাহলে এর ওপর আমল করা বৈধ হবে না। এগুলো মূলত কল্পনার আয়না বা প্রতিচ্ছবি।[১৫৫] যা তার সামনে ভেসে উঠেছে।[১৫৬]

তেমনিভাবে স্বপ্নের দ্বারা শরীয়তের বিধি-বিধান প্রমাণিত হয় না।

মুনাবী রহ. বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি রাসূল সা.-কে কোনো অপরিচিত গুণে দেখেছে রাসূল সা.-কে-ই দেখেছ।[১৫৭]

কোনো কোনো আলিমের মত হলো, যে ব্যক্তি রাসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখেছে মৃত্যুর পর রাসূল সা. তাকে বিশেষ সাক্ষাত দিয়ে ধন্য করবেন।[১৫৮]

মোল্লা আলী কারী রহ. বর্ণনা করেছেন, যে ব্যক্তি রাসূল সা.-কে মুচকি হাসতে দেখবে তার সুন্নত অনুযায়ী চলার তাওফীক হবে।[১৫৯]

---

১৫৩. ফাতহুল বারী : ১২/৩৮৬।
১৫৪. ফাতহুল বারী : ৩৮৮।
১৫৫. ফাতহুল বারী : ২৮৬।
১৫৬. ফাতহুল বারী : ১২/৩৮৮।
১৫৭. ফাতহুল বারী : ১২/২৩।
১৫৮. ফাতহুল বারী : ১২/৩৮৫।
১৫৯. জামউল ফাওয়ায়েদ : ২৩২।

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, যে ব্যক্তি স্বপ্নে আমাকে দেখল সত্যিকার অর্থে সে আমাকে-ই দেখল। কেননা শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।[১৬০]

ফায়দা : আল্লাহ তাআলা যেমনিভাবে রাসূল সা.-কে জীবিত অবস্থায় শয়তানের প্রভাব থেকে মুক্ত রেখেছিলেন তদ্রূপ তাঁর মৃত্যুর পরও শয়তানকে রাসূল সা.-এর আকৃতি ধারণের ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত করেছেন।

হযরত কুলাইব রহ. বলেন, আমাকে হযরত আবু হুরায়রা রা. রাসূল সা.-এর বাণী শুনিয়েছেন, যে আমাকে স্বপ্নে দেখল সে বাস্তবে আমাকেই দেখল। কারণ, শয়তান আমার আকৃতি ধারণ করতে পারে না।

কুলাইব রহ. বলেন, আমি এ হাদীস হযরত ইবনে আব্বাস রা.-কে শোনালাম, এও বললাম, স্বপ্নে আমি রাসূল সা.-এর দীদার লাভ করেছি। সে সময় হযরত হাসান রা.-এর কথা মনে পড়ল। আমি ইবনে আব্বাসকে বললাম, আমি স্বপ্নের আকৃতি হযরত হাসান রা.-এর সাথে অনেকটা মিল পেয়েছি। এ কথাকে হযরত ইবনে আব্বাস রা. সত্যায়ন করলেন যে, বাস্তবেই হযরত হাসান রা. রাসূল সা.-এর সাথে বেশ মিল ছিলেন।[১৬১]

আল্লামা মুনাবী রহ. উল্লেখ করেন, শয়তান হযরত আম্বিয়া আ. ও ফেরেশতাগণের আকৃতি ধারণ করতে পারে না।[১৬২]

ফায়দা : কোনো কোনো বর্ণনায় এসেছে, রাসূল সা.-এর সীনা ও তার ওপরের অংশ হযরত হাসান রা.-এর সদৃশ্য ছিলো। আর শরীরের নিচের অংশ হযরত হুসাইন রা.-এর সঙ্গে বেশ মিল ছিলো।[১৬৩]

সম্মতি লাভের কিছু উপকারীতা ও ব্যাখ্যা

যে ব্যক্তি রাসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখল, এটা তার জন্য এটা সফলতা ও পূর্ণ দীনদারিত্বের আলামত। রাসূলুল্লাহ সা.-কে স্বপ্নে দেখা সংশোধন, আল্লাহভীতি, পূর্ণ মর্যাদা ও সফলতার আলামত।[১৬৪]

যে ব্যক্তি রাসূল সা.-কে স্বপ্নে হাসতে দেখেছে সে রাসূল সা.-এর সুন্নতের অনুসরণ করা এবং সুন্নত যিন্দা করার ইত্যকার অত্যন্ত মূল্যবান

---

১৬০. শামায়েলে তিরমিযী : ৩০।

১৬১. ফাতহুল বারী : ১২/৩৮৯

১৬২. জামউল ফাওয়ায়েদ : ২৩২।

১৬৩. খাসায়েল : ৩৮৮

১৬৪. ফাতহুল বারী : ১২/৩৮৭

সম্পদ পাবে। যে ব্যক্তি রাসূল সা.কে ক্রুদ্ধ ও রাগান্বিত অবস্থায় দেখবে তার দীনদারীতে ক্ষতি হচ্ছে অথবা এটা তার দীনদারীত্ব ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার নিদর্শন।[১৬৫] اَللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْهُ. হে আল্লাহ! আপনি আমাদেরকে দীনি বিষয়ে গাফলতী করা থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

রাসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখার ব্যাখ্যা হলো, ইসলামের ওপর মৃত্যুবরণ ও পরকালে তাঁর সাক্ষাত লাভের নিদর্শন।[১৬৬]

যে ব্যক্তি রাসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখবে মৃত্যুর পর সে রাসূল সা.-এর সাথে বিশেষ সাক্ষাতের সৌভাগ্য লাভ করবে।[১৬৭]

রাসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখা কিয়ামত দিবসে তাঁর শাফায়াত ও সুপারিশ লাভের নিদর্শন।[১৬৮]

ইবনে সীরীন রহ. বলেন, যদি ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি রাসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখে তাহলে তার ঋণ পরিশোধ হবে। অসুস্থ ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলে সুস্থ হবে। আর যদি জুলুম নির্যাতনের শিকার হচ্ছে এমন জায়গায় দেখে তাহলে আদল-ইনসাফ ও ন্যায়পরায়ণতার যুগ আসবে। যদি জান্নাতে অবস্থানরত দেখে তাহলে এটি বিজয় লাভের নিদর্শন।

স্বপ্নে রাসূল সা.-এর দীদার লাভের পন্থা

শাহ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলবী রহ. তারগীবে আহলিস সাআদায় লেখেন, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাতে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। প্রতি রাকাতে ১১ বার আয়াতুল কুরসী এবং ১১ বার সূরা ইখলাস পড়বে। সালামের পর ১০০ বার দরূদ শরীফ পড়বে। ইনশাআল্লাহ তিন শুক্রবার অতিবাহিত হতে না হতেই দীদার লাভ হবে। দরূদ শরীফটি হলো,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ وَ اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَسَلِّمْ

শায়েখ আরো লেখেন, যে ব্যক্তি দু'রাকাত নামায পড়বে আর প্রতি রাকাতে সূরা ফাতিহার পর ২৫ বার সূরা ইখলাস এবং সালামের পর দরূদ শরীফ এক হাজার বার পড়বে, তার দীদার লাভ হবে। দরূদ শরীফটি হলো,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ

---

১৬৫. জামাউল ফাওয়ায়েদ : ২৩২

১৬৬. প্রাগুক্ত।

১৬৭. ফাতহুল বারী : ১২/৩৮৫, মুন্তাখাবুল কালাম : ১/৫৭।

১৬৮. আল কাউলুল বাদী, সাখাবী : ৪৩।

আল্লামা দিময়ারী রহ. 'হায়াতুল হায়াওয়ানে' লিখেন, যে ব্যক্তি জুমআর দিন জুমআর নামাযের পর অযু সহ একটি কাগজে مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ ৩৫ বার লিখে সে কাগজটি সঙ্গে রাখবে আল্লাহ তাআলা তাকে আনুগত্যের শক্তি দান করবেন, বরকতে সাহায্য করবেন এবং শয়তানের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা করবেন। আর যদি সে কাগজটিকে প্রতিদিন সূর্যোদয়ের পর দরূদ শরীফ পড়তে পড়তে গভীর মনোযোগ সহ দেখতে থাকে তাহলে সে স্বপ্নযোগে রাসূল সা.-এর দীদার বেশী বেশী লাভ করবে।[১৬৯]

আল্লামা সাখাবী রহ. কওলে বাদী' গ্রন্থে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পড়বে সে স্বপ্নযোগে বেশী বেশী রাসূল সা.-কে দেখতে পাবে।[১৭০]

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا أَمَرْتَنَا أَنْ نُصَلِّيَ عَلَيْهِ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ أَهْلُهُ ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَ تَرْضٰى لَهُ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَرْوَاحِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ مُحَمَّدٍ فِي الْأَجْسَادِ، اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ.[১৭১]

রানী যুবাইদার ক্ষমাপ্রাপ্তি

যুবাইদা খাতুন একজন নেককার রাণী ছিলেন। তিনি নহরে যুবাইদা খনন করে আল্লাহর মাখলুকের অনেক বড় উপকার করেছেন। তার মৃত্যুর পর কেউ একজন তাকে স্বপ্নে দেখল। সে জিজ্ঞেস করল, যুবাইদা! আপনার সঙ্গে কেমন আচরণ করা হয়েছে? যুবাইদা উত্তর দিলো, আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জত আমাকে ক্ষমা করেছেন। স্বপ্নদ্রষ্টা বললো, আপনি যুবাইদা খাল খনন করে আল্লাহর মাখলুকের অনেক উপকার করেছেন। আপনি তো ক্ষমা পাওয়ারই যোগ্য ছিলেন।

যুবাইদা খাতুন বললেন, না; না। যখন নহরে যুবাইদার আমল পেশ করা হয়, তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, তুমি তো রাষ্ট্রের সম্পদ দিয়ে এ কাজ করেছ। যদি রাষ্ট্রের সম্পদ না থাকত তাহলে খাল খননও হতো না। আমাকে একথা বলো যে, তুমি আমার জন্য কী আমল করেছ?

---

১৬৯. ফাযায়েলে দরূদ শরীফ : ৩৫।

১৭০. ফাযায়েলে দূরূদ শরীফ : ৫৩।

১৭১. আল-কওলুল বাদী' : ১৩০।

যুবাইদা বললো, আমি তো ঘাবড়ে গেলাম, এখন কী হবে? কিন্তু আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি দয়া করলেন। আমাকে বলা হলো, তোমার একটি আমল আমার পছন্দ হয়েছে। একবার তুমি ক্ষুধার্থ অবস্থায় দস্তরখানে বসে খাবার খাচ্ছিলে। ইতিমধ্যে 'আল্লাহু আকবার' আযানের শব্দ শোনা গেলো। তোমার হাতে লোকমা ছিলো। মাথার উড়না পড়ে গিয়েছিল। তুমি লোকমা রেখে প্রথমে ওড়না ঠিক করলে। অতঃপর লোকমা খেলে। আমার নামের আদবের প্রতি লক্ষ্য করে তুমি লোকমা গ্রহণে বিলম্ব করেছো। এ জন্য আমি তোমাকে ক্ষমা করেছি।

এক কামারের ঘটনা

হযরত ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রহ.-এর বাড়ির সামনে এক কামার বসবাস করত। সন্তানাদি বেশী হওয়ার কারণে সারাদিন সে কাজে ব্যস্ত থাকত। তার অভ্যাস ছিলো, যদি সে লোহা কাটার জন্য হাতুড়ি উঠাত আর এমতবস্থায় আযানের শব্দ শুনতে পেতো তখন হাতুড়ি দিয়ে লোহা কাটার পরিবর্তে তা মাটিতে ফেলে দিতো আর বলতো, এখন আমার রবের পক্ষ থেকে ডাক এসে গেছে। প্রথমে নামায পড়ব এরপর কাজ করবো।

তার ইন্তেকালের পর এক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখল। স্বপ্নদ্রষ্টা জিজ্ঞেস করল, তোমার কী অবস্থা? সে ব্যক্তি বললো, আমাকে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের এক স্তর নিচের মর্যাদা দান করা হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল, তোমার তো এত ইলম ছিলো না? সে উত্তরে বললো, আমি আল্লাহর নামের আদব রক্ষা করতাম। আযানের আওয়াজ শোনামাত্রই কাজ বন্ধ করে দিতাম, যেন নামায পড়ে নিতে পারি। এ আদব ও সম্মানের কারণে আল্লাহ তাআলা আমার প্রতি মেহেরবানী করেছেন।

স্বপ্নে আযান দেওয়া সম্মানেরও; লাঞ্ছনাকরও

ইমাম ইবনে সীরীন রহ.-এর নিকট এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি আযান দিচ্ছি। তিনি বললেন, তোমার ভাগ্যে সম্মান জুটবে। কিছুদিন পর সে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হলো। অপর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখল, সে আযান দিচ্ছে। ইবনে সীরীন রহ. বললেন, তুমি অপমানিত হবে। সে ব্যক্তি কিছুদিন পর চুরির অপরাধে গ্রেফতার হলো। তার হাত কাটা হলো। ইবনে সীরীন রহ.-এর জনৈক শিষ্য জিজ্ঞেস করলেন, দুজনই এক স্বপ্ন দেখেছে, কিন্তু ব্যাখ্যা ভিন্ন হলো কেন? বললেন, প্রথমজন যখন আযান দেওয়ার কথা এসে বললো, তখন আমি তার মাঝে নেক কাজের চিহ্ন দেখতে পেয়েছি। তখন কুরআনের এই আয়াত আমার সামনে এলো :

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ

মানুষের মাঝে হজ্বের ঘোষণা দাও।

আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, তার মর্যাদা হবে। যখন অপরজন স্বপ্নের কথা শোনালো তখন তার মাঝে পাপাচারের চিহ্ন ও নিদর্শন সুস্পষ্ট ছিলো। তখন আমার কুরআনের এই আয়াত মনে পড়ল :

ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ○

"অত:পর এক ঘোষক ঘোষণা করল, হে কাফেলা! তোমরা নিশ্চিত চোর।"

সুতরাং আমি এর ব্যাখ্যা করলাম, এ ব্যক্তি অপমানিত হবে। ফলে তাই হলো।

মসজিদের আদব

[আমাদের সাথী ভাইয়েরা অত্যন্ত গুরুত্বের সঙ্গে পড়ুন]

মসজিদ আল্লাহর ঘর এবং তাঁর শাহী দরবার। শাহী দরবারের কিছু বিশেষ আদব থাকে। কেউ এ আদবের বিপরীত কিছু করলে একে গোস্তাখী বা অপরাধী বলে মনে করা হয়। আর আদব রক্ষাকারী সবসময় বাদশাহর নৈকট্য লাভ করে। তাঁর কাজও সম্পন্ন হয় এবং প্রয়োজনও পূরণ হয়। কুরআন-হাদীসে মসজিদের আদব ও আহকাম বর্ণিত রয়েছে। অর্থাৎ মসজিদে গিয়ে কি কি করতে হবে আর কোন জিনিস থেকে বিরত থাকতে হবে। আমাদের জামাআতের সাথীরা সাধারণত এসব আদবের প্রতি খেয়াল রাখে না। এ জন্য বিস্তারিতভাবে মসজিদের আদব বর্ণনা করা হচ্ছে। যাতে জামাআতে গমনকারী সাথীগণ এ সব আদবের প্রতি বিশেষভাবে খেয়াল রাখেন।

০১. আল্লাহর নিকট পৃথিবীতে সর্বোত্তম ভূমি হলো, মসজিদের স্থান। আল্লাহর সাথে ভালোবাসার সম্পর্ক রক্ষাকারী বান্দাদের পরিচয় হলো, তারা মসজিদকেও ভালবাসেন। কিয়ামতের ভয়াবহ দিনে আল্লাহ ঐ ব্যক্তিকে আরশের ছায়া দান করবেন, যার অন্তর সবসময় মসজিদে পড়ে থাকে।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللهُ فِيْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلُّهُ : إِمَامٌ عَادِلٌ، وَشَابٌّ نَشَأَ فِيْ عِبَادَةِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, আল্লাহ তাআলা সাত শ্রেণির লোকদেরকে সেদিন নিজ আরশের ছায়ায়

আশ্রয় দেবেন, যে দিন সেই ছায়া ছাড়া অন্য কোনো ছায়া থাকবে না।...তাদের মাঝে এক শ্রেণী হলো, এমন ব্যক্তি যার অন্তর মসজিদের সাথে আটকে আছে। (বুখারী ও মুসলিম)

০২. ফরয নামায সর্বদা মসজিদে জামাআতের সাথে আদায় করবে। মসজিদে জামাআত ও আযান যাতে নিয়মতান্ত্রিক হয়; তার ব্যবস্থা রাখবে। মসজিদের নেযাম বা নীতি অনুসারে নিজের পুরো যিন্দেগী গঠন করবে। মসজিদ এমন এক কেন্দ্র বা মারকায যে, মুমিনের পুরো জীবনটাই এর অধীনে অতিবাহিত হয়।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ لِلْمَسَاجِدِ أَوْتَادًا الْمَلَائِكَةُ جُلَسَاؤُهُمْ إِنْ غَابُوا يَفْتَقِدُونَهُمْ وَإِنْ مَرِضُوا عَادُوهُمْ وَإِنْ كَانُوا فِي حَاجَةٍ أَعَانُوهُمْ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে সকল লোক বেশী পরিমাণে মসজিদে একত্রিত হয় তারা হলো মসজিদের খুঁটি। ফেরেশতা তাদের সঙ্গে বসে। তারা যদি মসজিদে না থাকে তবে ফেরেশতারা তাদের খুঁজে বেড়ায়। যদি তারা অসুস্থ হয় তাহলে ফেরেশতা তাদের সাহায্য করে। (মুসনাদে আহমদ)

وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَلِيسُ الْمَسْجِدِ عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ أَخٍ مُسْتَفَادٍ أَوْ كَلِمَةٍ مُحْكَمَةٍ أَوْ رَحْمَةٍ مُنْتَظَرَةٍ.

রাসূল সা. একথাও বলেছেন, মসজিদে উপবেশনকারী তিনটি ফায়দার মধ্য হতে যে কোনো একটি ফায়দা লাভ করে থাকে। প্রথমত: কোনো ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হওয়া যার কারণে দীনি কল্যাণ লাভ হয়। কোনো হিকমত পূর্ণ কথা শুনতে পায় অথবা আল্লাহর ওই রহমত পেতে থাকে; প্রত্যেক মুসলমানই যে রহমত লাভের প্রতীক্ষায় থাকে।

০৩. মসজিদকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। মসজিদ ঝাড়ু দেবে। ময়লা আবর্জনা পরিষ্কার করবে। সুগন্ধিময় করবে। হাদীসে এসেছে—

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: عَن أَنَّ رَجُلًا أَسْوَدَ أَوْ امْرَأَةً سَوْدَاءَ كَانَ يَقُمُّ الْمَسْجِدَ فَمَاتَ فَسَأَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ فَقَالُوا مَاتَ قَالَ أَفَلَا كُنْتُمْ آذَنْتُمُونِي بِهِ دُلُّونِي عَلَى قَبْرِهِ أَوْ قَالَ قَبْرِهَا فَأَتَى قَبْرَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا. متفق عليه

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক কৃষ্ণাঙ্গ মহিলা মসজিদ ঝাড়ু দিত। রাসূল সা. কয়েক দিন তাকে দেখতে পেলেন না। তখন তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। রাসূল সা.-কে বলা হলো, তিনি ইন্তেকাল করেছেন। রাসূল সা. বললেন, আমাকে কেনো খবর দিলে না? রাসূল সা. তার কবরে এসে জানাযা পড়লেন। (বুখারী ও মুসলিম)

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَمَرَ رَسُولُ للهِ صلى الله عليه وسلم بِبِنَاءِ اَلْمَسَاجِدِ فِي اَلدُّورِ, وَأَنْ تُنَظَّفَ, وَتُطَيَّبَ.

হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূল সা. আমাদের হুকুম দিয়েছেন যে, মহল্লায় মহল্লায় মসজিদ বানাবে। মসজিদ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে। মসজিদ সুগন্ধিময় করে রাখবে। (আহমদ ও তিরমিযী)

০৪. মসজিদে নীরব হয়ে বসবে। দুনিয়াবী কথা বলবে না। মসজিদে বসে হৈচৈ, হাসি-তামাশা করা, বাজার-ঘাটের খবর নেওয়া, বিশ্বের পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা, বেচাকেনা ও হাঙ্গামা করা মসজিদের আদব ও সম্মানের পরিপন্থি। মসজিদ আল্লাহর ইবাদতের ঘর। এখানে কেবল ইবাদত করবে। অনুরূপভাবে মসজিদে এমন শিশু-বাচ্চাদের না নেওয়া যারা মসজিদের আদব সম্মান বুঝে না। মসজিদে পেশাব পায়খানা করতে পারে বা থুথু ফেলবে। অনুরূপ মসজিদে তীর ও তরবারি কোষমুক্ত করবে না।

عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْيَانَكُمْ وَمَجَانِينَكُمْ وَشِرَاءَكُمْ وَبَيْعَكُمْ وَخُصُومَاتِكُمْ وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ وَسَلَّ سُيُوفِكُمْ.

রাসূল সা. ইরশাদ করেন, নিজ শিশু সন্তানকে, পাগলকে, মসজিদ থেকে দূরে রাখো (তথা মসজিদে নিয়ে যেয়ো না)। আর সেখানে বেচাকেনা, ঝগড়া-বিবাদ, হৈচৈ, দণ্ডবিধি প্রয়োগ করো না এবং তরবারি কোষমুক্ত করো না।

০৫. মসজিদে থুথু ফেলা থেকে বিরত থাকো।

عن أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبُصَاقُ فِي الْمَسْجِدِ خَطِيئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا.

হযরত আনাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেন, মসজিদে থুথু ফেলা গুনাহ। (যদি কেউ ফেলে তাহলে তার কাফফারা হলো, সে থুথু মুছে ফেলবে অর্থাৎ পরিস্কার করবে)।

০৬. বাইরে হারিয়ে যাওয়া কোন জিনিসের ঘোষণা মসজিদে করবে না।

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا رَأَيْتُمْ مَّنْ يَّنْشُدُ ضَآلَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا: لَا رَدَّ هَا اللهُ عَلَيْكَ.

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. বলেন, যখন তোমরা কাউকে দেখবে যে, সে মসজিদে হারানো জিনিসের ঘোষণা দিচ্ছে, তখন তার জন্য বদ দোয়া দিয়ে বলো, আল্লাহ তাকে এ জিনিস যেন ফিরিয়ে না দেন।

০৭. মসজিদকে বিশ্রামের জায়গা বানাবে না। মসজিদের দরজা দিয়ে প্রবেশের পর মসজিদের দাবী হলো, এখন এখানে নামায পড় অথবা বসে বসে যিকির ও তেলাওয়াত করা।

০৮. মসজিদে প্রবেশকালে প্রথমে ডান পা রেখে নবী সা.-এর ওপর দরূদ শরীফ পড়বে। এরপর নিম্নের দোয়া পড়বে; রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যখন তোমাদের কেউ মসজিদে আগমন করে তখন প্রথমে নবী সা.-এর জন্য দরূদ পড়বে এরপর এ দোয়া পড়বে :

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ

"হে আল্লাহ! আপনি আমার জন্য আপনার রহমতের দরজাগুলো খুলে দিন।"

মসজিদে প্রবেশ করে প্রথমে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। এ নামাযকে 'তাহিয়্যাতুল মসজিদ' বলা হয়। অনুরূপ যখন কোন সফর থেকে ফিরবে তখন সর্বপ্রথম মসজিদে পৌঁছে দু'রাকাত নফল নামায পড়বে। এরপর বাড়িতে যাবে। রাসূল সা. যখন-ই কোনো সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন প্রথমে মসজিদে গিয়ে নফল নামায পড়তেন। এরপর বাড়িতে প্রবেশ করতেন।

০৯. মসজিদ থেকে বের হওয়ার সময় বাম পা বাইরে রাখবে এবং এ দোয়া পড়বে: مسلم. اَللّٰهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আপনার রহমত প্রার্থনা করছি।'

১০. মসজিদে নিয়মতান্ত্রিকভাবে আযান দেওয়া ও জামাআত আদায়ের ব্যবস্থা করবে। ইমাম মুআজ্জিন এমন ব্যক্তিকে বানাবে যারা দীনি ও চারিত্রিক বিষয়ে সর্বোত্তম। যথাসম্ভব চেষ্টা করবে যেন এমন লোক আযান ও ইমামতির

গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবে; যারা বিনিময় বা পারিশ্রমিক নেবে না। স্বেচ্ছায় পরকালে পুণ্য লাভের আশায় এ দায়িত্ব পালন করবে।

১১. আযানের পর নিম্নের দোয়া পড়বে। রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি আযান শুনে এ দোয়া করবে কিয়ামতের দিন সে আমার সুপারিশ লাভের হকদার হবে।

اَللّٰهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ, وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ، آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ، وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَّحْمُودًا الَّذِى وَعَدْتَّهُ. – بخارى

হে আল্লাহ! হে এই পরিপূর্ণ দাওয়াত ও প্রতিষ্ঠিত নামাযের রব! আপনি মুহাম্মদ সা.-কে মর্যাদা ও সবিশেষ নৈকট্য দান করুন এবং তাঁকে ঐ প্রশংসিত স্থানে অধিষ্ঠিত করুন যার প্রতিশ্রুতি আপনি তাঁকে দিয়েছেন।

১২. মুআজ্জিনের আযানের শব্দ শুনলে তার উচ্চারিত শব্দে উত্তর দেবে। তবে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ এবং حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ এর সময় পড়বে لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ। ফজরের আযানের মুয়াজ্জিন যখন বলবে اَلصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ তখন এর উত্তরে বলবে صَدَقْتَ وَبَرَرْتَ وَبِالْحَقِّ نَطَقْتَ।

১৩. ইকামতের সময় যখন বলবে قَدْ قَامَتِ الصَّلٰوةُ এর উত্তরে বলবে أَقَامَهَا اللّٰهُ وَأَدَامَهَا 'আল্লাহ সর্বদা প্রতিষ্ঠিত রাখুন'।

১৪. হুশিয়ার ও সচেতন বাচ্চাদেরকে নিজের সঙ্গে মসজিদে নিয়ে যাবে। মায়েরা উৎসাহ দিয়ে পাঠাবে; যাতে বাচ্চাদের মাঝে আগ্রহ সৃষ্টি হয়। মসজিদে তাদের সঙ্গে খুবই নরম, কোমল ও স্নেহময় আচরণ করবে।

১৫. মসজিদে ভয়ে কম্পমান হয়ে প্রবেশ করবে। প্রবেশ করার সময় সালাম করবে। চুপ করে বসে এমনভাবে যিকির করবে, যেন আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ব আপনার ওপর প্রভাব বিস্তার করে আছে। হাসি মজাক-গালগল্প ও আলাপ করতে করতে মসজিদে প্রবেশ করা গাফেল ও বেআদবদের কাজ। তার পক্ষে এমনটি করা সম্ভব, যার অন্তরে আল্লাহর কোনো ভয় নেই। কেউ কেউ ইমামের সাথে রুকুতে শরীক হওয়ার জন্য এবং রাকাত পাওয়ার জন্য দৌড়ে মসজিদের দিকে ছোটে। এটি মসজিদের আদবের পরিপন্থী। রাকাত পান বা না পান অত্যন্ত ভাব-গাম্ভীর্য ও নম্রতার সঙ্গে মসজিদে প্রবেশ করবেন। কখনই দৌড়ে ছুটে যাবেন না।

১৬. নামাযের আগ্রহ-উদ্দীপনা নিয়ে মসজিদে যাবে। রাসূল সা. বলেন, যে ব্যক্তি সকালের অন্ধকারে মসজিদে যায় কিয়ামতের দিন তার সঙ্গে পূর্ণ আলোকরশ্মি থাকবে। তিনি একথাও বলেছেন, জামাআতে নামায আদায়ের জন্য মসজিদে গমনকারী প্রতি কদমে একটি করে নেকী পায় এবং তার একটি করে গুনাহ মাফ হয়।[১৭২]

১৭. কেউ কেউ মসজিদে নিজের মোবাইল চার্জ দেয়। এটি ঠিক নয়। কেননা মসজিদের সব জিনিস-ই ওয়াক্‌ফকৃত। এমন কাজ করলে সেটা খেয়ানত হবে। চার্জ দেওয়ার প্রয়োজন হলে মসজিদের আশপাশের দোকানে চার্জ দিয়ে নেবে। মসজিদে চার্জ দিয়ে থাকলে পরিমাণ মতো বিল জমা দিয়ে দেবে। অনুরূপভাবে মসজিদে প্রবেশের পূর্বে মোবাইল বন্ধ করে নেবে। কেননা মোবাইলের আওয়াজে নামাযে বিঘ্ন ঘটে।

১৮. রাসূল সা. ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি অযুর সঙ্গে ফরয নামায আদায় করার জন্য মসজিদে যাত্রা করে তার সাওয়াব হলো, ইহরাম বাঁধা হাজীর মত। আর যে ব্যক্তি চাশতের নামাযের জন্য যায় এবং চাশত পড়ার আগ্রহই তাকে দাঁড়াতে বাধ্য করে তার সাওয়াব হলো, উমরাকারীর সাওয়াবের মত এবং এক নামাযের পর দ্বিতীয় নামায ইল্লিয়্যিনে লিখা হয়।

বাগাভী রহ. ও ইমাম তাবরানী রহ. হযরত আবু উমামা রা.-এর সূত্রে উল্লিখিত হাদীসটি এ শব্দে বর্ণনা করেন, যে ব্যক্তি ফরয নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে মসজিদে যায় তার সে নামায হবে নফল হজ্জের মত। আর যে ব্যক্তি নফল নামাযের জন্য পায়ে হেঁটে মসজিদে যায় তার এ নামায হলো, নফল উমরার মত।[১৭৩]

১৯. আযান ও ইকামত শোনার সময় কথা বলবে না, সালাম দেবে না এবং সালামের উত্তর দেবে না। (অর্থাৎ এ সময়গুলোতে কথা বলা বা এসব কাজ করা অনুচিত।) আযান ও ইকামাত চলাকালে কুরআন শরীফও পড়বে না। আগে থেকেই পড়তে থাকলে বন্ধ করে আযান-ইকামতের জবাব দেওয়ায় ব্যস্ত হওয়া উত্তম। আর যদি পড়তে থাকে তাও জায়েজ আছে। ইকামতের সময় দোয়া করার অনুমতি রয়েছে।[১৭৪]

২০. অনুমতি ব্যতীত মসজিদে বাতি ও পাখা ব্যবহার করবে'না।

---

১৭২ ইবনে হিব্বান

১৭৩. তাফসীরে মাযহারী : ৮/৩৮২।

১৭৪. ফাযায়েলে আযান ও ইকামাত, লেখক : আবদুর রহমান হাশেমী।

হাদীস ও রাসূল সা.-এর সুউচ্চ মর্যাদা

হাদীসে কুদসীতে আছে :

لَوْلَاكَ لَمَا خَلَقْتُ الْأَفْلَاكَ

হে বন্ধু! যদি তুমি না হতে তাহলে আমি এ বিশ্বজগত সৃষ্টিই করতাম না। অর্থাৎ, যদি পৃথিবীতে মানবতার কল্যাণকামী মোহাম্মদ সা.-এর আগমন না হতো তাহলে এই জিন, মানুষ, চন্দ্র, সূর্য, গাছ-গাছালি, তরুলতা, পাথর, নদী, সমূদ্র, ফুলের সুগন্ধি, পাখির কলরব, সবুজ শ্যামল ভূমি, আকাশ-পাতাল, উঁচু-নিচু, আনন্দ-বিনোদন, মাটির কোমলতা, সূর্যের তাপ, নদীর জোয়ার, স্রোত-তরঙ্গমালা, নদীর প্রবাহ, আকাশের তারকারাজি, হেমন্ত বসন্ত, উদ্ভিৎ, অলংকার, হিরা-জাওহার, খনি ও ভাণ্ডার, জঙ্গলের পশু, বাতাসের তরঙ্গ; মোটকথা পৃথিবীর কোনো জিনিসের নাম নিশানাই থাকতো না। সৃষ্টিকুলের গৌরব আল্লাহর তাআলার প্রিয় মাহবুব সা.-এর অনন্য বৈশিষ্ট্যাবলি হলো :

১. তাঁর কারণে এ বিশ্বজগত অস্তিত্ব লাভ করেছে।

২. তাঁর বরকতে মানবতা, অনুভব-অনুভূতি ফিরে এসেছে।

৩. তাঁর কারণে "لَوْلَاكَ"-এর হার পরানো হয়েছে।

৪. তাঁকে (وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ)-এর মুকুট পরানো হয়েছে।

৫. তাঁর বরকতে হযরত ইবরাহীম আ. জাতির পিতা হতে পেরেছিলেন।

৬. তাঁর কালিমা হযরত সুলাইমান আ.-এর আংটিতে অঙ্কিত ছিলো।

৭. তাঁর সৌন্দর্যের আভা পেয়েছিলেন হযরত ইউসুফ আ.।

৮. তাঁর ধৈর্যের নমুনা পেয়েছিলেন হযরত আইয়্যুব আ.।

৯. তাঁর নৈকট্যের এক মুহূর্ত হযরত মূসা আ. কথপোকথনের আকৃতিতে পান।

১০. তাঁর মর্যাদার একটি অংশ হযরত হারুন আ. মন্ত্রীত্বের সুরত লাভ করে ছিলেন।

১১. তাঁর গুণকীর্তনের একটি লাইন হযরত দাউদ আ.-এর সুরে পরিণত হয়েছে।

১২. তাঁর পরিশুদ্ধতার এক ঝলক ইয়াহইয়া আ.-কে প্রদীপ্ত করেছে।

১৩. তাঁর জ্ঞানসাগরের এক বিন্দু হযরত লোকমান আ. পেয়েছিলেন।

১৪. তাঁর মর্যাদা ও সুউচ্চ আসনের এক ঝলক হযরত ঈসা আ. পেয়ে সৌভাগ্যময় হয়েছেন।

১৫. হযরত ইবরাহীম আ. ও ঈসা আ.-এর দোয়ার বরকতে সৌভাগ্যের বার্তা নিয়ে তিনি পৃথিবীতে আগমন করেন।

১৬. তাঁর আগমনের বরকতে আবরাহার হস্তিবাহিনী চর্বিত তৃণে ধুলিস্যাৎ হয়েছিলো।

১৭. তাঁর জন্মে পারস্যের অগ্নিপূজকদের অগ্নি নির্বাপিত হয়েছিলো।

১৮. শৈশবে তিনি আমীন ও সাদ্বিকীন উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন।

১৯. তাঁর আঙ্গুলির ইশারায় চাঁদ দ্বিখণ্ডিত হয়েছিলো।

২০. জড়পদার্থ বস্তুও তাঁর রেসালাতের স্বাক্ষ্য দিয়েছে।

২১. যাঁর জীবনে মিরাজ গমনে সৌভাগ্য হয়েছিলো।

২২. তাঁর পদধুলিতে সিদ্দিকে আকবার রা. সৃষ্টি হয়েছেন।

২৩. তাঁর ঈমানের পরশে ফারুকে আযম জন্ম নিয়েছে।

২৪. তাঁর লজ্জাশীলতার কারণে হযরত উসমান রা. যিন নূরাইন হয়েছিলেন।

২৫. তাঁর জ্ঞানভাণ্ডার থেকে এক বিন্দু পেয়ে আলী মুর্তাজা রা. জ্ঞানের দরজা হয়েছেন।

২৬. যাঁর শহরকে আল্লাহ তাআলা 'বালাদে আমীন' বলেছেন।

২৭. যাঁর প্রতি অবতীর্ণ কিতাবকে 'কিতাবুম্ মুবীন' বলেছেন।

২৮. তাঁর প্রতি স্বয়ং রব্বে কারীম ও তাঁর ফেরেশতাগণ রহমত বর্ষণ করেন।

২৯. তাঁর উম্মতকে সর্বোত্তম উম্মত নামে স্মরণ করা হয়।

এ সব বিশেষ গুণ ও বৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ .

নিশ্চয়ই আমি তোমাকে স্বাক্ষ্যদাতা, সুসংবাদদাতা এবং সতর্ককারী হিসেবে প্রেরণ করেছি। যাতে করে (হে মুমিনগণ!) তোমরা আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূলের ওপর ঈমান আনো, তাঁকে সাহায্য করো এবং তাঁকে সম্মান করো।[১৭৫]

---

১৭৫. সূরা ফাতাহ : ৮-৯।

হাদীসে নববী সা.-এর আদব

রাসূলুল্লাহ সা. ছিলেন আমাদের বাদশাহ। যাঁর মুকুটে শোভা পেতো দয়া-বদান্যতা। তিনি ছিলেন ফযীলত ও মর্যাদার আঁধার, এক কথায় সৌন্দর্য ও শোভার প্রতিচ্ছবি। নবী মুহাম্মদ সা. ছিলেন এমন ব্যক্তি :

১. যাঁর আগমনের সংবাদ আল্লাহ কর্তৃক অবতীর্ণ সকল কিতাবে দেয়া হয়েছিলো।

২. যাঁর জন্মগ্রহণের আলোকচ্ছটায় সারা বিশ্ব আলোকিত হয়েছিলো।

৩. যাঁর সৌন্দর্যের বর্ণনা কুরআনে কারীমে আলোচিত হয়েছে।

৪. যাঁর লালা লবণাক্ত পানিকে মিষ্টি বানিয়েছে।

৫. যাঁর আঙ্গুলী মুবারক থেকে ঝর্ণা প্রবাহিত হয়েছে।

৬. যাঁর আঁখিযুগল যদি ঘুমাচ্ছন্ন হত তবুও তাঁর হৃদয় সদা সজাগ ও সতর্ক থাকতো।

৭. যাঁর ঘাম মিশক আম্বরের চেয়েও অধিক সুগন্ধিময় ছিলো।

৮. যাঁর শরীর মুবারকে মাছি বসত না।

৯. যাঁর জন্মের বদৌলতে শয়তানের আসমানে যাওয়ার পথ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে।

১০. যাঁর সহচর এমনকি বয়সে বড় ব্যক্তিরাও মুসলমান হয়েছে।

১১. যাঁর প্রতি দরূদ ও সালাম পাঠানো উম্মতের ওপর আবশ্যক।

১২. যাঁকে 'রহমাতুল লিল আলামীন' তথা সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত স্বরূপ বানিয়ে পাঠানো হয়েছে।

১৩. যাঁর মাথায় نُصِرْتُ بِالرُّعْبِ তথা আল্লাহ কর্তৃক প্রভাব প্রাপ্তির মুকুট পরানো হয়েছে।

১৪. যাঁর ঘর ও মিম্বারের মধ্যবর্তি স্থানকে জান্নাতের বাগিচা সমূহের মধ্য থেকে একটি বাগিচা অভিহিত করা হয়েছে।

১৫. যাঁকে কিয়ামতের দিন 'মাকামে মাহমূদ' তথা সর্বোচ্চ প্রশংসিত আসন দান করা হবে।

১৬. যাঁকে হাউজে কাউসারের তত্ত্বাবধায়ক বানানো হবে।

১৭. যাঁর উম্মত কিয়ামতের দিন সকল উম্মতের চেয়ে সংখ্যায় বেশী হবে।

১৮. যাঁর থেকে তাবলীগ সম্পর্কে কিয়ামতের দিন সাক্ষ্য চাওয়া হবে।

১৯. যাঁর প্রতি অবতীর্ণ হওয়া কিতাব জান্নাতেও পড়া হবে।

২০. যাঁর ভাষা আরবীকে জান্নাতের ভাষা বানানো হবে।

২১. যাঁর শুভাগমনের জন্য পুরো বিশ্বজগতকে নববধূর মতো সজ্জিত করা হয়েছে।

কবির ভাষায় :

کتاب فطرت کے سرورق پر جو نام احمد ﷺ رقم نہ ہوتا
تو نقش ہستی اُبھر نہ سکتا وجود لوح قلم نہ ہوتا
زمیں نہ ہوتی فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا
یہ محفل کن فکاں نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا

◆ যদি 'সৃষ্টি' নামের গ্রন্থের শিরোনামে আহমদ সা.-এর নাম না থাকতো

◆ তাহলে এই বিশ্বজগৎ উদ্ভূত হতো না। লওহ ও কলম কোনোটাই অস্তিত্ব পেতো না।

◆ আকাশ-পাতাল কোনোটাই হতো না। আরব-অনারবের কোনোটাই হতো না।

◆ যদি সেই সকল উম্মতের শ্রেষ্ঠ সম্রাট না আসতেন তাহলে 'কুন' বলার মাধ্যমে সৃষ্ট এই মাহফিল হতো না।

কাযী আয়ায রহ. "কিতাবুশ শিফা"য় লিখেন, যে সব জিনিস রাসূল সা.-এর সাথে সম্পৃক্ত; তার ইজ্জত-সম্মান রক্ষা করা, হারামাইনে তাঁর উপস্থিতির স্থান ও বসবাসের স্থানগুলোর সম্মান করা এবং ঐ সব জিনিস; যা রাসূল সা.-এর নামে ডাকা হয় বা ঐসব বস্তু; যা রাসূল সা. আপন হাত মুবারক দ্বারা স্পর্শ করেছেন সে সবের আদব ও সম্মান করা মূলত নবী কারীম সা.-কেই সম্মান করার নামান্তর।

পূর্ববর্তী বুযুর্গগণের নীতি ছিলো, যেসব মজলিসে হাদীসে নববী শোনা হতো বা শোনানো হতো, সেসব মজলিসে তাঁরা অত্যন্ত আদবের সাথে বসতেন। যেমনিভাবে সাহাবায়ে কেরাম রা. রাসূল সা.-এর দরবারে আদবের সাথে বসতেন। এর কারণ হলো, তাঁরা মূলত রাসূলের হাদীসের আদবকে রাসূল সা.-এর আদব কল্পনা করতেন।

হাদীসের মজলিশে পালনীয় কিছু আদব

১. সর্বোত্তম হলো, গোসল করা। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে কমপক্ষে অযু করে মজলিশে অংশগ্রহণ করা।

২. শরীর ও কাপড়ে সুগন্ধি ব্যবহার করা।

৩. দু'জানু হয়ে বসা।

৪. হাদীস পাঠকারী কোনো উঁচু স্থানে বসে হাদীস পাঠ করা।

৫. যখন হাদীস মুবারক পড়া হয় তখন নীরবতা পালন করা।

৬. চুপ করে ধ্যানের সঙ্গে শোনা।

৭. হাদীসের পঠন ও পাঠনকালে যদি কোনো মেহমানও এসে যায় তবে তার সম্মানে না ওঠা।

৮. পূর্বের শোনা হাদীসও যখন পড়া হয় বা শোনা হয় তখনো পূর্ণ ধ্যানের সঙ্গে শোনা যেন মনে হয় এই প্রথম শুনছে।

হাদীসের আদব সম্পর্কিত কয়েকটি ঘটনা

প্রথম ঘটনা : একলোক হযরত নানুতবী রহ.-কে সবুজ রঙের অত্যন্ত সুন্দর এক জোড়া জুতা হাদিয়া দিলো। তিনি সুন্নাত মনে করে হাদিয়া কবূল করলেন বটে; কিন্তু জুতা ব্যবহার করলেন না। কেউ জিজ্ঞেস করলে বলতেন, কাসেমের শোভা পায় না; গম্বুজে খাজরার রঙও সবুজ আর আমার জুতার রঙও সবুজ। সবুজ রঙের জুতা পরা আমার নিকট বেয়াদবী।

দ্বিতীয় ঘটনা : এক ব্যক্তি হযরত গাংগুহী রহ.-কে একটি কাপড় দিয়ে বললেন, এটি মদীনা মুনাওয়ারা থেকে নিয়ে এসেছি। তিনি সে কাপড়ে চুমু খেলেন এবং চোখে লাগালেন। এক ছাত্র বললো, হযরত! এটা তো ভিনদেশী কাপড়। মদীনার তৈরি নয়! হযরত বললেন, যে দেশেরই হোক না কেনো, তাতে আমার প্রিয় রাসূল সা.-এর দেশের বাতাস তো লেগেছে। এটি নবী-প্রেম ও নবীর আদব ও সম্মান রক্ষার কতই না চমৎকার ঘটনা।

তৃতীয় ঘটনা : হযরত ইমাম বুখারী রহ.-এর উস্তাদ ইমাম আবদুর রহমান ইবনে মাহদী রহ. (মৃত্যু: ১৯৮হি.)-এর অভ্যাস ছিলো যে, যখন তাঁর সামনে কোনো হাদীস পড়া বা শোনানো হত তখন তিনি সকলকে চুপ করার আদেশ দিয়ে বলতেন,

لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ

তোমরা তোমাদের আওয়াজকে নবী সা.-এর আওয়াজের চে' উঁচু কর না।

হাদীস শরীফের পঠন ও পাঠনের সময় নীরব থাকা তেমনি আবশ্যকীয় যেমন রাসূল সা. দুনিয়াতে জীবিতকালে তাঁর সামনে নীরব থাকা আবশ্যক ছিলো।

চতুর্থ ঘটনা : তাবেঈগণের সর্দার হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব রহ. (মৃত্যু:৯৩) অসুস্থতার দরুন এক পাশে কাত হয়ে শুয়ে ছিলেন। এ সময় এক লোক তাঁকে একটি হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ বসে পড়লেন এবং হাদীস বর্ণনা করলেন। প্রশ্নকারী জিজ্ঞেস করলেন, হযরত এত কষ্ট কেনো করলেন? বললেন, আমি এমনটি পছন্দ করি না যে, আমি শুয়ে শুয়ে রাসূল সা.-এর হাদীস বর্ণনা করবো।[১৭৬]

পঞ্চম ঘটনা : লোকজন যখন ইমাম মালেক রহ.-এর নিকট ইলম শেখার জন্য আসত তখন এক খাদেম সেসব লোকদেরকে প্রথমে জিজ্ঞেস করত, হাদীসের জন্য এসেছেন না ফিকহী মাসায়েল জানার জন্য? যদি তারা বলত : মাসয়ালা জানার জন্য, তাহলে ইমাম মালেক সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে আসতেন। আর যদি তারা বলত : হাদীস শোনার জন্য এসেছি। তাহলে ইমাম মালেক রহ. গোসল করে খুশবু লাগাতেন এবং নতুন কাপড় পরিধান করে সেজেগুজে বের হতেন। তাঁর জন্য একটি আসন পাতা হতো; যেখানে বসে তিনি হাদীস বর্ণনা করতেন। হাদীস বর্ণনার সময় 'উদ'[১৭৭]-এর ধোঁয়া দেয়া হতো। কোনো ছাত্র এর কারণ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তরে বললেন, আমি চাই এভাবে রাসূল সা.-এর হাদীসের প্রতি সম্মান করতে।

ষষ্ঠ ঘটনা : হযরত শাহ আবদুল আযীয রহ. একবার হাদীস পড়াচ্ছিলেন। পড়াতে পড়াতে গলা এতটা শুকনো অনুভব করলেন যে, কথা বলাও কষ্টকর হয়ে যাচ্ছিলো। এক ছাত্রকে বললেন, পানি নিয়ে এসো। ছাত্র যখন ঘরে গিয়ে পানি চাইলো– তখন শাহওয়ালী উল্লাহ মোহাদ্দেসে দেহলভী রহ. এ কথা শুনে বড়ই পেরেশান হয়ে বললেন, আফসোস্! আমাদের বংশ থেকে ইলম বিদায় নিয়ে গেছে। বিবি সাহেবা বললেন, আপনি ধৈর্য ধরুন। এরপর তিনি পানির গ্লাসে সিরকা মিশিয়ে পাঠালেন। শাহ আবদুল আযীয রহ. পান করে নিলেন। তাঁর খবরই ছিলো না যে, পানিতে সিরকা মেশানো ছিলো। যখন শাহওয়ালী উল্লাহ রহ. এ অবস্থা জানতে পারলেন তখন বললেন, আলহামদু লিল্লাহ! এখনো আমাদের বংশে ইলম অবশিষ্ট রয়েছে।

---

১৭৬. মাদারিজুন নবুওয়্যাহ : ১/৫৪১।

১৭৭. 'উদ' অতি মূল্যবান সুগন্ধিময় কাঠ।

সপ্তম ঘটনা : ইমাম আবু হানীফা রহ. আদবের কারণেই ইমাম আযম হয়েছেন। হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. তাঁর মাকে খুব শ্রদ্ধা-সম্মান করতেন। তাঁর মার যখন কোনো মাসআলা জানার প্রয়োজন হতো তখন তিনি বিজ্ঞ কোনো প্রসিদ্ধ ফকীহকে জিজ্ঞেস করতেন। এ সময়ে ইমাম আবু হানীফা রহ. মাকে উটে চড়িয়ে নিজে লাগাম ধরে হেঁটে হেঁটে চলতেন। লোকজন এ দৃশ্য দেখে শ্রদ্ধায় রাস্তার দু'পার্শ্বে দাঁড়িয়ে যেত এবং সালাম দিত। ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মা তাঁর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন। কতকবার এমন হয়েছে, ওই বৃদ্ধ ফকীহের মাসআলার সঠিক সমাধান জানা থাকতো না তখন তিনি ইমাম আবু হানীফা থেকে নিচু স্বরে জিজ্ঞেস করে নিতেন এবং উঁচু স্বরে তাঁর মাকে বলে দিতেন।

ইমাম আযম আবু হানীফা রহ. বিনয়, নম্রতা ও আদবের এতোটাই অধিকারী ছিলেন যে, সারা জীবন নিজের মায়ের কাছে এ বিষয়টি প্রকাশ হতে দেননি যে, যেসব মাসআলা আপনি তাঁর নিকট জিজ্ঞেস করেন তাতো আমিই বলে দিতাম। এ সমস্ত প্রক্রিয়া এজন্য ছিলো যেন মায়ের মন সেভাবেই আশ্বস্ত হয় যেভাবে হওয়া উচিত। এমন আদব ও সম্মানের বিনিময়ে তিনি ইমাম আযম হয়েছেন।

পরিশেষে দোয়া করি, আল্লাহ তাআলা যেন আমাদের সকলকে হাদীস ও মুহাদ্দিসগণকে পূর্ণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা করার তাওফীক দান করেন। কেননা আদব দ্বারাই মানুষ মানবতার উঁচু স্তরে উন্নীত হয়। বেয়াদব সবসময় বঞ্চিত থেকে যায়।

সাতটি বিস্ময়কর প্রশ্ন ও তার উত্তর

এক লোক ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিকট এসে বিস্ময়কর কিছু প্রশ্ন করল। সে বললো, ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে আপনি কি বলেন যে,

১. না দেখেই সাক্ষ্য দেয়।

২. ইহুদী নাসারাদের বক্তব্যকে সত্যয়ন করে।

৩. আল্লাহর রহমত থেকে পলায়ন করে।

৪. মৃত খায়।

৫. আল্লাহ যেদিকে ডাকেন সেদিকে ভ্রুক্ষেপ করে না।

৬. আল্লাহ যে জিনিসের ভয় দেখিয়েছেন তার ভয় করে না।

৭. ফেৎনা পছন্দ করে।

ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, ঐ ব্যক্তি মুমিন। এ উত্তর শুনে প্রশ্নকারী হতবাক। সে বললো, জ্বী এটা কী করে সম্ভব? তিনি বললেন,

১. দেখ, তুমি বলেছ, না দেখে স্বাক্ষী দেয়। মুমিন তার প্রভুকে না দেখেই তাঁর ব্যাপারে সাক্ষ্য দেয়।

২. দেখ, তুমি বলেছ, ইহুদী নাসারার কথাকে সত্যায়ন করি। কুরআনের ঘোষণা : وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارٰى عَلٰى شَيْءٍ وَقَالَتِ النَّصَارٰى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلٰى شَيْءٍ : 'ইয়াহুদীরা বলে : নাসারারা সত্যের ওপর নেই। আর নাসারারা বলে : ইয়াহুদীরা সত্যের ওপর নেই।' তো মুমিন তাদের উভয়ের এ কথাকেই সত্যায়ন করে।[১৭৮]

৩. তুমি বলেছ, আল্লাহর রহমত থেকে দূরে পলায়ন করে। দেখ, বৃষ্টি আল্লাহর রহমত। আর বৃষ্টি থেকে তো সব মানুষই দৌড়ে পালায়। যাতে কাপড় ভিজে না যায়।

৪. তুমি বলেছ, 'মৃত খায়' মাছ মৃত-ই হয়। আর সব মানুষই তা খুব মজা করে খায়।

৫. দেখ, তুমি বলেছ, আল্লাহ যেদিকে ডাকেন তার প্রতি আগ্রহ নেই। আর তা হলো জান্নাত। আল্লাহ সে দিকেই ডাকেন : وَاللّٰهُ يَدْعُو إِلٰى دَارِ السَّلَامِ (আল্লাহ দারুস-সালাম তথা শান্তির নিকেতনের দিকে আহ্বান করেন।) কিন্তু আল্লাহর ভালবাসার দাবী এতটাই প্রবল যে, এই সত্যিকারের বন্ধু থেকে দৃষ্টি সরিয়ে জান্নাতের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া কখনোই পছন্দ করে না।

৬. দেখ, তুমি বলেছ : আল্লাহ যার ভয় দেখিয়েছেন, তার থেকে ভয় করে না। সেটা হলো দোযখ। অর্থাৎ বান্দা নিজ প্রিয় রবের অসন্তুষ্টির ব্যাপারে এত উদ্বেগ উৎকণ্ঠায় থাকে যে, জাহান্নামে জ্বলাকেও পরোয়া করে না।

৭. দেখ, তুমি বলেছ, সে ফেৎনা পছন্দ করে। আর কুরআনুল কারীমের ভাষায় সন্তানকে বলা হয়েছে : إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ 'নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান ফেৎনা।'[১৭৯] আর স্বভাবত-ই মানুষ তার সন্তানকে ভালোবাসে। সুতরাং সে লোক মুমিন। প্রশ্নকারী হতভম্ব হয়ে গেল।

---

১৭৮. সূরা বাকারা : আয়াত ১১৩।

১৭৯. সূরা তাগাবুন : আয়াত ১৫।

অন্য আরেক লোক এসে হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে বললো, শুনলাম, আপনি নাকি সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে পারেন? বললেন, তুমিও জিজ্ঞেস কর? সে বললো, পায়খানা মিষ্টি না লবণাক্ত? তিনি উত্তর দিলেন, মিষ্টি। সে বললো, আপনার নিকট এর কোনো প্রমাণ আছে? তিনি বললেন, লবণাক্ত জিনিসে মাছি বসে না। সে সবসময় মিষ্টি জিনিসের ওপর-ই বসে।

রাত ছোট হওয়ায় ফাতেমা রা.-এর কান্না

হযরত ফাতেমা রা. কান্না জড়িত কণ্ঠে বলতেন : হে আল্লাহ! তোমার রাত খুবই ছোট। আমি দু' রাকাত নামাযের নিয়ত করলাম আর তোমার রাত শেষ হয়ে গেলো।

একটা সময় ছিলো, যখন মহিলারা সারাদিন ঘরের কাজে ব্যস্ত থাকতো, আর রাত কাটাত নামাযের মুসল্লায়। সাইয়্যিদা ফাতেমা রা. সম্পর্কে বর্ণিত আছে, শীতকালের রাত বড় হতো। তিনি এশার পর দু'রাকাত নফলের নিয়ত বাঁধতেন। মনে এমন আনন্দ ছিলো এমন মজা ছিলো যে, কুরআন তেলাওয়াতের স্বাদ অনুভব করছিলেন, পড়তেই থাকলেন পড়তেই থাকলেন। এমনকি যখন সালাম ফিরালেন তখন দেখতে পেলেন যে, ফজরের সময় ঘনিয়ে এসেছে। ফলে তিনি কাঁদতে শুরু করলেন। দোয়া করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তোমার রাতও ছোট হয়ে গেছে। আমি দু'রাকাতের নিয়ত বাঁধলাম আর তোমার রাত শেষ হয়ে গেল।

তিনি এমন নারী ছিলেন যিনি রাত ছোট হওয়ার অভিযোগ করতেন। বর্তমানে আমাদের মা-বোন আছে, যাদের মধ্য থেকে খুব কম ভাগ্যবতীরই পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের তাওফীক হয়।

স্বামী যখন ব্যবসার কাজে যাবে
তুমি চাশতের নামায পড়ে বরকতের দোয়া কর

একসময় ছিলো, যখন স্বামী ব্যবসার জন্য ঘর থেকে বের হত তখন স্ত্রী জায়নামাযে বসে চাশতের নামায পড়তেন আর আঁচল পেতে আল্লাহর কাছে দোয়া করতেন : হে আল্লাহ! আমার স্বামী এ সময় হালাল রিযিকের জন্য ঘর থেকে বের হয়েছে। তার রিযিকে বরকত দাও। কাজে বরকত দাও। স্ত্রী কেঁদে কেটে দোয়া করত। আল্লাহ তাআলা স্বামীর কাজে সাহায্য করতেন। বরকত দিতেন।

মুসলিম সমাজে স্ত্রীরা ঘরের রানীর মর্যাদা রাখে। সুতরাং ঘরের পরিবেশ দীনদার হওয়া নির্ভর করে মহিলাদের দীনদারীর ওপর।

মহিলাগণ যদি দীনদার স্বভাবের হয় তাহলে ছেলে-মেয়েরাও দীনদার হবে। সুতরাং মুসলমান মেয়ে ও মুসলিম মহিলাদেরকে দীনি শিক্ষা ও চারিত্রিক অনুশীলন দানের ব্যাপারে বিশেষভাবে মেহনত করা আবশ্যক। জনৈক পণ্ডিত সত্যই বলেছেন, 'পুরুষ শিখেছে তো কেবল এক ব্যক্তিই শিখেছে। আর নারী শিখেছে তো পুরো বংশ শিখেছে। নেপোলিয়ন বোনাপোর্ট বলেছেন : তুমি আমাকে একজন আদর্শ মা দাও, আমি তোমাদের একটি আদর্শ জাতি দেবো।'

আজ মুসলিম মেয়েদের দীনি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া বেশী প্রয়োজন। যেন আমাদের আগামী প্রজন্ম মায়ের কোল থেকেই দীনের প্রতি ভালোবাসা ও উত্তম চরিত্রের দৌলত লাভ করতে পারে এবং তারা পৃথিবীর দিগন্ত জুড়ে চাঁদ ও সূর্যের মতো আলো বিকিরণ করতে পারে।

প্রথম যুগের নারীরা রুটি বানানোর সময়ই কয়েক পারা পড়ে ফেলতেন

একজন পুরুষ যেভাবে ইবাদত করে মহান আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করতে পারে, এভাবে একজন নারীও ইবাদত করে আল্লাহ রব্বুল ইয্যাতের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে এবং তাঁর মা'রিফাত অর্জন করতে পারে। জনৈক মহিলা সাহাবি উনুনের ওপর রুটি পাকালেন। সেগুলোকে নিজের মাথার ওপর রাখলেন। এরপর হাঁটতে হাঁটতে বলতে লাগলেন : আরে বোন! আমার তো তিন পারা তেলাওয়াতও হয়ে গেলো। আবার রুটি পাকানোও হয়ে গেলো। এ ঘটনা থেকে বুঝে আসে যে, ওই নারীরা যখন রুটি পাকানোর অপেক্ষায় বসতেন, সে সময়ও তাদের মুখে কুরআনুল কারিমের তেলাওয়াতও অব্যাহত থাকতো। এমনকি এ সময়ের ভিতর তাঁরা তিন তিন পারা তেলাওয়াতও শেষ করে ফেলতেন।

সে যুগের নারীরা শিশুদেরকে দুধ পান করানো সময়ই কয়েক পারা পড়ে নিতেন

বর্তমানে এমন কোন মা আছে যে বলতে পারবে, আমি সন্তানদের বিশ্বাস আল্লাহর প্রতি তৈরি করছি। বলতে পারবে, আমি সকাল-সন্ধ্যা খাবার খাওয়ানোর সময়ই সন্তানকে এই উৎসাহ দিই যে, সর্বাবস্থায় সত্য বলবে। এ সমস্ত বিষয়ের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই নেই। বাবা সামান্য উপদেশ করলে তখন মা বলে ওঠে: বড় হলে ঠিক হয়ে যাবে। অথচ শৈশবের মন্দ

অভ্যাস বড় হওয়ার পরও ছাড়তে পারে না। আজ প্রশিক্ষণ না দেওয়ার কারণে সন্তান যখন বড় হয় তখন সে তার পিতাকে এমন ঘৃণা করে যেভাবে পাপ কাজকে ঘৃণা করা হয়।

এমনও সময় ছিলো, যখন মহিলারা ফজর নামায পড়ে সন্তান কোলে নিয়ে সূরা ইয়াসিন তেলাওয়াত করতে থাকতো। কখনো সূরা ওয়াকিয়া পড়তে থাকতো। যার বরকতে সে সময় সন্তানের অন্তরে নূর বর্ষণ হতো। আজ সেই মায়েরা কোথায়? যারা সকাল বেলা সন্তানকে কোলে নিয়ে কুরআন পড়তেন? এখন তো সূর্য উঠে যায় অথচ সন্তান তখনো ঘুমিয়ে থাকে। মাও ঘুমিয়ে থাকে। সন্ধ্যা ঘনাতেই মা সন্তানকে কোলে নিয়ে বসে যায়। একদিকে বুকের সাথে জড়িয়ে দুধ পান করানো হয় আর অন্যদিকে টিভি দেখে। হে মা! যখন তুমি টিভিতে পরপুরুষকে দেখছো, মিউজিক শুনছো এবং ভুল কাজ করছো, আর এ অবস্থাতেই বাচ্চাকে দুধ পান করাচ্ছো, তাহলে বলো, তোমার ছেলে কিভাবে আবদুল কাদের জিলানি হবে?

হিরা তুমি খুঁজবে, মূল্য আমি নির্ধারণ করবো

ভাওয়ালপুরের এক নবাব সাহেব মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। তিনি স্থানীয় আলেমদের বললেন, ভবন তো আমি তৈরি করে দেবো, কিন্তু সেটিকে কিভাবে আবাদ করা যাবে? আলেমগণ বললেন, আমরা আপনাকে এমন ব্যক্তিত্ববান আলেমের খোঁজ দিচ্ছি; যাকে আপনি মাদরাসায় নিয়ে এলে মাদরাসা ভালোভাবে চলবে। তিনি বললেন- 'হিরা তোমরা খুঁজবে আর মূল্য নির্ধারণ আমি করবো।' নবাব সাহেবের অর্থের ওপর বেশ গর্ব ছিলো। যখন ভবন তৈরি হয়ে এলো, তখন তিনি আলেমদের জিজ্ঞেস করলেন, বলুন, কেমন হিরা খুঁজে এনেছেন? তারা বললেন, কাসেম নানতুবী। তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, হযরতের বেতন কত হবে? তারা বললেন, হযরতের বেতন চার পাঁচ রুপি হবে। সেই যুগে বেতন এ পরিমাণই হতো। তিনি বললেন, যাও! আমার পক্ষ থেকে হযরতকে এক শ' রুপি মাসিক বেতনের প্রস্তাব দাও। এখন যে ব্যক্তি পাঁচ রুপির পরিবর্তে প্রতি মাসে এক শ' রুপি পেতে শুরু করে, তাহলে সে কতো বড় লোভনীয় প্রস্তাব পাচ্ছে। স্থানীয় সেই উলামায়ে কেরাম খুব খুশি হলেন। জ্বি হ্যাঁ, এখন তো তিনি অবশ্যই চলে আসবেন। তারা দেওবন্দে এসে হযরত কাসেম নানতুবী রহ.-এর সাথে মিলিত হলেন। হযরত তাদের খুব সমাদর

করলেন। জিজ্ঞেস করলেন, আপনাদের আগমনের উদ্দেশ্য কী? তারা বললেন, হযরত! একটি নতুন মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আপনি সেখানে চলুন। নবাব সাহেব আপনার জন্যে প্রতি মাসে এক শ' রুপি বেতন নির্ধারণ করেছেন। হযরত বললেন- ভাই! বিষয় হলো, আমার বেতন তো মাসিক পাঁচ রুপি। এর মধ্য থেকে তিন রুপি আমি আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজন পূরণের জন্যে ব্যয় করি। আর বাকি দুই রুপি গরিব, মিসকিন ও অসহায়দের মাঝে ব্যয় করি। কিন্তু আমি যদি সেখানে চলে যাই আর এক শ' রুপি বেতন পাই, তাহলে আমার খরচ বাবদ তো তিন রুপিই রাখবো। আর বাকি সাতানব্বই রুপি গরিবদের মাঝে বণ্টন করার জন্যে আমাকে সারা দিন তাদেরকেই খুঁজে বেড়াতে হবে। যার কারণে আমি পড়াতে পারবো না। কাজেই আমি যেতে পারবো না।

কাসেম নানতুবী রহ. এমন দলিল দিলেন যে, স্থানীয় উলামায়ে কেরামের মুখ বন্ধ হয়ে গেলো। একেই বলে দুনিয়াবিমুখতা। আল্লাহু আকবার কাবিরা।

আমাদের মহান আকাবির ইলমের সাথে সাথে আদবের প্রতি খুব লক্ষ্য রাখতেন। হযরত থানভী রহ. বলতেন- আমি সবসময় চারটি বিষয় মেনে চলি :

- প্রথম বিষয় হলো, আমার লাঠির যে মাথা মাটিতে লাগে সেই লাঠি আমি কখনো কাবার দিকে মুখ করে রাখি না। আমি বায়তুল্লাহ শরীফের এ পরিমাণ সম্মান করি।
- দ্বিতীয় বিষয় হলো, আমি আমার রিযিকের এ পরিমাণ সম্মান করি যে, কখনো চারপায়িতে বসে খাবার খেলে, আমি পায়ের দিকে বসি আর খাবার মাথার দিকে রাখি। এভাবে আমি খাবার খাই।
- তৃতীয় বিষয় হলো, যেই হাত দিয়ে পবিত্রতা অর্জন করি সেই হাত দিয়ে কখনো পয়সা ধরি না।
- চতুর্থ বিষয় হলো, যেখানে আমার কিতাবাদি রাখা থাকে আমি কখনো আমার ব্যবহার্য কাপড় সেই দীনি কিতাবাদির ওপর ঝুলিয়ে রাখি না।

একবার মুফতি কেফায়েতুল্লাহ রহ. ছাত্রদের জিজ্ঞেস করলেন, বলতো, আনওয়ার শাহ কাশ্মীরি রহ. কেনো এতো বিখ্যাত হলেন? কেউ বললো, তিনি ভালো মুফাসসির ছিলেন। কেউ বললো, তিনি ভালো মুহাদ্দিস ছিলেন। ভালো কবি ছিলেন। ভালো যুক্তিবিদ্যা জানতেন। তিনি বললেন, না। এ প্রশ্নটাই

জনৈক ব্যক্তি একদিন খোদ হযরত কাশ্মীরি রহ.-কে জিজ্ঞেস করলে তখন তিনি বলেছিলেন : ওই সমস্ত বিষয় আমার মধ্যে ছিলো–

১. যখন আমি মুতাআলা করতাম অযূর সাথে মুতাআলা করতাম।

২. যখন আমার কিতাবের হাশিয়া (প্রান্তস্থিত টিকা) পড়ার প্রয়োজন হত আর সেই হাশিয়া উল্টো দিকে লেখা থাকতো তখন আমি নিজের স্থান ত্যাগ করে ওই দিকটায় এসে হাশিয়া পড়তাম। হাদীসের কিতাবগুলোকে কখনো আমি আমার নিজের অনুগত বানাই নি।

আলেম তিন প্রকার

সুফিয়ান সাওরি রহ. বলেন, আলেম তিন প্রকার :

১. আলেম বিল্লাহ ও আলেম বি আমরিল্লাহ। তাঁরা হচ্ছেন ঐ আলেম, যারা আল্লাহকে ভয় পান এবং তাঁর বিধি-নিষেধ ও ফরয কাজগুলো জানেন।

২. শুধু আলেম বিল্লাহ : যিনি আল্লাহকে তো ভয় পান। তবে তাঁর বিধি-নিষেধ ও ফরয বিধানগুলো জানেন না।

৩. শুধু আলেম বি আমরিল্লাহ : যিনি আল্লাহর বিধি-নিষেধ ও তাঁর ফরয বিধানগুলো জানেন। কিন্তু তার অন্তরে আল্লাহর কোন ভয় নেই।[১৮০]

বদ আমলের কারণে বিশৃঙ্খলা ছড়ায়

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

> স্থলে ও জলে লোকদের বদআমলের কারণে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়েছে। যেন তাদেরকে তাদের কতিপয় কৃতকর্মের স্বাদ আল্লাহ আস্বাদন করিয়ে দেন। সম্ভাবনা আছে যে, তারা ফিরে আসবে।[১৮১]

ব্যাখ্যা : স্থলভাগ বলতে উদ্দেশ্য মানববসতি আর জলভাগ বলতে উদ্দেশ্য সমুদ্র, সামুদ্রিক পথ ও তীরবর্তী জনবসতি। বিশৃঙ্খলা বলতে উদ্দেশ্য প্রত্যেক ওই বিশৃঙ্খলা, যার কারণে মানবসমাজে ও জনবসতির মাঝে শান্তি ও নিরাপত্তায় ব্যাপক তারতম্য ঘটে এবং তাদের স্বাভাবিক

---

১৮০. তাফসিরে মসজিদে নববী : ১২২৫।

১৮১. সূরা রূম : আয়াত ৪১।

জীবনযাত্রা বিঘ্নিত হয়। কাজেই এর প্রয়োগ যেমন গুনাহ ও পাপকাজের ওপর করা সঠিক এভাবে যে, এক মানুষ আরেক মানুষের ওপর জুলুম করছে, আল্লাহর বেঁধে দেয়া সীমারেখা পদদলিত করছে, নৈতিকতার শৃঙ্খলা জলাঞ্জলি দিচ্ছে, খুন খারাবি ও রক্তপাত ব্যাপক হয়ে গেছে। তদ্রূপ একে প্রাকৃতিক, ভূমিগত ও আসমানি বিপদ-মুসিবতের ওপর প্রয়োগ করাও সঠিক। যা আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে শাস্তি ও সতর্ক বার্তা হিসেবে অবতীর্ণ হয়। যেমন, দুর্ভিক্ষ, মহামারী, বন্যা, প্লাবন ইত্যাদি। উদ্দেশ্য হলো, যখন মানুষ আল্লাহর নাফরমানিকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নেয় তখন তার কৃতকর্মের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে মানুষের কাজকর্মের গতি মন্দত্বের দিকে ঘুরিয়ে দেয়া হয়। ভূখণ্ডে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে। শান্তি ও নিরাপত্তা বিদায় নেয়। তদস্থলে ত্রাস, ভীতি, ডাকাতি, অপহরণ ও হত্যা, গুম ব্যাপক হয়ে যায়। তার সাথে সাথে মাঝে-মধ্যে জমিনি ও আসমানি বালা-মুসিবতও আসতে শুরু করে। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হলো, এই সাধারণ বিশৃঙ্খলা খোদায়ী গযব দেখে হয়তো মানুষ গুনাহের কাজকর্মগুলো ছেড়ে দেবে। তাওবা করবে এবং তারা আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করতে শুরু করবে।

এর বিপরীতে যেই সমাজ আল্লাহর বিধি-নিষেধের আনুগত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। যেখানে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ কার্যকর হয়। জুলুমের স্থলে সাম্য ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা হয়। সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তা এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে কল্যাণ ও বরকত অবতীর্ণ হয়। এক হাদীসে এসেছে- 'পৃথিবীর বুকে আল্লাহ তাআলার একটি হদ [শরঈ বিচার] প্রতিষ্ঠা করা সেখানকার মানুষের জন্যে চল্লিশ দিনের বৃষ্টি থেকেও উত্তম।[১৮২]

তদ্রূপ এক হাদীসে এসেছে- 'যখন একজন বদকার মানুষ মরে যায়, তখন তার কারণে একমাত্র মানবজাতিই শান্তি অনুভব করে না, বরং নগর, গাছ ও জন্তু-জানোয়ারও শান্তি বোধ করে।[১৮৩]

---

১৮২. নাসাঈ, কিতাবু কতয়ি য়াদিস সারিক, বাবুত তারগিব ফি ইকামাতিল হদ; ইবনে মাজাহ।

১৮৩. বুখারী শরীফ, কিতাবুর রিকাক, বাবু সাকারাতিল মাওত; মুসলিম, কিতাবুল জানাইয; তাফসীরে মসজিদে নববী সূত্রে পৃ : ১১৩৫।

গ্রামে নারীশিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

মুসলিম সমাজে ছেলেদের তুলনায় মেয়েরা বিভিন্ন ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার। ইসলামী শরীয়ত তাদের ওপর যেই বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে তা তো শতভাগ যৌক্তিক ও যথার্থ। তারা সেগুলোর ওপর আমল করে সার্বিক সফলতা অর্জন করতে পারে। এর বিপরীতে পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতি তাকিয়ে লোকেরা মেয়েদের ক্ষেত্রে যেই প্রাচীন নীতি গ্রহণ করে থাকে তা কতটুকু সঠিক ?

ছেলেরা একটা পর্যায় এসে নিজেদের ভবিষ্যত নিয়ে কল্পনা ও চিন্তা-ভাবনা করতে পারে, কিন্তু বিয়ের পূর্বে মেয়েদের পক্ষে নিজেদের ভবিষ্যৎ নিয়ে কল্পনা করা দুরহ ব্যাপার। একজন মেয়ে জানে না, তার আগামী জীবন কোন গ্রামে, কোন থানায়, কোন শহরে কাটবে? গ্রাম-গঞ্জের তুলনায় শহরের মাঝে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বেশী। যার কারণে শহরগুলোতে বিয়ের পূর্বে মেয়েরা কোনো ধরনের প্রতিবন্ধকতার শিকার হয় না। তারা তাদের আগামী জীবনের গতি-প্রকৃতি ও ভালো জীবনের জন্য চিন্তা–ভাবনা করার সুযোগ পায়। এর বিপরীতে গ্রাম-গঞ্জে পিতা-মাতার অসম্পূর্ণ জ্ঞানের কারণে তারা তাদের ঘরের মেয়েদেরকে পুরাতন রুসম-রেওয়াজের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখে। যেমন, তারা নারীদের শিক্ষাকে বাহুল্য মনে করে। ঘরের বাইরে আসা-যাওয়া করতে পাবন্দি আরোপ করে ইত্যাদি। তবে একে আপনি পিতা-মাতার ভ্রুক্ষেপহীনতা বলতে পারেন না, বরং সন্তানের প্রতি এসব আচরণ পিতা-মাতার ভালোবাসা ও আদর-স্নেহের প্রাকৃতিক বা স্বভাবজাত বহি:প্রকাশ বলতে পারেন। গ্রাম-গঞ্জের পিতা-মাতাদের নিজ মেয়েদের ক্ষেত্রে প্রাচীন রীতি-নীতির আলোকে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা আপন স্থানে সঠিক হতে পারে কি? জ্বি না হতে পারে না, বরং এর কারণে তাদের আত্মবিশ্বাসের প্রাচীরে ঘুণ ধরতে শুরু করে এবং তারা দুর্বল হয়ে যাবে। আর এই দুর্বলতাই বিয়ের পর তার শ্বশুরবাড়িতে ঘটিতব্য জুলুম ও নির্যাতনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বাস্তবতা হলো, নিজ কন্যাদের ওপর এ ধরনের অত্যাচার-নিপীড়নের কারণে পিতা-মাতাও কষ্টে দিশেহারা হন। তখন তাদের অনুভূতি হয়, হায়! আমরা যদি আমাদের মেয়েদেরকে লেখাপড়া শেখাতাম। তাহলে আজ এমন দিন দেখতে হতো না। কেউ আর বিনা কারণে আমাদের সন্তানের ওপর অত্যাচার করার চেষ্টা করতো না। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, এসময় এধরনের অনুতাপ ও হা-হুতাশ কোনো উপকার বয়ে আনে না।

কাজেই গ্রাম-গঞ্জের পিতা-মাতাদের কর্তব্য হলো, তারা তাদের মেয়েদের পড়াশুনার প্রতি মনোযোগী হবেন। তাদেরকে প্রচলিত ঠুনকো রুসম-রেওয়াজের শৃঙ্খল থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। যাতে তারা তাদের এই নতুন জীবনে শৃঙ্খলার গণ্ডির মধ্য থেকে অন্যের বিপরীতে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে এবং নিজের প্রতিরোধ নিজেই করতে পারে।

আমরা সবাই জানি, আগামীতেও গ্রামের মেয়েরা শ্বশুরবাড়ির লোকদের অত্যাচার-নিপীড়নের শিকার হতে থাকবে। কারণ, এ ধরনের পরিস্থিতি শহরেও ঘটে। কিন্তু এখানে তার বিরুদ্ধে শ্লোগান তোলার মতো অনেক সংগঠন আছে। কিন্তু গ্রাম পর্যায়ে কোনো নারীর ওপর কোনো অবিচার হলে গ্রামের ভিতর তার পক্ষে ইনসাফের ফায়সালা করার মতো কোনো প্রতিষ্ঠান নেই। কোনো সংগঠন নেই। সে নিজেও নিজের অধিকার আদায় করে আনতে পারে না। এই জুলুম থেকে বাঁচার সর্বোৎকৃষ্ট হাতিয়ার হলো, শিক্ষা। এই হাতিয়ার সবারই কাজে লাগানো উচিৎ। যাতে প্রত্যেকেই নিজের পায়ের ওপর দাঁড়াতে পারে। নিজেই নিজেকে রক্ষা করতে পারে। কোনো মেয়ে যদি একবার নিজেই নিজের রক্ষাকবচ হতে পারে তাহলে তার ভবিষ্যত সম্পর্কে আর কোনো চিন্তা–ভাবনা থাকবে না, বরং সে নিজেই নিজের ভবিষ্যৎ সাজিয়ে নিতে পারবে।

গ্রামের মেয়েদের মাঝে শিক্ষার প্রতি আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে শহরের পড়াশোনা জানা নারীদের কর্তব্য হলো, তারা সবাই একত্র হয়ে নিজেদের ব্যস্ততার ভিতর থেকে কিছুটা সময় বের করে আশপাশের গ্রাম-গঞ্জের মেয়েদেরকে শিক্ষার আলোয় আলোকিত করে তুলবে। তাদের মাঝে শিক্ষার সচেতনতা সৃষ্টি করবে।

সর্বদা বৃদ্ধ পিতা-মাতার খেয়াল রাখবে

সাধারণত বৃদ্ধ পিতা-মাতাকে বোঝা মনে করা হয়। অনেক ঘরে তাদের কোনো মূল্যই থাকে না। তাদের পরামর্শ ও নসীহতকে বাজে প্রলাপ বলে মনে করা হয়। তবে যে সমস্ত বুড়ো এখনো ব্যবসা-বাণিজ্য করেন বা পেনশন পান, তাদেরকে কোনো মতে সয়ে নেয়া হয়। পক্ষান্তরে যেসব বয়স্ক লোকের আয়-আমদানীর কোনো মাধ্যম থাকে না, পুরোপুরি ঘরের লোকদের দয়া ও বদান্যতার ওপর নির্ভর করতে হয় তাদের অবস্থা হয় খুবই শোচনীয়। আমার বলার উদ্দেশ্য হলো, যতো দিন এ বয়োবৃদ্ধ আয় রোজগার করেন, টাকা পয়সা আয় করেন বা ব্যবসা বাণিজ্য করে কিংবা পেনশন পান, ততো

দিন তাদের সেবায় কোনো প্রকার ত্রুটি করা হয় না। তাদেরকে বোঝা মনে করা হয় না। সময়মতো শুধু খাবারই নয়; খানিক বাদে বাদে ঘরের লোকদের ভালোবাসাও উথলে ওঠে। অসুস্থ হতে না হতেই চিকিৎসা সেবা ঘরের দোড়গোড়ায় এসে হাজির। কেননা তারা জানে, চিকিৎসার ব্যয়ভার তিনি পকেট থেকেই দিয়ে দেবেন।

এধরনের বয়স্কদের সম্মানও করা হয়; যাদের নামে জায়গা সম্পত্তি রয়েছে। তাদের সেবা-শুশ্রূষা বা তাদের ভালোবাসা এজন্যে উৎসর্গ করা হয় যে, তাদের সেই জায়গা-সম্পত্তি থেকে কিছু পাওয়া যাবে। অর্থাৎ আয় রোজগারকারী, ব্যবসা-বাণিজ্যকারী বা বেশুমার ধন-দৌলতের মালিক বয়স্ক লোকদেরকে চোখের মণি করে রাখা হয়। তাও ততোক্ষণ পর্যন্ত, যতোক্ষণ তাদের কাছে সেই ধন-দৌলত থাকে। অথবা তার নিজের উপার্জন করার ক্ষমতা থাকে। যখন তাদের হাতের সেই দৌলত ফুরিয়ে যায় বা তাদের গায়ে আয়-রোজগারের শক্তি থাকে না, তখন তাদেরকে বোঝা মনে করতে শুরু করে। এমনটি যে সব ঘরেই যে ঘটে, তা নয়। তবে অধিকাংশ ঘরেই বৃদ্ধ ও বয়স্কদের এ ধরনের আচরণের সম্মুখীন হতে হয়।

কথা এখানে এসে থেমে যায়, তাহলে এর জন্য কে দায়ী? এই সেই সন্তান; যাকে এই বয়স্করাই একদিন বেশ বিত্ত-বৈভবের ভিতর দিয়ে লালন-পালন করেছিলেন। কিন্তু বয়স্কদের কিভাবে সম্মান করতে হয়, কিভাবে তাদের খেদমত করতে হয়, সেই পদ্ধতি কি শিখিয়েছেন? তাদেরকে এ কথা বলেননি যে, তারাও তাদের এ সন্তান যখন অসুস্থ হয়েছিল তখন তাদেরকে বোঝা মনে করেননি। কখনো এ কথা ভেবে তাদেরকে পড়ালেখা থেকে ছাড়িয়ে আনেননি যে, কে ওদের শিক্ষা দেবে? এতো পয়সা কোত্থেকে এনে খরচ করবো? তারা কখনো তাদের সন্তানদের এই অনুভূতি হতে দেননি যে, তাদেরকে ভালো পোশাক-আষাক পরানোর জন্যে দিন-রাত তাকে কিভাবে পরিশ্রম করতে হয়েছে? তাদের ক্ষুধা নিবারণের জন্য অনেক সময় নিজে ক্ষুধার্থ অবস্থায় শুয়ে পড়তো? অথচ তাদেরকে পেট ভরে না খাইয়ে কখনো ঘুম পাড়ান নি। সন্তানদের ভবিষ্যত সুন্দর করার জন্য এই বয়স্করাই নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। তাহলে তাদের সাথে এখন কেনো এমন খারাপ আচরণ করা হচ্ছে?

যুবকেরা কি এটা মনে করে যে, তারা কোনোদিন বুড়ো হবে না? নিজের পিতা-মাতা ও ঘরের বয়স্ক লোকদের সাথে এই অসদাচরণ ও ঔদ্ধত্য প্রদর্শণকারী

যুবকেরা কি এ কথা ভুলে যাচ্ছে যে, কাল যখন তাদের সন্তান বড় হবে এবং নিজেরা যেদিন বুড়ো হবে, তখন আজ তারা তাদের বাবা-মায়ের সাথে যে আচরণ করছে একদিন তাদের সাথেও সেই আচরণ করা হতে পারে।

জীবন হচ্ছে এক হাতে দিয়ে অন্য হাতে নেওয়ার নাম। অর্থাৎ আপনি স্বীয় মুরুব্বীদের সাথে আজ যে আচরণ করছেন; হতে পারে পরবর্তীতে আপনাকেও সেই আচরণের মুখোমুখি হতে হবে। আমাদের এ কথা ভোলা যাবে না যে, প্রতিটি মানুষ একদিন না একদিন পৌঢ়ত্বের দরজায় উপনীত হবেই। বাস্তব হলো, আমরা আমাদের পিতা-মাতা ও ঘরের বয়স্কদের সাথে যে আচরণ করবো আমরা আমাদের সন্তানদের কাছ থেকেও ঠিক সেই আচরণ পাবো। এজন্য আমাদের জন্যে আমাদের বয়স্কদেরকে বোঝা মনে করা ঠিক হবে না। বরং আমাদের উচিত হবে, তাদের বিগত জীবনের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও তাদের বার্ধক্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে তাদের সেবা-শুশ্রূষা ও তাদের চিত্তরঞ্জন, তাদের প্রিয়-অপ্রিয়, তাদের আরাম-আয়েশ সর্বোপরি তাদের প্রতিটি প্রয়োজনের প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি রাখব।

বৃদ্ধ বয়সে মানুষ কিছুটা রুক্ষ ও খিট খিটে স্বভাবের হয়ে যান। আর এটা বয়সের প্রভাব। বলা হয় যে, একজন বয়স্ক আর একটি শিশু সমান। অর্থাৎ মানুষ যখন বুড়ো হয়ে যায়, তখন সে শিশুদের মতো আচরণ করতে শুরু করে। তাদের মতো জিদ করে। কথায় কথায় তেতে ওঠা তখন স্বাভাবিক বিষয়। বয়স্ক লোকেরা ঠিক সেই শিশুদের মতো হয়ে যায়, যাদের কথা না শোনা হলে বা তাদের চাওয়া পূরণ না করা হলে তেতে ওঠে বা রেগে ওঠে। আমরা সেভাবে বৃদ্ধ মা-বাবার সেবা করবো যেভাবে নিজের সন্তানকে করি।

বয়স্ক লোকদের এভাবে সেবা করলে শুধু যে দুনিয়াতেই লাভ হবে; এমনটি নয় বরং আপনার পরকালও সাজিয়ে ওঠবে। বয়স্ক লোকদের অসুস্থ হওয়া, কথায় কথায় ভুল ধরা অথবা সারাক্ষণ ঘরের মধ্যে পড়ে থাকাটা অবশ্যই আপনাকে পেরেশান করতে পারে। কিন্তু এধরনের পরিস্থিতিই আপনার জন্যে চরম পরীক্ষা। অর্থাৎ আপনি আপনার পিতা-মাতা বা ঘরের বয়স্ক লোকদের কতোটুকু সম্মান করেন? গুরুত্ব দেন? কতোটুকু তাদের সেবা যত্ন করেন? এটি আপনার জন্যে এক ধরনের পরীক্ষা। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেই আপনি ইহকাল ও পরকালে মুক্তি পাবেন।

বয়স্ক লোকদের কাছেও একটি নিবেদন করছি যে, আপনি নিজেকে এতোটা দুর্বল ও অসহায় বানাবেন না, যার কারণে সন্তান আপনাকে বোঝা মনে করতে

শুরু করবে। অথবা আপনার ওপর রেগে ওঠবে। এটি তখনি সম্ভব, যখন আপনি আপনাকে একজন আদর্শ অভিভাবক হিসেবে উপস্থাপন করবেন এবং নিজের সন্তানদেরকে এমনভাবে গড়ে তুলবেন যে, তারা যেন জীবনের কোনো অংশে আপনার সাথে ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ করার সাহস দেখাতে না পারে বা আপনার কোনো পরামর্শ যেন ছুড়ে ফেলার দুঃসাহস দেখানোর সুযোগ না পায়।

অনেক বয়স্ক লোক অকারণে ঘরের অভ্যন্তরীণ বিষয়াদির মাঝে নাক গলায়। অথবা নিজের কথা বাস্তবায়ন করার জন্যে সন্তানদেরকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করে। তার কথা অনুপোযুক্ত হলেও সেটি মানিয়ে নেয়ার জন্যে অযথা শক্তিপ্রয়োগ করে যে, আমার কথা মানতেই হবে। এ ধরনের পরিস্থিতিতে সন্তান ও পিতা-মাতার মাঝে তিক্ততা বেড়ে যায়। এজন্য বয়স্ক লোকদেরকেও বিগত জীবনের অভিজ্ঞতার আলোকে কর্মকৌশলের সাথে এগিয়ে যেতে হবে। দূরদৃষ্টির সাথে নিজের পরিবারকে এগিয়ে নিতে হবে। তাদেরকে আগামী জীবনে এগিয়ে যেতে সহায়তা করতে হবে। যুবকদেরও কর্তব্য হলো, তাদেরকে সঙ্গ দেওয়া। যদি তাই হয়, তাহলে যুবক ও বয়স্কদের মধ্যকার সেই দূরত্ব দূর করা সম্ভব হবে। মুসলিম সমাজের মাঝে ইসলামী শিক্ষা সামনে রেখে বয়স্কদের প্রতি সম্মান জানানো ও তাদের প্রয়োজন পূরণের প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী। এর দ্বারা দ্বিগুণ ফায়দা হয়। দুনিয়াতেও উপকার হয়, পরকালে তো হয়ই।

মা, মেয়ে, স্ত্রী ও বোন হিসেবে নারীর মর্যাদা

সমাজে নারীর অবস্থান সবসময় দুর্বল বা অবলা মনে করা হয়। আর নারীরা নিজেরাও মাথা পেতে সেই বাস্তবতা মেনে নিয়েছে। অথচ প্রকৃত অবস্থা এর সম্পূর্ণ বিপরীত। সত্যি বলতে এই স্পর্শকাতর শ্রেণীই শক্তির উৎস। এর কয়েকটি স্তর রয়েছে :

মা : নারী মা হয়। তাই তার কাছে এতো বড় শক্তি রয়েছে যে, সে পুরুষকে জন্ম দেয়। এভাবে উভয় জাহানের স্রষ্টা মহান আল্লাহ 'মা'কে এমন শক্তি দিয়েছেন যে, সে এখন সৃষ্টির কাজ করতে পারছে। তারা মৌসুমের শীত ও গ্রীষ্মের আঁচ থেকে নিজ সন্তানকে রক্ষাও করেন। এভাবে নিজের সমস্ত শক্তি ব্যয় করে, নিজের সন্তানকে দুধ পান করিয়ে, কোলের মধ্যে শুইয়ে, তার সুস্থতার সার্বিক খেয়াল রেখে লালন-পালন করেন। এই পুরুষ যিনি অর্থ উপার্জন করে নিয়ে আসেন, তার মধ্যে কি এই শক্তি আছে যে, সে নিজের সন্তানের জন্য এসব করতে পারবে?

মেয়ে : একজন মেয়ে তার পিতা-মাতার জন্যে এমনই এক আশ্রয় যে, যদি কারো মেয়ে না থাকে, তাহলে বুড়ো বয়সে তাকে বন্ধুহীন জীবন কাটাতে হয়। ছেলের মা-বাবারা বার্ধক্যের সময় এ আফসোস খুব বেশী করেন যে, হায়! আমরা যদি মেয়ে নামক নেয়ামত থেকে মাহরূম না হতাম! একজন মেয়ে শৈশব থেকে বড় হওয়া পর্যন্ত এমনকি বিয়ে হওয়ার পরও পদে পদে পিতা-মাতার জন্যে আশ্রয়কুটির হয়ে থাকে। সে মায়ের সঙ্গে গার্হস্থ্য কাজে হাত লাগায়। ছোট ভাই বোনদের লালন-পালনে সহায়তা করে। পিতা ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে ঘরে ফিরলে সে বাবার সেবা-যত্ন করে। তাকে বিছানায় শোয়াতে সাহায্য করে। আজকালকার মেয়েরা তো কয়েক কদম এগিয়ে পিতা-মাতার জন্যে আর্থিক আশ্রয় হচ্ছে। ঘরের আয় রোজগার কম হলে সে আর্থিকভাবে সহায়তা করতেও পিছপা হচ্ছে না। মেয়ে পড়াশোনার পাশাপাশি টিউশনি ইত্যাদি করে ঘরের আয় রোজগারে বাড়তি সাহায্য করে। তাদের ওপর বোঝা হয়ে থাকে না।

স্ত্রী : জীবনসঙ্গিণী হিসেবে একজন নারী এমন বড় কিছু অবদান রাখতে পারে যা একজন পুরুষের পক্ষে স্বামী হিসেবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব নয়। সে স্ত্রী হয়ে পুরুষের দুর্বলতাকে তার আঁচলের নিচে ঢেকে দেয়। তারা শুধু ঘরে বসে সংসার সামলায় না, বরং অনেক সময় এক পা অগ্রসর হয় স্বামীর আয়-রোজগার বাড়ানোর জন্য। নিজে চাকুরি ইত্যাদি করে থাকে। শিশুদের লালন-পালনও এমনভাবে সেরে ফেলে যে, অনেক সময় তো স্বামী টেরই পায় না যে, তার বাচ্চা কিভাবে এত বড় হয়ে গেল? স্বামী অসুস্থ হয়ে গেলে স্ত্রী দিন-রাত একাকার করে তার সেবা-শুশ্রূষা করে।

বোন : নারী বোন হিসেবেও তার ভাইয়ের জন্যে নেয়ামত হিসেবে কম নয়। প্রায়শই দেখা যায় যে, খাবারের দস্তরখানে বোন তাদের মুখের খাবারও ভাইয়ের পাতে তুলে দেয়। নিজের চাহিদার ত্যাগ স্বীকার করে ভাইকে ভালো কাপড় পরিধান করার সুযোগ করে দেয়। সে মনে করে, আমার ভাইকে বাইরে যেতে হবে। নিজের পড়াশোনার চে' ভাইয়ের পড়াশোনার প্রতি বেশী মনোযোগ দেয়। ভাইয়ের আবেগকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রেও বোন সবসময় আগে আগে থাকে। বোনের আঁচলে মুখ লুকিয়ে অধিকাংশ ভাই নিজের সমস্ত বেদনা হালকা করে।

এই সমস্ত বিষয়গুলো ছাড়াও একজন নারী অফিসের কর্মকর্তা, কোম্পানীর সদস্য, দায়িত্বসচেতন অফিসার হিসেবে পুরুষের তুলনায় ভালো

কর্মদক্ষতা দেখায়। যদি সে একজন শিক্ষিকা হয়, তাহলে শিশুদেরকে অপেক্ষাকৃত ভালো পড়াতে পারে। নারীসুলভ স্নেহ, মায়া, মমতা, তাকে এই ময়দানে পুরুষের তুলনায় অনেক দূর এগিয়ে দিয়েছে।

"প্রত্যেক সফল পুরুষের পেছনে একজন নারীর হাত থাকে।" এই উপমাটি খুবই বিখ্যাত। আর এমনটা অনুভূত হয় যে, দীর্ঘ অভিজ্ঞতা ও অধ্যয়নের পর এই উপমাটি অস্তিত্বে এসেছে। আদম আ. যখন নির্জনতায় ঘাবড়ে গিয়ে একজন সঙ্গীর কামনা করছিলেন, তখন আল্লাহ তাআলা তাঁকে একজন নারীর আকৃতিতে এমন সঙ্গের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন যে, যিনি তাঁর জন্য সর্বদিক থেকে একজন সফল সঙ্গী প্রমাণিত হয়েছেন। তা সত্ত্বেও পুরুষ জাতি নারী জাতির সত্যিকার মূল্যায়ন করছে না। তাকে সবসময় নিজের দাসী মনে করে আসছে। ইসলাম নারী জাতিকে ওই মর্যাদা দান করেছে যা পৃথিবীর অন্য কোনো ধর্ম বা আইন দেয়নি। তা সত্ত্বেও মুসলমানদের মাঝে নারী জাতির প্রতি অবজ্ঞা ও তাদের ওপর অত্যাচার-অনাচারের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে। পুরুষ তার কাছ থেকে নিজের প্রতিটি বৈধ-অবৈধ খায়েশ চরিতার্থ করে নেয়ার চেষ্টা করে। এরপরও তার প্রতি অবিচার করে। এভাবে সে আল্লাহপ্রদত্ত এই বিশাল একটি নেয়ামতের অবমূল্যায়ন করছে। কাজেই বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রয়োজন হলো, নারীজাতির প্রকৃত শক্তি পুরুষকে জানতে হবে এবং ইসলাম তাকে যে সম্মান দিয়েছে তার সেই প্রাপ্য সম্মান তাকে দিতে হবে।

নারীর আসল শিক্ষালয় তার শ্বশুরবাড়ি

যেভাবে কোনো বিদ্যালয় বা প্রশিক্ষণকেন্দ্রে একজন ব্যক্তির অভ্যাস, চিন্তাধারা ও মন-মানসিকতার গঠন তৈরি করা সম্ভব; ঠিক সেভাবেই একজন নারী জীবনকে সুন্দরভাবে অতিবাহিত করতে এবং যেকোনো লেনদেন সঠিকভাবে নিষ্পন্ন করার বিদ্যা তার শ্বশুরবাড়িতে শিখতে পায়। মেয়েদের আসল ঘর হলো, তার শ্বশুরবাড়ি বা তার স্বামীর ঘর। এ ঘরেই সে জীবনের প্রতিটি ভালো মন্দের তারতম্য করতে শেখে। যতোদিন পর্যন্ত একজন মেয়ে তার বাবার বাড়িতে থাকে, ততোদিন সে আদর-সোহাগের কারণে অনেক কিছুর প্রতি মনোযোগ দেওয়ার সুযোগ পায় না। তখন তার থাকে চিন্তাহীন জীবন। যা সে শতভাগ উপভোগ করতে চায়। পিতা-মাতার ঘরে থেকে কোনো মেয়ে তার আসল জীবন অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনের কোনো কিছুই শিখতে পারে না। দাম্পত্য জীবনের জট বেঁধে থাকা রহস্যগুলো শ্বশুরবাড়িতে এসেই একে একে খুলতে শুরু করে। যে কোনো পিতা-মাতা তার মেয়েকে

বেশী থেকে বেশী সুখ দেওয়ার চেষ্টায় বিভোর থাকে। বিয়ের পূর্বে একজন মেয়ে তার বাবার বাড়িতে জীবনের একেকটি মুহূর্ত এমনভাবে উপভোগ করে যে, তার এ জীবনকে পেরেশানি বা ঝামেলার হাতে সঁপে দিতে চায় না। এ কারণেই এখানে জীবনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ বুনিয়াদি বিষয়ের প্রতি তার ধ্যান দেওয়া হয় না। এ বিষয়গুলো সে বিয়ের পরই জানতে পারে।

নারীদের জন্যে শ্বশুরবাড়ি একটি আদর্শ বিদ্যালয়ই নয়; বরং একটি পরীক্ষাকেন্দ্রও বটে। শাশুড়ি সেই বিদ্যালয় ও পরীক্ষাকেন্দ্র তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে থাকেন। শাশুড়ির বুদ্ধিমত্তা ও বৈষয়িক বোধশক্তির ওপর গোটা ঘরের আনন্দ-খুশি নির্ভর করে। যদি পূর্ণ ঈমানদারি ও নিরপেক্ষ মনোভাব নিয়ে নিরীক্ষা করা হয় তাহলে দেখা যাবে, অধিকাংশ শাশুড়ি সংকীর্ণ মন-মানসিকতা ও অনেক ক্ষেত্রে আমিত্বের প্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। যার কারণে বউদের সাথে তাদের মনোমালিন্য লেগেই থাকে এবং বেশ ভালো ঘরও জাহান্নামে রূপান্তরিত হয়।

এটি ঠিক যে, আচার-ব্যবহারের জন্য একমাত্র শাশুড়ি দায়ী নন; তবে এটি অবশ্যই বাস্তব যে, অধিকাংশ শাশুড়ি চরম আত্মকেন্দ্রিক মানসিকতার অধিকারী হয়ে থাকেন। তারা ছেলে ও ছেলেবউ; দুজনকেই মুঠোয় পুরে রাখতে চায়। এখান থেকেই বিশৃঙ্খলার সূচনা ঘটে। ছেলে চায় তার জীবন নিজের মতো করে কাটাতে। ওদিকে ছেলেবউয়ের চোখেও স্বাধীন জীবন যাপনের স্বপ্ন থাকে। এমতাবস্থায় অন্য কারো মর্জির বাধ্য হতে তাদের কারো কাছেই ভালো লাগে না।

অনেক মা তার ছেলের বিয়ের জন্যে অস্থিরতা দেখান। এমনকি সে তার ছেলের বিয়ের জন্য যে কোনো ধরনের ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত থাকেন। বউয়ের জন্যে অলঙ্কার তৈরি করতে সে নিজের অলঙ্কার বেঁচে দেয়। বা নিজের অলঙ্কার বউকে দিয়ে দেয়। এমতাবস্থায় প্রশ্ন সৃষ্টি হয় যে, তারা বিয়ের অল্প ক'দিন পর কেনো সেই বউকে দাসী ভাবতে শুরু করে? বউয়ের জন্যে যেকোনো ত্যাগ স্বীকার করার সেই আবেগ কোথায় হারিয়ে গেছে? অনেক শাশুড়ি এতোটাই সংকীর্ণ মানসিকতা ও বদমেজাযী হয়ে থাকেন যে, বউকে সবসময় যৌতুক কম নিয়ে আসার খোঁটা দেয়। এমতাবস্থায় স্ত্রী কিছু চাইতেই শাশুড়ির তরফ থেকে এই কর্কশ উত্তর উঠে আসে যে, 'তুমি তোমার মাকে কেনো বলোনি? সে তখন তোমার যৌতুকে তা দিয়ে দিতো'। অথবা 'তোমার বাবা-মা থেকে কেনো চাইছো না'?

যদি আমরা সেই বাস্তবতাকে অস্বীকার করি, তাহলে কিন্তু এ অবস্থার পরিবর্তন হবে না। আজ আমাদের সমাজের অধিকাংশ ঘরেই শাশুড়ি-বউয়ের মাঝে বিশাল দূরত্ব রয়েছে। এই সমস্যাগুলোর সমাধান করার একটাই পথ। তা হলো, সেগুলো থেকে পিছুটান না দিয়ে সেগুলোর মুখোমুখি হতে হবে। এই সমস্যাগুলোর সমাধান করার জন্যে বিশেষত পুরুষকেই সবচে' গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে। এধরনের পরিস্থিতিতে মা ও বউ; দু'জনের অবস্থান শুনতে হবে। একপক্ষের কথা শুনে অন্যপক্ষের ওপর তৎক্ষণাৎ রাগ বা বিরক্তি প্রকাশ করা চরম মূর্খতা সুলভ আচরণ হবে। এর দ্বারা যেমন ন্যায় বিচার করা হবে না, তদ্রূপ সমস্যার সমাধানও হবে না। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো, আমাদের দেশে সাধারণত পুরুষদের ভূমিকা একপক্ষীয় হয়ে থাকে। মাকে না বুঝিয়ে সে সমস্ত ক্রোধ স্ত্রীর ওপর ঢেলে দেয়। বা স্ত্রীর অসন্তুষ্টির ভয়ে তার ভুল ও অপ্রিয় বিষয়গুলোও নীরবে সয়ে নেয়। যার কারণে অনেক সময় স্ত্রী অবৈধ সুবিধা ভোগ করে।

প্রত্যেক মা-ই কামনা করে, তার মেয়ে যে ঘরে যাবে সে যেন ঐ ঘরে রাজত্ব করে। অথচ এই রাজত্বকামী মানসিকতা ঠিক নয়। রাজত্ব করলে বা অন্য কারো রাজত্ব মেনে নিলে অবস্থা সর্বদা বিশৃঙ্খলার দিকে যাবে। পারিবারিক ব্যাপারে নির্দেশ দেওয়া অথবা কারো অন্যায় আদেশকে মান্য করার দ্বারা ঘর সংসার চালানো যাবে না। কেননা এটি দ্বিপাক্ষিক বিষয়। এ জীবনে কখনো নিজের কথা মানাতে হয় আবার কখনো অন্যের কথাও মুখ বুজে মেনে নিতে হয়। যদি পিতা-মাতা এ কামনা করেন যে, তার মেয়ের জীবনে যেন কোনো দুঃখ-কষ্ট না আসে অথবা তাকে যেন কোনো বিপদ-মুসীবতে পড়তে না হয়, তাহলে তার কর্তব্য হলো, তাকে জামাতা নির্বাচন করার সময় তার ঘরের লোকদের সম্পর্কেও তথ্য সংগ্রহ করতে হবে।

অপর দিকে স্ত্রীর দায়িত্ব হলো, তাকে শ্বশুরবাড়ির প্রত্যেক সদস্য, বিশেষ করে শাশুড়িকে নিজের মায়ের মতো জ্ঞান করবে। তাকে এ চেষ্টা করতে হবে যে, স্বামীর সম্পূর্ণ মনোযোগ নিজের দিকে টেনে আনার চেষ্টা না করে সবাইকে আপন মনে করবে। তাদের সবার সাথে সদ্ব্যবহার করার চেষ্টা করবে। অপরদিকে প্রত্যেক শাশুড়ির দায়িত্ব হলো, সে ছেলেবউকে যদি নিজের মেয়ের চে'ও আপন না মনে করতে পারে তবে নিদেনপক্ষে মেয়ের সমকক্ষ যেন মনে করে। তাহলে এ লাভ হবে যে, ঘরের মাঝে ভারসাম্যপূর্ণ

পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সফল জীবনের জন্যে ভারসাম্যের বিকল্প নেই। পৃথিবীর প্রতিটি ঘরকেই উন্নতি ও অবনতির পথ অতিক্রম করতে হয়, আর ওই পথ অতিক্রম করতে পারলেই সংসার জীবন সুন্দর ও সুখময় হয়ে ওঠে।

যদি শাশুড়ি প্রয়োজনের চেয়েও বেশী আমিত্বভাব প্রদর্শন করে এবং স্ত্রীও গোয়ার্তুমির পরিচয় দেয় তাহলে সম্পর্কের মাঝে টানাপড়েন সৃষ্টি হয়। দুজনই তো মানুষ। দু'জনকে নিজেদের মূলনীতির মাঝে বৈচিত্র সৃষ্টি করতে হবে। সম্পর্কের স্থিতি বজায় রাখা ও সুন্দরভাবে চলার জন্য অনেক মনবাসনা ছাড়তে হবে, নিজের চাওয়া-পাওয়ার গণ্ডি থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তবেই এ জাতীয় সমস্যা সমাধান হবে।

আর্থিক স্বচ্ছলতার নাম উন্নতি নয়

আজ গোটা দুনিয়া দুর্ভাবনা ও অস্থিরতায় নিমজ্জিত। কোথাও শান্তি নেই। দুনিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে যুদ্ধের দামামা বেজেই চলেছে। যুদ্ধ ও পেশিশক্তির উন্মাদনা নির্মমতার আগুন বর্ষণ করছে। অধিকার লুণ্ঠিত হচ্ছে। চতুর্দিকে অত্যাচার, অনাচারের উন্মাতাল নৃত্য চলছে। আজ অত্যাচার ও অতিরঞ্জন ব্যক্তিবিশেষের নয়; এটি জাতি ও গোষ্ঠীর রীতি-নীতি হয়ে গেছে।

ভালোবাসা, ভ্রাতৃত্ব, ন্যায়নিষ্ঠা, সহমর্মিতা, সততা, বিশ্বস্ততা এবং অঙ্গীকার পূরণ করা ইত্যকার গুণগুলো আমাদের সমাজ থেকে বিদায় নিয়েছে। ঘুষ, চুরি, রক্তপাতের বাজার এখন গরম। মদ ও নেশাকর দ্রব্যের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে। নগ্নতা, অশ্লীলতা ও নির্লজ্জতা এখন সাধারণ হয়ে গেছে। নিষ্পাপ বাচ্চাদেরকে অপরাধ জগতে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সাধারণ থেকে অতি সাধারণ কথায় মানুষ খুন করে ফেলা হচ্ছে। প্রেম ও ভালোবাসার নামে কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব চলছে। অনেক স্কুল কলেজ এখন বেহায়াপনার আড্ডাখানা হয়ে গেছে। এই মন্দাচারগুলো ক্ষণে ক্ষণে রূপ বদলিয়ে মানবসমাজে আত্মপ্রকাশ করছে।

এগুলো মূলত নারীদের দুর্বল ভূমিকার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। যার দায়িত্ব ছিলো, মানব সম্প্রদায়ের চরিত্র গঠন করা; সেই নারী আজ উন্নতি, চাকুরি, নারী-পুরুষের সমান অধিকার, ফ্যাশন ও মেকাপ আর বিনোদনের আড্ডার আড়ালে হারিয়ে গেছে। বাহ্যত বর্তমান যুগের নারীরা অনেক উন্নতি করছে বলে মনে হচ্ছে। চাকরিবাকরির বিভিন্ন ক্ষেত্রে এবং অধিকাংশ ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের সম্পৃক্ততা চোখে পড়ার মতো। সে এখন বস হয়ে বসে থাকে। ব্যবসার বড় বড় শাখা পরিচালনা করে। এখন এমন কোনো স্থান নেই; যেখানে নারীর উপস্থিতি নেই। ক্লার্ক, টিচার, লেকচারার;

ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু I.P.S ও I.S এর মত প্রশাসনিক বড় বড় পদ সামলাচ্ছে। শিক্ষার ময়দানেও নিজের যোগ্যতা ও সফলতার পতাকা উড্ডীন করে যাচ্ছে। উন্নতির নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে সে কেবল সামনেই এগিয়ে যাচ্ছে। তার এই শ্রম, চেষ্টা ও সফলতা অবশ্যই প্রশংসনীয়। কিন্তু এ যুগে সে তার নাম, পরিচয় ও স্বকীয়তা খুইয়ে ফেলতে বসেছে। সে এখন আর পেছনে তাকাতে পছন্দ করে না। নারীত্বকে সে এখন বিদায় বলে দিয়েছে। দৌড়াতে দৌড়াতে সে লাজ-লজ্জার লেবাস খুলে ছুড়ে ফেলে দিয়েছে। পর্দাকে তো সেই কবে বিদায় জানিয়েছে। নিজের সম্মান ও সতীত্বের কঙ্কাল সে নিজেই ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে। তার ডানে-বামে, সামনে-পেছনে; চতুর্দিকে রক্তপিপাসু হায়েনার দল লোভাতুর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। অথচ এদেরকেই সে নিজের বন্ধু, সহমর্মী ও সমব্যাথী মনে করছে। এটি তার নির্বুদ্ধিতা নয় তো কী? স্বাধীনতা, উন্নতি আর চাকুরির অস্থিরতায় সে যখনি ঘর থেকে বের হয় তার ধ্বংস ও নিঃস্বতার গল্প ঠিক তখন থেকেই শুরু হয়।

শয়তান জানতো যে, মানব সম্প্রদায়ের সবচে মজবুত মোর্চা বা ঘাটি হলো তার ঘর। এজন্য সে তার চেলা-চামুণ্ডাদেরকে নির্দেশ দিয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই ঘরের তত্ত্বাবধায়ককে ঘরছাড়া না করা যাবে, ততোক্ষণ পর্যন্ত সফলতা পাবে না। এ কারণে তার চেলারা নারী স্বাধীনতার শ্লোগান তুলেছে। এরপর এখন তারা সর্বক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার চাইছে এবং নারীদেরকে ঘরে বসিয়ে রাখাকে অবিচার বলছে। কাজেই এখন নারীদেরকে পুরুষের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে হবে। নারীর নির্বুদ্ধিতা দেখুন! সে নারী-পুরুষের সমতার ধুয়া তুলে নিজেই নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করছে। ফলে এখন তার ওপর দ্বিগুণ দায়িত্ব অর্পিত হলো।

তাকে এখন ঘরও সামলাতে হবে, অফিসও সামলাতে হবে। এটি কি ওই অবলা শ্রেণীর প্রতি অবিচার নয়? খুব সকালে ওঠা। ঘরের সমস্ত কাজ নিয়মতান্ত্রিকভাবে সম্পন্ন করা। বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো। টিফিন তৈরি করা। অফিসে যাওয়ার জন্য নিজের প্রস্তুতি নেওয়া। ঘরের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা কাজের বুয়োকে বুঝিয়ে দেওয়া। এরপর সন্ধ্যার সময় স্বামী-স্ত্রী ক্লান্ত হয়ে যখন ঘরে ফেরে তখন তারা একরাশ বিরক্তি ও ক্রোধ নিয়ে ঘরে ফেরে। সামান্য কথা নিয়ে দু'জনের মাঝে ঝগড়া বেঁধে যায়। অথচ আগে এমন ছিলো যে, স্বামী যখন অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ঘরে ফিরত, তখন স্ত্রী

মুচকি হেসে এগিয়ে যেত, অভ্যর্থনা জানাত। চা নিয়ে আসতো। আগ থেকেই ঘর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখত। আর এভাবে ঘরের শিশুদের হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে স্বামীও তার ক্লান্তি ভুলে যেত। কিন্তু এখন আর সচরাচর সেই দৃশ্য দেখা যায় না।

এই অত্যাধুনিক যুগে স্বামী-স্ত্রীর দুজনেই অর্থোপার্জন ও জীবনের মান উন্নত করার ধান্ধায় ঘরের সুখ–শান্তির কথা ভুলে গেছে। দু'জনের হাতে সেই সময় কোথায় যে, তারা একে অপরকে বুঝবেন বা শিশুদের প্রয়োজন অনুভব করবেন। এধরনের পরিস্থিতির ভিতর দিয়ে প্রতিপালিত শিশু কেমন হবে? তা আপনি নিজেই অনুমান করে নিতে পারেন। এ জাতীয় শিশুরা যখন বড় হয়, তখন তাদের মধ্যে মা-বাবার প্রতি কোনো ভালোবাসা থাকে না। যেখানে রক্তের সম্পর্কের ভিতর ভালোবাসা থাকবে না, সেখানে মানবতা কোথায় অবশিষ্ট থাকবে। পয়সা কামানোর প্রতিযোগীতায় আজ আমরা কারো থেকে পিছিয়ে নেই। যতো অর্থ আমাদের হাতে আসে, তাতে আমাদের পেট ভরে না, বরং লোভের আগুন আরো দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠে। নারী যদি বুদ্ধিমতি ও কৌশলী হয়, তাহলে কম টাকা দিয়েও সুন্দরভাবে সংসার চালিয়ে নিতে পারে। তার মুখে কখনও অভিযোগবাক্য আসে না। কিন্তু ওই নারী যদি বুদ্ধিমতি ও কৌশলী না হয়, তাহলে অনেক অর্থও তার কাছে কম হয়ে যায়। একটার পর একটা অভিযোগ লেগেই থাকে। তবে এতো কিছুর ভিতরে এখনও এমন কিছু নারী দেখা যায়; যারা যুগপৎ ঘর-সংসার ও অফিস; দুটোই ভালোভাবে সামলিয়ে নিতে পারছেন। স্বামীও তার প্রতি খুশি। আবার সন্তানরাও যথাযথ প্রশিক্ষণ পাচ্ছে। কেননা সে চাকুরির পাশাপাশি ঘরকন্যার কাজও দক্ষতার সাথে চালিয়ে নিতে পারছে। সে চাকুরি ও ব্যবসা-বাণিজ্যের হৈহুল্লোড়ের মাঝেও নিজের মান-সম্মান ও সতীত্বকে চমৎকারভাবে রক্ষা করতে পারছে।

কাজেই উন্নতি শুধু আর্থিক স্বচ্ছলতার নাম নয়। যদি আজকের নারীরা আমাদের আগামী প্রজন্মকে ভালোভাবে গড়ে তুলতে পারেন, মানবতা শেখান, তাদের মাঝে নৈতিকতা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হন তাহলে এটি শুধু আমাদের দেশ ও জাতির জন্যে কল্যাণ বয়ে আনবে না; বরং দেশের সত্যিকার উন্নতির সোপান হবে।

মোটকথা, নারীর আসল কার্যক্ষেত্র হলো, তার ঘর। এই বাস্তবতা কিছুতেই ভোলা যাবে না।

কন্যা সন্তান আল্লাহর রহমত ও নেয়ামত

মহান আল্লাহ এ জগতের কোনো সৃষ্টিকেই অযথা নিরর্থক ও নিষ্প্রয়োজনে সৃষ্টি করেন নি। চাই তার সম্পর্ক প্রাণীকুল, উদ্ভিৎ, তরুলতা কিংবা সৃষ্টিকুলের সেরা মানবকুল-এর সাথেই হোক। অবশ্য কারো কারো সৃষ্টির কারণ ও হেতু হয়ত মানববোধ ও তার অনুভবের ঊর্ধ্বে হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিরহস্য, সৃষ্টিতত্ত্ব ও তার গুরুত্ব সম্পর্কে পূর্ণ অবহিত হবে, এই অধিকার কারো অর্জন হয় নি। আমাদের দৃষ্টিতে সেটা যতই ক্ষুদ্রাতি ক্ষুদ্র মনে হোক না কেনো।

হযরত মূসা আ.-এর যামানার একটি ঘটনা বলছি। বনী ইসরাঈলের এক মহিলা হযরত মূসা আ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, হযরত! আল্লাহ তাআলা টিকটিকি কেনো সৃষ্টি করেছেন? এটা তো কোনো কাজে আসে না। হযরত মূসা আ. উত্তরে বললেন, টিকটিকিও এ প্রশ্ন মানুষের ব্যাপারে আল্লাহর দরবারে করেছিল; হে আল্লাহ! আপনি মানুষ কেনো সৃষ্টি করেছেন? এরাতো অকৃজ্ঞ, অধৈর্য, লড়াকু, ঝগড়াটে। পৃথিবীজুড়ে গণ্ডগোল ও ফাসাদ সৃষ্টিকারী। লোভী ও বিদ্বেষী। এদের সৃষ্টি করে কী লাভ? এ প্রশ্নের উত্তরে আল্লাহ তাআলা বলে ছিলেন : 'সৃষ্টিজগতের লাভ ও রহস্য সম্পর্কে আমিই অধিক জ্ঞাত।'

কারো সৃষ্টি আমার ইচ্ছা ও মর্জি মোতাবেক হবে? এ ভাবনা ও কল্পনা শুধু অজ্ঞতা নয়, বরং বিবেক বহির্ভূত। যে মানুষের আপন বোধ-বুদ্ধির গর্ব রয়েছে এবং যাদের স্বীয় বিবেক-ভাবনার অহংকার আছে খোদ সে মানুষ যদি এ ভাবনার কথা প্রকাশ করে তবে যে তা অবাক কাণ্ডই নয়, বরং হতাশা ও আফসোসেরও কারণ বটে।

জাহেলী যুগ থেকে কুলক্ষণ গ্রহণের প্রথা চলে আসছে। তাদের কারো ছেলে সন্তান জন্ম নিলে তারা খুশি হতো। আবার কারো মেয়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করত। তাদের এহেন কাজের প্রতি অসমর্থন জানিয়ে কুরআনুল কারীমে ঘোষণা করা হয়েছে–

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ ○ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ.

'যখন তাদের কাউকে কন্যাসন্তান জন্মের সুসংবাদ দেয়া হয়, তখন তার মুখ কালো হয়ে যায়। তার সংবাদকে মন্দ ভেবে লোকদের

থেকে গোপন করতে থাকে। সে ভাবে অপমানবোধ নিয়ে তাকে রাখবে, না? তাকে মাটিতে পুঁতে ফেলবে'?[১৮৪]

জাহেলী যুগের লোকদের এ ধরনের পাষণ্ডতা ও পাশবিকতা সম্পর্কে দুনিয়ার সকলেরই কম-বেশী জানাশোনা রয়েছে যে, মেয়েসন্তানের ব্যাপারে তাদের এ নেতিবাচক কর্মপদ্ধতি চলমান ছিলো। ছেলেসন্তান জন্মের সুসংবাদে যে খুশি প্রকাশ করতে দেখা যেত মেয়েসন্তান জন্মের সংবাদে তা অনুপস্থিত থাকতো। আলেম-জাহেল, জ্ঞানী-গুণী কম-বেশী সবাই এ ব্যাধিতে আক্রান্ত ছিলো। একটু তো ভেবে দেখুন! কন্যাসন্তান জন্মানোর ক্ষেত্রে স্ত্রীর কী অপরাধ? যে বিষয়টি তার সাধ্যের বাইরে, যা সে ইচ্ছা করলেও সম্ভব নয়। বরং একজন মহিলা ন'মাস পর্যন্ত যে দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে পুরুষরা তা ন'দিন তো দূরের কথা সম্ভবত: ন'ঘণ্টাও সহ্য করতে পারবে না। এ ক্ষেত্রে স্ত্রীদের সাথে আমাদের আচরণ নিষ্ঠুর ও নিপীড়নমূলক হয়ে থাকে। আমরা কন্যাসন্তান জন্ম লাভের কারণে অসন্তুষ্ট হয়ে যাই। চোখ কপালে উঠে যায়। বরং কয়েক দিন পর্যন্ত স্ত্রীর সাথে কথা বলাও ছেড়ে দেয়। এমনকি নিষ্পাপ মেয়েশিশুটির চেহারা পর্যন্ত দেখে না। অপরদিকে ঘরের মহিলারাও এ স্ত্রী লোকটির ওপরও অত্যাচার করে এবং শাশুড়ি ও ননদরা গাল-মন্দ করে। অশালীন ও অশ্রাব্য কথা বলে তাকে কষ্ট দেয়া হয়। এমনকি নিজের ছেলেকে দ্বিতীয় বিবাহ করানোর ধমকি দিয়েও তার মনে ব্যথা দেওয়া হয়। কিছু মানুষতো এমন কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলে।

একজন মুসলমান হওয়ার সুবাদে আমাদের এহেন আচরণ আল্লাহ তাআলার নেয়ামতের না-শোকরের নামান্তর। তাঁর দানের অবমূল্যায়ণ, মানতিক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন নিরপরাধীকে অপরাধী সাব্যস্ত করা, নিঃসন্দেহে এটি একটি জঘন্যতম অত্যাচারী আচরণ।

কন্যা সন্তান আল্লাহ তাআলার নেয়ামত ও রহমত। নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন- যে ব্যক্তি দু'টি মেয়ে লালন পালন করলো এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে শিক্ষাদান করলো, এমনকি তারা জ্ঞানবুদ্ধিতে উপযুক্ত হলো। কিয়ামতের দিন আমি ও সেই ব্যক্তি এমনভাবে উপস্থিত হবো যেভাবে আমার হাতের এই দু'টি আঙ্গুলী এক সাথে থাকে।[১৮৫]

এখানে মহানবী সা. তাঁর শাহাদাত আঙ্গুলীকে পাশের আঙ্গুলের সাথে মিলিয়ে দেখিয়েছিলেন। মুসলিম শরীফে এ হাদীস বর্ণিত আছে, রাসূল সা.

---

১৮৪. সূরা নাহ্‌ল, আয়াত : ৫৮-৫৯।

১৮৫. মুসলিম, কিতাবুল বির্‌রে ওয়াস্-সিলাহ।

বলেছেন, যে ব্যক্তিকে কন্যাসন্তান দিয়ে পরীক্ষায় ফেলা হয়, অতঃপর সে ব্যক্তি এদের সাথে সদ্ব্যবহার করে। কিয়ামতের দিন এ কন্যা সন্তানরা তার জাহান্নামের পথে অন্তরায় হবে।[১৮৬]

এ ছাড়াও বহু হাদীস শরীফে কন্যা সন্তানের লালন-পালন, শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রতিপালনের ওপর পুরস্কারের সুসংবাদ এসেছে। সেই সাথে এর অসংখ্য গুণাগুণের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এ কারণেই বলা হয়েছে, কন্যাসন্তান আল্লাহর 'রহমত' ও 'নেয়ামত'। সন্তান হওয়ার দিক থেকে 'নেয়ামত' আর ক্ষমাপ্রাপ্তির কারণ হওয়ার দিক থেকে 'রহমত'।

মহান আল্লাহ নারীদেরকে অনেক বড় মর্যাদা দান করেছেন। মা, বোন ও মেয়ে ইত্যকার পুতঃবিধৌত সম্পর্ক জুড়ে দিয়ে নারীসমাজকে ধন্য করেছেন। আজকের জন্ম নেয়া মেয়েটি কাল মাতৃত্বের পবিত্র ধারকবাহক হবে। যার সন্তুষ্টি গুনাহ মাফের কারণ হবে। যার দোয়া কবুলিয়্যাতের মাধ্যম হবে। যার দিকে সম্মান ও শ্রদ্ধাভক্তির সঙ্গে তাকালে কবুল হজ্জের সাওয়াব পাওয়া যাবে। তার সেবা-শুশ্রূষা জান্নাতে প্রবেশের অন্যতম মাধ্যম হবে। এ মেয়েই তো সমস্ত সম্মান ও মর্যাদার ধারকবাহক হবে। বংশধারাগুলোর মাঝে 'সাইয়্যেদ' বংশ সবচে' উঁচু ও শ্রেষ্ঠ বংশের অধিকারী। আমরা যদি সে বংশপরম্পরার দিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করি তবে এ বিষয়টি খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের সামনে ফুটে ওঠবে। এ বংশধারাটির সম্পর্ক নবী করীম সা.-এর প্রিয় কন্যা জান্নাতি মহিলাদের সরদার হযরত ফাতেমাতুয্ যোহরা রা.-এর সাথে। এই মর্যাদা এক মেয়ের অর্জিত হয়েছে যিনি ওই ধারাবাহিক সৌভাগ্যের উৎস।

হাদীস শরীফের আলোকে আমাদের কি শোভা পায় যে, আমরা কন্যাসন্তানের জন্মে চিন্তিত বা অসন্তুষ্ট হবো? মহান আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের না-শোকর করবো? যার জন্ম লাভের ব্যাপারে তার নিজের কোনো হস্তক্ষেপ ও ক্ষমতা নেই বা এ ক্ষেত্রে যার কোনো দোষ নেই; সে নারীকে অপরাধী সাব্যস্ত করবো? আমাদের এহেন আচরণ একদিকে অত্যাচারমূলক অন্যদিকে এটি আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামতের প্রতি অকৃতজ্ঞতা ও আল্লাহর গজবকে আহ্বান করার নামান্তর। দৈনন্দিন জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা হলো, ছেলেসন্তানের তুলনায় কন্যাসন্তান অধিক বিশ্বস্ত, প্রেমময়ী ও সহানুভূতিশীল হয়। সুখ-দুঃখেও পাশে থাকে।

---

১৮৬. মুসলিম, আল বির্‌রি ওয়াস্-সিলাহ, বাবু ফজলিল ইহসান ইলান নাস।

সন্তানের ব্যাপারে মা'য়ের দোয়া কবুল হয়

মুফাক্কিরে ইসলাম হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী রহ.-এর নাম আমরা কে না শুনেছি? কয়েক বছর পূর্বে ছিয়াশি (৮৬) বছর বয়সে ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৯৯ মুতাবেক ২৩ রমজানে তিনি ইন্তেকাল করেন। আল্লাহ তাআলা মহান এ মনীষী থেকে দীনের এ পরিমাণ কাজ নিয়েছেন; ইসলামী ইতিহাসের নিকটতম অতীতে যার নজীর খুঁজে পাওয়া বড় মুশকিল। আল্লাহ তাআলা তাঁকে অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা ও মাকবুলিয়্যাত দান করেছিলেন। তিনি আল্লাহ তাআলার মাকবূল ও মাহবূব বান্দা ছিলেন; এ ব্যাপারে অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। শুক্রবার দিন, রোযা অবস্থায়, জুমুআর নামাযের ঠিক পূর্বমুহূর্তে সূরা 'ইয়াসীন' তেলাওয়াতরত অবস্থায় তাঁর আত্মা এ ধরাধাম ত্যাগ করে পরজগতে গমন করে। পৃথিবীর প্রায় সকল বড় এবং গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চলগুলোতে তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করা হয়। রমযান মাসের ২৭তম রাতে মসজিদে নববী ও মক্কা শরীফে সাতাশ লাখের চেয়েও বেশী উপস্থিত মুসল্লিগণ তাঁর গায়েবানা জানাযা আদায় করেন এবং তাঁর মাগফিরাত ও উঁচু মর্যাদার জন্য দোয়া করেন। আল্লাহ তাআলার কাছে এমন প্রিয় ও গ্রহণীয় খুব কম বান্দাদেরই জোটে।

নদভী রহ. ছেলেবেলায় খুব মেধাবী ছিলেন না। চতুরও ছিলেন না। মাদরাসায় তাঁর ইলমী যোগ্যতা স্বাভাবিক এবং মধ্যম মানের একজন তালেবে ইলমের মতো ছিলো। এতদ্সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা তাঁর থেকে যে পরিমাণ দীনের কাজ নিয়েছেন তা খুবই বিস্ময়কর। নদভী রহ.-কে যখন আল্লাহ প্রদত্ত কর্মকাণ্ডের বিষয়ে তাওফীকপ্রাপ্ত হওয়ার কারণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হতো; তখন তিনি বলতেন, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমার তাকদ্বীরে যে দীনি খেদমত জুটেছে তার পেছনে আমার সম্মানিতা মায়ের দোয়ার উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। মূলতঃ আমার সব অর্জন তাঁর সে দোয়ার বরকতেই হয়েছে। নদভী রহ.-এর মাতা বড় ইবাদতগুজার, পরহেযগার ও জিকিরকারিণী ছিলেন। ৯৩ বছর বয়সে তিনি ইন্তেকাল করেছিলেন। তিনি তাঁর মৃত্যু অবধি দৈনিক দু'রাকাত 'সালাতুল হাজাত' পড়ে তার এ ছেলের জন্য দোয়া করতেন, হে আল্লাহ! আমার চোখের মণি আলী থেকে যেন কোনো মন্দ কাজ না হয়। জীবনের প্রতিটি বাঁকে হে আল্লাহ! তুমিই তাঁকে সঠিক পথ প্রদর্শন করো। তিনি তাঁর এ ছেলেকে

ওসীয়ত করে ছিলেন, আলী! তুমি তোমার কর্মতালিকায় এ দোয়াটিকে অন্তর্ভুক্ত করে নিও–

اللّٰهُمَّ آتِنِي بِفَضْلِكَ أَفْضَلَ مَا تُؤْتِي عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ

'হে আল্লাহ! তুমি তোমার নেক বান্দাদেরকে যা দাও, মেহেরবানী করে আমাকে তার শ্রেষ্ঠ অংশ দান করো।'

নদভী রহ.-এর 'মা' তাঁর জন্মের পূর্বে একটি স্বপ্ন দেখেছিলেন যার ব্যাখ্যা তিনি নিজেই মৃত্যুর পূর্বে দেখে যান। স্বপ্নে দেখেছিলেন, এক অদৃশ্য আওয়াজকারী তার যবানে কুরআনের এ আয়াত জারী করে দিয়েছেন যে, 'আমরা তোমার চোখের শীতলতার জন্য যে গুপ্ত ধন গোপন করে রেখেছি সে সম্পর্কে তোমাদের কোনো ধারণা নেই।'[১৮৭]

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ

নদভী রহ.-কে তাঁর মা এভাবে প্রতিপালন করেছিলেন যে, যদি তিনি কোনো কাজের লোক বা বুয়ার ছেলেসন্তানের ওপর জুলুম করতেন, তাহলে তাদের থেকে শুধু ক্ষমাই চাইতে বলতেন না, বরং তাদের থেকে মারও খাওয়াতেন। ফলাফল এই দাঁড়িয়ে ছিলো যে, ছেলেবেলা থেকেই জুলুম-নির্যাতন, অহংকার ও আত্মম্ভরিতার প্রতি নদভী রহ.-এর ঘৃণা জন্মে ছিলো এবং কারো মনে কষ্ট দেওয়ার প্রতি তাঁর ভয় জন্মেছিলো। এশার নামায না পড়ে যদি শুয়ে পড়তেন তবে মা তাঁকে উঠিয়ে নামায পড়িয়ে নিতেন। ফজরের নামায জামাআতে পড়ার জন্য পাঠিয়ে দিতেন। ফজরের পর তেলাওয়াত ছুটতে দিতেন না।

উপরোক্ত ঘটনার আলোকে আমরা যদি আমাদের অবস্থার জরিপ চালাই তাহলে হয়ত আমাদের শতকরা দু'জন বাবা-মাকে সে অনুযায়ী পাওয়া যাবে। দৈনিক 'সালাতুল হাজাত' পড়ে সন্তানের জন্য দোয়া করা তো দূরের কথা সারা জীবনে একবার হয়ত আমরা সালাতুল হাজাত পড়ে সন্তানের উন্নতি-কল্যাণ ও সংশোধনের জন্য আল্লাহ তাআলার দরবারে দোয়া করিনি। অথচ স্বয়ং আল্লাহ তাআলা-ই আমাদের সন্তানদের কল্যাণ ও উন্নতির জন্য দোয়া করার পদ্ধতি পর্যন্ত শিখিয়ে দিয়েছেন এবং তার আদবও বলে দিয়েছেন। আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন- তোমরা তোমাদের সন্তানের জন্য আমার থেকে এভাবে চাও,

---

১৮৭. আস সাজদা : আয়াত ১৭।

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ○

'হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করো যারা আমাদের চোখ শীতল করবে। হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে মুত্তাকীদের ইমাম বানাও।'[১৮৮]

অনর্থক কথাবার্তা থেকে বাঁচুন

যখন দু'নারী পরস্পরে দেখা সাক্ষাত করে তখন তারা তৃতীয় নারীর ব্যাপারে অনর্থক কথাবার্তায় লিপ্ত হয়ে যায়। এ ধরনের নিষ্প্রয়োজন ও অনর্থক উদ্দেশ্যহীন কথাবার্তার প্রভাব কী হয়?

যদি আপনি কোনো ঘটনা বলতে চান, যা অন্য কারো সম্বন্ধে এবং ঘটনাটি আপনাকে কোনো মহিলা শুনিয়েছে তাহলে এ ঘটনাটি বলার পূর্বে আপনি তিনটি ধাপ খুব ভালো ভাবে ভেবে নিন। এ তিনটি ধাপ সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। প্রথম ধাপ হলো, আপনি যা বলতে যাচ্ছেন তা কি সম্পূর্ণ সত্য? দ্বিতীয় ধাপ হলো, আপনি যা বলতে যাচ্ছেন সেটা বলা কী খুবই প্রয়োজন? তৃতীয় ধাপ হলো, আপনার কথা কারো কষ্টের কারণ হবে না তো?

گوسپ ইংরেজী শব্দ। যাকে বাংলাতে গপ্পোবাজি বলা যায়। বর্তমানে তো 'গল্প' আকর্ষণীয় ব্যাপক অর্থবহ শব্দ হয়ে গেছে। অবশ্য এ শব্দের নিজস্ব একটি ইতিহাস আছে। মূলতঃ এর সঠিক মর্ম হলো, মানুষের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপন করা। কিন্তু এখন অর্থ হবে অন্যকারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে দায়িত্বহীনভাবে কথাবার্তা বলা।

আমাদের মাঝে এমন অনেকেই আছেন যাদের জন্য গল্পগুজব করা একটি মজার ব্যাপার। সবাই এক সঙ্গে বসে গল্প করতে থাকে। তা ছাড়াও অসংখ্য বই, পত্র-পত্রিকা আছে যা আমাদের মুখরোচক গল্প প্রদান করে থাকে। যা সাধারণত অতিরঞ্জিত কাজে এবং ধারণা সর্বস্ব হয়ে থাকে। অথবা যা বিভিন্নভাবে প্রলোভন এবং ঘুষ দিয়ে লেখানো হয়ে থাকে।

গল্পবাজি বা গপ-শপ কী জিনিস? গপ্পোবাজি অনেক ধরনের হয়। এখানের খবর ওখানে ছড়িয়ে বেড়ানো, সাদাসিধে ও যারা কারো ক্ষতি করে না; এদের থেকে শুরু করে যারা অন্যের নামে উচ্চবাচ্য করে এবং অন্যের বদনাম রটিয়ে বেড়ায়; তাদের পর্যন্ত এ ধারাটি প্রলম্বিত। চিন্তা-ফিকিরহীন

---

১৮৮. সূরা ফুরকান, আয়াত : ৭৪।

মানুষদের একটি বদ অভ্যাস হলো, তারা লোকদের নিয়ে নিজেদের মাঝে আপসে গপ-শপ করা শুরু করে দেয়। এমন দু'জন লোক যখন একত্র হয়; যাদের কাছে সময়ের কোনো অভাব নেই এবং যারা দীর্ঘক্ষণ কথাবার্তা চালাতে পারে; অবশ্যই তাদের কথা ও গল্পে পড়শী ও বন্ধু-বান্ধবদের দিকে মোড় নেয়, আর তখনই তারা এদের ব্যাপারে সত্য-মিথ্যা কথাবার্তা বলতে থাকে।

এটা জরুরী নয় যে, যারা এখানের খবর ওখানে ছড়িয়ে বেড়ায়, তারা জেনে-বুঝে এ কাজটি করে এবং তাদের উদ্দেশ্য কারো জন্য সমস্যা সৃষ্টি করা। কিন্তু সে এ কথার ধারণাও করতে পারে না যে, তার মুখ থেকে বের হওয়া দায়িত্বহীন কথাবার্তায় ধারাবাহিকতা অন্যত্র গিয়ে পৌঁছে। যদ্দারা ছোট কথা বিকৃত হয়ে ভিন্নরূপ ধারণ করবে এবং তার পরিণাম হবে ভয়াবহ এবং অন্তরে তিক্ততা সৃষ্টি হবে।

বাচাল ব্যক্তি মনের ভিতর কোনো কথা লুকিয়ে রাখতে পারে না। যে সব গোপন কথা সে জানতে পারবে, অন্যদেরকে সে তা অবশ্যই বলে দেবে। এ ধরনের কানাঘুষা মৌলিকভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণ হয়। তখন একে রোধ করতে আমাদেরকে সচেতনভাবে চেষ্টা চালানোর প্রয়োজন হয়। যাতে করে আমাদের ওপর আস্থা রেখে যে সব গোপন কথা বলা হয়েছে আমরা যাতে তা প্রকাশ না করি।

সবচে' খারাপ ও ক্ষতিকর গল্পগুজব হলো, যা কারো দুর্নাম ও বদনাম করার জন্য করা হয়। যে ব্যক্তি অন্যের বদনাম ছড়ানোর মিশন পরিচালনা করে এবং তার বদনাম করে সে ব্যক্তি মূলতঃ এমন এক হাতিয়ার বগলদাবা করে আছে, যে হাতিয়ার দিয়ে মাত্র একটি আঘাতে সে তার জীবনের উল্লেখযোগ্য যে কোনো সুকর্মকে ধুলিস্যাৎ করে দিতে পারে। কুৎসা রটানো ব্যক্তি সাধারণত হিংসুকও হয়ে থাকে। আর এ হিংসার কারণে মানুষের অগোচরে অনিষ্টতা করে থাকে এবং তাদের অনিষ্ট অনাচার খুঁজে বেড়ায় এবং তার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে মিথ্যা ও বানোয়াট কথাবার্তা ছড়িয়ে বেড়ায়। গলত-মিথ্যা কথাবার্তা, মনগড়া ও বানোয়াট কল্পকাহিনীর মাধ্যমে সে সমাজে মুনাফেকীর বীজ বপন করে। সে যেকোনো কথায়ই নিজের পক্ষ থেকে রং চড়িয়ে বলে। এর মাধ্যমে সে লোকদের মাঝে ঝগড়া বিবাদ ও ফিতনা-ফাসাদ উস্কে দেয়। সম্ভবত এ প্রকৃতির লোকেরা কারো হিতাকাঙ্ক্ষী হতে পারে না। এদের মুখ দিয়ে কারো জন্য ভালো বা উপকারী

কোনো কথা বের হয় না। এ জাতীয় লোকেরা গল্পগুজব করা, অন্যের ব্যাপারে কুৎসা রটানো এবং তা ছড়িয়ে বেড়ানোর মাঝে সুখ ও তৃপ্তি পায়। আমরা যদি অন্যদের কোনো উপকারে না আসি তাহলে তাদের ব্যাপারে অধিক আগ্রহ প্রকাশ না করাই কি সঙ্গত নয়?

নিজের সংশোধন নিজেই করবো

আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিজীবের সম্ভাব্য পরিমাণ ছত্রিশ (৩৬) হাজার। তন্মধ্যে মানুষও একটি মাখলুক বা সৃষ্টি। আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য দান করেছেন তা অন্য কোনো সৃষ্টির মাঝে নেই। আল্লাহ তাআলা মানুষকে সবচে' বড় উপহার 'বাকশক্তি' দান করেছেন। মহান আল্লাহ মানুষকে এমন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দান করেছেন যেগুলোকে সে ভালো কিংবা মন্দ কাজে স্বেচ্ছায় ব্যবহার করতে পারে। মানুষের জন্য আল্লাহ তাআলার শ্রেষ্ঠ উপঢৌকন হলো, তিনি তাদেরকে বিবেক-বুদ্ধি ও প্রজ্ঞা দান করেছেন। মানুষের জন্য আসমান ও জমিনকে অনুগত করে দিয়েছেন এবং নিজের কুদরতসমূহের কথা মানুষের সামনে তুলে ধরেছেন যাতে মানুষের আকীদা-বিশ্বাস ও ঈমান সুদৃঢ় হয় এবং তারা তাঁর অকুণ্ঠ আনুগত্য করে।

মানুষ হলো অপরাধ ও গুনাহের পিণ্ড। অন্যায় ও অপরাধ করা তার বৈশিষ্ট্য। এতদসত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা স্বীয় বান্দাদেরকে ক্ষমা করার ওয়াদা করেছেন। কিন্তু এ দুনিয়াতে এমনও কিছু মানুষ আছে যারা শুধু অন্যের ভুল-বিচ্যুতি আঙ্গুল উচিয়ে দেখিয়ে দেয়। অন্যের ভুলগুলো চিহ্নিত করে। কিন্তু সে হয়ত দিব্যি ভুলে যায়, তার মাঝেও ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে। তার ভিতরেও অপরাধের উপাদান রয়েছে। বাস্তবতা হলো, মানুষ নিজের দোষ-ত্রুটি ও ভুল-বিচ্যুতির হিসাব কষে না এবং নিজের দোষ ও অপরাধ গোপন করার জন্য অন্যের দোষ-প্রকাশ করে বেড়ায়।

অতএব এ কথা আমাদের হৃদয়গহীনে গেঁথে নেয়া উচিৎ যে, অন্যের দোষ খোঁজা যতটা সহজ, নিজেকে চেনা ততটাই কঠিন। আমরা অন্যের সংশোধনের দায়-দায়িত্ব তো নিতে পারি, কিন্তু নিজের সংশোধনের ব্যাপারে খুবই সংকীর্ণমনা।

একটি বিষয় ভেবে দেখা উচিৎ এবং পর্যবেক্ষণেরও উপযুক্ত যে, আমি যদি একটি আঙ্গুল তুলে কারো ভুলের দিকে ইঙ্গিত করি, তখন চারটি আঙ্গুল আমাদের প্রতি ইঙ্গিত করবে। সে সময়ও আমাদের এ অনুভূতি জাগ্রত হয় না যে, হয়তঃ আমার ভিতরেও সে অপরাধ ও ত্রুটি বিদ্যমান আছে। এ কথাটি

শতভাগ সত্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা আমাদের কথার ওপর আমল না করবো ততক্ষণ পর্যন্ত অন্যদেরকে সে কথায় প্রভাবিত করতে পারবো না। আমাদের উন্নতির পেছনে এটাই বাঁধা। ফলশ্রুতিতে আমরা সেই কর্মকে অসম্ভব বলে গণ্য করি।

আমরা যদি গভীরভাবে একটু ভিতর থেকে ভালোভাবে চিন্তা করি তাহলে এ 'অসম্ভব'ই আমাদের সফলতার ভিত্তি হতে পারে। 'অসম্ভব' শব্দ থেকে যদি আমরা 'অ' ফেলে দেই, তবেই তো সম্ভব হয়ে যায়। আমাদের পক্ষে তখন খুব সহজেই তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়ে ওঠবে। 'অ' অক্ষরটি-ই তো সকল চেষ্টা মেহনতের মূল–গোড়া। এ 'অ' এর জন্যই তো আমরা বারবার চেষ্টা করি। এ 'অ'ই আমাদের উন্নতির পথে বাঁধ সাধে। আমাদের জীবনের সকল দৌড়ঝাঁপ, চেষ্টা-তদবীর এ 'অ' এর জন্যই হয়ে থাকে।

নেপোলিয়ান বোনাপোর্ট-এর সফলতার নিগূঢ় রহস্য এই 'অ' 'না' বা 'নয়' শব্দেই লুকায়িত ছিলো। নেপোলিয়ানের মতে তার জীবন অভিধানে 'অ', বা 'না' শব্দ নেই। ঠিক হুবহু একই অবস্থা ইংরেজি শব্দ imposibile। ইংরেজিতে সোজাসাপটা ভঙ্গিতে এ শব্দটি উচ্চারণ করে কোন কিছু না হওয়ার ব্যাপারে সীলমোহর এঁটে দেয়া হয়। অবশ্য এ শব্দটি স্বয়ং নিজেই শব্দোচ্চারণকারী ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে উদাত্ত আহবান জানায় যে, এ শব্দের নিগূঢ়ে যে তত্ত্ব লুকিয়ে আছে, একটু মৃদু চেষ্টায়ই তা ফুটে ওঠে। যে ব্যক্তি নিজ মুখে এ imposibile শব্দ উচ্চারণ করে সে যেন আপন মুখে উচ্চারণ করেছে Im(am) posibile। অর্থাৎ এ 'অসম্ভব' বা 'পারবো না' শব্দটিই যেন চিৎকার করে বলে 'সম্ভব, আমি পারবো'। কিন্তু তবু আমাদের বোধ-বুদ্ধি এ আহবানে কান পাতে না। এ দাওয়াত গ্রহণ করে না।

যদি এতে কোনো ত্রুটি ও অভাব থাকে তবে এটা দূর হবে না। অথচ বিষয়টি এমন নয়। মানুষ যদি প্রকৃত চেষ্টা চালায় তাহলে তার পক্ষে কোনো জিনিসই অসম্ভব নয়। মানুষের মাঝে এর বড়ই অভাব যে, ব্যক্তি নিজের ভিতর ভালো গুণাগুণ সৃষ্টি করে একটি অনুপম নমূনা স্থাপন করবে; বরং 'অন্ধের হাতে বাতি' এই প্রবাদেরই প্রতিফলন ঘটে। অন্ধের বাতি থেকে সে নিজেতো উপকৃত হতে পারে না, কিন্তু অন্যরা তার দ্বারা উপকৃত হয়।

আমরা অন্যদেরকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করি। অন্যরা আমাদের দ্বারা সংশোধিত হয়ে যায়। আমরা অন্যদের ভুল-ভ্রান্তি নিয়ে হাসি-তামাশা করি। আমরা অন্যদের যোগ্যতা নিয়ে হিংসা করি; অথচ হিংসা না করে তার ওপর

আমাদের ঈর্ষা করা উচিৎ ছিলো এবং নিজেদের ভিতর এ পরিমাণ যোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করা উচিৎ ছিলো যা আমাদেরকে শক্তি জোগাবে। অন্যদের দোষ না ধরে উচিত হলো আগে নিজের সংশোধন করা।

এ কাজটি এখনই শুরু করে দিন। হয়তো আমাদের কারো ভিতর এ প্রশ্ন হচ্ছে যে, কিভাবে শুরু করবো? এবং কোথেকে শুরু করবো? এ প্রশ্নের উত্তর হলো, যার পূর্বে কিছু হয়নি তাকে সূচনা ও শুরু বলে। তাই আসুন, আমরাও ঠিক আজকের এখন থেকেই আত্মসংশোধনের সূচনা করি। সেই সাথে অন্যের দোষ-ত্রুটির দিকে দৃষ্টি দেয়া ছেড়ে দিই। তবেই হয়ত আশা করা যায়, আমরাও একদিন সফল-সুখি-সমৃদ্ধশীল জীবন যাপনকারীদের মিছিলে শামিল হতে পারবো।

নবী কারীম সা.-এর ছায়া দেখা যেত কি?

প্রশ্ন : নবী করীম সা.-এর শরীর মোবারকের ছায়া পড়তো কি?

উত্তর : হযরত যাকওয়ান রহ. বলেন, নবী করীম সা.-এর ছায়া দিন বা রাতে কখনই দেখা যেতো না। হাকীম তিরমিযী রহ. এ কথাটি বর্ণনা করার পর মন্তব্য করেন, 'এর কারণ হলো, কোনো কাফের যেন নবী করীম সা.-এর ছায়ার ওপর না হাঁটতে পারে। কেননা যদি কোনো কাফের হুযূর সা.-এর ছায়া মোবারকের ওপর হাঁটে, তবে তা রাসূল সা.-এর জন্য অসম্মানের কারণ হবে'।

ইবনে সা'বী রহ. বলেন, নবী করীম সা.-এর ছায়া মুবারক যমিনে পড়তোই না। হুযূর সা. নূর ছিলেন। রাত-দিনে যখনই চলাফেরা করতেন, তাঁর ছায়া প্রকাশ পেত না। কোনো কোনো আলেমদের মতে রাসূল সা.-এর একটি হাদীস শরীফ : اللّٰهُمَّ اجعلني نوراً এ মতটিকে সুসাব্যস্ত করে।[১৮৯]

ইমাম নববী রহ. তাঁর কিতাব আল আযকার (الأذكار) এর চার নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন, যে ব্যক্তির রাত-দিনের কোনো সময় অথবা নামাযের পর অথবা অন্য কোন নির্দিষ্ট সময় যিকিরের ওযীফা নির্ধারিত থাকে আর কোনো কারণে ঐ সময়ে তার ওযীফা পড়া ছুটে যায় তবে তার উচিৎ হলো, যখন-ই সুযোগ পাবে তখন-ই সে নিজ ওযীফা পূরা করে নেবে। (ওযীফা পড়া ছাড়বে না। কারণ ওযীফা পড়া যখন অভ্যাসে পরিণত হয়ে যাবে, তখন

---

১৮৯. সাবিলুল হুদা ওয়ার রাশাদ ফি সিরাতে খাইরিল ইবাদ : ২/৯।

আর তার ওযীফা ছুটবে না।) কিন্তু কেউ যদি তার ওযীফা পুরা করার ব্যাপারে অলসতা করে তখন তার থেকে নির্ধারিত সময়ে ওযীফা ছুটে যাওয়া সহজ হয়ে যায়।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, "যে ব্যক্তি তার পুরো ওযীফা বা আংশিক ওযীফা পুরা না করে ঘুমিয়ে পড়ল, অতঃপর সে তার ঐ ওযীফা ফজরের সময় থেকে নিয়ে যোহরের নামায পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ের কোনো এক সময়ে পুরা করে নিল তবে তার আমলনামায় যেন রাত্রেই পড়েছে এভাবেই সাওয়াব লেখা হবে।"[১৯০] অতএব আমার মত হলো, ছুটে যেন না যায়, সেভাবেই কিতাবটি পড়ার চেষ্টা করা উচিৎ।

যৌতুকের অভিশাপ থেকে বাঁচুন

আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকুলের মাঝে মানুষকে উত্তম ও শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা দান করেছেন। মানুষের মাঝে চিন্তা-ভাবনা ও বোঝার ক্ষমতা বিদ্যমান। পৃথিবীর সকল মানুষের কথা বাদ দিয়ে আমরা যদি শুধু মুসলমানদের কথা বলি, তবে তাদের কিছু কর্মকাণ্ড দেখে হতাশ ও অবাক না হয়ে পারি না। যে জাতিকে আখেরী নবী সা. নিজে আমল করে জীবন-যাপনের সকল পদ্ধতি বাতলে দিয়েছেন, সে মুসলিম সমাজ আজ কিছু কর্মকাণ্ডের কারণে নিন্দিত হচ্ছে। 'যৌতুক' প্রথা হচ্ছে সেই অভিশপ্ত কর্মকাণ্ডের একটি; যার সাথে ইসলাম ধর্মের কোনো সম্পর্ক নেই। এরপরও মুসলমানদের মাঝে এটি মহামারীর রূপ ধারণ করেছে। অথচ রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন, 'ওই বিবাহ খুবই বরকতময় যার ব্যয় খুব সামান্য হয়।'[১৯১]

যৌতুক আমাদের সমাজের একটি মারাত্মক ব্যাধি। এর জন্য আমাদের যুবসমাজই এককভাবে দায়ী। তারা তাঁদের বাবা-মার সাথে যৌতুকের ফরমায়েশ দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। অথচ যুবকদের এ স্বাধীনতা আছে যে, তারা ইচ্ছা করলে পারে, তারা নিজেদের জীবনের ব্যাপারে নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেবে এবং এ জন্য বাবা-মাকেও তাতে রাজি করাবে। যৌতুকের বিরুদ্ধে যুবসমাজই সবচেয়ে বেশী অগ্রণী ভুমিকা পালন করতে পারে। মা-বাবারা যতটুকু সাধ্যে কুলায় তারচে' বেশী মেয়েদেরকে

---

১৯০ সহীহ মুসলিম, ১/২৫৬।

১৯১. শুআবুল ঈমান, বায়হাকী কৃত।

দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু তারপরও যৌতুকলোভী পাষাণ মানুষগুলোর আত্মা ভরে না। আশ্চর্যের বিষয় হলো, এসব লোকদেরকে সমাজে সম্ভ্রান্ত লোক বলে গণ্য করা হয়।

এ ব্যাপারে যেমন যুবকদের কিছু দায়-দায়িত্ব আছে, তেমনি মেয়ে ও তার পরিবার পরিজনদেরও দায়মুক্ত করার কোনো অবকাশ নেই। কেননা, সাধারণত দেখা যায়, মেয়ের বাবা-মা তাকে খুশি করার জন্য ধার-কর্য করে অথবা ঘর বিক্রি করে যে কোনো মূল্যে যৌতুকের পণ সংগ্রহ করে। চাই ছেলেপক্ষ যৌতুক চাক বা না চাক। আসবাবপত্র দিলে তাদের মেয়ে খুশি হবে, সুখি হবে; এ ধরনের ভাবনা মেয়েপক্ষের একটি ভুল সিদ্ধান্ত।

সুতরাং প্রথমত তো যৌতুক না দেয়াই উচিৎ। দ্বিতীয়তঃ যারা যৌতুক খোঁজে এমন লোকদের সাথে নিজের মেয়ের বিবাহ না দেওয়াই উচিৎ। কেননা আজ যারা চাচ্ছে; কী গ্যারান্টি আছে যে, তারা এতটুকু পেয়েই সন্তুষ্ট হয়ে যাবে? কখনো কখনো তো এমনও দেখা যায় যে, বিবাহের প্রস্তাবের কয়েক মাসের মাথায় ছেলেপক্ষ নতুন যৌতুক চেয়ে বসে। মেয়েপক্ষ নিজেদের সম্মান রক্ষার্থে চুপচাপ তাদের দাবী-দাওয়া মেনে নেয়। অন্যথায় বিবাহ ভেঙ্গে দেয়ার হুমকিও দেওয়া হয়। আর এ কথা আমাদের সকলেরই জানা যে, যদি কোনো কারণে মেয়ের বিবাহ ভেঙ্গে যায়, তবে নির্দোষ হলেও সব দোষ তার ওপরই বর্তায়। সবাই ভাবে, অবশ্যই মেয়ের কোনো ত্রুটি আছে? তা না হলে কি এতো দিন পর বিবাহ ভেঙ্গে যায়! মেয়েপক্ষকে এ ধরনের কোনো হীনমন্যতা ও ধোকা সহ্য করা উচিৎ নয়। এ জাতীয় জটিলতা নিরসনে প্রয়োজনে আইনের আশ্রয় নেওয়া যেতে পারে।

যৌতুকের ব্যাধি আমাদের পুরো সমাজকে গ্রাস করে ফেলেছে। কী শিক্ষিত, কী মুর্খ, সবাইকে একই কাতারে দেখা যায়। আরাম-আয়েশ ও নিষ্প্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণ করার জন্য বিবাহ হয়ে যাওয়ার বহু বছর পরও ফরমায়েশ দেওয়া হয়। ফরমায়েশ পূরণ না হলে সারা জীবন এক সাথে থাকার কৃত অঙ্গীকার মুহূর্তেই ভেঙ্গে ফেলা হয়। এমনকি মেয়ে যখন বাবা-মার কাছে ফেরত আসে তখন সে একা থাকে না। তার সাথে সন্তানও থাকে। যার লালন-পালনের ভার মেয়ের মা-বাবাকে বহন করতে হয়।

মাঝে মধ্যে তো এমন হয় যে, ছেলে যদি কোন কাম কাজ না করে তাহলে ছেলের বাবা-মা তাকে সৌদি আরব বা অন্যান্য দেশে পাঠানোর জন্য মেয়ের কাছ থেকে খরচ চেয়ে বসে। এ ধরনের ঘটনাতো অহরহ ঘটছে।

কিন্তু একে আমরা আমাদের অজ্ঞতা ছাড়া আর কী বলতে পারি? আমরা দেখেও না দেখার ভান করে থাকি।

যৌতুকের কারণে সমাজের অনেক মেয়ের বিয়ে হচ্ছে না। অথচ তাদের বয়স পেরিয়ে যাচ্ছে। আধুনিক সমাজ আজ যৌতুককে ফ্যাশন বানিয়ে ফেলেছে। আজও কিছু মানুষ এমন আছেন যারা সাদাসিধে ভাবে বিনা যৌতুকে বিয়ে করছে। যদিও তাদের সংখ্যা অনেক কম। এরপরও যৌতুকের দাবীদারদের সংখ্যাই বেশী। এই যৌতুক ব্যাধির প্রতিরোধে যুবকদের সাথে মেয়েরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা যৌতুকের ফরমায়েশ সাধারণতঃ শাশুড়ি ও ননদদের থেকেই বেশী হয়ে থাকে।

ইসলামের মত সর্বজনীন সহজ ধর্মের অনুসারী হওয়ার কারণে আমাদের দায়িত্ব হলো- আমরা নিজেরা এ জাতীয় সামাজিক অন্যায় কর্মকাণ্ড থেকে বাঁচবো এবং অন্যদেরকেও এ থেকে বাঁচাবো। এটাই ইসলামের শিক্ষা ও বৈশিষ্ট্য। আমরা যদি আমাদের সমাজের সংশোধন ও সংস্কার করতে চাই তবে আমাদেরকে আগে নিজেদের ঘর থেকেই এ সংস্কারকাজ শুরু করতে হবে।

ইসলামের দণ্ডবিধি মানবসমাজের জন্য রহমত

ইসলাম ধর্মে নারীকে যে সম্মান ও মর্যাদা দেয়া হয়েছে, পৃথিবীর ইতিহাসের কোনো যুগেই তা কোথাও পাওয়া যাবে না। নারী-পুরুষের মাঝে পারস্পরিক তুলনার বিবেচনায় অধিকার ও মান-মর্যাদার ক্ষেত্রে নারী-পুরুষ সমান সমান। এ ক্ষেত্রে তাদের মাঝে কোন ব্যবধান নেই। অবশ্য তাদের উভয়ের মানসিকতা, অভিরুচি, চাহিদা ও সৃষ্টিগত দিক বিবেচনায় তাদের পরস্পরের দায়িত্বের মাঝে পার্থক্য ও ব্যবধান রাখা হয়েছে। এ কারণেই দু'জনের কর্মক্ষেত্র ভিন্ন। এটা শ্রেষ্ঠত্ব-অশ্রেষ্ঠত্ব কিংবা উচুঁ-নিচুর ব্যাপার নয়, বরং একটি অবধারিত সামাজিক প্রয়োজন। নারী-পুরুষের দায়-দায়িত্বের ব্যাপারে শরীয়তের আরোপিত বিধি-বিধানগুলোকে এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই বিবেচনা করা উচিৎ।

নারী-পুরুষ উভয়ের স্রষ্টা ও প্রতিপালক একজন। তারা পরস্পরে বৈবাহিক সম্পর্কে জোড়ার পর থেকে নিয়ে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাদের মাঝে কোনো পার্থক্য নেই। একজনের দুঃখ কষ্টকে অন্যের দুঃখ-কষ্ট থেকে হালকা জ্ঞান করারও কোনো সুযোগ নেই। এ কারণেই ইসলাম ধর্মে স্বামী-স্ত্রীর মাঝে কোনো কারণে মিল বা সম্পর্ক বজায় না থাকলে যেভাবে স্বামীর তালাক দেয়ার অধিকার দিয়েছে তদ্রূপ স্ত্রীরও 'খোলা' গ্রহণ করার অধিকার দিয়েছে। যদিও

অন্য কোনো ধর্মে এ ধরনের ছাড়-সুযোগ খুঁজে পাওয়া যায় না। উদাহরণস্বরূপ আমাদের দেশের প্রাচীন ধর্মমত-হিন্দুধর্ম বা সনাতন ধর্মের কথাই বলি; যাদের মানবতাবোধ ও মানববন্ধুতার কথা আর কী বলবো, সকলের-ই তো জানা। আমরা সেই হিন্দুধর্মে বৈবাহিক জীবনের এই সঙ্গীন মুহূর্তের বেলায় স্পষ্ট কোন দিকনির্দেশনা পাই না। 'তালাক'ও 'খোলা'র মত স্বভাবজাত এ নিয়ম হিন্দু ধর্মে পাওয়া যায় না। 'খোলা' এর কোনো ভাবনাও এ ধর্মের গ্রন্থগুলোতে খুঁজে পাওয়া যায় না। মহিলা যে পুরুষের সাথে থাকার জন্য অগ্নিকুণ্ডকে সাতবার প্রদক্ষিণ করল সেই আঁচল আঁকড়ে তাকে জীবনের শেষ শ্বাস বাকি থাকা পর্যন্ত থাকতে হবে। পারিবারিক জীবনে যত চড়াই-উৎরাই আসুক না কেনো এবং স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাত্রা যতো বিষেই তেঁতো হয়ে উঠুক না কোনো। বিধবার ব্যাপারটি তো আরো লোমহর্ষক ও মমর্ন্তুদ। মহিলা যদি বিধবা হয় তবে সাজ-সজ্জা করে ঘর থেকে বের হওয়া এবং ফিটফাট সাজগোজ করা তো দূরের কথা; সাজ-সজ্জার সামগ্রী পর্যন্ত ঘরে রাখার অনুমতি নেই। দ্বিতীয় বিবাহ করার তো কোন প্রশ্নই ওঠে না।

এর বিপরীতে ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার কী পরিমাণ নিশ্চিত করা হয়েছে? নারীর ব্যাপারে কতটা উঁচু মানসিকতা প্রদর্শন করেছে, তার অনুমান ছোট্ট একটা বিষয় থেকে খুব সহজেই করা যায়। যদি কোনো ব্যক্তি কোনো নারীর সতীত্বের ব্যাপারে কথা তুলে তবে তার অভিযোগ প্রমাণ করতে চারজন সাক্ষী উপস্থিত করতে হবে। সে যদি চারজন পুরুষের সাক্ষ্য উপস্থাপনে ব্যর্থ হয় তবে তার বিবস্ত্র পিঠে আশি (৮০)টি বেত্রাঘাত করা হবে। এক্ষেত্রে ইসলাম ধর্মের অবস্থান হলো, কোনো নারীর ব্যাপারে অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বে খুব ভেবে নাও। চিন্তা-ভাবনা ছাড়া নিছক অনুমানের ওপর ভিত্তি করে কখনো মুখ খুলবে না।

নবী করীম সা.-এর পারিবারিক ও সামাজিক জীবন সদা-সর্বদা আমাদের জন্য মাইলফলক। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা রা.-এর ওপর অপবাদ লাগানো হয়েছিলো। কিন্তু নবী করীম সা. পূর্ণ তত্ত্ব-তালাশ না করে কোনো প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করেননি। যদিও রাসূলে কারীম সা.-এর সাহাবীগণ ভিন্ন শব্দে- তখনকার ইসলামী সমাজও সু-ধারণার ওপর ভরসা করে বসে- তারা ধৈর্য ও পর্যবেক্ষণের নীতি গ্রহণ করে চূড়ান্ত ধৈর্যশক্তি ও সহ্যশক্তির প্রমাণ দেন। অবশেষে হযরত উম্মুল মুমিনীন রা.-এর নিরাপরাধ প্রমাণ করে পূর্ণ একটি 'রুকু' অবতীর্ণ হয়। যার মাধ্যমে মুনাফিকদের অপবাদের গোমর ফাঁস হয়ে যায়।

পশ্চিমা লেখকগণ ইসলামের যে সব দণ্ডবিধির খোলামেলা উপহাস করেছে সেগুলোর মাঝে 'ব্যভিচারের শাস্তি' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইসলামের এ শাস্তিকে তারা বর্বরতার পাশবিক প্রতিচ্ছবি বলে মনে করে। ইসলামের দণ্ডবিধির কোনটিই ভয়াল বর্বরতার বিগত দিনের কথা মনে করিয়ে দেয় না। এটাই সত্য যে, ইসলামের কোনো শাস্তি ও দণ্ডবিধিই মানবসমাজের জন্য ক্ষতিকারক নয়, বরং মানবসমাজের জন্য বিমূর্ত রহমত। যেনা-ব্যাভিচারের শাস্তি নিয়েই পর্যালোচনা করা যাক। এটা নিছক একটি শাস্তিই নয়, বরং পুরো সমাজের জন্য একটি সতর্কবার্তা। এর উদ্দেশ্য সমাজকে চারিত্রিক কদর্যতা থেকে পাক-পরিষ্কার রাখা। পশ্চিমাদের বিবেকপ্রসূত আইনে ব্যভিচার একটি সাধারণ অপরাধ। এটি গুনাহ হওয়ার কল্পনা পর্যন্ত পশ্চিমা সভ্যতার মাঝে নেই।

আধুনিক আইনে বা পশ্চিমাদের আইনে কেবল জোরপূর্বক যিনাকে অপরাধ গণ্য করা হয়। ভিন্ন শব্দে বললে এভাবে বলা যায় যে, পশ্চিমাদের স্বাধীনতার ব্যাপারে মনোভাব হলো, স্বাধীনতা ততক্ষণ পর্যন্ত স্বাধীনতা থাকে যতক্ষণ তা অন্য কারো স্বাধীনতার সাথে সাংঘর্ষিক না হয়। কিন্তু ইসলামে স্বাধীনতার সংজ্ঞা এর চেয়ে ভিন্ন। ইসলাম এর সাথে আরো একটি কথা যোগ করে, ইসলাম এটাও দেখে যে, উন্মুক্ত স্বাধীনতা প্রয়োগের ফলে সমাজে কী ধরনের প্রভাব পড়বে? পশ্চিমা ধ্যান-ধারণায় যে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপকেই স্বাধীনতাপরিপন্থি মনে করা হয়। অথচ ইসলাম এর পরিধিকে ব্যক্তি থেকে সমাজ পর্যন্ত পরিব্যপ্ত করে। সরাসরি হস্তক্ষেপের পাশাপাশি কোনো মাধ্যমে হস্তক্ষেপ করাকেও স্বাধীনতার পরিপন্থি বলে মনে করে এবং একে মানবসমাজের জন্য ক্ষতিকর বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

হয়ত কেউ কেউ এ কথা বলতে পারেন যে, ইসলামের স্বাধীনতাবোধ ও সমাজকে নিঃকলুষ রাখার দাবীটি যথার্থ-ই। কিন্তু এটা কেমন পাষণ্ডতা যে, কারো দ্বারা ব্যভিচারের মতো অপরাধ সংঘঠিত হয়ে গেলে, প্রস্তরাঘাত করে তাকে শেষ করে দিতে হবে? মেরে হত্যা করার (রজম করার) এ শাস্তিটি চূড়ান্ত পর্যায়ের বিভীষিকাময় ও প্রচণ্ড পাষণ্ডতার নিদর্শন বৈ আর কী? তাদেরকে বলবো, উপরোক্ত অভিযোগ উত্থাপনের পূর্বে একটু চোখ খুলে দেখে নেওয়া খুবই প্রয়োজন যে, যে সব দেশে ইসলামী আইন বাস্তবায়ন করা হয়, সে সব দেশে রজম, কেসাস এবং হাত কেটে দেওয়ার মতো মামলা ও বিচার কয়টি সামনে আসে? এর বিপরীতে যে সব দেশে উন্মুক্ত স্বাধীনতার

প্রাদূর্ভাব বা যেখানে অধুনা-সভ্যতা সংস্কৃতির সয়লাব চলছে বিশেষত: পশ্চিমা দেশগুলোতে ব্যভিচার, হত্যা-গুম, ডাকাতি ছিনতাই ইত্যকার গর্হিত কর্মকাণ্ডগুলো কতটা ব্যাপক আকারে বেড়ে চলছে? ইসলাম তার দৃঢ় অবস্থানের মাধ্যমে সমাজকে এই ভয়াবহ পরিণতি থেকে বাঁচাতে চায়। নতুন প্রজন্মকে চারিত্রিক এসব ব্যাধি ও রোগ-ব্যাধি থেকে পাক পবিত্র রাখতে চায়; যা দুর্ভাগ্যবশত পশ্চিমাদের কপালে জুটেছে।

বর্তমানে সেই শান্তি আর নেই। তাই দেখুন, মানুষ আজ কেমন বন্ধুহীন শত্রু বনে গেছে আর এদিক ওদিক পথভ্রষ্টের মতো চলছে। বিশেষভাবে পশ্চিমা দেশগুলোতে, যেখানে ইসলামী মতবাদ ও আদর্শ নিয়ে প্রতিনিয়ত উপহাস করা হয়; সে সব দেশে উচ্চ মানবীয় বৈশিষ্ট্য, আত্মিক ও চারিত্রিক উন্নত মূল্যবোধ স্বপ্নেও ধরা দেয় না। পশ্চিমা সমাজে আধ্যাত্মিক চিন্তা-চেতনাকে পশ্চাদগামিতা বলে ব্যক্ত করা হয়। এর বিপরীতে আপনি তাদের দেশগুলোতে একটু ঘুরে দেখে আসুন, যেখানে কোনো না কোনো ভাবে ইসলামী আইন কানুন কার্যকর আছে। অথবা যেখানে সর্বসাধারণের মাঝে ইসলামী বিধি-বিধান, আইন-কানুন, বিশ্বাস ও ভাবধারা উন্নত ও সর্বশ্রেষ্ঠ দর্শন হিসেবে জায়গা দখল করে নিয়েছে। এ দেশগুলোতে ওসব নির্লজ্জ দৃশ্য চোখে পড়ে না, যা লন্ডন প্যারিস অথবা ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোতে খোলা চোখে সাধারণভাবে নজরে পড়ে।

এখানে প্রয়োজন হলো, ইসলামের পারিবারিক ও সামাজিক আইন-কানুনের ব্যাপারে সাধারণের মাঝে যে ভুল বুঝাবুঝি আছে, মিডিয়ার মাধ্যমে তার সঠিক নিরসন করা। সে সাথে ইসলামের সামগ্রিক ও সর্বজনীন নিয়ম-নীতিগুলোকে লোকদেরকে বুঝিয়ে দেওয়া।

তোমার কোলে লালিত হয় জাতির ভাগ্য

ইলমের গুরুত্ব ও উপকার সর্বস্বীকৃত। আজকের এ যুগে শিক্ষা এতোটাই গুরুত্বপূর্ণ, জীবনের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস যতটা গুরুত্বপূর্ণ। একটি শিশুর জন্য মায়ের কোলই তার প্রথম মাদরাসা ও বিদ্যালয়। একজন নবজাতক যখন এ পৃথিবীতে আসে, তখন সে সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও ফেরেশতাদের মতো গুনাহমুক্ত পাক-পবিত্র থাকে। দুনিয়াবী সব ধরনের ঝায়-ঝামেলা ও কায়-কারবার থেকে সে থাকে মুক্ত। কিন্তু সে যখন তার জীবনের প্রাথমিক ধাপ অর্থাৎ শৈশব পার করে কৈশর জীবন শুরু করে, তার অবচেতনেই তার সামনে অনেক কিছু ঘটতে থাকে। শিশু যখন তার মায়ের কোল থেকে নিচে নামে তখন সে তার

ঘরের মাটিতে পা ফেলে তখনই তার অনুভব হয়ে যায় তার আশ-পাশের পরিবেশ কেমন? সে নিজের আশ-পাশের পরিবেশের সাথে ধীরে ধীরে মানিয়ে নিতে থাকে এবং ওই সমস্ত বিষয়কে গ্রহণ করে যা তার চারপাশে বিদ্যমান।

সামাজিক দৃষ্টিকোণ থেকে একটি শিশুর সমাজ হলো তার ঘর। ঘরের সব রীতি-নীতির সাথে সে খাপ খাওয়াতে শিখে বা বাবা-মা তাকে এসব রীতি-নীতি শিখায়। এ ক্ষেত্রে প্রধান ভুমিকা হলো মায়ের। কারণ, বাবা তো জীবিকা উপার্জনের খোঁজে ঘরের বাইরে থাকেন। মা যদি শিক্ষিত হন তবে প্রথমে তাকে লেখা-পড়া শেখান। কিন্তু মা যদি মূর্খ হয় তবে এ ব্যাপারে সে এতটুকু ভাবে না। যার ফলে শিশুটি তখন লেখাপড়া ছেড়ে খেলা-ধুলায় লিপ্ত হয়ে থাকে। যার পরিণাম এই দাঁড়ায়, তাকে যখন স্কুলে ভর্তি করা হয় তখন লেখাপড়ার প্রতি তার মাঝে সেই আগ্রহ ও মনোযোগ থাকে না, শিক্ষিত পরিবারের সন্তানদের মাঝে যেমনটা পাওয়া যায়।

মায়ের কোলের পর স্কুলে ভর্তি হওয়ার পূর্বে একজন শিশুর দ্বিতীয় বিদ্যালয় হলো, তার ঘর ও তার আশপাশের পরিবেশ। ঘরের বাইরের পরিবেশও শিশুদের মাঝে তেমন প্রভাব ফেলে; যেমন প্রভাব ফেলে ঘরের ভিতরের পরিবেশ। সধারণতঃ শিশুরা ঘরের বাইরের পরিবেশ থেকে অশালীন ভাষা ও অশ্রাব্য গাল-মন্দ শিখে। যার প্রতিফলন কম-বেশী ঘরের ভিতরেও প্রকাশ পেতে দেখা যায়। ভাই-বোনদের সাথে ঝগড়া কালে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার মুখ দিয়ে সেসব অশালীন শব্দ বের হয়ে যায়। বাচ্চাদের অভ্যাস হলো তারা বাইরের পরিবেশ থেকে সমবয়সী বাচ্চাদের থেকে সে যা শুনে, খুব দ্রুত তা আয়ত্ব করে নেয়। যৌথ পরিবারের বাচ্চারা বেশী অভিমানী ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল হয়। যৌথ পরিবারে লোকজনের সংখ্যা বেশী হওয়ার কারণে পারস্পরিক খোলামেলা কথা-বার্তা হয়। একটি শিশু যখন দু'ব্যক্তির মধ্যকার আচরণবিধি লক্ষ্য করে তখন সে তদ্দারা প্রভাবিত হয়। তার থেকে সে শিখে নেয়। যার ফলে এসব বাচ্চারা ঘরের বাইরের ঝগড়া-বিবাদে আগে আগে থাকে। যৌথ পরিবারে যদি বাচ্চাদের সামনে কিছু করার ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন না করা হয় তবে বাচ্চা সে স্রোতেই নিজের গাঁ ভাসাতে শুরু করে দেবে। যার পরিণতিতে পরিবারের অন্য সদস্যরা ভোগান্তিতে পড়তে পারে। অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতা এ কথাকে প্রমাণ করে যে, বাচ্চাদের মন স্বচ্ছ কাগজের মত। ছেলেবেলায় সে যে কথা-কাজ ও অভ্যাস অন্যদেরকে করতে দেখে বা শোনে তাই তাদের হৃদয়ে গেঁথে যায় এবং বদ্ধমূল হয়ে যায়। আর বয়স হওয়ার সাথে সাথে এগুলো আরো বাড়তে থাকে।

আমাদের সমাজকে একটি সুস্থ সমাজ বানাতে হলে এ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে হবে যে, আজকের শিশুটিকে আমাদেরকে আগামী দিনের শ্রেষ্ঠ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। যাতে শিশুটি মানবতাবোধ সম্পন্ন একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হয়ে উঠতে পারে। যেভাবে একজন বুঝমান ব্যক্তি ছোট্ট শিশু থেকে অনেক কিছু শেখে, তদ্রূপ একটি শিশুও তার বড়দের থেকে অনেক কিছু বরং সবকিছু শেখে ও গ্রহণ করে।

বাচ্চারা সাধারণতঃ অনুকরণপ্রিয় হয়। তাই পরিবারের সকলের এ কথাটি মনে রাখা উচিৎ যে, কোনো আচরণ ও কর্মকাণ্ড প্রকাশ পাবে বাচ্চা সাথে সাথে তা কবুল করে নেবে। অতএব বাচ্চাদের সামনে অনর্থক ও অপ্রয়োজনীয় অযাচিত কথা-কাজ ত্যাগ করা উচিৎ। মা-বাবা ও বড়দের এটা কেবল নৈতিক দায়িত্বই নয়, বরং সামাজিক দায়িত্বও বটে। আমরা যদি এ কাজটি করি তবে বাচ্চাদের প্রতি আমরা ন্যায় ও ইনসাফ করে একটি সুস্থ উপযুক্ত ও সুন্দর পরিবেশ নির্মাণে একজন আদর্শ সমাজ নির্মাতার ভূমিকা পালন করছি।

আজকের শিশু আগামী দিনের ভবিষ্যত ও পুঁজি। তাই তার সঠিক পরিচর্যার লক্ষ্যে ঘরের পরিবেশ সাস্থ্যসম্মত ও মনোরম করে রাখা আমাদের একান্ত কর্তব্য। কারণ, একটি শিশু ঘরের ভিতরে বাবা-মায়ের পাশাপাশি ঘরের অন্যান্য লোকজনের সাথেও সময় কাটায়। একটি ভাল সৎ শিশু যখন ঘরের বাইরে পা ফেলে তখন সমাজের বিভিন্ন লোকের সাথে তার দেখা-সাক্ষাত হয়। এসব লোকজন বাচ্চার চাল-চলন, আচার-ব্যবহার, কথা-বার্তা দেখে অনুমান করে নেয় যে, তার ঘরের পরিবেশ কেমন?

পরিবেশ যদি দীনি হয় তবে বাচ্চার মানসিকতায় অবশ্যই তা প্রভাব পড়ে। নচেৎ সাধারণত নতুন প্রজন্ম স্বীয় দীন ধর্ম থেকে হাজারো মাইল দূরে দেখা যাবে। এ অভাবের জন্য মা-বাবা ও ঘরের অন্য লোকদেরই দায়ী হতে হবে। শিশুরা কুদরতীভাবে নিস্পাপ হয়ে থাকে। তার এ নিস্পাপতার মাঝেই আগত দিনের ভবিষ্যত লুকায়িত থাকে। বিশেষত একজন মায়ের কোলেই তার সন্তানের ভাগ্য লালিত হয়।

পংক্তিটির মর্ম এটাই :

تیری گود میں پلتی ہے تقدیر امم

তোমার কোলেই লালিত হচ্ছে জাতির আগামীর ভাগ্য।

কুরাইশী নারী

হযরত উম্মে হানি রা. নবী করীম সা.-এর চাচাতো বোন ছিলেন। নবুওয়াত লাভের পূর্বে নবী করীম সা. চাচার কাছে তার সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার আবেদন করেছিলেন। কিন্তু কোনো সঙ্গত কারণে তিনি না করে দেন। তখন অন্য কারো সাথে তার বিয়ে হয়ে যায়। এরপর একসময় তিনি বিধবা হন। হযরত আলী রা.-এর আন্তরিক তামান্না ছিল যে, যদি এর সাথে নবী করীম সা.-এর বিবাহবন্ধন রচিত হয় তবে এটা বড়ই গৌরবের বিষয় হবে। একদিন হযরত আলী রা. সুযোগ বুঝে নবী করীম সা.-এর খেদমতে আরয করলেন, হুযূর! আপনি যদি উম্মে হানি বিনতে আবি তালেবকে বিয়ে করে নিতেন তবে সে দু'ভাবে আপনার আত্মীয় হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করবে। তো সে আগ থেকেই আপনার নিকটাত্মীয়। এখন সে আপনার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে নবীপত্নি হতে পারবে।

রাসূলে করীম সা. হযরত আলী রা.-এর পরামর্শকে পছন্দ করলেন এবং উম্মে হানিকে বিবাহ করার প্রস্তাব পাঠিয়ে দিলেন। উম্মে হানি রা. এ প্রস্তাবের উত্তরে বললেন, আল্লাহর রাসূল সা. আমার জানের চেয়ে প্রিয়, কিন্তু হুযূর সা.-এর হক অনেক বেশী সম্মানিত। আমার বাচ্চারা ইয়াতীম-যাদেরকে আমি লালন-পালন করছি। আমার ভয় হচ্ছে, আমি যদি হুযূর সা.-এর হক আদায় করার কাজে লেগে যাই তবে আমার বাচ্চাদের হক আদায়ে প্রভাব পড়বে। আর যদি বাচ্চাদের হক আদায়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ি তবে আল্লাহর রাসূলের হক আদায়ে আমার ত্রুটি হবে।

রাসূলে কারীম সা. যখন হযরত উম্মে হানি রা.-এর উত্তর শুনলেন, তখন তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হলেন এবং ইরশাদ করলেন, কুরাইশ বংশের নারীরা সকল নারীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ। তারা উটে চড়ে যাতায়াত করতে পারে, শিশু-সন্তানদের ওপর দয়ার্দ্র ও স্নেহ পরায়ণ হয়। স্বীয় স্বামীদের ব্যক্তিগত কাজের প্রতি পূর্ণ যত্নবান ও মনোযোগী হয়।[১৯২]

এটা জাহেলী যুগের কথা, মক্কায় এক শীর্ষস্থানীয় সরদারের মেয়ের নাম হিন্দা বিনতে উতবাহ ইবনে রাবিয়া। মেয়েটি তার সময়ের শ্রেষ্ঠ মেধাবিনী, বুদ্ধিমতী, রূপবতী ও সুন্দরী ছিলো। তাকে বিয়ে করার জন্য একই সময়ে

---

১৯২. আল ইসাবা : ৮/১৮৫।

সুহাইল ইবনে আমর এবং আবু সুফিয়ান ইবনে হারব প্রস্তাব পাঠিয়ে ছিলো। পিতা উতবা মেয়ের কাছে এসে বললো, মা! মক্কার শ্রেষ্ঠ দু'যুবক তোমাকে বিয়ে করার আগ্রহ প্রকাশ করেছে। এখন তোমার ইচ্ছা, তুমি যাকে পছন্দ করবে তার সাথেই তোমার বিয়ে দেবো। হিন্দা উত্তরে বললো, আব্বাজান! তাদের উভয়ের চরিত্র ও অভ্যাসের ব্যাপারে আমাকে অবহিত করুন। যাতে আমার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। উৎবা সুহাইল ইবনে আমরের পরিচয় এভাবে দিলেন :

'সুহাইল ইবনে আমর খান্দানের নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। জীবন যাপনের সমুদয় প্রাচুর্য তার আছে। তার আঙ্গিনায় ধন-দৌলতের প্রচুর ঢের লেগে থাকে। আমার সোনামণি! তুমি যদি তার পয়গাম মেনে নাও তবে সে তোমার হয়ে থাকবে। তোমার আবদার রক্ষা করাকে নিজের সম্মান মনে করবে। তুমি যদি তার কথা সমর্থন করো এবং তার প্রতি ভালোবাসা ও আবেগ দেখাতে পারো তাহলে তুমি নিঃসন্দেহে তার নয়নমনি হয়ে থাকবে। তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ তার নখদর্পণে থাকবে এবং তোমার প্রতিটি কথাকে অগ্রাধিকার দেবে। তার পরিবারের কর্তৃত্ব তোমার হাতে থাকবে এবং তার ধন-সম্পদের ওপর তোমারই রাজত্ব চলবে।

আর আবু সূফিয়ান ইবনে হারবের পরিচয় হলো, সে সুখী সমৃদ্ধশালী সম্ভ্রান্ত বংশের অধিকারী। বিবেক বুদ্ধিতে পরিপক্ক। তার পরিবার আভিজাত্যে প্রসিদ্ধ। তার বংশ প্রতাপশালী। আত্মমর্যাদাবোধ তাদের চরিত্র। সুলক্ষণ গ্রহণ তাদের অভ্যাস। ধন-সম্পদ উড়াতে তারা বেশ সতর্ক থাকে। তারা স্বীয় পরিবার থেকে শাসনের লাঠি ওঠাতে কখনো পিছপা হন না।

হিন্দা পিতার কথা শোনার পর আরয করল, 'আব্বু! প্রথম ব্যক্তি সুহাইল ইবনে আমর একজন সরদার। সে তার স্ত্রীর নেশায় তার পায়ের নিচে ধন-দৌলত বিছিয়ে দেবে। তাই সম্ভাবনা আছে, স্ত্রীর মন না চাওয়া সত্ত্বেও তার জন্য মহব্বত ও ভালোবাসার নজরানা পেশ করাকে নিজের অভ্যাস বানিয়ে নিতে হবে। সেই সাথে নিজের হৃদয়ের কোমল মণিকোঠায় তাকে জায়গা দিয়ে আপন তনু-মন-ধন সবকিছু তার সামনে সঁপে দিতে হবে। কিন্তু তার পরিবারের দায়-দায়িত্ব যখন তার স্ত্রীর অপোক্ত ঘাড়ে এসে চেপে বসবে, তখনই তার জীবনের ভাগ্যরাশির বির্বতন ঘটবে। সে বিভিন্ন ভুলের শিকার হতে থাকবে। এ অবস্থাতে তার জীবন নক্ষত্রে অস্থিরতা নেমে আসবে। ঘরের লোকেরা যখন তার থেকে কোনো বাঁধা পাবে তখন তার জন্য নিশ্চিন্ত শ্বাস

ফেলাও কষ্টকর হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় তার মর্যাদা হ্রাস পাবে। তার সব গর্ব-অহংকার ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। যদি তার পেট হতে মন্দাকৃতির কোনো সন্তান জন্ম নেয় তবে এ ধরনের পরিবারে মহিলার দুর্ভাগ্য কখনই তার থেকে পিছু ছাড়বে না। অতএব পিতাজি! সুহাইল ইবনে আমরের সম্বন্ধ প্রত্যাখ্যান করুন। এবার আসা যাক, আবু সুফিয়ান ইবনে হারব-এর ব্যাপারে। তো সে সতী সাধ্বী আযাদ ও রাজকুমারী কন্যার স্বামী হওয়ার যথাপোযুক্ত পাত্র। আর আমিও তার বাড়িতে তাদের পরিবারভুক্ত হয়ে এভাবে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবো যে, আমার আত্মমর্যাদাবোধে আঘাত করবে এতটুকু সুযোগও তার জুটবে না। অর্থাৎ আমি পূর্ণ স্বাধীনভাবে নির্দোষ হয়ে স্বামীর প্রতি আগ্রহভরে মনোপূর্তিতে মনোনিবেশ করতে পারবো। যে কারণে পরিবারের পক্ষ থেকে আমার ব্যাপারে এমন কোনো অভিযোগ উঠবে না; যে অভিযোগের কারণে আমার জীবনসঙ্গী স্বামীকে কোনো ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়। আমি এমন আত্মসম্ভ্রমবোধ সম্পন্ন ব্যক্তির পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে পূর্ণপ্রস্তুত। এ বিবাহবন্ধনে আমি একমত। অতএব পিতাজি! আমার বিয়ে এর সাথে করিয়ে দিন।

দুজনের ব্যাপারে এ মেয়ের দীর্ঘ বিশ্লেষণ শোনার পর উতবা ইবনে রাবিয়া মেয়ের বিয়ে আবু সুফিয়ান ইবনে হারবের সাথে করিয়ে দেয়। এ হলো সেই 'হিন্দা', যে এক সময় রাসূল সা.-এর সবচে বড় দুশমন ছিলো। বদর যুদ্ধে তার বাবা উতবা হযরত হামযা রা.-এর হাতে জাহান্নামবাসী হয়। এ কারণে সে তার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রতিজ্ঞা করে বসে। তাই তো সে প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য উহুদ যুদ্ধের সময় ওয়াহশীকে প্রস্তুত করেছিলো। নিজে মহিলা বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়ে উহুদ যুদ্ধে অংশগগ্রহণ করে। অতঃপর মক্কা বিজয়ের পর সে ইসলাম গ্রহণ করে। রাসূলে কারীম সা.-এর কাছে বায়আত হওয়ার জন্য লুকিয়ে হাজির হয়। বায়আতের শর্তাবলি উচ্চারণ করে যখন রাসূলে কারীম সা. বললেন, 'যিনা করবো না' তখন সে নিজেকে সামলাতে না পেরে শব্দ করে বলে ওঠে, একজন স্বাধীন মহিলাও কী এ ধরনের নীচু কাজ করতে পারে? এ মহিয়সী নারীর গর্ভেই জন্ম নেন এমন এক মহামানব যিনি আরবের প্রথিতযশা মেধা ও প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বের অধিকারী ছিলেন। ছিলেন একজন সফল ও সহনশীল রাজনৈতিজ্ঞ। যাকে সমগ্র পৃথিবী 'আমীরে মুআবিয়া' নামে জানে।

অহংকারের পরিচয় ও তার পরিণতি

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. থেকে বর্ণিত, রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন, ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অন্তরে সামান্য পরিমাণ অহংকার থাকে।

এক ব্যক্তি আবেদন করলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক ব্যক্তির ইচ্ছা হলো, তার পরিধানে ভালো কাপড়চোপড় থাকুক, তার পায়ের জুতাটা ভালো হোক। রাসূল সা. ঐ ব্যক্তির প্রশ্নের উত্তরে বললেন, 'আল্লাহ তাআলা সুন্দর। তিনি সুন্দর পছন্দ করেন। অহংকারতো হলো, হকের বিপক্ষে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন ও অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করার নাম। [মুসলিম শরীফ]

ফায়েদা : উপরোক্ত হাদীস শরীফ থেকে বুঝা গেলো, জায়েযের সীমার ভিতরে থেকে, পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসস্থান ও সাজ-সজ্জায় সৌন্দর্য ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবলম্বন করা এবং নিজের মনকে খুশি করা শরীয়ত পরিপন্থি কোনো কিছু নয়। তবে এসব যদি লোকদের মাঝে নিজেকে বড় বানানো ও অন্যকে তুচ্ছ জ্ঞান করার নিয়তে হয়; তবে এটি গর্ব ও অহংকার হবে। যার পরিণতি জাহান্নাম। কেউ বড়ই সুন্দর বলেছেন যে, সাজ-সজ্জাও জায়েয এবং বিলাসিতাও জায়েয; তবে লোক দেখানো না জায়েয। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবাইকে রক্ষা করুন।

আবু হুরায়রা রা.-এর মায়ের নাম কী ছিলো?

প্রশ্ন : হযরত আবু হুরায়রা রা. এর ময়ের নাম কী ছিলো?

উত্তর : হযরত আবু হুরায়রা রা. এর মায়ের নাম ছিলো, হযরত উমায়মা রা.।

ঘটনা : হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, হযরত উমর রা. তাঁকে আমীর নিযুক্ত করার জন্য ডেকে পাঠালেন। তিনি হযরত উমর রা.-এর কাছে আমীর হতে অস্বীকৃতি জানালেন। হযরত উমর রা. জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আমীর হওয়াকে মন্দ মনে করেন। অথচ আপনার চেয়েও যোগ্য এক ব্যক্তি আমির হতে চেয়েছেন। হযরত আবু হুরায়রা রা. জিজ্ঞেস করলেন, তিনি কে? হযরত উমর রা. বললেন, তিনি হলেন, হযরত ইউসুফ ইবনে ইয়াকুব আ.। হযরত আবু হুরায়রা রা. বললেন, তিনিতো স্বয়ং আল্লাহর নবী এবং নবীর ছেলে ছিলেন। আমীর হওয়া তাঁর হক ছিলো। আমি তো উমায়মা নামক এক মহিলার ছেলে আবু হুরায়রা। আর আমীর হলে আমার তিনটি এবং আরো দুটি মোট পাঁচটি বিষয়ের ভয় আছে। হযরত উমর রা. বললেন, পাঁচটি কেন

বলছেন? হযরত আবু হযরায়রা রা. বললেন, দুটি বিষয় হলো : ১. হতে পারে, না জেনে আমি কিছু বলে ফেলবো। ২. কোনো ভুল মীমাংসা করে ফেলবো। আমীর হলে আমার থেকে এ ভুলগুলো হতে পারে। যার ফলে আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে আমাকে এই তিনটি শাস্তি ভোগ করতে হতে পারে- ১. আমার পিঠে বেত্রাঘাত করা হবে ২. আমার ধন-সম্পদ জব্দ করে নেওয়া হবে ৩. আমাকে অসম্মান করা হবে।[১৯৩]

স্বেচ্ছাচারিতা ধ্বংসের কারণ

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. বলেন, হযরত উসমান রা. তাঁকে কাযী (বিচারক) নিযুক্ত করতে চাইলে তিনি অপারগতা পেশ করে বলেন, আমি রাসূল সা.-কে বলতে শুনেছি, বিচারক তিন ধরনের : ১. নাজাত পেয়ে যাবে ২. জাহান্নামে যাবে ৩. যে অন্যায় মীমাংসা করলো অথবা নিজের ইচ্ছানুযায়ী মীমাংসা করলো সে ধ্বংস হবে। আর যে ন্যায়সঙ্গতভাবে মিমাংশা করলো সে মুক্তি পেয়ে যাবে।[১৯৪]

ইসলামের সর্বপ্রথম আমীর কে?

প্রশ্ন : ইসলামের ইতিহাসে সর্বপ্রথম আমীর কে হয়েছিলেন?

উত্তর : হযরত আবদুল্লাহ ইবনে জাহাশ আসাদী রা.। তিনিই প্রথম সাহাবী; ইসলামের ইতিহাসে যাকে সর্বপ্রথম আমীর নিযুক্ত করা হয়।[১৯৫]

যিনি সাঁতরে তাওয়াফ করেছিলেন

প্রশ্ন : আমরা শুনেছি এক সময় নাকি সাঁতার কেটে তাওয়াফ করতে হতো। এ কথাটি কি সত্য ?

উত্তর : হ্যাঁ, এ কথাটি সহীহ।

ঘটনা : হযরত মুজাহিদ রহ. বলেন, হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. ইবাদত বন্দেগীতে এমন স্তরে পৌঁছেছিলেন যে, সে স্তরে আর কেউ পৌঁছতে পারেনি। একবার প্রবল বন্যা হয়, যে কারণে মানুষ তাওয়াফ করতে পারছিল না। কিন্তু হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের রা. এক সপ্তাহ পর্যন্ত সাঁতার কেটে তাওয়াফ করতে থাকেন।[১৯৬]

---

১৯৩. হায়াতুস্ সাহাবা : ২/৬৩।
১৯৪. হায়াতুস সাহাবা : ২/৬৪।
১৯৫. প্রাগুক্ত : পৃ. ৫৪।
১৯৬. প্রাগুক্ত : ২/৭১৫।

নির্বাচিত দু'টি কলি

ہم نے کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوا ہے لیکن
لوگ بے درد ہیں پھولوں کو مسل دیتے ہیں
نہ جانے کتنے چراغوں کو مل گئی شہرت
اک آفتاب کے بے وقت ڈوب جانے سے

আমরা তো কাটাকেও স্পর্শ করি কোমল হাতে, কিন্তু...
নিষ্ঠুর মানুষ ফুলকেও নিষ্পেষিত করে ফেলে।
না জানি কতো প্রদীপের অর্জিত হয়েছে খ্যাতি,
একটি সূর্য অসময় অস্ত যাওয়াতে।

আপনি শ্রেষ্ঠ মা-বাবা হতে পারেন

আপনি খুব ভালো মা-বাবা হতে পারেন, শর্ত হলো আপনি আপনার সন্তানদেরকে বুঝতে হবে। তাদের প্রতি মনযোগী হতে হবে। তাদের কথাগুলো মনোযোগসহ শুনে আপনার সুচিন্তিত মতামত পেশ করবেন। আপনি ওই সময়ও নিজের রাগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন, যখন আপনার সন্তান মধ্য রাতে আপনাকে উঠিয়ে কোনো কিছুর আবদার করে এবং এমন সমস্যা সৃষ্টি করে যার তাৎক্ষণিক সমাধা করা প্রয়োজন। এভাবে আপনি যখন দিন-রাত সন্তানদের আবদার পূরণ করবেন, তখন সন্তানরা ঘরে নিরাপদ অনুভব করবে এবং তাদের মধ্যে আস্থা বিরাজ করবে।

আপনি যদি সন্তানদের জীবনে সফলতা দেখতে চান, তাহলে উত্তম হবে তাদেরকে সর্বক্ষণ পর্যবেক্ষণ করা ছেড়ে দিন। এর অর্থ এই নয় যে, সন্তানদের মনে যা চায় তাই করতে থাকবে। আপনি তাদের প্রতি দৃষ্টি রাখুন। কিন্তু তারা যেন অনুভব করতে না পারে, আপনি তাদের সার্বক্ষণিক নজরদারী করছেন।

বর্তমানে মা-বাবা সন্তানের ব্যাপারে খুব বেশী অনুভূতিশীল হন। তারা সন্তানের প্রশ্নের জবাবগুলো কেবল কঠোর স্বরেই দেয় না, বরং মারপিট করে তাদেরকে বুঝানোর চেষ্টা করে থাকেন। আপনার সন্তান যদি তার সমবয়সীদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখে এবং সে তার আপন পরিবেশের সাথে অন্তরঙ্গভাবে জড়িয়ে যায় তবে পেরেশান হওয়ার কিছু নেই। কিছু শিশু

যাদের মাঝে শিল্পগুণের যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও অধিক সময় অনর্থক কাজে ব্যয় করে। এমন কেন হয়? মনে রাখবেন, শৈশবের পিটুনি শিশুদের যোগ্যতা নিঃশেষ করে দেয়। আপনি যদি সন্তানদেরকে নিয়ে সবসময় চিন্তিত থাকেন তবে একসময় আপনি নিজেই হতাশ ও অস্থির হয়ে পড়বেন। তাই সন্তানদের আচরণে উত্তেজিত না হয়ে শান্ত মনে তাদের কথার ওপর চিন্তা করুন।

শিশু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের বক্তব্য হলো, বাচ্চা শান্ত প্রকৃতির নাকি খিট খিটে স্বভাবের? মা-বাবা সেটা বাচ্চার তিন বছর বয়সের মধ্যেই অনুমান করতে পারেন। যদি বাচ্চার স্বাস্থ্য ভালো হয় এবং দীর্ঘ সময় নিজে নিজে খেলতে থাকে মা-বাবার তত্ত্বাবধান ব্যতীত তাহলে এটা খুব ভালো কথা। আপনি সন্তানের প্রতি বেশী মনোযোগী হয়ে আপনার মুখাপেক্ষী বানাবেন না। তার ব্যক্তিত্ব গঠনে তাকে সাহায্য করুন। ঘরের পরিবেশ শান্ত-শিষ্ট রাখুন। কেননা মা-বাবা-ই সন্তানের কাছে আদর্শ হয়ে থাকেন। যখন আপনারা দু'জনই বাসায় থাকবেন, তখন নিজেদের সময় সন্তানকে দিন। আপনি যদি এমনটি না করেন তবে সন্তান আস্তে আস্তে আপনার থেকে দূরে যেতে শুরু করবে। তেরো বছর পর্যন্ত সন্তান আপনাকে খুব প্রয়োজন বোধ করবে। যখন সে কলেজে যাওয়া শুরু করবে তখন সে নিজের সময় কাটানোর সিদ্ধান্ত নিজে নিয়ে নেয়। তখন তার কর্মব্যস্ততার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করুন। কিন্তু অযথা বাঁধা-নিষেধ করবেন না। ছুটির দিনে অবশ্যই সন্তানদের নিয়ে ঘুরতে বের হোন। সন্তানের বিকাশের জন্য তাদের নিস্পৃহ সহায়তা করুন। তাহলে তাদের মাঝে ভালো মানুষ হওয়ার যোগ্যতা ধীরে ধীরে সৃষ্টি হবে।

সাধারণত: যারা প্রথমবার বাবা-মা হয়েছেন, তারা তাদের সন্তানদের ব্যাপারে খুব অল্পতে ভুল বোঝাবুঝির শিকার হন। ফলে তাদের বুঝেই আসেনা, সন্তানকে কিভাবে একজন পূর্ণাঙ্গ ও ভালো মানুষ বানাবে? সে তার অধিকাংশ সময় বাচ্চাকে বিভিন্ন কথা বুঝিয়ে অতিবাহিত করে। আজ বাচ্চার সামনে লোকদেরকে এই বলে বেড়ায়, সে তার সন্তানকে অনেক ভালোবাসে এবং তার জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করছে। এ ধরনের কথা বলে বেড়ানো তাও আবার সন্তানের সামনে, এটা কোনোভাবেই উচিত নয়।

সন্তান মাঝে-মধ্যে অকাণ্ড বাঁধিয়ে আপনাকে পেরেশানীতে ফেলে দেবে। যেমন, টাকা-পয়সা অথবা অসুস্থতার কারণে। ওই মুহূর্তে আপনি এমন কোনো কাজ করবেন না, যেন সন্তান নিজেকে অপরাধী মনে করে। অবশ্যই

এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এ জাতীয় ক্ষেত্রে প্রথমতঃ নিজে ধৈর্যের পরিচয় দেবেন। রাগ নিয়ন্ত্রণে রাখবেন এবং সুন্দর আচরণ করবেন। এতে আপনার অসন্তুষ্টি ও রাগ কমে যাবে।

সন্তানকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হলে আপনি নিম্নোক্ত সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকে অবশ্যই মনে রাখবেন :

১. সন্তানকে সবসময় উপদেশ দেবেন না।

২. তাকে নিজ থেকে ভাবার সুযোগ দিন। যাতে সে নিজেকে আপনার সামনে একজন ভালো মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করতে পারে।

৩. আপনি এই বিষয়টি চিন্তা করবেন যে, আপনার সন্তানকে কী বলছেন?

৪. সন্তানকে অপমান করবেন না।

৫. তাকে এই অনুভূতি হতে দিবেন না যে, আপনি তার জন্য অস্থিরতায় নিমজ্জিত।

৬. সবসময় সন্তানের ভুল ধরবেন না। অন্যথায় এমন এক সময় আসবে যে, সেও আপনার কথা অবহেলা করতে শুরু করবে। কিংবা মুখের ওপর আপনার কথার উত্তর দিয়ে বসবে।

৭. উচ্চস্বরে বাচ্চাদের সাথে কথা বলবেন না।

৮. অনেক নসীহত এক সঙ্গে করবেন না।

৯. বাচ্চাদেরকে ঘরে বন্দী করে রাখার চেষ্টা করবেন না, বরং তার বয়স উপযোগী খেলনা অথবা মাঠে খেলার প্রশিক্ষণ দেবেন।

১০. নিজের আচরণ-বিধির ওপর চিন্তা করুন। সন্তান আপনার রাগ ও হতাশা থেকে খুব বেশী শেখে।

১১. সন্তানকে শাস্তি না দিয়ে বুঝাবেন।

কোমল শ্রেণীর যত্ন নেওয়া খুবই জরুরী

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ.

হে নবী! আপনি আপনার পত্নীগণকে ও কন্যাগণকে এবং মুমিন স্ত্রীগণকে বলুন, তারা যেন তাঁদের চাদরের কিয়দাংশ নিজেদের ওপর টেনে নেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে।[১৯৭]

---

১৯৭. সূরা আহযাব : ৫৯।

নারী কোমল শ্রেণীর। যাদের যত্ন নেওয়া খুবই জরুরী। যদি তারা পর্দায় থাকে তাহলে তাদেরকে নিরাপদ রাখা সহজ হয়। পর্দা ও পর্দার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাহ্যিক আমলের পরিচয়। অর্থাৎ যে জিনিস পর্দায় সংরক্ষিত থাকে তা সব ধরনের আশংকা থেকে মুক্ত থাকে। এ কথাটিই আমি ওই সমস্ত শিক্ষিত, কবি ও সাহিত্যিকদের বলতে চাই, যারা সামাজিকভাবে উদ্যমী, কর্মঠ ও উদ্যোগী। সমাজের ওপর যাদের প্রভাব আছে। এরা যদি পর্দার পক্ষে কথা বলে তাহলে স্পষ্ট যে, সমাজে তার প্রভাব পড়বে।

স্বভাবগত চাহিদাটাই এমন যে, মা-বাবার প্রভাব সন্তানদের মানসিকতার ওপর পড়ে। অর্থাৎ সন্তানকে সর্বদা খেয়াল রাখা, ভালো ও মন্দের পার্থক্য শেখানো, জীবনের কর্মসূচি ঠিক করে দেওয়া আমাদের-ই দায়িত্ব। এখন এই পরিবেশগত দূর্বলতা ও পরিস্থিতি যদিও যুগের চাহিদা অনুযায়ী পরিবর্তন হতে থাকে। কিন্তু আমাদের একথা ভুললে চলবে না যে, আমি কে এবং আমাদের বাস্তবতা কী?

মূলতঃ আমাদের জন্য ঐসব রীতি-নীতি বাধ্যতামূলক; যাকে ইসলামী আইন-কানুন বলা হয়। বাস্তবিক পক্ষে, আমরা তো আমাদের পরিচয়ের বৈশিষ্ট্যই বদলে ফেলেছি। দীনের প্রতি উদাসীনতা ও দুনিয়াবী বিলাসিতা আমাদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে। মোটকথা, সমাজের মানসিকতার পরিবর্তন হচ্ছে। স্বার্থপরতার এ জগতে চারিত্রিক অবক্ষয় ও অবনতি সুস্পষ্ট। বিশেষ করে আমাদের মা-বোনেরা অধঃপতনকে নিজেদের জন্য বরণ করে নিয়েছে। এ কারণেই বর্তমানে আমাদের ফুলের মতো নিষ্পাপ মেয়েরা দুনিয়ার বাজারে আজ নিষ্পেষিত হচ্ছে আর আমরা অধ:পতনের দিকে যাচ্ছি। ধোঁকা, প্রতারণা, স্বার্থপরতা আমাদেরকে উদাসীন ও লাগামহীন করে দিয়েছে। আমাদের সশ্রদ্ধ মায়েরা ঘর থেকে বের হয়ে দুনিয়ার বাজারে হারিয়ে যাচ্ছে। নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট করে চলেছে।

একটু ভেবে দেখুন! কোথাও না কোথাও আপনি এমন নারী পেয়ে যাবেন যাদের কপাল-শির দীনের দ্যুতিময় গুণাবলির আলোয় উদ্ভাসিত। যাদের ব্যক্তিত্ব ঈমানের সুগন্ধে সুবাশিত। এমন অনুপম আদর্শের অধিকারিণী আমাদের চারপাশে এখনও বিদ্যমান? কিন্তু অপরাধ হলো আমাদের চোখের। আমরা সব কিছু দেখেও দিব্যি না জানার ভান করে আছি। উদাসীনতার নেশা আমাদেরকে অন্ধ করে ফেলেছে। তাই আমরা এমন আদর্শবান মেয়েদের দেখেও আমরা কিছু শিখি না।

ইসলামের পুতঃবিধৌত দৃষ্টিভঙ্গি দিবালোকের মতো স্পষ্ট। এটা আমাদের ভুল, যার অনুতাপে আজ আমরা ভূগছি। মানবতা আমাদের সমাজ থেকে ধীরে ধীরে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে। কী ঘটবে? কী ঘটতে পারে? এ কথা ভাববার প্রয়োজনই অনুভব করি না। আমাদের সমাজে যা হওয়া উচিৎ ছিলো তা হচ্ছে না। আমাদের অনেক মা-বোন পর্দাকে নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে নিয়েছে বটে। কিন্তু তার ধরণ বদলে দিয়েছে। যে কারণে এখন আমাদের পর্দা কৃত্রিমতা ও লোক দেখানো সাজসজ্জায় পরিণত হয়েছে।

পর্দাহীনতা আমাদেরকে কোথায় নিয়ে দাঁড় করিয়েছে? আগে তো ইয়াহুদীদেরকে দেখে আমরা লজ্জা পেতাম। আর বর্তমানে আমাদেরকে দেখে অন্যান্য জাতি উপহাস করছে। আমাদের গুটিকয়েক নারীর পর্দাহীনতা দেখে পৃথিবী অবাক। সুযোগসন্ধানীরা অপেক্ষার প্রহর গুনছে যে, তারা আমাদের বে-পর্দা মা-বোনদের দেখে উচ্চকণ্ঠে প্রতিবাদ করবে।

অবশেষে তবে এটা কেমন বিপ্লব? নবযুগে নতুন দর্শনে আমাদের অবস্থা প্রকাশ করছে। তারপরও আমরা নিশ্চুপ, তামাশা বনে অনুতাপে হাতের তালু চুলকাচ্ছি। 'না বন্ধুর বিরহ ভাগ্যে জুটলো, না বন্ধুর অক্ষতি ভাগ্যে জুটলো।' পর্দা এক রকম ছিলো। তার রং ব্যতিক্রমী ছিল। কিন্তু এখন তার ধরণ বদলে গেছে। অগণিত বোরকায় অসংখ্য নতুন নতুন ডিজাইন শোভা পায়। যেগুলো পরা না পরা একই কথা।

আমি ওই সমস্ত মা-বোনকে বলতে চাই, যারা তথাকথিত আধুনিকতাকে নিজের ভিতর ঠাই দিয়ে নিজেদের ব্যক্তিসত্ত্বা ও আপন গর্বিত পরিচয়ের সাথে গাদ্দারি করেছে। দুঃখের কথা হলো, ঘর আজ তাদের কাছে জেলখানা মনে হয়। পার্ক, সিনেমা হল, মার্কেট তাদের কাছে স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তি-সুখের জায়গা মনে হয়। চোখ অবদমিত রাখা তো পরের কথা। চোখ এদিক ওদিক করা এখন তাদের অভ্যাসে পরিণত হতে চলেছে। মাথার কাপড় সরিয়ে নেওয়াকে দোষ মনে করা হয় না। এখন তারা মাথা খুলে মার্কেটে ঘুরে বেড়ায়। মহিলাদের বাইরে বের হওয়ার অনুমতি অবশ্যই আছে। কিন্তু এভাবে বের হবে যে, পরপুরুষের লোলুপ দৃষ্টি থেকে সে যেন সংরক্ষিত থাকে। সভ্যতা ও ভদ্রতা ও সূচিতাকে নিজের জীবনে পরমসঙ্গী বানাবে।

আমার শ্রদ্ধাস্পদ মা, বোন ও মেয়েরা! আপনি যদি চান, আমাদের সমাজব্যবস্থার অস্তিত্ব অটুট থাকুক। তাহলে সর্বপ্রথম নিজের দিকে উঁকি দিয়ে দেখুন। কিছু অর্জন করতে হলে, কিছু বিসর্জন দেওয়া জরুরী। প্রথমে

খুব কষ্ট হবে। কণ্টকাকীর্ণ পথ মাড়াতে হবে। তবু অন্ধকারের ঘোর অমানিশা থেকে বের হতে হবে। তবেই হয়ত ভুলে যাওয়া গন্তব্যের পথ খুঁজে পাওয়া সম্ভব হবে। কী? আপনি এর জন্য তৈরি তো?

আমাদেরকে নিজের উন্নতিকে নিরীক্ষা করতে হবে। নিজের সম্মান ও পবিত্রতার দৃষ্টিভঙ্গিকে অটুট রাখতে হবে। তার জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো পর্দা। পর্দাহীনতা আমাদের সমাজকে মন্দ ছাড়া ভালো কিছু দিতে পারবে, এমনটা আশা করা যায় না। মন্দকে রোধ করা না গেলে সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধূলিসাৎ হয়ে যাবে। তখন ওই উদাহরণকেই পুনরাবৃত্তি করতে হবে 'যা হচ্ছে তা হতে দাও, চলছে তো চলতে দাও।'

تم اپنی شمع سے اس گھر میں روشنی کر دو
مرا چراغ سر راہ گزر رکھا ہے

তুমি নিজের প্রদীপ দ্বারা আপন ঘর আলোকিত করো॥
আমার বাতি রাস্তার ওই মাথায় ফেলে এসেছি।

সমাজনির্মাণে নারীর ভূমিকা

নারী-পুরুষের মিলনেই মানববংশ বিস্তার হতে চলেছে। উভয়ের সম্পর্ক থেকে পরবর্তীতে বংশ ও সমাজ অস্তিত্বে আসে। মানবজাতি পরস্পর মিলে মিশে বসবাস করে। একে অপরের সাহায্যে-সহযোগিতা নিয়েই জীবন অতিবাহিত করে। অর্থাৎ সামাজিক বন্ধন ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারে না। সমাজে বিভিন্ন ঘটনা সামনে আসে। যেমন : বিয়ে-শাদি, সুখ-দুঃখ, সেবা-শুশ্রূষা, শোক জ্ঞাপন, অনুষ্ঠান, ধর্মীয় ঘরোয়া সমাবেশ; এ সমস্ত আচার-অনুষ্ঠানগুলোতে মহিলারা একত্রিত হয়। সেখানে পরস্পরের মাঝে প্রাথমিক অবস্থায় উপস্থিত বিষয়ে কথাবার্তা চলতে থাকে। এরপর ধীরে ধীরে কথাবার্তা স্বাভাবিক অবস্থা থেকে সরে গিয়ে ভিন্ন বিষয়ের দিকে মোড় নেয়। এক পর্যায়ে অভিযোগ ও দোষচর্চায় গিয়ে ঠেকে।

অধিকাংশ নারীরা সতর্কতা অবলম্বন করে কথা বলে না। নারীরা যদি মুখের ব্যবহারে সতর্কতা অবলম্বন করতো তাহলে আমাদের সমাজ অনেক অনিষ্টতা থেকে মুক্ত থাকতো। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে, ওই মুসলমানগণ সফল হয়েছে যারা নিজের নামায একাগ্রতার সাথে আদায় করে এবং অনর্থক কথাবার্তা এড়িয়ে চলে।[১৯৮]

---

১৯৮. সূরা আল মুমিনূন : ১-৩।

সমাজের বিয়ের অনুষ্ঠানই ধরুন। বিয়ে হওয়ার পূর্বে কাবিনের অনুষ্ঠান করা হয়। দু'পক্ষ থেকে মহিলাদের আসা-যাওয়া হয়। রাতভর বাদ্য বাজিয়ে গান গাওয়া হয়। মহিলা ও মেয়েরা সাজগোজ করে মাহরাম, গায়রে মাহরামের সামনে দিয়ে উশৃঙ্খলভাবে চলাফেরা করে। এ ধরনের আচার অনুষ্ঠানে বধূ তার শাশুড়ির আলোচনা করে। ননদ তার ভাইয়ের স্ত্রীর দোষচর্চা করে। এ ধরনের অনুষ্ঠানে হাসি-তামাশায় মিথ্যাও বলা হয়। যা সম্পূর্ণ নাজায়েয। একটি হাদীসে ইরশাদ হয়েছে : সাহাবায়ে কেরাম রাসূলে কারীম সা.-এর খিদমতে আরয করলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি আমাদের সাথে হাসি মজাক করেন! হুযূর সা. ইরশাদ করলেন, নিঃসন্দেহে আমি (হাসি মজাক করে) সত্য কথাই বলি।[১৯৯]

জাগতিক অনেক সভা-সমাবেশ আছে যেখানে মহিলাদের একেবারে যাওয়াই উচিত না। অথচ মহিলারা যাওয়াকে ফরজে আইন মনে করে। মহিলাদের উচিৎ, ইসলামী শিক্ষার ওপর আমল করা। কেননা, সমাজ নির্মাণে নারী অনেক বড় দায়িত্ব পালন করে থাকে। ইসলাম মনে করে, নারী-পুরুষ উভয়ে মিলেই সমাজ গঠন করে অথবা ধ্বংস করে। আল্লাহভীরু নারী-পুরুষ একে অপরের সহযোগী হয় এবং সমাজকে তাকওয়ার ওপর সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারে।

আবু হানীফা রহ.-এর বিচক্ষণতায় একটি সংসার রক্ষা পেলো

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর যুগে এক ব্যক্তির ঘরে ডাকাতি হয়। ডাকাত ওই এলাকার-ই ছিলো। সে ঘরের মালিককে বলপূর্বক একথার শপথ করিয়ে নেয় যে, আমার ব্যাপারে যদি তুমি কাউকে বলে দাও তবে তোমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। ঘরের মালিক বেচারা বাধ্য হয়ে স্ত্রী তালাকের কসম করে বসে। আর ডাকাত ঘরের সব মালামাল নিয়ে পালিয়ে যায়। এবার ঘরের মালিক খুবই হতাশ হয়ে পড়ে এই ভেবে যে, আমি যদি লোকদেরকে ডাকাতের কথা বলে দিই তবে আমার মালামাল তো ফেরত পাবো কিন্তু আমার স্ত্রীকে তো আমি হারাবো। আর যদি ডাকাতের কথা কাউকে না বলি তবে স্ত্রীতো থাকবে কিন্তু সমস্ত ঘর খালি হয়ে যাবে। স্ত্রী ও মালের দোটানায় পড়ে গেল। হয় স্ত্রী থাকবে, না হয় মাল। তখন সে ব্যক্তি হযরত

---

১৯৯. হায়াতুস সাহাবা : ২/৬৭২।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর মজলিসে উপস্থিত হয়। এসময় সে বড়ই দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ পেরেশান ও হতাশ ছিলো। হযরত ইমাম আবু হানীফা রহ. তাকে বললেন, আজ তোমাকে অনেক উদাস মনে হচ্ছে! কী হয়েছে তোমার? সে উত্তরে বললো, হযরত! আমি তো ব্যাপারটি কাউকে বলতেও পারছি না। ইমাম সাহেব রহ. বলেন, কিছু তো বলবে! সে বললো, হযরত! আমি যদি কিছু বলি, তাহলে নাজানি আমার কী হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, সংক্ষেপে বলো। তখন সে বললো, হযরত, আমার ঘরে ডাকাতি হয়েছে। আমি ডাকাতের কাছে বাধ্য হয়ে এ ওয়াদা করেছি যে, আমি যদি ডাকাতের কথা কাউকে বলে দিই তবে আমার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। আমি জানি ডাকাত কে? সে তো এই এলাকার-ই।

ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, নিশ্চিন্ত থাকো, তুমি তোমার স্ত্রীকেও পেয়ে যাবে। তোমার মালও পেয়ে যাবে। আর তুমিই ডাকাতের ব্যাপারটি বলে দেবে। কুফা শহরে হৈ চৈ পড়ে গেলো, আবু হানীফা রহ. এ কী করছেন? এটাতো একটা অঙ্গীকার। সে যদি তার অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তবে তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে। ইমাম আবু হানীফা এটা কিভাবে বললেন, স্ত্রীও তালাক হবে না, মালও হাতছাড়া হবে না। মোটকথা, ওলামা ও ফকীহগণও পেরেশান হয়ে গেলেন।

ইমাম আবু হানীফা রহ. বললেন, আগামীকাল আমি তোমাদের এলাকার মসজিদে গিয়ে যোহরের নামায পড়ব। পরদিন ইমাম আবু হানীফা রহ. তাশরীফ নিয়ে গেলেন। সেখানে নামায পড়লেন। অতঃপর ঘোষণা করিয়ে দিলেন, নামায শেষে মসজিদের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হবে। কেউ যেন বের না হয়। সেখানে ডাকাতও ছিলো। মসজিদের একটি দরজা খুলে দিলেন এক পাশে ইমাম আবু হানীফা রহ. বসে পড়লেন এবং অন্য পাশে ঐ লোকটিকে বসিয়ে দিলেন এবং বললেন, একেকজন করে বের হবে। যে চোর নয় তার ব্যাপারে বলে যাবে, এ চোর নয়। আর যখন চোর বের হবে তখন চুপচাপ হয়ে বসে থাকবে।

অতএব যারা চোর নয় তাদের প্রত্যেকের ব্যাপারে বলতে থাকে সে চোর নয়। এও নয়। এভাবে যখন চোর বের হতো তখন সে চুপ করে বসে থাকতো। এ প্রক্রিয়ায় বলা ছাড়াই ডাকাত চিহ্নিত সব চোর জানা হয়ে যায়। ফলে ডাকাতকে পাকড়াও করা হলো। এভাবে সে তার মালও ফিরে পেলো আর তার স্ত্রীও হাতছাড়া হলো না।

এক লক্ষ হাদীস এমনভাবে মুখস্থ আছে যেভাবে সূরা ফাতেহা মুখস্থ থাকে

হযরত আবু যুরআ রহ. নামে এক মুহাদ্দীস ছিলেন। তাঁর মাহফিলে এক শিষ্য আসা যাওয়া করত। তার সবেমাত্র বিয়ে হয়েছিলো। একদিন হযরতের মজলিশ দীর্ঘ সময় ধরে চলছিলো, যার কারণে তার বাড়ি পৌঁছতে দেরি হয়ে যায়। যখন সে রাতে দেরি করে বাড়ি পৌঁছে, তখন স্ত্রী ঝগড়ার স্বরে বললো, আমি অপেক্ষায় ছিলাম আপনি আসতে কেনো দেরী করেছেন? লোকটি তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলো, আমি সময় নষ্ট করছিলাম না। আমি তো হযরতের পাশে ছিলাম। স্ত্রী একটু বেশী রেগে গিয়ে ছিলো। রাগে বলে ফেললো, তোমার উস্তাদের তো কোনো অভিজ্ঞতাই নাই, আর তুমি কী জানো? উস্তাদ সম্পর্কে এমন কথা শুনে এই যুবক উত্তেজিত হয়ে গেল।

যখন স্ত্রী একথা বললো যে, তোমার উস্তাদ কিছুই জানে না তুমি কী জানবে? তখন একথা শুনে সে রেগে গিয়ে বলে ফেললো, যদি আমার উস্তাদের এক লাখ হাদীস মুখস্ত না থাকে তাহলে আমার পক্ষ থেকে তোমাকে তিন তালাক।

সকালে ঘুম থেকে ওঠার পর মাথা যখন একটু ঠাণ্ডা হয় তখন ভাবতে শুরু করে আমি তো অনেক বড় বোকামী করে ফেলেছি। স্ত্রী স্বামীকে বললো, আমার তালাক তো শর্তসাপেক্ষ ছিলো, এখন বলুন, আমার তালাক পতিত হয়েছে কী না? সে উত্তর দিল, এটাতো উস্তাদ থেকে জেনে নিতে হবে। স্ত্রী বললো, যান, গিয়ে জেনে আসুন। যুবক তার উস্তাদের খেদমতে উপস্থিত হয়ে রাতের ঘটনা খুলে বললো এবং জিজ্ঞেস করল, এখন আপনি বলুন তো! বিয়ে ঠিকঠাক আছে নাকি তালাক হয়ে গেছে। তার উস্তাদ শুনে মুচকি হেসে বলেন, যাও, সংসার করতে থাক। কেননা, এক লক্ষ হাদীস আমার এভাবে মুখস্থ আছে যেভাবে মানুষের সূরা ফাতিহা মুখস্থ থাকে। সুবহানাল্লাহ! এটা তাঁর মেধা শক্তির বরকত ছিলো এবং তাঁর ইলমের বরকত ছিলো যা আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন।

নোট : উক্ত ঘটনাটি আমি আমার মাকে শুনিয়ে ছিলাম। তিনি ঘটনাটি আমার রচনায় সংযোজন করার নির্দেশ দেন। আমি আমার মায়ের নির্দেশে এ ঘটনাটিকে আমার কিতাবে লিখলাম।

কু প্রবৃত্তি থেকে বাঁচার উপায়

প্রশ্ন : বাদ সালাম, আরয হলো, আমরা বারবার আপনার ও অন্যান্য বুযুর্গদের মুখে শুনেছি তাহলে প্রবৃত্তি বলতে কী বোঝায়? মেহেরবানী করে বিস্তারিত জানিয়ে বাধিত করবেন এবং এর থেকে বাঁচার পথ বাতলে দেবেন।

উত্তর : 'শাহওয়াত' আরবী শব্দ। اشتهاء মূলধাতু থেকে নির্গত। যার অর্থ কোনো জিনিসের চাহিদা ও ক্ষুধা। মানুষের যখন ক্ষুধা লাগে তখন তার যেমন খাবারের ইচ্ছা জাগে। পিপাসার্ত মানুষের পানি পান করার আগ্রহ হয়। কারো ভালো খাবারের প্রতি আগ্রহ হয়। আবার কারো ভালো পোশাকের প্রতি আগ্রহ হয়। অনুরূপভাবে মানুষ যখন যৌবনে পদার্পণ করে তখন তার স্ত্রীর প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রেও শাহওয়াত শব্দ ব্যবহার করা হয়। এভাবে শাহওয়াত শব্দের মর্মে বিশাল ব্যাপকতা রয়েছে। ছোট বাচ্চাদের মাঝে মিষ্টিদ্রব্য খাওয়ার ইচ্ছে জাগে। মা-বাবা তাদেরকে চুইংগাম ও চকলেট খেতে নিষেধ করে। তা সত্ত্বেও তারা লুকিয়ে লুকিয়ে খায়। তাদের মাঝে মিষ্টিদ্রব্যের প্রতি চাহিদা আছে। কারো কারো খাবারের প্রতি চাহিদা এতো বেশী হয়ে থাকে যে, বেচারা পেটুকে পরিণত হয়। সে সবসময় খাবারের প্রতি মনোযোগি থাকে। দুনিয়াতে কারো কারো রাজত্বের প্রতি আগ্রহ রয়েছে। সে বেচারা এর জন্য নিজের জীবনকে খুইয়ে বসে। কিছু তো অর্জন হয় বাকি সব অধরাই থেকে যায়।

যুবকদের মাঝে নারীদের প্রতি শাহওয়াত অধিক হয়ে থাকে। অন্যদিকে যখন নারীদের হৃদয়ে পোশাক পরিচ্ছদ ইত্যাদির মাধ্যমে নিজের দিকে অন্যকে আকৃষ্ট করার মন-মানসিকতা খুব বেশী হয়ে থাকে। প্রত্যেকের মাঝে ভিন্ন ভিন্ন সমস্যা থাকে। বর্তমানে পুরুষদেরকে রূপ-সৌন্দর্যপূজা ধ্বংস করে দিয়েছে। আর ধন-সম্পদ নারীদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছে। যেন সমস্ত মুসলমান জাতি আজ ধন-দৌলত ও রূপ লাবণ্যের হাতে বরবাদ হতে শুরু করেছে। পুরুষ সৎ, ভদ্র কিংবা বুযুর্গ হোক— রূপ সৌন্দর্য তাকে দূর্বল করে ফেলে। এ কারণেই চোখ নিয়ন্ত্রণে থাকে না। এ ব্যাধি থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে মেহনত করতে হবে। বই-পুস্তক কিতাবাদি পড়ে ফেলা যায়। অন্যান্য ভালো কাজও করে ফেলা যায়। কিন্তু চোখের নিয়ন্ত্রণ করতে হলে আল্লাহর রাহে পায়ে হেঁটে পথচলা বিশেষভাবে কাম্য। যা নফসের আত্মশুদ্ধির কারণ হবে আর তখনই অন্তর থেকে বাজে চিন্তার আবর্জনা দূর হতে পারে।

নবী সা.-এর পবিত্র মুখে নামাযের উপকারিতা

১. নামায দীনের খুঁটি।

২. নামায শয়তানের মুখ কালো করে দেয়।

৩. নামায মুমিনের জন্য নূর স্বরূপ।

৪. নামায উত্তম জিহাদ।

৫. যখন কোনো বিপদ আসমান থেকে অবতীর্ণ হয় তখন মসজিদকে যারা আবাদ রাখেন, তাদের থেকে সে বিপদ সরে যায়।

৬. যদি কাউকে কোনো কারণে জাহান্নামে যেতে হয় তবুও তার সিজদার জায়গাকে আগুন স্পর্শ করবে না।

৭. আল্লাহ তাআলা সিজদার জায়গাকে আগুনের জন্য হারাম করে দিয়েছেন।

৮. আল্লাহ তাআলার নিকট সবচে' অধিক প্রিয় আমল হলো, ওই নামায যা সঠিক সময় পড়া হয়।

৯. আল্লাহ তাআলার নিকট বান্দার ওই অবস্থা সবচেয়ে বেশী প্রিয় যখন বান্দা সিজদারত অবস্থায় থাকে।

১০. আল্লাহ তাআলার সাথে বান্দার সবচেয়ে বেশী নৈকট্য লাভ হয়, সিজদারত অবস্থায়।

১১. নামায হলো বেহেস্তের চাবি।

১২. মানুষ যখন নামাযে দাঁড়ায় তখন জান্নাতের দরজাগুলো খুলে যায়। আল্লাহ তাআলা ও নামাযি ব্যক্তির মাঝখান থেকে পর্দা সরে যায়। যতক্ষণ না সে কাশি ইত্যাদি কাজে লিপ্ত না হয়।

১৩. নামাযি ব্যক্তি শাহেনশাহে আলমের দুয়ারে করাঘাত করে, আর নিয়ম হলো যে দরজায় করাঘাত করতে থাকবে একসময় সে দরজা অবশ্যই খুলবে।

১৪. শরীয়তে নামাযের অবস্থান এমন যেমন মাথার গুরুত্ব শরীরের জন্য।

১৫. নামায অন্তরের নূর। যে নিজের অন্তরকে নূরানী বানতে চায়, সে যেন নামায দ্বারা বানিয়ে নেয়।

১৬. যে ব্যক্তি ভালো করে অযু করে একাগ্রতার সাথে দুই অথবা চার রাকাত ফরয বা নফল নামায পড়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দেন।

১৭. যমীনের যে অংশের ওপর নামাযের দ্বারা আল্লাহকে স্মরণ করা হয় সে অংশ যমীনের অন্য অংশের ওপর গর্ব করে।

১৮. যে ব্যক্তি দু'রাকাত নামায পড়ে আল্লাহ তাআলার শাহী দরবারে দোয়া করে আল্লাহ তাআলা তার দোয়া কবূল করেন।

১৯. যে ব্যক্তি দু'রাকাত নামায পড়ে, যেখানে তাকে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ ব্যতীত কেউ দেখে না তাহলে তার জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তির ছাড়পত্র লাভ হয়।

২০. যে ব্যক্তি একটি ফরয নামায আদায় করে আল্লাহ তাআলার দরবারে একটি মকবূল দোয়া তার জন্য হয়ে যায়।

২১. যে ব্যক্তি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হয়, তার রুকু-সিজদা ও অযু ইত্যাদি গুরুত্বসহ ভালোভাবে আদায় করে, তার জন্য জান্নাত ওয়াজিব হয়ে যায় এবং জাহান্নাম হারাম হয়ে যায়।

২২. মুসলমান যতক্ষণ পর্যন্ত পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের গুরুত্ব দেবে ততক্ষণ শয়তান তাকে ভয় পাবে। যখন সে নামাযে অবহেলা করবে তখন শয়তান তার ওপর দুঃসাহস দেখাবে এবং তাকে ধোঁকায় ফেলার জন্য ওৎ পেতে থাকবে।

২৩. নামায সকল মুত্তাকীর কুরবানী।

২৪. ভোর সকালে যারা নামায পড়তে মসজিদে গমন করে তারা ঈমানের পতাকাবাহী। আর যে বাজারে গমন করে সে শয়তানের ঝাণ্ডাবাহী।

২৫. যোহর নামাযের পূর্বের চার রাকাতের সাওয়াব এমন, যেমন তাহাজ্জুদ নামাযের চার রাকাতের।

২৬. যখন মানুষ নামাযে দাঁড়ায় তখন আল্লাহর রহমত তার প্রতি মনোযোগী হয়।

২৭. সর্বোত্তম নামায হলো, মধ্যরাতের নামায। তবে তা আদায়কারীদের সংখ্যা খুবই কম।

২৮. নিঃসন্দেহে মুমিনের আভিজাত্য হলো তাহাজ্জুদের নামায।

২৯. শেষ রাতের দু'রাকাত নামায সমগ্র দুনিয়া থেকে উত্তম। হুযূর সা. ইরশাদ করেন, যদি আমার উম্মতের জন্য কষ্টের আশংকা না করতাম তবে উম্মতের ওপর তা ফরয করে দিতাম।

৩০. তাহাজ্জুদ অবশ্যই পড়বে। তাহাজ্জুদ আল্লাহভীরুদের পন্থা। আল্লাহ তাআলার নৈকট্য লাভের মাধ্যম। তাহাজ্জুদ গুনাহ থেকে বাঁচায়। এটি গুনাহ থেকে ক্ষমা চাওয়ার মাধ্যম। এর দ্বারা শারীরিক সুস্থতাও লাভ হয়।

৩১. যখন মানুষ নামাযে দণ্ডায়মান হয়, আল্লাহ তাআলা তখন তার দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করেন। যখন সে নামায থেকে বিমুখ হয় তখন আল্লাহ তাআলাও তার থেকে মনোযোগ সরিয়ে ফেলেন।

৩২. আল্লাহ তাআলা ঈমান ও নামায থেকে উত্তম কোনো বিষয়কে ফরয করেননি। যদি তার থেকে উত্তম অন্য বিষয়কে ফরয করতেন তবে ফেরেশতাদেরকে সে সম্পর্কে আদেশ করতেন। ফেরেশতারা দিন রাত কেউ রুকুতে কেউ সিজদায় রত আছেন।

৩৩. মানুষ ও শিরকের মাঝে নামায-ই প্রাচীর।

৩৪. আল্লাহ তাআলা আমার উম্মতের ওপর সর্বপ্রথম নামায ফরয করেছেন এবং কিয়ামতের দিন সর্বপ্রথম নামাযের-ই হিসাব নেওয়া হবে।

৩৫. নামাযের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো।

৩৬. ইসলামের নিদর্শন নামায। যে ব্যক্তি নিশ্চিন্ত মনে ওয়াক্তমতো, যাবতীয় মুসতাহাব সহকারে সযত্নে নামায আদায় করে; সে মুমিন।

৩৭. আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন, হে আদমসন্তান! তুমি দিনের শুরুতে চার রাকাত নামায পড়তে অক্ষম হয়ো না। আমি সারা দিন তোমার কাজের যিম্মাদারী গ্রহণ করে নেব।

৩৮. নামাযির ওপর থেকে রিযিকের অভাব দূর করে দেওয়া হয়।

৩৯. নামাযি ব্যক্তির কবরের আযাব দূর করে দেওয়া হয়।

৪০. কিয়ামতের দিন নামাযি ব্যক্তির আমলনামা ডান হাতে দেওয়া হবে।

৪১. নামাযি ব্যক্তি পুলসিরাত বিদ্যুৎচমকের মতো মুহূর্তেই অতিক্রম করবে।

৪২. নামাযি থেকে আমলের হিসাব নেওয়া হবে না।[২০০]

---

২০০. ফাযায়েলে আমল থেকে সংগৃহীত।

হারাম মালের অনিষ্টতা

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, রাসূলে কারীম সা. ইরশাদ করেন, মানুষের সামনে এমন এক যুগ আসবে যখন লোকেরা এ বিষয়ের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না যে, সে যে সম্পদ নিচ্ছে তা হালাল না হারাম?[২০১]

অর্থাৎ কিয়ামতের আগে বহু ধরনের অনিষ্টতা ছড়াবে। তন্মধ্য হতে একটি অনিষ্টতা হলো, মানুষ ধন-সম্পদের প্রতি সীমাহীন লোভী হবে। এই লালসার কারণে সে হালাল ও হারামের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না। তার দৃষ্টি শুধু মালের ওপর আচ্ছন্ন থাকবে। সে এটা দেখবে না যে, এ মাল হালাল না হারাম? এটা ব্যবহার করা আমার জন্য বৈধ না অবৈধ? চোখ বন্ধ করে মালের পেছনে ছুটবে। ঠিক এ অবস্থা আজ আমাদের যুগেই বিরাজমান। মিথ্যা, ধোঁকা, প্রতারণা, হত্যা, লুণ্ঠন, চুরি-ডাকাতি, ওয়াদা খেলাফী সহ এমন কোনো হীন কাজ আছে; মাল উপার্জনের জন্য যার আশ্রয় নেয়া হচ্ছে না? এমন কোনো অপকর্ম আছে যা তার জন্য করা হচ্ছে না? লটারী-জুয়া, মদের ক্রয়-বিক্রয়, সূদ ও ঘুষ ব্যাপক হয়ে গেছে। বর্তমানে তো মনে করা হয় এগুলো করা ছাড়া কী আর ব্যবসা-বাণিজ্য চলে? এসব পথে হাঁটা ছাড়া কি ধন-সম্পদ অর্জন করা সম্ভব? অথচ বাস্তবতা এর পুরো উল্টো। আল্লাহ তাআলার রহমতের দরজা এখনও খোলা আছে। আল্লাহ তাআলার কোনো বান্দা যদি আল্লাহর ভয়-ভীতি নিজের ভিতর লালন করে এসব হারাম প্রক্রিয়ায় অর্থ উপার্জন থেকে বিরত থাকে এবং হালাল ও সঠিক পন্থায় আয়-উপার্জনের চেষ্টা তদবীর করে তবে আল্লাহ তাআলা তাকে অবশ্যই বঞ্চিত করবেন না। বরং আল্লাহ তাআলা তার বিশেষ কৃপায় তাকে অঢেল সম্পদ দান করবেন। এমনকি তার সামান্য আয়-উপার্জনেও বরকত দান করবেন। এর বিপরীতে হারাম উপায়ে উপার্জন করার দ্বারা আল্লাহ তাআলা বরকত উঠিয়ে নেন। তার কামাই-রোজগারে বেবরকতি ও অনিষ্টতা সৃষ্টি হয়। যার প্রভাব দুনিয়া আখেরাত; উভয় জগতে দৃশ্যমান হয়। নবী করীম সা. বিভিন্ন সময় বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে হারাম মালের অনিষ্টতা ও মন্দ পরিণতির কথা বর্ণনা করেছেন।

হারাম মালের মন্দ দিক হলো, হারাম মালের দ্বারা কুপ্রবৃত্তি ও কু অভ্যাস জন্ম নেয়। ইবাদতের স্বাদ বিদূরিত হতে থাকে। দোয়া কবূল হয় না।

---

২০১. বুখারী শরীফ।

পক্ষান্তরে হালাল খাবার গ্রহণ করলে অন্তরে নূর পয়দা হয়। কু-অভ্যাসের প্রতি ঘৃণা ও ভালোর গুণাগুণ অর্জনের প্রতি আগ্রহ জন্মায়। ইবাদতে মন বসে। গুনাহের প্রতি আতঙ্ক সৃষ্টি হয়। দোয়া কবূল হয়। অনুরূপভাবে ব্যক্তি যদি হারাম মাল উপার্জন করে আর তার দ্বারা কোনো ভাল কাজ করে যেমন সদকা দেয়, গরিবদেরকে দান করে, হজ্জব্রত পালনে গমন করে তবে তার কোনো আমল কবূল হয় না। কেননা হারামের মাধ্যমে করা আমল আল্লাহ তাআলা কোনোভাবেই কবূল করেন না। হারাম মালের অপকারিতা ও ব্যাপক ক্ষয়-ক্ষতির অনুমান নবী করীম সা.-এর একটি হাদীস থেকে সহজেই করা যায়। নবী করীম সা. একবার শপথ করে বলেন, যদি কোনো বান্দার পেটে হারাম মালের লোকমা পৌঁছে, তবে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার কোনো আমল কবূল করা হয় না।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে এবং সমস্ত উম্মতে মুসলিমাকে হারাম মাল থেকে বাঁচিয়ে রাখুন এবং হালাল উপার্জন করার তাওফীক দান করুন।

পিতা-মাতার আনুগত্যশীল হওয়ার উপায়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، لِلّٰهِ الْحَمْدُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ رَبُّ الْعَالَمِيْنَ، وَلَهُ الْعظمَةُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ، هُوَ الْمَلِكُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَالَمِيْنَ، وَلَهُ النُّوْرُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ.

আল্লামা আইনী রহ. বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন, যে ব্যক্তি উপরোক্ত দোয়াটি একবার পড়ে এই দোয়া করে, হে আল্লাহ! এর সাওয়াব তুমি আমার পিতা-মাতাকে পৌঁছে দাও। তবে সে তার পিতা-মাতার হক আদায় করে দিল। অতঃপর তিন বার قُلْ هُوَ اللّٰهُ তিন বার اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ এবং তিনবার দরূদ শরীফও পড়ে নেয় তবে সে পিতা-মাতার আনুগত্যশীলদের মাঝে গণ্য হবে।

হাদীস শরীফে এসেছে, যদি কোনো ব্যক্তি নফল সদকা করে তবে এতে কী অসুবিধা আছে যে, যদি তারা তার সাওয়াব পিতা-মাতার জন্য বখশে দেয়? শর্ত হলো, তারা মুসলমান হতে হবে। এভাবে পিতা-মাতা সাওয়াব পেয়ে যাবেন এবং সদকাকারীর সাওয়াবে কোনো কাটছাট হবে না।[২০২]

নোট : ইমাম আওযাঈ রহ. বলেন, আমার নিকট এ কথা পৌঁছেছে, যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের অবাধ্য হয়ে থাকে আর তাদের ইন্তেকালের পর তাদের জন্য ইস্তেগফার করে, আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করে। তাদের যিম্মায় থাকা ঋণ পরিশোধ করে দেয় এবং তাদের গালমন্দ না করে তবে এ সন্তান তাদের বাধ্যসন্তানদের অন্তর্ভুক্ত হবে। আর যে ব্যক্তি পিতা-মাতার জীবদ্দশায় তাদের বাধ্য ছিলো, কিন্তু মৃত্যুর পর তাদের গাল-মন্দ করে, তাদের ঋণ পরিশোধ করে না এবং তাদের জন্য দোয়া-ইস্তেগফারও করে না তবে সে নাফরমান বা অবাধ্য সন্তানদের মাঝে গণ্য হবে।

মাসতুরাতের ২৪ ঘণ্টার সংক্ষিপ্ত কাজ

নারীদের প্রধান কাজ হলো, নিজেদের ঘরে পাঁচ ওয়াক্ত নামায ওয়াক্তের শুরুতে একাগ্রতার সাথে দাঁড়িয়ে আদায় করা। কুরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করবে। যদি আগে পড়ে না থাকে তবে দৈনিক কোনো মাহরাম আত্মীয় বা সহীহ শুদ্ধভাবে পড়তে পারে এমন কোনো মহিলার নিকট থেকে দুই দুই চার চার আয়াত করে শিখতে থাকবে।

সকাল-সন্ধ্যা বসে তিন তাসবীহ আদায় করতে পারলে এটা খুবই ভালো হবে। নিজের সন্তানদের দীনি শিক্ষা-দীক্ষা দেবে এবং স্বামীর খেদমত করবে। যদি কোনো আত্মীয় মহিলা বা বান্ধবী আসে তবে মহব্বত ভালোবাসা এবং হেকমতের সাথে দীনের ওপর চলতে এবং ঘরে দীনি শিক্ষা অর্জন করতে ও নিজের মাহরাম আত্মীয়দেরকে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার উৎসাহ দেবে। আপনি যদি তাদেরকে এ সৎকাজের জন্য প্রস্তুত করতে পারেন তবে এটা অনেক বড় কামাই করে নিলেন। প্রত্যেক দিন আপনার ঘরে 'ফাযায়েলে আমল'-এর তালিম চালু করুন। তা'লিম করতে করতে দাওয়াতের মেজায তৈরি হয়ে গেলে পাঁচজন মাসতুরাতের একটি জামাআত বানিয়ে নিন।

---

২০২. কানযুল উম্মাল।

এদের মাঝে দু'তিনজন পুরাতন এবং দু'তিনজন নতুন মিলিয়ে জামাআত তৈরি করুন। এদের প্রত্যেকের সাথে তার হাকিকি মাহরাম অর্থাৎ পিতা, ছেলে, ভাই, স্বামী, মামা প্রমুখদের কেউ থাকতে হবে। বাচ্চা যেন সাথে না থাকে। অতঃপর এ জামাআতটিকে নিয়ে এমন কোনো বাড়ি যান যে বাড়িটি সম্পর্কে পূর্ণ জানাশোনা আছে এবং তাদের আগে থেকেই আপনাদের আসার পূর্ববার্তা জানিয়ে দেয়া হয়েছে। সে বাড়িতে পৌঁছে প্রথমে পুরুষদের কেউ দোয়া করবে। মহিলারা পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে মনে মনে আমীন বলতে থাকবে। এ কাজটি তখন করবে যখন অভ্যর্থনাকারীদের সংখ্যা কম থাকবে। যদি অভ্যর্থনাকারীদের ভিড় হয় তবে পুরুষগণ বাড়ির বাইরে দোয়া করবে আর মহিলাগণ বাড়ির ভিতর চলে যাবে এবং অযু করে নফল নামায পড়ে নেবে। তবে শর্ত হলো, তখন যেন নামাযের নিষিদ্ধ সময় না হয়। এমতাবস্থায় পুরুষদের দোয়াই যথেষ্ট। তাদের দোয়া করতে হবে না। উত্তমতো হলো, যে জায়গায় যাবে সেখানের শহরে প্রবেশ করার পূর্বেই দোয়া করে নেবে। নিজেদের প্রাইভেট গাড়ি থাকলে গাড়িতেই দোয়া করে নেয়া উত্তম। পুরুষেরা মসজিদে গিয়ে তাহিয়্যাতুল অযু নামায আদায় করে মাশওয়ারায় বসে যাবে এবং মহিলাদের জন্য সিদ্ধান্ত নেবে কে তালিম করবে? কে খেদমত করবে? একটি কাগজের টুকরায় লিখে ভিতরে পাঠিয়ে দেবে। কোনোক্রমেই জামাআতকে দু'ভাগ করবে না। যখনই মাশওয়ারার চিরকুট পৌঁছবে সে মোতাবেক-ই কাজ শুরু করে দেবে। মেয়েরা শুধু কিতাবের তালিম করবে। তাদের বয়ান করার অনুমতি নেই। নিজেদের সাথে আসা বোনদেরকে বিশুদ্ধ রূপে কুরআন শিক্ষা দেওয়ার মজলিস শুরু করে দেবে। যতক্ষণ প্রয়োজন কুরআনী হালকায় সময় ব্যয় করবে। তারপর পুনরায় তালিম শুরু করে দেবে। কিতাবী তালিম খুব ধীরে ধীরে করবে। যাতে নিরক্ষর মা-বোনরাও বুঝতে পারেন। অতঃপর হালকা বানিয়ে ছয় নম্বরের মুযাকারা করবে। এসব হলো, যোহরের নামাযের পূর্বের আমল।

যোহরের নামাযের পর স্থানীয় মহিলারা তালিমে আসবে। মাশওয়ারায় যার ব্যাপারে তালিম করার সিদ্ধান্ত হয়েছে সে তালিম করবে। তালিম ও বয়ানের অপেক্ষায় থাকা অবস্থায় তাসবীহ ইত্যাদি পাঠ করতে পারবে। উপস্থিত মহিলাদের সংখ্যা অল্প হলে বসে তালিম শুরু করবে। উপস্থিত মহিলাদের সংখ্যা বেড়ে গেলে টুল বা চৌকিতে বসে তালিম করতে পারবে। চেয়ার-সোফায় বসবে না। মজলিশের লোকজনের সংখ্যা বেশী হয়ে গেলে

এবং ঘরে সংকুলন না হলে দু'টি ভাগে বসা যেতে পারে। ফাযায়েলে আমল ছাড়া অন্য কোনো কিতাব যেন না পড়া হয় (মুরব্বীদের মাশওয়ারা সাপেক্ষ) মা-বোনদের কারো কোনো মাসআলা জানার প্রয়োজন হলে তার মাহরাম কারো মাধ্যমে কোনো গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞ হক্কানী আলেম থেকে জেনে নেবে। সম্মিলিতভাবে মাসআলা-মাসায়েলের কোনো তালিম হবে না। ব্যক্তিগতভাবে মাসআলা-মাসায়েলের বই-পুস্তক পড়া যেতে পারে।

যখন কোনো পুরুষ বয়ান করতে আসবে তখন মহিলারা তাদের তালিম বন্ধ করে দেবে। মহিলাগণ পূর্ণ সতর্কতা অবলম্বন করবে যাতে তাদের কণ্ঠ বা আওয়াজ পুরুষ পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। পুরুষগণ বয়ানের পর তাশকীল করার সুযোগ দেবে। মহিলাগণ স্থানীয় মহিলাদেরকে তাশকীল করবে। এভাবে তাশকীল করবে যে, কারা কারা তার স্বামী, ছেলে, অথবা আপন আত্মীয়কে দাওয়াত ও তাবলীগের মেহনতে জুড়ার জন্য তিন চিল্লা অথবা এক চিল্লার জন্য পাঠাবে? দোয়ার পূর্বেই তার পূর্ণ নাম ঠিকানা সহ পাঠিয়ে দেবে। যাতে করে তাদের সাথে সাক্ষাত করা সহজ হয়। চিরকুটটি স্থানীয় যিম্মাদার সাথীদের কাছে পাঠিয়ে দেবে। পুরুষ লোকটি দোয়া করে চলে আসবেন। অতঃপর মহিলারা আসরের নামায আদায় করবে। নিজেদের তাসবীহ-তাহলীল পূর্ণ করবে। যদি এলাকার স্থানীয় কোনো মহিলা বসা থাকেন তবে তার সাথে দীনি কথাবার্তা বলে মেহনতের প্রতি উৎসাহ যোগাবে। মাগরিবের নামাযের পর আওয়াবিনের নামায আদায় করবে। সুযোগ হলে ব্যক্তিগত আমল শেখা-শেখানোর কাজ করবে অথবা বিশ্রাম নেবে।

এশার নামাযের পর কোনো তালিম হবে না। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে। যাতে তাহাজ্জুদের জন্য উঠা সহজ হয়। রাতের খাবার এশার নামাযের আগে বা পরে যেভাবে সহজ হয় সেরে নেবে। তাহাজ্জুদের নামায পড়ে দোয়া করবে। নিজের পিতা-মাতা ও পুরো উম্মতের জন্য দোয়া করবে। একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করার অনুশীলন করবে। ফজরের পর নাস্তা হতে দেরি হলে বিশ্রাম নেবে। নাস্তা আগে ভাগে সেরে ফেললে নাস্তার পর বিশ্রাম নেবে। তালিমের জন্য যে সময় নির্ধারণ করা হয়েছে তার পূর্বেই ব্যক্তিগত আমল ও সকল প্রয়োজনী কাজ সেরে নেবে। পুরুষদের কেউ বয়ান করতে পারলে ফজরের নামাযের পর ৩০/৪০ (ত্রিশ/চল্লিশ) মিনিট দীনি আলোচনা ও বয়ান করতে পারে, যদি নাস্তার দেরি হয়। দেরি না হলে নাস্তার পর বয়ান করবে যাতে মহিলাগণ সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজে জুড়ে থাকতে পারে।

নাস্তা সেরে নেয়ার পর যদি আরাম করা হয় তবে মশওয়ারা সাপেক্ষে এক বোনকে এমন জায়গায় বসাবে যেখান থেকে বাইর থেকে আসা বোনদের দেখা যায়। এই বোন কুরআন নিয়ে বসবে বা তাসবীহ্ নিয়ে বসবে। যাতে আগন্তুক মা-বোনদের অভ্যর্থনা জানাতে পারে। তাদেরকে নিয়ে এমন জায়গায় বসে কথা বলবে যেন বিশ্রাম নেওয়া বোনদের ঘুমে বিঘ্ন না ঘটে। কেননা যেখানে মাস্তুরাতের জামাআত গমন করে সেখানে স্থানীয় মা-বোনেরা সাক্ষাত করতে আসেন। তাই সবাইকে যদি ঘুমন্ত অবস্থায় পান তবে নিরাশ হয়ে ফিরে যাবেন। এ জন্য মাশওয়ারা ক্রমে কাউকে না কাউকে বসিয়ে রাখবে। জামাআতে আসা পুরুষ মাহরাম তাদের মা-বোনদের সাথে সাক্ষাত করতে চাইলে মাগরিবের পূর্বে সাক্ষাত করতে পারবে। মাগরিবের পর সাক্ষাত করা অনুচিৎ। মানুষ যে মহিলাদের 'ইজতেমা' নাম রেখেছে, মূলত সেটা মহিলাদের তালিম।

মহিলারা গাশত করবে না। ছোট বড় কেউ-ই করবে না; না এলাকায় না জামাআতে। মহিলাদের সাথে আসা পুরুষ স্থানীয় সাথী ভাইদের সঙ্গে মিলে গাশ্ত করবে এবং স্থানীয় পুরুষদেরকে দাওয়াত দেবে, তারা যেন ঘরের মহিলাদেরকে মহিলাদের তালিমের স্থানে পাঠায়। গুরুত্ব দেবে তারা যেন সাদাসিধে পোশাক-আষাক পরিধান করে সাধারণভাবে তালিমে শরীক হয়। সেজে-গুজে অলংকারাদি পরে সুসজ্জিত হয়ে যেন তালিমে না যায়। সম্ভব হলে, হোটেল থেকে রুটি কিনে নেবে আর ঘরে তারকারি পাক করে নেবে। খেদমতে থাকা মহিলা তালিমে বসেও তরকারির দেখাশোনা করতে পারবে।

হযরত শাহ মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. এই ষোলটি কাজ করতে বলতেন। তার মাঝে চারটি কাজ খুব বেশী করতে বলতেন : ১. দাওয়াত ২. নিজে শেখা ও অপরকে শেখানো ৩. ইবাদত ৪. খেদমত।

চারটি কাজে সময় কম ব্যয় করবে: ১. খাবার-দাবারে ২. ঘুমে ৩. ধোয়া-মুছা ও গোসলে ৪. অন্যান্য যে কোনো জায়েয কাজে।

চার কাজে যুক্ত হবে না: ১. রাজনীতি ২. তর্ক-বিতর্ক ৩. মাসআলা-মাসায়েলের পর্যালোচনা ৪. বর্তমান পরিস্থিতির পর্যালোচনা। ব্যাস্! শুধু দীন ও ঈমানের ভাবনা থাকবে। পরকালের চিন্তা। আপনি ভালো করেছেন যা জেনে নিয়েছেন। যে জিজ্ঞেস করে করে পথ চলবে সে সঠিক কাজ করতে পারবে।

নোট : উপরোক্ত কথাগুলোতে প্রাণ সৃষ্টি করতে হলে ঘরে ফাযায়েলে আমালের তালিম বাচ্চাদেরকে সাথে নিয়ে মনোযোগ সহকারে চিন্তা ভাবনা করে নিয়মিত করতে হবে।

মহিলাদের মাঝে দাওয়াতী মেহনতের সূচনা

[রায়বেন্ডের হাজী বশীর আহমদ সাহেবের উদ্দেশে মাওলানা দাউদ আটাওয়ারীর পক্ষ থেকে পত্র]

শ্রদ্ধেয় জনাব ভাই আলহাজ্জ মুহাম্মদ বশির সাহেব!

আস্‌সালামু আ'লাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

আশা করি, ভালো আছেন। সুস্থ আছেন। আমরাও এখানে ভালোই আছি। দু'বছর যাবৎ টাখনু ফুলে আছে। সেখানে ব্যথাও হয়। এখন আবার দু'সপ্তাহ ধরে নাভির নিচে রগের ওপর একটি ফোঁড়া উঠেছে। ব্যথা হয়। কথা বললে ব্যথা বেড়ে যায়। দোয়ার প্রয়োজন।

যাই হোক। মাস্তুরাতের দাওয়াতি মেহনতের কাজের সূচনা ১৯২৬-১৯২৮ সালে একদমই হয়নি। আমি ১৯৪০ সালে মাদরাসা থেকে পাশ করে বের হয়েছি। ১৯৪১ সালে সম্ভবত আমি নেজামুদ্দীনে হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ.-এর খেদমতে হাজির হই। আমি মাদরাসায়ে সুবহানিয়ায় পড়াশোনা করতাম। হযরত মাওলানা আব্দুস সোবহান রহ. এবং তাঁর সম্মানিত স্ত্রী রহ. –যাকে আমরা 'আম্মাজি' বলে ডাকতাম– তিনি আমাদেরকে খুব মহব্বত করতেন। আম্মাজি দিল্লির বিভিন্ন জায়গায় কিতাব শোনাতেন। আমি তার কারগুজারী হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ.-এর কাছে শোনাতাম এবং হযরতজি রহ.-এর হেদায়েত ও নির্দেশনাবলি তাকে বলতাম। একদিন আম্মাজি বললেন, হযরতজি রহ.-কে বলো, হযরত! আপনি পুরুষদের জামাআত পাঠান কিন্তু মহিলাদের জামাআত কেনো পাঠান না?

আমি হযরত ইলিয়াস রহ.-এর খেদমতে আরয করলাম, হযরত! আম্মাজি তো এ কথা বলেন, হযরত! মহিলাদের জামাআত কেনো পাঠান না? হযরত ইলিয়াস রহ. এ কথা শুনে অত্যন্ত খুশি হলেন এবং অনেক দোয়া দিলেন। অতঃপর আমাকে বললেন, তুমি এই তিনজনের কাছ থেকে মাশওয়ারা নাও যে, হযরত মাস্তুরাতের জামাআত পাঠাতে চায়। আপনার মতামত কী? হযরত মাওলানা ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, হযরত ইলিয়াস রহ. মাস্তুরাতের জামাআত পাঠাতে চাইছেন, এ ব্যাপারে আপনার মত কী? হযরত মাও. ইনআমুল হাসান সাহেব রহ.-এর শব্দগুলো তো আমার মনে নেই তবে তার উত্তরের মর্ম মনে আছে।

আর তা হলো, 'পুরুষদের জামাআত বের হওয়ার বিষয়টি তো এখনো উলামাদের বুঝে আসছে না। মহিলাদের জামাআত বের হওয়ার বিষয়টি তারা কিভাবে মেনে নেবেন? তাই এ কাজে আমার মত নেই'।

হযরত কারী দাউদ সাহেব রহ.ও একই উত্তর দেন। অতঃপর আমি হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইউসুফ রহ.-এর খেদমতে হাজির হলাম। তিনি তখন মসজিদ বরাবর ওপরে মকতবে থাকতেন যেখানে বর্তমানে হাফেযদের মক্তব। যখন তাঁর থেকে মতামত গ্রহণ করি তখন তিনি আমাকে বললেন, 'এ কাজে আমার মত নেই। যদিও একজন মহিলার সাথে তার দু'জন মাহরাম থাকে। তার পিতা ও স্বামী দু'জনই সাথে থাকে তবুও একাজে আমার মত নেই'।

উপরোক্ত বুযুর্গগণ যেভাবে তাদের মতামত প্রদান করেন আমি সেভাবেই হযরতজি রহ.-এর কাছে আরয করি- অমুকে এ কথা বলেছেন, তমুকে একথা বলেছেন। হযরত শাহ মুহাম্মদ ইউসুফ সাহেব রহ.-এর কথা শুনে হযরতজি রেগে গেলেন এবং আমাকে বললেন, যে সব মহিলারা জামাআতে যেতে প্রস্তুত তুমি দিল্লিতে গিয়ে তাদেরকে একটি ঘরে একত্র করে বয়ান শুরু করে দাও। আর আমি দেখে নেবো, ওই মুসলমানদেরকে। তাদের মতামত নাই কেন? আমি পাহাড়গঞ্জ মুলতানী ঢান্ডায় একটি ঘরে মহিলাদেরকে একত্র করে বয়ান শুরু করে দিই। যোহর নামাযের পর ইলিয়াস রহ. হযরত মাও. নূর মুহাম্মাদ বাঝুট রহ.-কে সাথে নিয়ে পাহাড়গঞ্জে উপস্থিত হন। হযরত মাওলানা নূর মুহাম্মদ রহ. পৌঁছে বয়ান শুরু করেন।

মাওলানা নূর মুহাম্মদ রহ. তার বয়ানে বলেন, 'দীন শেখার জন্য মহিলাদেরও আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া জরুরী। কিন্তু মহিলারা তাদের মাহরাম সাথে না নিয়ে যেতে পারবে না'।

বয়ান শেষ করার পর হযরত ইলিয়াস রহ. মাওলানা নূর মুহাম্মদ রহ.-কে শাসালেন। তোমাকে মুফতি কে বানাল যে, তুমি মাহরাম ছাড়া বের থেকে নিষেধ করে দিলে। অর্থাৎ প্রথম কাজ হলো জামাআত তৈরি করা। এখনই মাসআলা-মাসায়েলের ওপর জোর দিয়ো না। এখন শুধু বের হওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ প্রদান করো। এখানে তো এতটুকু ঘটল। আর বড় হযরতজি রহ. যখন আমাকে দিল্লি পাঠিয়ে দেন তখন হযরত স্বশরীরে হযরত মাওলানা ইউসুফ সাহেব রহ.-এর নিকট গিয়ে বললেন, তুমিই মুসলমান, আমি

মুসলমান না। তুমি কিভাবে বললে, মহিলাদের তাবলীগে যাওয়া উচিৎ না। এসব মহিলারা কোথায় যায় না? এরা বিয়ে শাদীর অনুষ্ঠানে যায়। তারা তা'জিয়া জলসায় যায়। দিল্লির মহিলারা 'মহর ওয়ালী' এলাকায় যায়। ভ্রমণে 'উখলা' গমন করে। এরপরও তুমি কিভাবে বললে, এ কাজে আমার মত নেই? যখন হযরতজি রহ. মুহাম্মদ ইউসুফ রহ.-এর ওপর রাগ করেন, তখন মাওলানা ইউসুফ রহ. আমার ওপর রাগ করে বসেন যে, দাউদ আব্বাজিকে কী সব বলে দিয়েছে?!

মাগরিবের পর হযরত মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ রহ. দু'জন ছেলেকে হাউজের পাড়ে এ কথা বলে বসিয়ে দেন, দাউদ দিল্লি থেকে যখন-ই আসবে তখনই ধরে আমার কাছে নিয়ে আসবে। আমি দিল্লি থেকে এশার নামায পড়ে আসি। গরমকাল ছিল। ছেলেরা আমাকে ধরে হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ.-এর নিকট হাজির করল। হযরতজি আমাকে বললেন, আব্বাজি আমার ওপর কখনো এতো রাগ করেন নি। আজ তো শুধু এতটুকু বাকি যে, তিনি লাঠি দিয়ে আমাকে প্রহার করেন নি, অথচ মুখে অনেক কিছু বলেছেন। তখন হযরত ইলিয়াস রহ.-এর নারাজির কারণে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ. প্রায় অর্ধেক অভিযোগ দূর হয়ে যায়। ওদিকে বার বার মেওয়াতে জামাআত যাওয়া শুরু করল। এ দিকে ভারতের তৎকালীন প্রধান মুফতী হযরত কিফায়াতুল্লাহ রহ. মহিলাদের জামাআতে বের হওয়ার বিষয়টি জানতে পারেন। তখন তিনি খুবই নারায হন যে, মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস রহ. এটা কী করলেন? আর অন্য হযরতদের যে আশংকা ছিলো তা দেখা দিলো।

মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রহ.-এর নারাজ হওয়ার কথা কেউ হযরত ইলিয়াস রহ.-এর নিকট এসে বলে দেয়। হযরত ইলিয়াস রহ. টাঙ্গা নিয়ে মাদরাসায় আমিনিয়্যায় তাশরিফ নেন এবং মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রহ.-এর সামনে মহিলাদের জামাআত বের হওয়ার উপকারিতা তুলে ধরেন। সেই সাথে মহিলাদের বের হওয়ার গুরুত্বও উপস্থাপন করেন। তিনি তাঁকে আরো অবহিত করেন, যখন মাস্তুরাতের জামাআত বের হয় তখন প্রত্যেক মহিলা তার মাহরামের সঙ্গে বের হয়। তাদের সাথে হয় স্বামী থাকে, না হয় ছেলে বা পিতা অথবা ভাই সাথে থাকে। যদি কোনো মহিলা মাহরাম ছাড়া জামাআতে যাওয়ার জন্য চলে আসে আর বলে আমার মাহরাম কাল-পরশু চলে আসবে তবে আমরা সে মহিলাকে ফেরত পাঠিয়ে দিই। আর যেখানে জামাআত যাবে, আগেভাগেই তাদেরকে জানানো হয় যাতে তারা তাদের

বাড়ি খালি করে প্রস্তুত রাখতে পারে। যে বাড়িতে মহিলা জামাআত অবস্থান করে, তারা সে বাড়িতেই থাকে। গ্রামের মহিলারা তাদের কাছে আসে। জামাআতের মহিলারা তাদের কাছে ঘুরে বেড়ায় না।

মহিলাদের মাহরাম পুরুষ ও এলাকার স্থানীয় পুরুষরা মিলে গাশত করে। পুরুষ পুরুষদের সাথে কথা বলে, দাওয়াত দেয় যে, ওমুক বাড়িতে তুমি তোমার বাড়ির মহিলাদেরকে পাঠিয়ে দাও। সেখানে মাস্তুরাতের জামাআত আছে। এ মহিলা জামাআত কোথাও যায় না। পর্দার পূর্ণ খেয়াল রাখা হয়। এ সব কথা শুনে হযরত মুফতী কিফায়াতুল্লাহ রহ.-এর পূর্ণ আস্থা জন্মে। তিনি বলেন, যদি তারা এতো সাবধানতা অবলম্বন করে তবে মাস্তুরাত জামাআতে কোনো অসুবিধা নেই। এভাবে যখন সমস্ত মাস্তুরাতের জামাআত মেহনত করে আসতো তখন তারা হযরত মাওলানা মুহম্মদ ইউসুফ রহ.-কে কারগুজারী দিত। এ সবের কারণে ধীরে ধীরে হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইউসুফ রহ.-এর মন থেকে সব অভিযোগ শেষ হয়ে যায়।

মাস্তুরাতের সর্বপ্রথম জামাআত ঘাসেড়াহ ও 'নাওহ্' এলাকার আশপাশে আট দিন সময় লাগিয়ে আসে। সে জামাআতে আমি (লেখক)ও ছিলাম। আট দিনের মাথায় যখন তারা ফিরে আসে তখন এ খবর শুনে হযরত ইলিয়াস রহ. রাগ করেন যে, এতো অল্প সময়ে তারা কেনো ফিরে আসল? আমি আরয করলাম, হযরত! মহিলারা সাথে করে বেশী কাপড়চোপড় নিয়ে আসেনি। তখন হযরত আমাকে বললেন, তুমি 'নাওহ্' থেকে তাদের জন্য নতুন কাপড় সেলাই করে দিতে। টাকা আমার থেকে এসে নিয়ে যেতে। আমি আরয করলাম, হযরত মাশওয়ারাওয়ালারা বলে ছিলো, এটা মাস্তুরাতের প্রথম জামাআত। এদের দায়িত্বের প্রতি খেয়াল রেখো। এ জন্য হযরত দ্রুত চলে এসেছি। মাশওয়ারার কথা শুনে হযরত অনেক খুশি হন এবং অনেক দোয়া দেন।

যখন মাস্তুরাতের এ জামাআতের মাশওয়ারা ক্রমে ঘাসেড়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহে যাবে বলে ফায়সালা হয় তখন হযরত ইলিয়াস রহ. সে এলাকার চৌধুরীর উদ্দেশে একটি চিঠি লিখে পাঠিয়ে দেন যে, আমি তোমাদের ওখানে দিল্লির পর্দানশীল মহিলাদেরকে পাঠাচ্ছি। তোমরা এদের খুব নুসরত করবে ইত্যাদি ইত্যাদি।

ঘাসেড়ার লোকেরা অধির আগ্রহে মাস্তুরাত জামাআতের অপেক্ষার প্রহর গুনতে থাকে। অভ্যর্থনা জানাতে সড়কে চলে আসে। যখন জামাআতটি

পৌঁছল গ্রামের লোকেরা তাদের অভ্যর্থনায় বড়-সড় আয়োজন করে এবং বিশালাকারে অভ্যর্থনা জানায়; এই ভেবে যে, ইতিহাসের প্রথম মাস্তুরাতের জামাআত আমাদের এলাকায় এসেছে। এভাবেই প্রতিটা গ্রামে অভ্যর্থনা জানানো হয়। অতঃপর অল্প বিরতি দিয়ে দিয়ে অনেক জামাআত বের হয়।

এক সময় 'মেওয়াত' এলাকা থেকে মাস্তুরাতের জামাআতের আবেদন আসা শুরু হয়। মাস্তুরাতের মেহনত প্রায় ১৯৪২ সালে এসে শুরু হয়। এর পূর্বে শুরু হয়নি। আমি ১৯৪১ সালে মারকাযে এসেছিলাম, আমার মারকাযে আসার পর মাস্তুরাতের মেহনত শুরু হয়। যদি হযরত ইলিয়াস রহ.-এর ইন্তেকালের দশ বছর পূর্বে মাস্তুরাতের মেহনত শুরু হতো তবে ভারতের বিভিন্ন এলাকায় অসংখ্য জামাআত পৌঁছে যেত। হযরত ইলিয়াস রহ.-এর জীবদ্দশায় মেওয়াত ছাড়া অন্য কোথাও মাস্তুরাতের জামাআত যায়নি।

ইতি

মুহাম্মদ দাউদ

আমলহীন ঈমান ঘ্রাণহীন ফুলের মতো

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا لَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَنُدْخِلُهُمْ ظِلًّا ظَلِيلًا.

'আর যারা ঈমান এনেছে ও সৎ আমল করেছে আমি অচিরেই তাদেরকে এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবো যার তলদেশ দিয়ে নহর প্রবাহিত হয়। যেখানে তারা সদা সর্বদা থাকবে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে পুতঃপবিত্র স্ত্রীগণ। আমি তাদেরকে ঘন ছায়ায় (পূর্ণ শান্তিতে) রাখবো।'[২০৩]

ব্যাখ্যা : আল্লাহ তাআলা কুরআনুল কারীমের সব জায়গায় ঈমানের আলোচনার সঙ্গে নেক আমলের আলোচনা করে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, এ দু'টির একটি অপরটির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ঈমান নেক আমল ছাড়া ঐ ফুলের মতো; যার সুবাস নেই, ঐ গাছের ন্যায় যার ফল নেই। সাহাবায়ে কেরাম রা. এবং খায়রুল কুরুনের অপরাপর মুসলমান এ সূক্ষ্ম বিষয়টি অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। এ কারণেই তাদের জীবন ঈমানের ফল এবং

---

২০৩. সূরা নিসা : ৫৭।

নেক আমলের দ্বারা ভরপুর ছিলো। সে সময়ে আমলহীন বা বদআমলের সাথে ঈমান কল্পনাই করা যেত না। এর বিপরীতে বর্তমানে ঈমান শুধু মুখে মুখে। নেক আমলের দাবীদারগণের অন্তরও ঈমান থেকে মুক্ত। যদি কেনো ব্যক্তি এমন আমল করে থাকে যাকে আমলে সালেহা বলে অভিহিত করা যায় যেমন, সততা, আমানতদারী, দীনদারি, সহানুভূতিশীলতা, সমবেদনা ও অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলি। কিন্তু সে ঈমানের মহামূল্যবান দৌলত থেকে বঞ্চিত, তাহলে তার এ সব আমল দুনিয়াতে তো তার সুনাম-সুখ্যাতি অর্জনের মাধ্যম হবে কিন্তু আল্লাহর দরবারে এর কোনো মূল্যায়ন করা হবে না। কেননা আল্লাহর দরবারে যে কোনো আমল কবুল হওয়ার জন্য ঈমান শর্ত। কারণ, তার কাছে ঈমানের সেই ভিত্তিই নেই, যেই ঈমান দ্বারা ভালো আমলকে আল্লাহর নিকট দামী বানিয়ে দেবে।

জাহান্নামী জাহান্নামে অনেক মোটা হবে

সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে বর্ণিত কোনো কোনো হাদীস শরীফে পাওয়া যায়, জাহান্নামে জাহান্নামীদের চামড়া যখন জ্বলে-পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে, তখন আল্লাহ তাআলা তাদের চামড়াকে আবার ভালো চামড়ায় বদলে দেবেন। প্রতিদিন অসংখ্যবার চামড়া পরিবর্তনের এ কাজটি চলতে থাকবে। মুসনাদে আহমদ শরীফের একটি বর্ণনার আলোকে জানা যায়, জাহান্নামীরা জাহান্নামে এতো বেশী মোটা হয়ে যাবে যে, তাদের কানের লতি থেকে কাঁধের দূরত্ব সাতশ' বছরের দূরত্বের সমান হবে। তাদের চামড়া সত্তর বিঘৎ পুরু হবে। দাড়ি ওহুদ পাহাড়ের মতো বিশাল হবে।[২০৪]

আল্লাহর অনুগ্রহে জান্নাত পাওয়া যাবে

আমরা আমাদের আমলের বিনিময়ে নেয়ামত পাইনা, সমস্ত নেয়ামত আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে আসে। কারণ, নেক কাজ করার তাওফীকও আল্লাহ তাআলা দেন। তাছাড়া আল্লাহ তাআলার নেয়ামত এতো বেশী অফুরন্ত যে, মানুষের কোনো ইবাদত ও আনুগত্য তার তুলনায় কোনো সামর্থ্যই রাখে না। এ কারণেই এক হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাতে যেই প্রবেশ করবে, সে শুধু আল্লাহর রহমত ও দয়ায় জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তার কোনো আমলের বিনিময়ে যেতে পারবে না) সাহাবায়ে কেরাম রা. আরয করলেন, হে আল্লাহর

---

২০৪. অফসীরে মসজিদে নববী : ২২৯।

রাসূল সা.! وَلَا أَنْتَ؟ 'আপনিও কী আল্লাহর রহমত ছাড়া জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেন না'?

হুযূর সা. ইরশাদ করলেন, হ্যাঁ, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা আমাকে তাঁর রহমতের আঁচলে জড়িয়ে না নেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত আমিও জান্নাতে যেতে পারবো না।[২০৫]

দু'পক্ষের কথা শুনেই সিদ্ধান্ত দেবে

দু'পক্ষের কোনো একজনের ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ বিশ্বাস না হয় যে, সে সত্যের ওপর আছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার সহযোগিতা করা, তার পক্ষে ওকালতি করা জায়েয নেই। দু'পক্ষের কোন পক্ষ যদি ধোকা-প্রতারণা ও বাকপটুতা দিয়ে আদালত অথবা বিচারক থেকে নিজের পক্ষে ফায়সালা করিয়ে নেয়; অথচ প্রকৃতপক্ষে সে হকদার না; তবে আল্লাহ তাআলার নিকট এ ফায়সালার কোনো গুরুত্ব ও গ্রহণযোগ্যতা নেই। এ কথাটিকেই নবী করীম সা. তাঁর এক হাদীস শরীফে এভাবে বলেছেন, সাবধান! আমিও একজন মানুষ। যেভাবে আমি শুনি, সেই দৃষ্টিতেই আমি মিমাংসা করি। সম্ভাবনা আছে, কোনো ব্যক্তি তার দলিল-প্রমাণ পেশ করার ক্ষেত্রে চালু ও চতুর। আমি তার বাকপটুতায় প্রভাবিত হয়ে তার পক্ষে ফয়সালা করে দিই, অথচ সে আসল হকদার নয়; আমি অপর মুসলমানের হক তাকে দিয়ে দিই। তার ভালো করে জেনে নেয়া উচিৎ, এ হক আগুনের টুকরো। তার মন চাইলে সে জাহান্নামের আগুনের এ টুকরা গ্রহণ করতে পারে অথবা ছেড়ে দিতে পারে।[২০৬]

কারো দোষ দেখলে চর্চা করবে না

لَا يُحِبُّ اللهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ وَكَانَ اللهُ سَمِيعًا عَلِيمًا.

'মন্দ কথার প্রচারণা আল্লাহ পছন্দ করেন না; তবে যার ওপর জুলুম করা হয়েছে সে ব্যতীত। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।'[২০৭]

---

২০৫. বুখারী শরীফ, কিতাবুর রিকাক, বাবুল কাস্দি ওয়াল মুদাওয়ামাত আলাল আমল।

২০৬. বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ।

২০৭. সূরা নিসা : ১৪৮।

ব্যাখ্যা : শরীয়ত এ ব্যাপারে খুবই গুরুত্বারোপ করেছে যে, কারো মাঝে যদি কোনো দোষ-ত্রুটি দেখতে পাও তবে তার চর্চা করো না। তা বলে বেড়াবে না, বরং নির্জনে তাকে বোঝাবে। তবে যদি দীনি কোনো লাভ থাকে তবে তা বলা যাবে। অনুরূপভাবে খোলামেলা ঘোষণা দিয়ে মন্দকাজ করাও মারাত্মক নিন্দনীয়। গুনাহের প্রতিশ্রুতি এক প্রকার গুনাহ; চাই সেটা আড়ালে আবডালে হোক না কেনো। আর যদি প্রকাশ্যে করা হয় তবে তা অতিরিক্ত গুনাহ। আর তার কারণে ওই মন্দকাজের অপরাধ দ্বিগুণ এবং দশগুণ হয়ে যায়। কুরআনুল কারীমের উপরোক্ত আয়াতের দ্বারা দুই প্রকার মন্দকাজের প্রকাশ করা থেকে নিষেধ করাই বুঝায়। এ আয়াতে এটাও সন্নিবেশিত যে, কোনো ব্যক্তির কৃত অথবা অকৃত কর্মের ভালোমন্দ বলা। অবশ্য এক ক্ষেত্রে এ বিধানের ব্যতিক্রম করা যাবে। আর তাহলো, কোনো ব্যক্তি যদি তোমার ওপর জুলুম করে তবে সেই জুলুমের কথা তুমি লোকদের সামনে আলোচনা করতে পারবে। এর লাভ হলো, হয়ত সে তার জুলুম থেকে বিরত থাকবে। অথবা সেই জুলুমের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করবে। আর দ্বিতীয় আরেকটি ফায়দা হলো, লোকেরা তার থেকে বেঁচে থাকবে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি নবী করীম সা.-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করল, আমার প্রতিবেশী আমাকে কষ্ট দেয়। হুযূর সা. তাকে বললেন, তুমি তোমার ঘরের মালপত্র বের করে রাস্তায় রেখে দাও। সে তাই করল। এখন যেই সেদিক দিয়ে অতিক্রম করে, সেই তাকে জিজ্ঞেস করে এবং উত্তরে সে তার প্রতিবেশীর অত্যাচারী আচরণের কথা ব্যাখ্যা করে। তার কথা শুনে প্রত্যেকেই ওই প্রতিবেশীকে ধিক্কার ও তিরস্কার করে। প্রতিবেশী তার এমন কষ্টদায়ক পরিস্থিতি দেখে ক্ষমা চেয়ে নিল এবং ভবিষ্যতে কষ্ট না দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলো এবং তাকে তার মালপত্র ঘরে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনুরোধ করলো।[২০৮]

আল্লাহর রহমত একশ' ভাগ

আল্লাহ তাআলার রহমতের ব্যাপকতার কারণেই এ দুনিয়াতে সৎ-ফাসেক, মুমিন-কাফের, সবাই তাঁর রহমতের অফুরন্ত ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হচ্ছে। হাদীস শরীফে বর্ণিত আছে, 'আল্লাহ তাআলার রহমত একশ' ভাগ

---

২০৮. সূনানে আবু দাউদ, কিতাবুল আদব।

রয়েছে। সেই একশ' ভাগের একটি ভাগ পেয়েই মানুষ একে অপরের প্রতি দয়া-মায়া করে। জংলি প্রাণী তার বাচ্চাকে আদর সোহাগ করে। আর আল্লাহ তাআলা তাঁর রহমতের বাকী ৯৯ (নিরানব্বই) ভাগ নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন।[২০৯]

প্রত্যেক মুত্তাকী মুমিন আল্লাহর ওলী

মানুষ ওলী হওয়ার জন্য আত্মপ্রকাশকে জরুরী মনে করে। তাই সে নিজের তৈরি করা ওলীর জন্য সত্য মিথ্যা অলৌকিক ঘটনা মানুষের মাঝে প্রচার করে। এমন ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। ওলী হতে হলে অলৌকিক ঘটনার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে হবে এমন কোনো শর্ত নেই। কারামত একটি ভিন্ন বিষয়। কারো থেকে যদি কারামত প্রকাশ পায় সেটা আল্লাহর ইচ্ছায়। এ ক্ষেত্রে বুযুর্গ ব্যক্তির ইচ্ছার কোনো সংযোগ নেই। কিন্তু কোনো মুত্তাকী মুমিন এবং সুন্নতের অনুসারী ব্যক্তি থেকে কারামত প্রকাশ পাওয়া না পাওয়া সেটা তার ওলী হওয়ার ব্যাপারে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি করে না।[২১০]

জান্নাত ও জাহান্নামের ঝগড়া

হাদীস শরীফে আছে, নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, জান্নাত-জাহান্নাম পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হলো। জান্নাত বললো, কী মনে করো, আমার এখানে কি ওই সমস্ত লোকই আসবে যারা উচ্ছিষ্ট? জাহান্নাম বললো, আমার এখানে তো বড় বড় পরাক্রমশালী ও অহংকারীরা আসবে?

আল্লাহ তাআলা জান্নাতকে বললেন, 'তুমি আমার রহমতের মঞ্চ। তোমার মাধ্যমেই আমি যার ওপর ইচ্ছা দয়া করবো।' অনুরূপভাবে জাহান্নামকে লক্ষ্য করে আল্লাহ তাআলা বলেন, 'তুমি আমার আযাবের মঞ্চ। তোমার মাধ্যমে যাকে খুশী শাস্তি দেবো।' আল্লাহ তাআলা জান্নাত জাহান্নাম দু'টোকেই ভরে দেবেন। জান্নাতে সর্বদা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহ থাকবে। এমনকি আল্লাহ তাআলা এমন মাখলুক সৃষ্টি করবেন যারা জান্নাতের জন্য নির্ধারিত স্থানের অবশিষ্ট জায়গাগুলোতে থাকবে। আর জাহান্নাম; জাহান্নামীদের আধিক্য হওয়া সত্ত্বেও هَلْ مِنْ مَّزِيْد 'আরো চাই, আরো চাই' বলে চিৎকার করতে থাকবে। এক পর্যায়ে আল্লাহ তাআলা তাতে আপন

---

২০৯. সহিহ মুসলিম, হাদীস নং ২১০৮, ইবনে মাজা শরীফ, হাদীস নং ৪২৯৩, তাফসীরে মসজিদে নববী, পৃ. ৪৫৯।

২১০. তাফসীরে মসজিদে নববী : ৫৮২।

কুদরতি পা রাখবেন আর তখনই জাহান্নাম চিৎকার করে উঠবে قط قط وعزتك 'তোমার ইজ্জত ও বড়ত্বের কসম, যথেষ্ট; যথেষ্ট'।[২১১]

সিজদায়ে তেলাওয়াতের মাসনুন দোয়া

সিজদায়ে তেলাওয়াতের মাসনুন দোয়া নিম্নরূপ :

سَجَدَ وَجْهِى لِلَّذِى خَلَقَهُ وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ بِحَوْلِهِ وَقُوَّتِهِ.

[আবু দাউদ, তিরমিযি, নাসায়ী ও মিশকাত সূত্রে]

কোনো কোনো বর্ণনায় এ অংশটুকু বেশী আছে :

فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

নির্বাচিত পংক্তিমালা

০১. আজ এ সব দাগ অনুও গর্ব করে স্বীয় দীপ্তিতে
তোমার দরবারে সিজদার চিহ্ন যাদের কপালে ॥
০২. রাজা-রানী আর হাতি ঘোড়া ছাড়া
ঘুমায় না খোকা-খুকু গল্প ছাড়া ॥
০৩. আঁচলে সব ছেড়া টুকরো নিয়ে চলে যা হে পাগল
এখানে জামার ধারী থেকেও তৈরি হয় নতুন শিকল ॥
০৪. ফেরত যাওয়ার আর জো কোথায়?
ঘর ছেড়েছি বুক ভাসানো অশ্রুকণায় ॥
০৫. আমরা তো বন্ধুত্ব রক্ষায় অভ্যস্ত
কষ্ট দেয়া সেতো তোমার জীবনের রীতি ॥
০৬. পিপাসায় শুকনো ঠোঁট রাখিনি ফোরাতে
ইতিহাস পানির এই প্রথম পরাজয় দেখল বুঝি ॥
০৭. পরীর দেশের আজব গল্প শুনতে ভারি মজা
ক্ষুধার্ত শিশুধের এভাবেই ঘুম পাড়ালো মা ॥
০৮. আমার সিজদা এ দুনিয়াতে আমার কাজে এসেছে
হত্যাকারী আমার কপাল দেখেই চিনে নিয়েছে ॥
০৯. পানির মতো ভেসে গেছে হাজারো বছর কখনো
কভু এমনিতেই থমকে গেছে যেন মুহূর্ত ॥

---

২১১. সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম, তাফসীরে মসজিদে নববী পৃ. ২৩৬ এর সূত্রে।

১০. আমিতো মদিরাচ্ছন্ন চোখে বুঝে ছিলাম কাঁচি
তুমি হেঁসে এনে দিলে প্রাণ আমার শিরায় ॥
১১. তোমার নীড় নয়কো রাজপ্রাসাদের গম্বুজে
তুমি বাজ পাখি; রাত্রি যাপন করো পাহাড়ের চূড়ায় ॥
১২. ঝড়-ঝাঁপটায় এমন ব্যাকুল হয় মানুষ
যে ফাঁপা গাছেই জড়িয়ে নেয় নিজেকে ॥
১৩. চাঁদের চরিত্র গ্রহণ করেছি হে বন্ধু
দাগ নিজে রেখেছি আলো করেছি বণ্টন ॥
১৪. মানুষজন উচ্চাসনে সামাসীন হয়ে যখন
অন্যদের কতটা তুচ্ছ মনে হয় তখন ॥
১৫. পৃথিবীবাসী আমাদের দোয়া দিক, এ আশায় বন্ধ বাতাস
আমি জ্বালাইনি বাতি তবে প্রবাহিত হয়নি বায়ু; সর্বনাশ ॥
১৬. অন্তর বিনা এখন আর কাজে আসবে না কিছু
হত্যাকারীর সরুপথ ছাড়া সব রুদ্ধ গলি শুধু ॥
১৭. না বলা থেকেও ভাষার কারিশমা আবিস্কার করা যায়
নির্যাতন সহ্য করলেও জালিমের সাহায্য-সহযোগিতা হয় ॥
১৮. সে দিলজগতে বর্ষিত হোক রহমত খোদার
একবার অপরাধ করে, লজ্জিত হয় যার মানস শতবার ॥
১৯. সূর্যের কিরণের সাহায্যে হলো এই ক্ষতি
হাত বাঁড়িয়ে দেয় না কেউ চাইলে মোমবাতি ॥
২০. মনের স্বাধীনতায় শাহেনশাহী আর পেটের ধান্দায় মরণ
সিদ্ধান্ত তোমার হাতে, কোন্‌টির করবে অনুসরণ ॥

নিজে সুখে থেকে অন্যকে সুখে রাখবে

মানুষের জীবন বলতে কিছু চাহিদা, আশা ও দায়িত্বানুভূতিকে বোঝায়। স্বীয় জীবনের সূচনা লগ্নে সে শুধু নিজের চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষার কথা চিন্তা করে। কিন্তু তার খুব দ্রুত অনুভূতি হয়ে যায় যে, সে এমন এক সমাজে বাস করে যেখানে তাকে শুধু নিজের জন্য নয়, বরং অন্যের জন্যও অনেক কিছু করতে হবে। তখন তার আশা-আকাঙ্ক্ষার সাথে কিছু দায়িত্ববোধও সংযোগ হয়ে যায়। এমন অবস্থায় নিজের ব্যক্তিত্বকে মর্যাদাপূর্ণ ও গ্রহণযোগ্য বানানোও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এভাবে যখন জ্ঞানপ্রসূত ও স্বভাব মানসিক কর্মক্ষম ব্যক্তিত্বের ওপর প্রভাবিত হয়, তখন মানুষ নিজেই নিজের স্বভাবকে পরিবর্তন করতে থাকে। এটা জীবনের এমন এক স্তর যেখানে এসে অধিকাংশ মানুষ নিজের অগ্রাধিকার ও পছন্দের কথা ভুলে যায়। সে তখন নিজের জন্য নয় বরং অন্যের জন্য বেঁচে থাকে। নিম্নে ওই সমস্ত কাজের বিতর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে যা আপনার ব্যক্তিত্বকে বৃদ্ধি ও ধ্বংস করার জন্য দায়ী। এখন এটা মানুষের বিবেকের ওপর ছেড়ে দেয়া হলো, সে নিজের জন্য কোন পথ অবলম্বন করবে?

ভিতরের অনুভূতিগুলো গোপন রাখতে শিখুন

কিছু অপ্রিয় সত্য, তিক্ত বাস্তবতা ও ঘটনাবলি থেকে আমরা প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু শিখতে থাকি। চেহারার ভাব, শারীরিক অঙ্গ-ভঙ্গির মাধ্যমে আমরা আমাদের ভিতরের অনুভূতি ও আবেগগুলোকে ব্যক্ত না করাও শিখে নেই। আমাদের ব্যক্তিত্বের কৃত্রিম পর্দা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জন্য কল্যাণকর প্রমাণিত হয়। একটু কল্পনা তো করুন! যদি আমাদের ভিতরের কল্পনা ও ভাবনাগুলোর প্রতিচ্ছবি আয়নার মতো চেহারায় ধারণ করতো তাহলে জীবন কেমন দুর্বিষহ হতো? তাহলে আমাদের মধ্যে অনেকেই নিজের চাকুরিটাই খুয়ে বসতো। হয়তো বৈবাহিক জীবনে প্রভাব পড়তো ও বিশৃঙ্খলার শিকার হতো। না কোনো বন্ধু থাকতো না কোনো আত্মীয়স্বজন। কেননা আমাদের চেহারা থেকে সত্য প্রতিক্রিয়া প্রকাশ হওয়ার অপরাধে আমরা নিজেরাই নিজেদের শত্রু বানিয়ে ফেলতাম। সুতরাং আপনি তার জন্য অস্থির হবেন না যে, আপনার ব্যক্তিত্বে নোংরামি অথবা কপটতা কেনো বিদ্যমান? অথবা বৈপরীত্বের সাথে সমঝোতা করছেন? আপনি একে যৌক্তিক নামও দিতে পারেন। এটা এমন এক যৌক্তিকতা যা সমাজিক সম্পর্ককে আরো উন্নতি করতে খুবই প্রয়োজন।

সমাজ উপযোগী মানসিকতা গড়ুন

আমরা সমাজে বিভিন্ন লোকদের সাথে কিভাবে মিশবো? তা নির্ভর করে আমাদের মানসিকতা ও সামাজিক অবস্থার ওপর। সমাজের ভাবধারা অনুযায়ী কিভাবে নিজের আবেগ প্রকাশ করবো? এ জিনিসগুলো আমাদের রীতি-নীতিতে বড় ভূমিকা পালন করে। মানুষ চায় যেন আমরা তাদের পছন্দ-অপছন্দ অনুযায়ী নিজের ব্যক্তিত্ব নির্মাণ করি, আমাদের অনুভূতি কী এবং স্বভাবত আমাদের কোনটি ভালো ও কোনটি মন্দ লাগবে, সে রীতিমতো নিজেদের ইচ্ছা ও মতামতকে চাপিয়ে দেওয়ার জন্য উদগ্রীব থাকে। যারা সমাজের এ চাওয়ার সাথে নিজেকে খাঁপ খাইয়ে নিতে পারে সে তার জীবনকে সফল ও সার্থক করে গড়ে নিতে সক্ষম হয়। আর যে এর সাথে বিদ্রোহ করে, এর বিপরীতে নিজেকে দাঁড় করায় সে মূলত নিজেকে অন্যের চোখে ছোট ও নিচু বানিয়ে ফেলে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, সমাজের সাথে তাল মিলাতে গিয়ে আপনি নিজের ব্যক্তিসত্ত্বা ও বৈশিষ্ট্যকে একেবারে ধ্বংস করে দেবেন।

তিক্ত কথাগুলো ভুলে যান

একটু ভেবে দেখুনতো! জীবনের ছোট ছোট ঘটনা অথবা দুর্ঘটনাকে যদি আমরা মনে রাখি তবে জীবন কতটা দুর্বিষহ হয়ে ওঠবে। কেউ কতই না চমৎকার বলেছে : 'আপনি যদি আপনার সম্পর্ককে মনোরম ও দীর্ঘস্থায়ী বানাতে চান তবে প্রয়োজন হলো আপনার স্মৃতিশক্তি সীমিত হতে হবে।'

স্মৃতি ভুলে যাওয়ার এ অভ্যাসটির আরেকটি লাভজনক দিক আছে। সাধারণত লোকজন যখন কোনো ভীতিকর দুর্ঘটনার শিকার হয় যেমন, একসিডেন্ট, খুন অথবা প্রাকৃতিক কোনো দুর্যোগ, তখন এসবের প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচানোর জন্য স্মৃতিশক্তির কোনো কোণে গোপন করার চেষ্টা করে। যার ফলশ্রুতিতে স্মৃতিপটে আত্মবিস্মৃতির অবস্থার অবতারণা ঘটে। এভাবে প্রতিরোধ করার কারণে শরীরের মাঝে এর কোনো প্রভাব প্রতিফলিত হয় না। যে সব লোকের মাঝে অপ্রিয় ও তিক্ত বিষয়গুলো ভুলে যাওয়ার অভ্যাস না থাকে, তারা অধিকাংশ সময় অস্থিরতা ও হতাশাময় জীবনের সম্মুখিন হয় এবং এ কারণে মানুষের সাথে তার আচার ব্যবহারও তিক্ত হয়। সুতরাং আপনার চেষ্টা হওয়া চাই, যে বিষয়টি আপনার কষ্টের কারণ হয়, তা যতটুকু সম্ভব মন থেকে দূরীভূত করুন।

অন্যের অনুভূতিকে মূল্যায়ন করুন

মানুষের ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কেমন হয়ে থাকে? এ বিষয়টি সমাজে নিজেকে প্রত্যেকের কাছে প্রিয় বানানোর ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। অনেকেই প্রচুর মেধা ও যোগ্যতার অধিকারী। কিন্তু তারা মানুষের অনুভূতির মূল্যায়ন করতে পারেনা। তারা শুধু এ বিষয়কে গুরুত্ব দেয় যেন মানুষ তার ব্যক্তিত্বকে বুঝার চেষ্টা করে। আর এ বিষয়টি তাকে সামাজিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ করে। পক্ষান্তরে আরেক লোক ততটা যোগ্য নয় কিন্তু যেহেতু সে অন্যদের অনুভূতির প্রতি পূর্ণ মনোযোগি হয় এবং বুদ্ধিমান মানুষের চেয়ে বেশী বিজ্ঞ মনে হয়। আপনি খামোখাই নাম কামানোয় লিপ্ত হবেন না। আপনার কোনো কর্মকাণ্ডে কারো অনুভূতিতে আঘাত লাগতে দেবেন না। আপনার দ্বারা কারো আবেগেও যেন আঘাত না লাগে।

চাটুকরিতার পথ পরিহার করুন

বর্তমানে সমাজে বাহ্যিক রূপ-লাবণ্য ও ধন-দৌলতের ভিত্তিতে মানুষকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। আর তারই ভিত্তিতে অন্যের অনুভূতির প্রতি খেয়াল রাখা হয়। ফলে তার ব্যক্তিত্ব সম্পূর্ণরূপে কৃত্রিমতা ও লৌকিকতা হয়ে যায়। তাদের অন্তরে একরকম আর বাইরে ভিন্ন কিছু হয়ে থাকে। তারা তাদের ব্যক্তিত্বের ওপর বিশ্বাস করতে পারে না যে, সে কে এবং কী তার বাস্তব মূল্য ও মর্যাদা?

এটি এমন এক মানসিক রোগ, যে রোগে আক্রান্ত হয়ে মানুষের আমিত্ব তার ভিতরেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা যায়। সাধারণত ফিল্মস্টারগণ এ রোগের শিকার হন। আমাদের মাঝেও প্রত্যেকে তার ব্যক্তিজীবনে কখনো এ অবস্থার মুখোমুখি হয়েছে। কেউ যদি দাবী করে যে, সে তার জীবনে কখনো এ রোগে আক্রান্ত হয়নি তবে নিঃসন্দেহে সে মিথ্যার আশ্রয় নিচ্ছে। এটা মানুষের ওপর নির্ভর করে, এই লৌকিকতার পরিবেশ থেকে বের হতে কী পরিমাণ যোগ্যতা রাখবে। এই বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ যত দ্রুত নেওয়া যাবে, একজন ব্যক্তিত্ববান ও ভালো মানুষ হওয়ার জন্য ততটাই সহায়ক হবে।

দৃষ্টিভঙ্গিতে নম্রতা আনুন

আমরা নিজের জীবনে কখনো এমনভাবে কথা বলি যদ্দারা আমাদের ধ্যানধারণা ও অনুভূতি সঠিকরূপে প্রতিভাত হয় না। এর অনেক কারণ হতে পারে। আমরা মানবতার খাতিরে কাউকে নারাজ করতে চাই না

অথবা মন থেকে কারো প্রশংসা করতে চাচ্ছি না কিন্তু স্বভাবতই করতে হয়। কারণ যাই হোক না কেনো, সত্যি হলো এই যে, নিজের জীবনের বেশীরভাগই অর্ধেক সত্য ও মিথ্যার আশ্রয়ে কেটে যায়। একজন ব্যক্তি যত বড়ই আমিত্ববোধ ও আত্মম্ভরিতার দাবীই করুক না কেনো, আজীবন সে তার আমিত্ববোধের আঙ্গিনায় পদচারণা করতে পারে না। কোথাও না কোথাও তাকে বাধ্যতামূলক অন্যের জন্য কিছুটা বিনম্র ও নমনীয় হতে হয় এবং অধিকাংশ সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্যের অনুভূতির প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়।

দু'জাহানের স্বামী তুমি হে প্রিয় মালিক
রহমত বর্ষে, আমায় বইছে যে আঁখিধারা ॥
বুক ভরা দরদ উথলে উঠেছে করো যে দয়া
তোমায় দিয়ে প্রাণভরা আমার জীবনআশা ॥
ঠোঁট মুদে তাই চুপচাপ; আমি শুনছি যে সদা
মিটাও জ্বালা, হতাশায় আমার মুক্ত করো দিশা ॥
পথে পথে স্তব্ধতা, গুলশান সব বিজন বিরান
তোমার দয়ায়, আসুক এবার জীবনে সঞ্জীবন ॥
এখানে শুরু তোমাতে শেষ সংকটে জ্বালাও বাতি
তোমার দয়া চাই সদা তব তটে যবে ভিড়বে তরী ॥

কিছু নির্বাচিত পংক্তিমালা

বিরান ঘরে নাড়লে কড়া খুলবে গো কে সেই দুয়ার?
রাণী হয় রাত, তার স্মরণে; সন্ধ্যা হলেই সুখসম্ভার ॥
তাদের মাঝে মা-বাবার রীতি নীতি কেমন পাবে?
আধুনিক শিক্ষায় হৃষ্ট তারা পুষ্ট কৌটার দুধে ॥
বাইর দেখে যায় না চেনা আসল মানবী
বাইরের মতোই ভিতর হবে এমন কী জরুরী!

নেককার স্ত্রী এক অমূল্য সম্পদ

নেককার জীবনসঙ্গিনী নিঃসন্দেহে এক অমূল্য সম্পদ। ইতিহাসে পাওয়া যায়, অনেক প্রসিদ্ধ মহামনীষীদের প্রসিদ্ধি ও তার মহান ব্যক্তিত্ব গঠনের পেছনে নেককার স্ত্রীর প্রভূত অবদান ছিলো। পৃথিবীর সবচে শ্রদ্ধেয় সম্মানিত ব্যক্তিত্ব হযরত মুহাম্মদ সা.-এর ওপর যখন গারে হেরায় সর্বপ্রথম হযরত জিবরাইল আ.-এর মাধ্যমে ওহী নাযিল হয়, তখন নবী করীম সা. অত্যন্ত ভীত সন্ত্রস্ত ও

পেরেশান হয়ে পড়েন। ভয় শংকা ও ঘর্ম মিশ্রিত ললাট নিয়ে যখন মহানবী সা. ঘরে ফিরলেন তখন তাঁকে সান্ত্বনা বাক্য শুনানো, কপালের ঘাম মুছে দেয়া, সাহস দান এবং মহানবী সা.-এর কালিমায়ে হক-এর ওপর সর্বপ্রথম ঈমান আনয়ণকারী, সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করেছিলেন হযরত খাদিজাতুল কুবরা রা.। তিনি ছিলেন নবী করীম সা.-এর সম্মানিতা পত্নি। যিনি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ত্যাগ স্বীকার করে স্বামীর হক আদায় করেন এবং ইসলামের প্রচার-প্রসারের নিমিত্তে আপন সমুদয় ধন-সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় বিলিয়ে দেন। অন্যদিকে যখন নবী করীম সা.-এর দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়ার মুহূর্ত হয় তখনও হুযূর সা.-এর মাথা মুবারক হযরত উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রা.-এর কোলেই রাখা ছিলো।

তাঁরা ছিলেন উম্মতের মাতৃধন। যাঁরা নবী করীম সা.-এর দীন প্রচারের মিশনে নিজেদের সর্বস্ব কুরবান করে দিয়ে ছিলেন। কোনো কোনো নবীপত্নি খান্দানী ধন-দৌলতের অধিকারিণী ছিলেন। তাঁরা চাইলে সেসব ধন-দৌলতের আশ্রয় নিয়ে অত্যন্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে জীবন যাপন করতে পারতেন। কিন্তু তাঁরা নবীপত্নি হয়ে থাকতেই পছন্দ করেছেন। কষ্টের জীবনকে ধন-দৌলতের ওপর প্রাধান্য দিয়েছেন।

একটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে: 'উত্তম সম্পদ হলো, নেক স্ত্রী। স্বামী যখন তার দিকে তাকায় ওই স্ত্রী তখন স্বামীকে খুশী করে দেন। স্বামী যখন তাকে কোনো কিছুর আদেশ করে তখন সে মন-প্রাণ দিয়ে তা বাস্তবায়ন করে। স্বামী যখন ঘরের বাইরে থাকে তখন সে উত্তম রূপে তার ব্যক্তিত্ব-সতিত্বের সংরক্ষণ, স্বামীর ঘরের হেফাযত, সেই সাথে তার সন্তানদের ভালোভাবে লালন-পালন করে। স্বামীর অনুপস্থিতে তার ঘরে এমন কাউকে প্রবেশ করতে দেয় না, যার আসাটা স্বামী অপছন্দ করে।[২১২]

এ কথা সত্য যে, ধন-সম্পদ তো শুধু মানুষের বৈষয়িক চাহিদা পূরণ করে। কিন্তু নেক স্ত্রী পরিবার ও ঘরকে শান্তি-সুখ ও আনন্দের সূতিকাগার বানিয়ে দেয়। সে তার মিষ্টি কথাবার্তা ও উন্নত চরিত্রের মাধ্যমে পুরো ঘরের পরিবেশ মাতিয়ে রাখে এবং ঘরে ভালোবাসার সুবাস ছড়িয়ে দেয়। তার উন্নত স্বভাব এবং পরিবারের সকল সদস্যের সাথে তার সুন্দর আচরণ পরিবারের সকলের জন্য পরম সুখময়ে পরিণত হয়। নবী করীম সা.

---

২১২. নাসায়ী, কিতাবুন নেকাহ, মুসনাদে আহমদ।

ইরশাদ করেন, সমস্ত পৃথিবী তো সাময়িকভাবে উপকারে আসে কিন্তু একজন সৎ স্ত্রী সুখী জীবনের (দুনিয়াতে অস্থায়ী জান্নাতের নমুনা) দায়িত্ব নেয়। কোনো এক জ্ঞানী ব্যক্তি এ বিষয়টিকে একটি ঘটনার রূপ দিয়ে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। সে ঘটনার বর্ণনা নিম্নরূপ, যাতে মহিলাদের জন্যও রয়েছে অনুপম শিক্ষা।

এক দুর্বল নারী। সে বৃদ্ধা হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত রূপ-লাবণ্যময়ী চেহারার অধিকারিণী ছিলো। তাকে কোনো এক যুবতী বিবাহিতা মহিলা তার এই রূপ–লাবণ্য ও সৌন্দর্য্যের রহস্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তখন এ বর্ষীয়ান মহিলা সংক্ষেপে এতোটুকুই বলে যে, 'আমি সর্বদা আমার ঠোঁটকে সততার রঙে রাঙিয়ে রাখি। স্বীয় জিহ্বাকে আল্লাহর যিকিরের মাধ্যমে সর্বদা সতেজ রাখি। আল্লাহ যে জিনিসকে দেখতে নিষেধ করেছেন তা থেকে সর্বদা বিরত রয়েছি। অর্থাৎ বিরত থাকার সুরমা ব্যবহার করেছি। স্বীয় হাতে দানের (বদান্যতা ও উদারতার) মেহেদী লাগিয়েছি। স্বীয় আমলের ওপর ধৈর্য ও অটল থাকার পাউডার লাগিয়েছি। আপন হৃদয়ে স্বীয় আল্লাহ তাআলার ভয় ও মহব্বত আবশ্যকীয় করেছি। স্বীয় জ্ঞানের ওপর প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতাকে প্রাধান্য দিয়েছি। নিজের সত্তাকে আল্লাহর নির্দেশ মানার পর নিজের স্বামীর আনুগত্য ও খুশীর ছায়াতলে সঁপে দিয়েছি। আত্মাকে এই ভেবে বেঁধে রেখেছি যে, আল্লাহ তাআলা তো সবখানে আছেন, সব বিষয়ে তিনি অবগত আছেন। তিনি সব দেখেছেন। আমার চেহারার নূর ও রূপ লাবণ্য এ সব নেক আমলের বদৌলতেই।'

মহান আল্লাহর দরবারে আরয করেছি, আপনি সকল মুমিনের ঘরের পরিবেশ দেখছেন। আপনি সবাইকে এই বুযুর্গ মুমিনা নারীর আমলের অধিকারী বানিয়ে দিন। আমীন।

আপন দাম্পত্য জীবনকে সুখী করুন

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার অতি সাধারণ দ্বিমত ও দ্বন্দের সময় যদি বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেওয়া না হয় তবে জটিলতা বেঁধে যায়। দাম্পত্য জীবনে তিক্ততাও নেমে আসে, কিন্তু ঐ মুহূর্তে উভয় দিক থেকেই তখন শুধু আবেগের বহিঃপ্রকাশ হয়। ছেলে-মেয়ে, মা-বাবাও সন্তানের মহব্বতে ও ব্যক্তিগত অহংকার বোধের কারণে বিষয়টিকে সমাধানের পরিবর্তে আরো জটিল করে তোলে। পরিবারের মুরুব্বী যার মিমাংসা ও সমাধান করা কথা তাদের ঘটনার এক অংশ দেখেই বিচার করাটা আমাকে আরো বিস্মিত করে।

স্বামী-স্ত্রীর বৈরী সম্পর্কের জন্য মৌলিকভাবে উভয়েই দায়ী। তবে আমাদেরকে এ উভয়ের সম্পর্ককে পুনরায় ভালোবাসার পথে নিয়ে আসতে হলে নিঃস্বার্থভাবে পরিপূর্ণ চেষ্টা করা উচিৎ। নবী করীম সা.-এর জীবনচরিত আমাদের জন্য পূর্ণ অনুসরণীয় ও অনুকরণীয়। অতএব, দাম্পত্য জীবনের এ দিকটিকেও মহানবী সা.-এর পবিত্র জীবনচরিত থেকে হৃদয়ঙ্গম করে নেওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ।

হযরত ফাতেমা রা. নবী করীম সা.-এর প্রিয়তমা কন্যা ছিলেন। তিনি তাঁকে তাঁর কলিজার টুকরো এবং জান্নাতী মেয়েদের সরদার বলে ডাকতেন। তাঁর বিয়ে হযরত আলী রা.-এর সাথে হয়। যিনি আশারা-মুবাশ্‌শারা [জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন]-এর একজন। এমন মহান মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিত্বের অধিকারীদের মধ্যেও কখনো কখনো তিক্ততা সৃষ্টি হয়ে যেতো।

ইতিহাসের কিতাবে এই ঘটনার উল্লেখ আছে যে, একবার কোনো ব্যাপারে তাদের পরস্পরে ঝগড়া বাঁধে। হযরত ফাতেমা রা. তাঁর প্রিয় পিতা মহোদয়ের খেদমতে হাজির হন। পিছনে পিছনে রাসূলুল্লাহ সা.-এর জামাতা হযরত আলী রা.ও দুরু দুরু বুকে পৌঁছলেন এবং দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে গেলেন। ভাবতে লাগলেন, আল্লাহ না করুন, আল্লাহর রাসূল সা. যদি অসন্তুষ্ট হয়ে যান তবে তো দুনিয়া-আখেরাত সবই ধ্বংস হয়ে যাবে।

হযরত ফাতেমা রা. নবী করীম সা.-এর খেদমতে আপন স্বামীর অভিযোগ করলেন। ঘটনা শোনালেন এবং কেঁদে কেটে একাকার হয়ে গেলেন। কিন্তু নবী করীম সা. যে প্রতিক্রিয়া দেখালেন, তা আমাদের কল্পনাতীত ও ভাবনার পরিপন্থী। তিনি সংসার আবাদ করার মতো আচরণ করেছেন। পিতা মেয়েকে এভাবে কাঁদতে দেখে অশ্রুসিক্ত হলেন। মেয়েকে বোঝাতে গিয়ে স্নেহপরায়ণ পিতা বললেন, মা! আমি তোমার বিয়ে এমন এক ব্যক্তির সাথে দিয়েছি যে কুরাইশি যুবক ও ইসলাম গ্রহণকারী যুবকদের মাঝে সর্বোত্তম। মা! স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মাঝে কখনো কখনো এমন কথা হয়েই থাকে। চাই সে স্বামী-স্ত্রী যে কেউ হোক না কেনো। মা! এটা কী করে সম্ভব যে, স্বামী সর্বদা স্ত্রীর মর্জি মতো সব কাজ করবে আর সে তার স্ত্রীকে কিছুই বলবে না। মা! নিজ বাড়িতে যাও! আল্লাহ তোমাকে সুখি সমৃদ্ধশালী রাখুন। আর আমি তোমাদের দু'জনকে খুশী দেখে নিজের চোখ শীতল রাখবো।

হযরত ফাতেমা রা. বিদায় নিলেন। এদিকে হযরত আলী রা. আবেগে আপ্লুত হয়ে আড়াল থেকে বের হয়ে সামনে এলেন। চোখ ছিল অশ্রুসিক্ত। কোমল কণ্ঠে হযরত ফাতেমা রা.-কে বললেন, আল্লাহর কসম, ভবিষ্যতে তুমি এমন কোনো বিষয় দেখতে পাবে না যার দ্বারা তোমার কোমল হৃদয় আঘাত প্রাপ্ত হয়। একথা শুনে হযরত ফাতেমা রা.ও আবেগী হয়ে বলতে লাগলেন, ভুলতো আমার-ই ছিলো। অতঃপর দু'জনেই খুশি মনে বাড়ি ফিরে এলেন।

ঘরে দীনি পরিবেশ তৈরি করুন

ইসলামবিরোধী শক্তি, সংস্থা, সংগঠন ও মিশনারীরা নিজেদের টার্গেট ও লক্ষ্য পূরণে আন্তর্জাতিকভাবে সমগ্র দুনিয়াতে; বিশেষত মুসলমানদের মাঝে নাস্তিকতা, বদ দীনি, বেহায়াপনা ও বেলেল্লাপনার প্রচলন ঘটিয়ে ইসলামী সভ্যতা ও সংস্কৃতি নিশ্চিহ্ন করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে। বর্তমান সময়ে তারা খুবই অগ্রসর ও বেগবান। তারা এর জন্য কত পদক্ষেপ ও চেষ্টা-তদবীর-ই না করে চলেছে! যেমন, ভিডিও চিত্র, টেলিভিশন, রেডিও ও অডিও, চরিত্র বিনষ্টকারী ম্যাগাজিন-পত্রিকা। এ সব আধুনিক হাতিয়ারে সজ্জিত হয়ে তারা মুসলমানদের জীবনবোধ ও অনুভূতি থেকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতিকে কুরে কুরে বের করে নিক্ষেপ করে দিতে চায়। বিশেষত অবলা শিশু-কিশোরদেরকে পশ্চিমা ধাঁচে গড়ে তুলে তারা তাদের থেকে নিষ্পাপতা, সাধুতা, সূচিতা ও পবিত্রতা ছিনিয়ে নিতে চায়।

ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز
چراغ مصطفوی سے شرار بولہبی

সেই সূচনা থেকে আজো তারা আপসহীন যোদ্ধা
বু-লাহাবী মিশন রোধে নববী পথে যাত্রা।

সবচে' বড় কষ্টদায়ক কথা হলো, ওই মুসলমান —যারা কখনো নিজের চরিত্র সভ্যতা সংস্কৃতি শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যমে পুরো দুনিয়ার রাজত্ব করেছে— আজ সেই তারাই আধুনিকতা ও প্রগতির নামে পশ্চিমা সভ্যতায় গা এলিয়ে দিচ্ছে। চিন্তা-চেতনার অধঃপতন ও আমলী অবক্ষয় আজ তাদের দিকে ধেয়ে আসছে। অধিকাংশ মুসলমান পরিবারে চারিত্রিক অবক্ষয়ের সব কিছু বিদ্যমান। মুসলিম বাচ্চা-কাচ্চাদের মাঝে অনৈসলামিক ধ্যান-ধারণার প্রতি

আসক্তি পরিলক্ষিত হচ্ছে। ধীরে ধীরে তারা ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা থেকে হাজার মাইল দূরে সরে যেতে চলেছে। অনেক পরিবারে এমন লোকও আছে যারা মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও কালিমায়ে তাওহীদ : 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু' পর্যন্ত (ছহীহ শুদ্ধভাবে) জানে না। সে শুধু পারিবারিক মুসলমান। তাকে যদি কোনো ফিল্ম বা সিরিয়ালের কোনো গল্প জিজ্ঞেস করা হয় তবে সে কাহিনীটি হুবহু বলার ক্ষেত্রে এতটুকু সংশয় বোধ করবে না। কিন্তু তাকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় আমাদের নবী সা.-এর নাম কী? তাঁর ওপর আসামানী কোন কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে? খোলাফায়ে রাশেদীন কারা ছিলেন? ইসলামের মৌলিক আরকানগুলো কি কি? সেগুলোর তাকাযা ও চাহিদা কী? এসবের যে কোনো উত্তরই দিতে পারবে না। উম্মতে মুসলিমার এহেন পরিস্থিতি নিঃসন্দেহে দুঃখজনক ও গভীরভাবে ভাববার বিষয়।

এ শিশু সমাজের অবক্ষয়ের জন্য অন্যতম দায় হলো, পিতা-মাতারা আপন কর্তব্য পালনে উদাসীন। ছেলে-মেয়েরা হলো আল্লাহ তাআলার আমানত। তাদের ভালো শিক্ষা-দীক্ষা দেয়া, তাদের দেখভাল করা এবং তাদেরকে ইসলামী শিক্ষার আলোকে বড় করে তোলা পিতা-মাতার দীনি দায়িত্ব। কেননা ছেলে-সন্তানদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত ও বিনষ্ট হওয়ার ক্ষেত্রে মাতা-পিতার যথেষ্ট ভূমিকা রয়েছে। নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, সব সন্তান-ই স্বভাবগতভাবে ইসলামের ওপর জন্মগ্রহণ করে, অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইয়াহুদী-খৃস্টান, অগ্নিপূজক বানিয়ে ফেলে।[২১৩]

ভিন্ন শব্দে বললে, ছেলে-সন্তানরা বাবা-মায়ের প্রতিচ্ছবি হয়ে থাকে। তার উপমা হলো, গাছের বের হওয়া ছোট্ট শেকড়ের মত। যদি রোপনকারী তার দেখাশোনা করে, তাতে নিয়মিত পানি ঢালে এবং বাতাসের তীব্রতায় যমীনে পড়ে যাওয়ার ভয়ে একটি কাঠ-বাঁশ তার সাহায্যের জন্য পুঁতে দেয় এবং যথাসম্ভব তা সোজা রাখার চেষ্টা করে তবে সে চারাটি একদিন বড় হবে এবং সোজা দৃষ্টিনন্দন একটি গাছে পরিণত হবে। আর যদি চারাটিকে তার অবস্থায় ছেড়ে রাখা হয় তবে তার ডাল-পালাগুলো এদিক ওদিক ঝুলে থাকে। দেখতে অসুন্দর লাগে। তদ্রূপ সন্তানদের ভালো ও মন্দ শিক্ষা তার ভবিষ্যতকে সুন্দরভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

---

২১৩. বুখারী, মুসলিম।

সন্তানদের জীবন গড়া ও ধ্বংস হওয়ার ক্ষেত্রে মায়ের দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপর্ণ। কেননা সে মানববংশধারার শিক্ষক ও দায়িত্বশীল মুরব্বী। পুরো পরিবার ও সমাজের গঠন ও ধ্বংস এই মা'র ওপরই নির্ভর করে। নবী করীম সা. ইরশাদ করেন, 'নারী স্বামীর ঘর ও তার সন্তানদের সংরক্ষক। তাকে সন্তানদের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।'[২১৪]

একজন মা এই গুরুদায়িত্ব তখন ভালোভাবে পালন করতে পারবেন যখন সে নিজে শিক্ষাদীক্ষার সমস্ত নিয়ম নীতি ও পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞাত থাকবেন। তাই একজন মায়ের জন্য আবশ্যক হলো, তিনি উন্নত চরিত্রের অধিকারিণী হবেন। আপন মান-মর্যাদা ও দায়িত্বের অনুভূতির অধিকারিণী হবেন। নিজেকে ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষার বাস্তব নমূনা বানাবেন। ভালো কথা গ্রহণ করার চেষ্টা করবেন আর নিষিদ্ধ কর্ম থেকে বিরত থাকবেন। হালাল-হারামের প্রতি খুব খেয়াল রাখবেন। হিংসা-বিদ্বেষ, লোভ, মিথ্যা এবং মুনাফেকীর আচরণের মতো আত্মিক ব্যাধি থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার পূর্ণ চেষ্টা করবেন। নিজের চিন্তা-চেতনা, ইবাদত, ওঠা-বসা, দীন-ধর্ম, অভ্যাস, চরিত্র; এককথায় জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে দীনের অনুশাসন মেনে চলবেন। এসবের পর যখন একজন মা তার সন্তানের লালন-পালন করেন তখন ঐ ঘরে দীনি পরিবেশ গড়ে ওঠবে। বাড়ি থেকে অনৈসলামিক আচার-রেওয়াজ এবং নতুন-পুরাতন অজ্ঞতার অন্ধকারগুলো মুহূর্তেই বিদূরিত হবে। মহিলা সাহাবী ও তাবেয়ী যুগের নারীদের জীবন এরই জ্বলন্ত প্রমাণ। আজো সময় আছে, আসুন আমরা মুসলমান বাবা-মা তাদের চাল-চরিত্র সংশোধন করে নতুন সময় ও নতুন সমাজ গঠনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি। আত্মত্যাগ, কুরবানী, মহব্বত ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের পরিধি বিস্তৃত করার চেষ্টা করি। পিতা-মাতা যদি এ কাজ না করেন তবে কিয়ামতের দিন তাদেরকে আল্লাহ তাআলার দরবারে জবাবদিহীতার মুখোমুখি হতে হবে। যেমন একটি হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে, 'তোমাদের প্রত্যেক দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে তার দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হবে।'[২১৫] আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন।

---

২১৪. বুখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফ।

২১৫. বুখারী, মুসলিম শরীফ।

কয়েকটি জ্ঞানগর্ভ মুক্তা

১. সৎ ব্যবসায়ীদের পুনরুত্থান নেককার ও শহীদদের সাথে হবে।

২. আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী ধনী লোকের চেয়ে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী দরিদ্র লোক উত্তম।

৩. মন্দ লোক কারো ব্যাপারে সুধারণা পোষণ করতে পারে না।

৪. না-শুধরে শুধু অনুতপ্ত হওয়া এমন, যেমন ফুটো বন্ধ না করে জাহাজ থেকে পানি সেচা।

৫. পেরেশানী ও দুশ্চিন্তা দূর করার সহজ উপায় হলো, কোনো গঠনমূলক কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখা।

৬. চতুর-ধুরন্ধর লোক ঐ হিংস্র প্রাণীর মতো যে প্রাণী শিকারের লক্ষ্যে নখ বা থাবা লুকিয়ে বসে আছে।

৭. বনী ইসরাঈলের লোকেরা এ জন্য ধ্বংস হয়েছিলো যে, তারা অসহায় লোকদেরকে সাজা দিত আর সম্পদশালীদের ছেড়ে দিত।

৮. পুরো দুনিয়া খারাপ চরিত্রের উদাহরণ দিলেও মানুষকে নিজের সুন্দর চরিত্র ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়।

৯. আল্লাহ তাআলার কাছে তাঁর দয়া ও অনুগ্রহ চাও, কেননা তিনি তাঁর কাছে প্রার্থনা করা পছন্দ করেন।

১০. সর্বক্ষেত্রে আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব, দেশের কল্যাণ ও সততা অর্জনে লক্ষ্য রাখবে।

১১. নিজের অন্তরকে বন্ধুত্বের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করো, কেননা এটা এমন সাক্ষী, যে কারো থেকে ঘুষ গ্রহণ করে না।

১২. সম্পদের লোভে যুদ্ধকারী ব্যক্তি শহীদদের দলভুক্ত হবে।

১৩. কুরআনুল কারীম ও আল্লাহর যিকিরকে আঁকড়ে ধর। কেননা এটা তোমার জন্য দুনিয়াতে নূর এবং আল্লাহর দরবারে উত্তম আলোচনা হওয়ার অন্যতম মাধ্যম।

১৪. যারা মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না তারা আল্লাহ তাআলার কৃতজ্ঞ বান্দা হতে পারে না।

১৫. প্রতিশোধ নেওয়ার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও ক্রোধ হজম করাই হলো সর্বোত্তম জিহাদ।

১৬. ইলম সম্পদের চেয়ে উত্তম। কেননা ইলম তোমায় রক্ষা করে আর তুমি সম্পদ রক্ষা করো।

১৭. শুধু ইচ্ছা করলেই সবকিছু পাওয়া যায় না, তার জন্য চেষ্টা-তদবীরও আবশ্যক।

১৮. তুমি যদি উচ্চ শিখরে পৌঁছতে চাও তবে নিজের সংকল্প ও মনোবল উন্নত করো, কেননা মনোবলই তোমার শক্তি।

১৯. নিজে সুখে থাকতে চাইলে অন্যকেও সুখে রাখো।

২০. কারো প্রশংসা করে নিজের মূল্যবান সময় নষ্ট না করে বরং তার সেই সব গুণ নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করো।

বিবাহিত ছেলে-মেয়েদের দায়িত্ব

সদ্য বিবাহিত পুরুষেরা তার অনিন্দ্য সুন্দরী নববধূর ভালোবাসায় ডুবে যায়। আর পুরো দুনিয়াকে সে তখন ভুলে বসে। তার পূর্ণ মনোযোগ তখন স্ত্রীর মনোরঞ্জণে ব্যাকুল থাকে। আর নিজেও সেই আনন্দের নেশায় দুলতে থাকে। অনেক সময় তার পরিণাম অত্যন্ত ভয়াবহ রূপ নেয়।

কিছু দিন আগের ঘটনা। এক ছেলে বিয়ে করল। ছেলের বাবাকে কোনো প্রয়োজনে শহরের বাইরে যেতে হয়। সে ছেলেকে তার ব্যবসা-বাণিজ্য দেখাশোনার দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়ে সফরে বের হয়। ব্যবসাটি তারা দু'জন মিলেই করত। সদ্য বিবাহিত স্বামী তার নববধূর মহব্বতে এতোটাই মত্ত-বিভোর হয়ে যায় যে, বাবার সব আদেশ-উপদেশ একদম ভুলে বসে। যার পরিণামে ব্যবসায় ভীষণ ক্ষতির সম্মুখিন হতে হলো। যদি তার স্ত্রীর বিবেক-বুদ্ধি থাকতো তবে সে তার স্বামীকে বাধ্য করতে পারতো, তাকে সে ভালোবাসার উন্মত্ততা থেকে বের করে ব্যবসা-বাণিজ্যে মনোযোগী করাতে পারতো। তাহলে তো এ দুঃখজনক পরিস্থিতি দেখতে হতো না।

একজন স্ত্রীর দায়িত্ব, সে তার ভিতরে বদ্ধমূল করে নেবে যে, তার স্বামী আপন কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনে যেন উদাসিনতার পরিচয় না দেয়। অনুরূপভাবে কোনো স্বামীর জন্য আদৌ উচিৎ নয় যে, কোনো দুর্ঘটনার শিকার হলে সব দায়-দায়িত্ব স্ত্রীর কাঁধে চাপিয়ে দেবে এবং তাকে স্বার্থপর, সুবিধাবাদী ও অনুভূতিহীনের মত মারাত্মক অপবাদ দেবে।

এক বিবাহিত দম্পতি হানিমুন শেষে যখন ঘরে ফেরে, তখন স্বামী অফিসে না যেয়ে ফোন করে বলে, আমি অসুস্থ। শুরুর দিকে তার স্ত্রীর একথা ভালোই লাগছিল যে, তার স্বামী তাকে কতো মহব্বত করে। তাকে তার স্বামী কতোটা কাছে চায়। স্বামীর দিলে তার কতো গুরুত্ব। অতঃপর স্ত্রীর বোধোদয় হয় যে, স্বামীর এ কাজ অত্যন্ত ভুল। তাই সে নিজেই স্বামীকে অফিসে যেতে

এভাবে বাধ্য করে যাতে তার মন খারাপও না লাগে এবং সে নিজ থেকেই তার দায়িত্ব ভালোভাবে পালন করতে পারে। কখনো ছেলে পিতা-মাতার ব্যাপারে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিতে থাকে। বিয়ের পর বৃদ্ধ মা-বাবার খেদমতের জন্য তার কাছে কোনো সময়-ই থাকে না। কিন্তু বধূর যদি শ্বশুর-শাশুড়ির কষ্টের অনুভূতি হয় তবে সে অতি সহজেই শ্বশুর-শাশুড়ি ও তার স্বামীর মাঝে সেতুবন্ধনের কাজ করে দিতে পারে এবং তার স্বামীকে পিতা-মাতার ব্যাপারে তার কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্পর্কে মনে করিয়ে দিতে পারে।

অপব্যয়ে অভ্যস্ত স্বামীদেরকে তাদের স্ত্রীগণ সময় বুঝে বিচক্ষণতার সাথে অর্থ-কড়ির প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্বের কথা বুঝিয়ে দিতে পারে।

এক ভদ্রলোক, তার পুরো বেতন মাসের বিশ তারিখের মধ্যে শেষ করে ফেলত। অতঃপর সে মাসের বাকি দিনগুলোতে নিজের প্রয়োজন পূরণ করার জন্য বন্ধু-বান্ধবদের থেকে ঋণ নিয়ে চলত। এভাবেই তার জীবন চলছিল। সে বিয়ে করার পর তার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে। তার স্ত্রী তার বেতনের হিসাব-নিকাশ তার নিজের হাতে নিয়ে নেয়। মাথা খাটিয়ে বাজেট করে এবং তদনুযায়ী খরচ করার ফলে সকল চাহিদা মিটানোর পর এক সময় সে সম্ভাব্য প্রয়োজনের জন্য টাকা-কড়ি সঞ্চয়ও শুরু করে।

কখনো ছেলে বিয়ের সময় কোনো প্রফেশনাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়া-শোনা করে থাকে। অতঃপর সে তার রূপসী স্ত্রীর প্রেমে বন্দি হয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। এটা খুবই বিপদজ্জনক। শুধু জ্ঞানী স্ত্রীই পারে বুদ্ধিমত্তার সাথে নিজের স্বামীকে পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী করে তুলতে। স্ত্রীর চেষ্টায় পড়াশোনা উপযোগী একটি পরিবেশ তৈরি করতে পারে। একথার বিশ্বাস স্ত্রীর ভিতরে বদ্ধমূল হতে হবে যে, যদি স্ত্রী চেষ্টা করে তার স্বামীর জন্য উপকারী বন্ধুর ভূমিকা পালন করতে পারে। এ প্রক্রিয়ায় স্বামীর সফলতার পুরস্কারে স্ত্রীও ভূষিত হবে। এটাতো একটি সাধারণ ব্যাপার যে, স্বামী গ্রাজুয়েট হয়ে বড় কোনো পোষ্টে চাকুরী করবে তখন স্ত্রীও তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের অংশীদার হবে।

আমরা এ যাবৎ যা আলোচনা করলাম তা দাম্পত্য জীবনের একটি দিক। সেখানে সব দায়-দায়িত্ব ও যিম্মাদারী স্ত্রীর। আমরা এটাও সহসাই ভেবে নিতে পারি যে, যে কোনো ভুল-বিচ্যুতির জন্য শুধু স্ত্রী-ই দায়ী নয়। আমাদের সকলের জানা কথা যে, একজন স্ত্রী তার মা-বাবা ছেড়ে একটি নতুন পরিবেশে নতুন সব লোকজনদের মাঝে নতুন জীবনসঙ্গীকে নিয়ে নতুন

জীবনের সূচনা করে। এহেন পরিস্থিতিতে যদি সে এমন একজন প্রেমময়ী স্বামী পেয়ে যায় যে তাঁর পূর্ণ যত্ন নেবে, তার সব চাহিদা আবদার মেনে নেবে, তার সব আশা পূরণ করবে এবং সেই সাথে সে তার ঘরের অন্যসব দায়-দায়িত্ব থেকে নিজেই মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তার জন্য দোষী কে? এর জন্য দায়ী কী শুধু স্ত্রী? যে এখনো ঘরের পরিবেশকেও বুঝে সারতে পারেনি। পরিবারের সকল সদস্যের মন-মানসিকতাও চিনে উঠতে পারেনি। এক্ষেত্রে স্বামী যদি তার দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে তবে তার জন্য কেবল মেয়েটিকেই কেনো দায়ী করা হয়?!

ছেলে যদি তার স্ত্রীকে মহব্বত করে তবে এটা তার কর্তব্য। সেই সাথে এটাও তার দায়িত্ব যে, সে পিতা-মাতা সহ পরিবারের অন্যদের ব্যাপারেও তার দায়িত্বশীলতাকে অনুভব করবে। ছেলে যদি এমনটি না করে তবে মেয়ের ওপর এ অপবাদ দেওয়া যাবে না যে, সে স্বামীকে এর জন্য বাধ্য করেছে।

যদি কোনো ব্যবসা-বাণিজ্যে লোকসান অথবা ঘরে যে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক অভাব দেখা দেয় অথবা আল্লাহ না করুন কেউ মারা যায় তবে উন্নত ও শিক্ষিত সমাজের লোকজনও এর জন্য নববধূকে দায়ী করে।

বিয়ের পর ছেলে যদি পিতা-মাতা অথবা ঘরের অন্য সদস্যের ব্যাপারে আপন দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে তবে নিঃসন্দেহে স্ত্রীর কর্তব্য সে তার যোগ্যতা ও মেধা অনুপাতে স্বামীকে এ ধরনের উদাসীনতা থেকে ফিরিয়ে রাখবে। কিন্তু তারপরও যদি ছেলে তার দায়িত্ব পালন না করে তবে এর জন্য মেয়েকে অপবাদ দেওয়া নিতান্ত অন্যায়। হ্যাঁ, মেয়েও যদি তার দায়িত্ব পালনে ত্রুটি করে তবে সে জন্য স্বামী-স্ত্রী দু'জনেই দায়ী। কেননা ছেলের শুধু এই দায়িত্ব নয় যে, সে একমাত্র তার স্ত্রীর হক আদায় করবে। বরং পিতা-মাতা ও ঘরের অন্যদের প্রতি খেয়াল রাখাও তার দায়িত্ব। বিচক্ষণ ও বুদ্ধিমান তো সেই, যে শুধু স্ত্রীকেই ভালোবাসে না, বরং মা-বাবা ও পরিবারের সকল সদস্যের ব্যাপারেও দায়িত্বসচেতন হয় এবং দায়িত্বগুলো ভালোভাবে পালন করে।

তারকারাজীর ঊর্ধ্বের আরো একটি জগত

আল্লাহর দয়া যে, অগণিত যোগ্যতা এবং অসংখ্য অনুভূতিকে একত্র করে মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত-এর মর্যাদা দান করেছেন। এমনও তো হতে পারতো, মানুষকে বর্তমান আকৃতির স্থলে হিংস্র প্রাণী অথবা ভিন্ন কোনো

আকৃতি দিয়ে দিতো। আল্লাহ মানুষকে অত্যন্ত সুন্দর আকৃতি দিয়ে তৈরি করেছেন এবং শরীরের প্রতিটি অঙ্গকে শক্তিশালী করে সক্রিয় করে এর পূর্ণতা দান করেছেন। এমনও আকৃতি আছে যে, কোনো কারণে আল্লাহ কারো কোনো অঙ্গ অথবা অনুভূতিকে সুন্দরাকৃতি থেকে বঞ্চিত করেছেন। কাউকে জন্মগতভাবে বিকৃত, অসুস্থ বা বিকলাঙ্গ বানিয়েছেন। কোনো ব্যতিক্রম ও প্রতাপশালী গোত্রে জন্ম না দিয়ে এর বিপরীত করেছেন।

বাস্তবিক অর্থে বিকল ও অপারগ ওই ব্যক্তি, যে নিজেকে অক্ষম ও অসহায় ভাবে অথবা কোনো সাধারণ কাজ করতে গিয়েও নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে এবং নিজেকে অন্যের দয়া ও সহানুভূতির কাছে সমর্পণ করে।

প্রকৃতির এক অলঙ্ঘণীয় বিধান হলো, আমাদের যে কারো মধ্যে ছোট-বড় ত্রুটি ও অপূর্ণতা বিদ্যমান। আমরা শুধু একজন অসম্পূর্ণ ব্যক্তির প্রতিনিধিত্ব করছি। কেউ এ দাবী কখনো করতে পারবে না যে, সে সর্বদিক থেকে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্বের অধিকারী। জীবনের এই দীর্ঘ সফরের কোথাও না কোথাও তার অপূর্ণতা ও অক্ষমতা বেরিয়ে আসে। তাই হতাশ না হয়ে এবং আফসোস না করে নিজের ত্রুটিগুলো সম্পর্কে সচেতন হওয়া এবং তা গ্রহণ করে নেওয়া উচিত।

এ জগতের কোনো ব্যক্তি বা বস্তু তার অপূর্ণতা ও ত্রুটিসহ নিরর্থক নয়। আল্লাহ তাআলা আমাদের এ সব অপূর্ণতাগুলোর সর্বোত্তম ব্যবহারের সুযোগ করে দিন। যাতে মানুষ উপলব্ধি করতে পারে যে, তার জীবনের এ অভাবগুলো তার জন্য বরং জগতের সকলের জন্য বিশেষ করে তার পরিবারের জন্য এক বিশাল বড় উপঢৌকন। এ মহা সত্যটি শুধু অনুভব করা ও জানা এবং সেমতে নিজেকে পরিচালনা করার অসংখ্য উদাহরণ পৃথিবীতে রয়েছে। যারা পূর্ণাঙ্গ অক্ষম। যারা জন্মগতভাবে অথবা জন্মের পর কোনো মারাত্মক ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে অথবা কোনো দূর্ঘটনার শিকার হয়ে কোনো অঙ্গহানি এবং শক্তি ও ক্ষমতায় আংশিক ও পূর্ণ ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে। নিজের প্রতিবন্ধী জীবনের সাথে যারা সাহসিকতার সাথে লড়েছেন। কালের দুর্যোগের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে নিজের সুপ্ত প্রতিভাকে কাজে লাগিয়ে স্বযুগের শ্রেষ্ঠ ও সফল ও আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। পৃথিবী তাদেরকে ইজ্জত ও মূল্যায়ন করতে বাধ্য হয়েছে। এ সব লোকদের বিস্ময়কর কীর্তি ও উপাখ্যান দেখে ও শুনে বড় ঈর্ষা হয়। তারা এমন সব ইতিহাস গড়েছে, যার কল্পনাও তাদের থেকে করা যায় না। কিন্তু তারা করে দেখিয়েছে।

পশ্চিমা সভ্যতা বনাম প্রাচ্য সভ্যতা

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সভ্যতার মাঝে বিদ্যমান বৈপরিত্ব ও অসামঞ্জস্য নিয়ে আমরা অনেক বলাবলি করি। প্রাচ্যের সভ্যতা-সংস্কৃতিকে সর্বোত্তম ও ভালো সভ্যতা বলে আখ্যায়িত করি। পাশ্চাত্য সভ্যতার দোষ গেয়ে আমরা আমাদের সংস্কৃতি ও সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলো লুকাতে পারবো? অথবা আমরা কি এই দাবী করতে পারবো যে, আমরা আমাদের প্রাচ্য সভ্যতা ও আমাদের সমাজের সব চাহিদাকে সত্যাসত্য পূরণ করতে পারছি? এবং সব সম্পর্ককে পূর্ণ বিশ্বস্ত তার সাথে রক্ষা করে চলছি? এ সব প্রশ্নের সঠিক উত্তর আমাদেরকে-ই খুঁজে বের করতে হবে। তবেই হয়ত আমরা আমাদেরকে প্রাচ্য সভ্যতার অধিকারী এবং মানবসম্পর্কের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করে তা রক্ষাকারী হিসেবে নিজেদের পরিচয় দিতে পারবো; নিম্নের আলোচনায় এ বিষয়টি ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

এক গবেষক ও চিন্তাবিদ বলেছিলেন, 'প্রাচ্য তো প্রাচ্য আর পাশ্চাত্য তো পাশ্চাত্য। এ দু'টির কখনোই মিল হওয়া সম্ভব নয়।' সবার সব কথা সঠিক হয় না। কিন্তু উপরোক্ত কথাটিকে অবশ্যই ঠিক বলে মেনে নেওয়া যায়। বাস্তবেই প্রাচ্যের কিছু বিষয় পাশ্চাত্যের কিছু ব্যাপারের সম্পূর্ণ বিরোধী। কিছু ভালো গুণ আমাদের প্রাচ্যের সমাচার ও কর্তৃত্বে পাওয়া যায়। আবার কিছু ভালো গুণ পশ্চিমাদের ন্যায়-নীতি পূর্ণ সমাজব্যবস্থার অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অংশ। প্রাচ্য তার চারিত্রিক ক্ষমতা ও আত্মিক পরিশুদ্ধতার দিক থেকে পশ্চিমাদের থেকে অনেক দূর অগ্রসর। আর জীবন পরিচালনায় সঠিক নিয়ম-নীতির অনুশাসন মেনে চলার ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য আমাদের থেকে অনেক দূর অগ্রসর।

বলা হয়, ইংরেজরা উপমহাদেশ থেকে চলে যাওয়ার সময় তিনটি বস্তু নিয়ে গেছে। ১. আল্লাহর ভয় ২. আইন কানুনের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ৩. সময়ের গুরুত্ব। আমরা যদি আমাদের জীবনের কার্যকলাপের ওপর দৃষ্টি রাখি তবে বাস্তবেই দেখবো যে, উপরোক্ত তিনটি বিষয়ে আমরা রিক্তহস্ত। কিন্তু পশ্চিমারা পিতা-মাতার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি, বড়দের সম্মান করা, সম্পর্ক-সম্বন্ধের গুরুত্ব এবং ঘর-গৃহস্থলির মতো মূল্যবান উপাদানগুলোকে করে দেখিয়ে দিয়েছে। তাই বলা যায়, প্রাচ্য; যাই হোক প্রাচ্যই। কিন্তু কয়েকটি ভালোগুণের ওপর গর্ব করে আমরা নিজেদের দোষ-ত্রুটির ওপর পর্দা ঝুলিয়ে রাখতে পারি না।

আমাদের সকলের মনে রাখা উচিৎ, ব্যক্তি থেকেই সমাজের অস্তিত্ব। মানুষ কখনো একাকী বসবাস করতে পারে না। মানুষকে তার জীবনযাত্রা উত্তম ও সুখীময় করে তুলতে দল ও গ্রুপের প্রয়োজন হয়। তার বংশ, পরিবার, গোত্র-গোষ্ঠী এবং রাষ্ট্র ও দেশ; এ প্রয়োজন পূরণে তার সহযোগিতা করে।

নিঃসন্দেহে মানুষ সামাজিক জীব। এজন্য মানুষ নিজের মনের অবস্থা শোনানো ও শোনার জন্য কোনো সহানুভূতিশীল সঙ্গীর মুখাপেক্ষী। দুনিয়ার সব ছেড়ে ছুড়ে বসলে, দুনিয়াত্যাগী হলে মানুষের কখনো শান্তি অর্জন হয় না। এজন্য আল্লাহ তাআলা মুমিনদেরকে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রাখতে, ঘর-সংসার করতে, পরিবারের সাথে মিলেমিশে থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। যাতে মানুষ অন্যের দুঃখ কষ্ট ভাগাভাগি করে নিতে পারে। একে অন্যের সুখে অংশগ্রহণ করতে পারে। বিপদে-আপদে একজন অপরজনের সাহায্য-সহযোগিতা করতে পারে। যে যখন কোনো দুর্দশা ও পেরেশানীর শিকার হয় তখন তার আশপাশের লোকজন তাকে সাহস যোগায়। এতদসত্ত্বেও আপনি যদি সমাজের সমষ্টিগত অবস্থার ওপর দৃষ্টিপাত করেন তবে সমাজের চিত্র ভিন্নরকম-ই পাবেন। এ পরিস্থিতির প্রেক্ষিতেই মির্যা গালিবের কবিতার লাইন দু'টো যথার্থ মনে হয়:

رہئے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی اور نہ ہو
ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ

'যায় না হেথা কেউ এখন আর যেথায় আমি থাকি
কথা বলার নেইকো সাথী; নাই তো স্বভাষী'।

সমাজের চরম অবক্ষয় দেখে কবি ফয়েয তার মনের ব্যাথাতুর আকুতিগুলো নিম্নের শব্দের গাঁথুনিতে গেঁথে ছিলেন :

زندگی کیا مفلس کی قبا ہے جس میں
ہر گھڑی درد کے پیوند لگے جاتے ہیں

'গরীবের ছেঁড়া জামা-ই বুঝি জীবনের সাধারণ উপমা
বেদনার দুঃখ পট্টি দিবানিশি লাগতেই থাকে যেথা।'

মনের এ আকুলতা জড়ানো চেতনা ও সহমর্মিতা সকল হৃদয়বান ব্যক্তির হৃদয়ে-ই উদিত হয়। যাদের অন্তর মানুষের ভালোবাসায় সিক্ত হয়; এমন সব লোকের মনেই এসব অভিব্যক্তির অবতারণা ঘটে। যখন কেউ আদম সন্তানকে

কেবল বনি আদম হিসেবেই বিবেচনা না করে মানবতার উচ্চাসনে সমাসীন করে, তখন তার ভিতর এমন আবেগের ঝরনাধারা প্রবাহিত হবেই। তবে আমাদের সমাজব্যবস্থা বাস্তবিকপক্ষে কি এতসব সমূহ গুণে গুণান্বিত এবং এতোটা ভালো-সৎ ও যোগ্য? যতটা আমরা বলি, অথবা ভাবি? আমরা আমাদের ঘর-গৃহস্থের কথা বলি। আমরা আমাদের নিরাপত্তার বুলি আওড়াই। কিন্তু সমাজের কোনো নারী যদি একাকী হয়ে পড়ে তবে সে নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। সে নিজেকে অনিরাপদ ভাবে। শুধু কি তাই; নারী যদি তার কোনো অভিভাবকের সাথে থাকে তবুও তো সে অন্যের লালসার শিকার হয়।

সত্য নিশ্চয়-ই তিক্ত হয়। আমাদের সমাজে আজকাল নারীরা তাদের আপনজন, আত্মীয়-স্বজনদের হাতেই বেশী অপদস্থ ও লাঞ্ছিত হচ্ছে। নারী যদি একজন মেয়ে হয় তবে তাকে বাবার ইজ্জত সম্মান রক্ষায় নিজেকে বলি দিতে হচ্ছে। আর যদি সে একজন 'মা' হয় তবে তাকে তার ছেলের মায়ায় মরতে হচ্ছে। যদি 'বোন' হয় তবে তাকে ভাইয়ের আত্মমর্যাদাবোধের জগদ্দল পাথরের তলে পিষ্ট হতে হচ্ছে। আর যদি সে স্ত্রী হয় তবে তাকে তার স্বামীর বাড়াবাড়ির শিকার হতে হচ্ছে। মোটকথা, নারী শাশুড়ি হোক বা বধূ, ননদ বা ভাবী, দেবর বউ বা জেঠাস; যেখানেই পুরুষ তার সাথে রয়েছে সেখানেই নারী তার মত অপর এক নারীকে সংকীর্ণ ও জবর দখল করার হীন চেষ্টা চালাচ্ছে। কারণ, দুর্বলের ওপর সবলের রাজত্ব চলে। নারী সাধারণত পুরুষের ওপর ক্ষমতা খাটাতে পারে না। তাই সে তার মত অপর এক নারীকে অধিনস্ত করে তৃপ্তির ঢেকুর তোলে।

একদিকে তো আমরা আমাদের মুরব্বী ও বড়দের প্রতি খেয়াল রাখার দাবী করি। অথচ দেখুন, পাবলিক ট্রান্সপোর্টে সফররত মুরুব্বীরা কিভাবে দাঁড়িয়ে থাকে, ঝুলে থাকে? ব্যাংকের সিরিয়ালে, টেলিফোন, বিদ্যুতের বিল পরিশোধের লাইনে, বাজার-সদায়ের সিলিপ বহনকারী, বোঝাবহনকারী যারা; তাদের শরীরে কী শক্তি-সামর্থ বেশী কাজ করে? হাসপাতালে দাঁড়ানো অসহায় সামর্থহীন লোকদের প্রতি নজর দিন। আমাদের অধিকাংশ কিংবা আমাদের কিছু লোকজনও কী এসব বয়স্কদের সাহায্য সহযোগিতা করতে পেরে আনন্দবোধ করে?! ভাববার ও করার মত অনেক কাজ-ই আছে। প্রয়োজন শুধু মহৎ হৃদয়ের অধিকারী হওয়া। এখানে আমার এ সব কথা উল্লেখ করার উদ্দেশ্য হলো, কেবল আপনাদের একটু মনে করিয়ে দেয়া। এগুলো সব মীমাংসিত বিষয়। কিন্তু সমষ্টিগতভাবে যা চোখে পড়ছে তা নিয়ে

চিন্তা-ভাবনা করে নিজেদের ভুল-ত্রুটিগুলো শুধরে নিলে অবশ্যই প্রাচ্য তার আপন মহিমায় পাশ্চাত্যের তুলনায় সুন্দর ও উত্তম সমাজব্যবস্থার অধিকারী হতে পারবে। কেননা এ জীবন টেকনোলজি ও বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাথে কাটানো হয় না, বরং মানুষদের সঙ্গে থেকেই জীবন অতিবাহিত করতে হয়।

ফজর নামায পড়ে শয়ন করা নিষেধ

ফজর নামায পড়ে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে কোনো কারণ ছাড়া ঘুমানো ঠিক না। এ সময়টি ইবাদত ও যিকির-আযকার করার সময়। এ সময়ে সকল সৃষ্টিকুল মহান আল্লাহ তাআলার হামদ-সানা ও তাসবীহ পড়তে থাকে। তাই সবার এ সময় আল্লাহর যিকির করা থেকে গাফেল না থাকা উচিৎ। সকালে ঘুমালে মানুষের রিযিক ছিনিয়ে নেয়া হয়। নবী করীম সা. ইরশাদ করেন :

نَوْمُ الصُّبْحِ يَمْنَعُ الرِّزْقَ

সকালের ঘুম রিযিক থেকে বঞ্চিত করে দেয়।

হযরত ফাতেমা রা. বর্ণনা করেন, আমি সকালে ঘুমাতাম। একদিন হুযূর সা. আমার পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, তখন তিনি আমার পায়ে নাড়া দিয়ে বললেন, হে আমার প্রিয় সন্তান! দাঁড়িয়ে যাও। আল্লাহর রিযিকের ভাণ্ডার থেকে নেওয়ার জন্য উপস্থিত হও! গাফেলদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। আল্লাহ তাআলা সুবহে সাদেক তথা ভোর সকাল থেকে সূর্য উদিত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে রিযিক বণ্টন করেন।

হযরত আলী রা. বলেন, রাসূলে কারীম সা. সূর্য ওঠার পূর্বে ঘুমাতে নিষেধ করেছেন। অতএব, ফজর নামাযের পর আল্লাহর যিকির, তেলাওয়াতে কুরআনুল কারীম এবং ওযীফা আদায়ে লিপ্ত থাকা উচিৎ। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে নেক আমল করার তাওফীক দান করুন। আমীন।[২১৬]

॥ সপ্তম খণ্ড সমাপ্ত ॥

---

২১৬. মুসনাদে আহমদ : ১/৭৩, আল কামিল : ১/৩২১।

মুক্তার চেয়ে দামী

(অষ্টম খণ্ড)



প্রতিমুহূর্তে উচ্চারিত হয় আজানের ধ্বনি

পৃথিবীর বুকে প্রতিমুহূর্তে যে ধ্বনি উচ্চারিত হয় তা হলো আজানের ধ্বনি। প্রতিবেদন অনুযায়ী ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব প্রান্তের দ্বীপসমূহ হতে সুবহে সাদিক উদ্ভাসিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ফজরের আজান শুরু হয়। এক সাথে হাজারো মুয়াজ্জিন আল্লাহর একত্ববাদ ও রাসূল সা.-এর রিসালাতের আওয়াজ উচ্চকিত করে তোলেন। পূর্ব প্রান্তের দ্বীপসমূহ হতে শুরু হওয়া আজানের এই ধারাবাহিকতা পশ্চিম প্রান্তের দ্বীপসমূহ পর্যন্ত বিরামহীনভাবে চলতে থাকে। দেড় ঘণ্টা পর আজানের এই ধারা সুমাত্রায় শুরু হয়। সুমাত্রার জনপদে আজান শুরু হওয়ার আগেই মালয়শিয়ার মসজিদসমূহে আজান শুরু হয় এবং এক ঘণ্টা পর তা ঢাকায় পৌঁছে।

প্রতিবেদন অনুযায়ী বাংলাদেশের আজানের সময় শেষ হওয়ার আগেই কলকাতা থেকে শ্রীলংকা পর্যন্ত আজান শুরু হয়ে যায়। অপর দিকে আজানের এই ধারাবাহিকতা কলকাতা থেকে মুম্বাই পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং পরে ভারতবর্ষের আকাশে-বাতাশে তাওহীদ ও রিসালাতের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে।

রিপোর্ট অনুযায়ী শ্রীলংকা এবং সিয়ালকোটে একই সাথে ফজরের আজানের সময় হয়। সিয়ালকোট থেকে কোয়েটা, করাচী এবং গোয়ালন্দ পর্যন্ত চল্লিশ মিনিটের দূরত্ব। এই পরিমাণ দূরত্বের পর পাকিস্তানে ফজরের আজান শুরু হয়। পাকিস্তানে ফজরের আজান শুরু হওয়ার আগেই আফগানিস্তান ও মাস্কাটে আজান শুরু হয়ে যায়। মাস্কাট থেকে বাগদাদ পর্যন্ত

এক ঘণ্টার ব্যবধান। এই পরিমাণ দূরত্বে সৌদি আরব, ইয়েমেন, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত এবং ইরাক পর্যন্ত আজানের আওয়াজ ছড়িয়ে পড়ে। অপর দিকে বাগদাদ থেকে ইসকান্দারিয়া পর্যন্ত এক ঘণ্টা সময়ের ব্যবধান। এই সময়ে সিরিয়া, মিশর, সোমালিয়া এবং সুদানে আজান শুরু হয়।

ইসকান্দারিয়া থেকে তারাবলুসের দূরত্ব প্রায় এক ঘণ্টা পরিমাণ। এই পরিমাণ দূরত্ব অতিক্রম করার আগেই উত্তর আমেরিকা, লিবিয়া এবং তিউনিসে ফজরের আজান শুরু হয়। প্রতিবেদন অনুযায়ী ফজরের আজানের যে ধারা ও ধারাবাহিকতা ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব দিগন্তের দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু হয় তা অবিচ্ছিন্নভাবে প্রদক্ষিণ করে সাড়ে নয় ঘণ্টায় আওকিয়ানুস সমুদ্রের পশ্চিম প্রান্তে পৌঁছে যায়।

আওকিয়ানুস সমুদ্রের পশ্চিমে ফজরের আজান পৌঁছানোর আগেই এদিকে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব প্রান্তে যোহরের আজান শুরু হয়ে যায়। ঢাকা পর্যন্ত যোহরের আজান পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিমে আসরের আজান শুরু হয়। আজানের এই ধারাবাহিকতা মাত্র দেড় ঘণ্টায় খুব স্বাভাবিক ভাবেই জাকার্তা পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং অপরদিকে ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব প্রান্তের দ্বীপসমূহে মাগরিবের আজান শুরু হয়ে যায়। মাগরিবের আজান সিলভ থেকে জাকার্তা পর্যন্ত পৌঁছতে না পৌঁছতেই ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব প্রান্তের দ্বীপসমূহে এশার আজান শুরু হয়ে যায়।

প্রতিবেদন অনুযায়ী পৃথিবীর ভৌগলিক সীমানায় এমন কোনো সময় অতিবাহিত হয় না যখন শত শত, হাজারো, বরং লাখো মুয়াজ্জিন আল্লাহর তাওহিদ ও রাসূল সা.-এর রিসালাতের বাণী আজানের মাধ্যমে ছড়িয়ে দিচ্ছেন না।

মক্কা ও মদীনার সম্মান

হযরত ওমর ফারুক রা.-এর পৌত্র হযরত সালিম রহ. একবার মক্কায় আসলেন। তাওয়াফের সময় তৎকালীন বাদশাহ হিশাম ইবনে আব্দুল মালিকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হলো, সালাম বিনিময়ের পর হিশাম তাঁকে বললেন; হযরত! কোনো প্রয়োজন থাকলে বলুন, আপনার খেদমতে আমি প্রস্তুত। তখন সালিম রহ. বললেন; হিশাম! বাইতুল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে গাইরুল্লাহর কাছে প্রয়োজন পেশ করতে আমার লজ্জা হয়।

পরে সালিম রহ. যখন হেরেম শরীফের বাইরে এলেন কাকতালীয় ভাবে তখন আবার হিশামের সঙ্গে দেখা হলো। তাঁকে দেখে হিশাম কাছে এসে

বললেন; হযরত! এবার বলুন, আপনার কী খেদমত করতে পারি? সালিম রহ. বললেন; হিশাম! তোমার কাছে আমি কী চাইতে পারি? দীন না দুনিয়া? হিশাম জানতেন যে, দীনদারীর ক্ষেত্রে তিনি সময়ের শ্রেষ্ঠ আলেম ও বুযুর্গ ব্যক্তিত্ব হিসেবে সর্বজনমান্য। তাই তিনি এবার বললেন; হযরত! দুনিয়াবি কোনো প্রয়োজন নিবেদন করতে পারেন। সালিম রহ. তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন; হিশাম! দুনিয়াতো আমি কখনো দুনিয়ার মালিকের কাছেই চাইনি তাহলে তোমার কাছে আমি কী নিবেদন করবো?! এ কথা শোনার পর হিশামের চেহারা অবনত হয়ে গেলো। আসলে যে সমস্ত বুযুর্গানে দীন আল্লাহর দরবারে অভিযোগ করার আদব জানেন তারা আল্লাহর সৃষ্টির সামনে হাত প্রসারিত করেন না। একবার এক ব্যক্তি মদীনা সফরের জন্য নিজের ঘর থেকে পায়ে হেঁটে রওয়ানা করলেন। যখন কেউ জিজ্ঞেস করলো পায়ে হেঁটে কেনো? তখন তিনি বললেন, পলাতক গোলাম নিজ মনিবের দরজায় বাহনে চড়ে যায় না। যদি আমার শরীরে শক্তি থাকতো তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে যেতাম।

খলিফায়ে রাশেদা হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.-এর যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন কিছু লোক চিন্তা করলো যে, তাকে সবুজ গম্বুজের অভ্যন্তরে দাফন করা যায় কি না! এ কথা যখন তাঁর কানে পৌঁছলো তিনি তা বারণ করলেন এবং বললেন; নবী সা.-এর কাছে আমার দাফন হওয়া আমার কাছে চরম ধৃষ্টতা ও বেআদবী মনে হচ্ছে। আমার কী সাধ্য যে, আমার কবর নবী সা.-এর কবরের নিকটে হবে?!

কুরআন তেলাওয়াতের আদবসমূহ

কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের আদব দুই প্রকার। এক. যাহেরী আদব, দুই. বাতেনী আদব। দুই প্রকার আদবের বিবরণ নিচে প্রদত্ত হলো।

এক. যাহেরী আদবসমূহ-

১. অজু সহকারে কেবলামুখি হয়ে বসবে। সুগন্ধি লাগিয়ে নিলে আরো ভালো।

২. তেলাওয়াতের সময় পোশাক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবে।

৩. এমন স্থানে বসবে না যেখানে লোকজনের চলাচলে কষ্ট হয়।

৪ কুরআন মাজিদকে তাকিয়া, রেহাল বা উঁচু কোনো জিনিসের ওপর রাখবে।

৫. তেলাওয়াতের মাঝে নতুন সূরা এলে আউযু বিল্লাহ পড়ার দরকার নেই। শুধু বিসমিল্লাহ পড়লেই যথেষ্ট হবে।

৬. সূরা তওবা থেকে কুরআন মাজিদ তেলাওয়াত শুরু করলে আউযুবিল্লাহ পড়া জরুরী। বিসমিল্লাহ পড়লে ভালো, না পড়লে ক্ষতি নেই।

৭. তেলাওয়াতের মাঝে সূরা তওবা এসে পড়লে আউযুবিল্লাহ ও বিসমিল্লাহ পড়া জরুরী নয়।

৮. যেখানে বিভিন্ন লোক নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত থাকে সেখানে নিচু আওয়াজে কুরআন তেলাওয়াত করা উত্তম।

৯. নির্জন পরিবেশ উচ্চ কণ্ঠে তেলাওয়াত করা যেতে পারে। তবে কারো কষ্ট হতে পারে এমন আশংকা হলে নিচু স্বরে পড়বে।

১০. উচ্চ কণ্ঠে তেলাওয়াতের সময় কানে অথবা চেহারায় আঙ্গুল রাখবে না। কেননা এটা গায়কদের পদ্ধতি।

১১. কুরআন মাজিদ তেলাওয়াতের সময় তাজবীদের নিয়ম-কানুন অনুযায়ী উত্তম এবং শুদ্ধ মাখরাজ ও সুস্পষ্টভাবে পড়ার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।

১২. সাধ্য অনুযায়ী তারতীলের সাথে অর্থাৎ থেমে থেমে তেলাওয়াত করবে।

১৩. ওয়াকফের স্থানগুলির প্রতি খেয়াল রেখে তেলাওয়াত করবে।

১৪. সাধ্যমতো সুন্দর সুরে তেলাওয়াত করবে। তবে গানের পদ্ধতি অনুসরণ করা বে-আদবী।

১৫. রহমতের আয়াত পাঠ করলে রহমতের দোয়া করবে এবং শাস্তির আয়াত পাঠ করলে মাগফেরাতের দোয়া করবে।

১৬. তেলাওয়াতের সময় এদিক-সেদিক তাকানো বে-আদবী।

১৭. তেলাওয়াতের সময় পায়ে হাত রাখবে না এবং আশপাশের জিনিসপত্র নিয়ে খেলবে না।

১৮. পৃষ্ঠা উল্টানোর প্রয়োজন হলে মুখের থু থু আঙ্গুলে লাগাবে না। এটা বে-আদবী।

১৯. তেলাওয়াতের সময় নাকের ভিতর আঙ্গুল দেবে না। এটা আদবের পরিপন্থি।

২০. তেলাওয়াতের সময় কারো সঙ্গে কথা বলবে না। কথা বলা খুব প্রয়োজন হলে আয়াত পূর্ণ করে কথা বলবে। সম্ভব হলে রুকু শেষ করে বলবে। পুনরায় তেলাওয়াত শুরু করলে অবশ্যই আউযুবিল্লাহ পড়ে নেবে।

২১. তেলাওয়াতের মাঝে আযাবের আয়াত সামনে এলে ক্রন্দনের চেষ্টা করা উত্তম।

২২. সেজদার আয়াতে সেজদা করবে। তৎক্ষণাৎ না পারলে পরে দ্রুত সেজদা আদায় করে নেবে। কারণ এটা এই আয়াতের হক।

২৩. তেলাওয়াত করতে করতে ক্লান্ত হলে থেমে যাবে। তেলাওয়াতের মাঝে বিশ্রাম নেওয়া উত্তম।

২৪. কুরআন খতম করার পর দোয়া করা নবী করিম সা.-এর সুন্নত।

দুই. বাতেনী আদবসমূহ-

- কুরআন মাজিদের বড়ত্ব অন্তরে রাখো, এটি মহিমান্বিত কুরআন।
- আল্লাহ তাআলার বড়ত্ব ও মহত্ব অন্তরে রাখবে। আল্লাহ যত বড় ও মহান তাঁর কালামও ততো মর্যাদাবান ও মহান।
- অন্তর সবসময় কু-চিন্তা ও অনিষ্টতা থেকে পবিত্র রাখবে।
- অর্থের প্রতি খেয়াল করে স্বাদ নিয়ে পড়বে।
- যে আয়াত তেলাওয়াত করবে মনকে তার অধিনে রাখবে।
- যেমন : যদি শাস্তির আয়াত পড়ো তাহলে মনকে ভীত-সন্ত্রস্ত রাখবে।
- স্বীয় কানকে এমন মনোযোগী করবে, যেন আল্লাহ তাআলা কথা বলছেন আর আমি শুনছি।

কুরআনের বেআদবীর কিছু নমুনা

কুরআনের বেআদবীর কিছু নমুনা নিম্নে দেয়া হলো যা থেকে বেঁচে থাকা প্রতিটি মুসলমানের উচিত।

১. অজু ছাড়া কুরআন মাজিদ স্পর্শ করা।

২. তাফসীরের কিতাব ও সাধারণ কিতাবে লিখিত কুরআনের আয়াত অজু ছাড়া স্পর্শ করা।

৩. যখন কুরআন তেলাওয়াতের আওয়াজ কানে আসে তখন চুপ থেকে শ্রবণ না করা।

৪. কুরআন মাজিদ মুখস্ত করে ভুলে যাওয়া।

৫. কুরআন মাজিদের ওপর কোনো বই-কিতাব রাখা, হোক সেটা হাদীস বা ফিকহের কিতাব।

৬. কুরআন মাজিদের ওপর চশমা, টুপি, কলম ইত্যাদি রাখা।

৭. কুরআন মাজিদের দিকে পা ছড়িয়ে বসা।

৮. কুরআন মাজিদ নিচু স্থানে রেখে উঁচু স্থানে বসা।

৯. এমন স্থানে কুরআন মাজিদ রাখা যেখানে চলাচলরত লোকদের পেছনে পড়ে।

১০. তেলাওয়াতের সময় পায়ে হাত দেওয়া অথবা নাকে আঙ্গুল দেওয়া।

১১. শরীয়ত অনুযায়ী কোনো সমস্যা না থাকলে শোয়া অবস্থায় তেলাওয়াত করা। চাই দেখে দেখে হোক বা মুখস্থ।

১২. তেলাওয়াতের সময় হুক্কা, সিগারেট অথবা তামাক জাতীয় দ্রব্য মুখে রাখা।

১৩. নাজায়েজ ব্যবসায় বরকতের জন্য কুরআন মাজিদ পড়া কিংবা পড়ানো।

১৪. কুরআন মাজিদের আয়াত সম্বলিত আংটি পরে বাথরুমে যাওয়া।

১৫. পত্র-পত্রিকায় কুরআন মাজিদের আয়াত ছাপানো এবং সাধারণ কাগজের মতো মাটিতে ফেলে রাখা।

১৬. পত্রিকা ও চিঠিপত্রের যেখানে কুরআন মাজিদের আয়াত রয়েছে তা দস্তরখান ও অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা।

১৭. কুরআনের আয়াত সম্বলিত ক্যালেন্ডার অথবা কিতাবের দিকে পা দেওয়া।

১৮. মনোগ্রাম বা উপহারসামগ্রী ইত্যাদিতে কুরআনের আয়াত লিখা যদ্দ্বারা বেআদবী হওয়ার আশংকা থাকে।

১৯. কুরআন মাজিদের আয়াতকে ক্যালিগ্রাফি ডিজাইনে এমনভাবে অঙ্কন করা, যাতে পাঠকের বুঝতে সমস্যা হয় এবং ভুল পড়ার আশংকা থাকে।

২০. কুরআন মাজিদকে মৃত ব্যক্তির সাথে কবরে রাখা।

২১. কুরআন মাজিদের জীর্ণশীর্ণ পৃষ্ঠা সাধারণ ময়লা-আবর্জনার স্তূপে ফেলা। (প্রয়োজনে এ ধরনের পৃষ্ঠাগুলো জমা করে নদীতে ফেলবে।)

২২. কুরআনের আয়াতে লেখা কাগজ খোলা অবস্থায় বাথরুমে নিয়ে যাওয়া। (চামড়া আবৃত অবস্থায় থাকলে ভিন্ন কথা।)

২৩. কুরআনের আয়াতকে অথবা কুরআনকে তুচ্ছ মনে করে আগুনে নিক্ষেপ করা।

২৪. কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে খেল-তামাশার অনুষ্ঠান শুরু করা।

২৫. যে ব্যক্তি কুরআন তেলাওয়াত করলো এবং মনে করলো কেউ তারচেয়ে উত্তম বিষয়ের বাহক, তাহলে সে কুরআনের অবমাননা করলো।

মা-বাবার আদব রক্ষার সুফল

বনী ইসরাঈলের এক এতিম ছেলে মায়ের পরামর্শ নিয়ে সব কাজ করতো। সব সময় মায়ের খুশি ও সন্তুষ্টি অনুযায়ী চলতো। তার সুন্দর একটি গাভী ছিলো। দিনের বেশীরভাগ সময় সে গাভী দেখাশোনায় ব্যস্ত থাকতো। একবার এক ফেরেশতা মানুষের বেশে তার কাছে এলেন এবং গাভীটি ক্রয় করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ছেলে মূল্য জিজ্ঞেস করলে ফেরেশতা অনেক কম মূল্য বললেন। ছেলে যখন মাকে জানালো মা তখন নিষেধ করলেন। ফেরেশতা যতবার মূল্য বৃদ্ধি করতে লাগলেন, ছেলে ততবারই মাকে জিজ্ঞেস করে এসে উত্তর দিতে থাকলো। যখন কয়েকবার এমন হলো তখন ছেলে অনুভব করলো যে, আমার মা গাভীটি বিক্রি করতে রাজি নয়। সুতরাং সে ফেরেশতাকে পরিষ্কার মানা করে দিলো যে, গাভী কোনো মূল্যেই বিক্রি করা যাবে না। ফেরেশতা বললেন; তুমি উত্তম চরিত্রের ও সৌভাগ্যবান সন্তান, প্রতিটি কাজ মাকে জিজ্ঞেস করে করো।

অচিরেই কিছু লোক তোমার নিকট এই গাভীটি ক্রয় করার জন্য আসবে। তখন তুমি এই গাভীর চড়া মূল্য হাকবে।

এ ঘটনার কিছুদিন পর বনী ইসরাঈলের একজন লোক নিহত হয়। বিচারক তখন খুনের বদলায় নির্দিষ্ট ধরণের একটি গাভী কুরবানী করার নির্দেশ দেয়। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো–

তখন বনী ইসরাঈলের লোকেরা যখন এই গাভী ক্রয় করার জন্য আসলো, এতিম বালক বললো; এই গাভীর মূল্য এর ওজন বরাবর স্বর্ণ। বনী ইসরাঈলের লোকেরা এই বিশাল মূল্য দিয়েই গাভীটি ক্রয় করলো। তাফসীরে আযীযী ও তাফসীরে মুযল্লেফুল ইরফানে লেখা রয়েছে যে, ওই বাচ্চার এতো পরিমাণ সম্পদ অর্জনের সৌভাগ্য হয়েছিলো, মায়ের প্রতি তার আদব ও আনুগত্য প্রকাশের কারণে। তাফসীরে তাবারীতেও ঘটনাটি বর্ণিত হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, মা-বাবার খেদমত ও আদব রক্ষার কিছু প্রতিদান ও পুরস্কার দুনিয়াতেও লাভ হয়।

এক যুবক তার মা-বাবার খুব আদব রক্ষা করে চলতো এবং সর্বদা তাদের সেবা যত্নে ব্যস্ত থাকতো। মা-বাবা যখন বার্ধক্যে উপনীত হলো তখন তার ভাইয়েরা পরস্পরে পরামর্শ করলো যে, মা-বাবা জীবিত থাকতেই কি আমরা তাদের সম্পত্তি ভাগ করে নিতে পারি না? যেন পরে কোনো ঝগড়া না হয়। তখন এই যুবক তার ভাইদের বললো; তোমরা নিজেদের মধ্যে সব

সম্পত্তি ভাগ করে নাও, আর তার বিনিময়ে আমাকে মা-বাবার সেবা-যত্ন করার দায়িত্ব দাও। ভাইয়েরা স্বাচ্ছন্দ্যে ও আগ্রহের সাথে তাকে এই দায়িত্ব অর্পণ করলো। এই যুবক সারাদিন পরিশ্রম করতো এবং সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে পিতা-মাতার খেদমত এবং বিবি-বাচ্চার দেখাশোনা করে বাকি সময় অতিবাহিত করতো। এভাবে সময় অতিবাহিত হতে লাগলো। এক সময় এই বৃদ্ধ পিতা-মাতা পরপারে পাড়ি জমালেন।

একবার এই যুবক রাত্রে ঘুমের মাঝে স্বপ্নে দেখলো যে, কেউ তাকে বলছে; হে যুবক! তুমি তোমার মা-বাবার খুব সম্মান করেছ, তাদের সন্তুষ্ট রেখেছো। এর বিনিময়ে তোমাকে পুরস্কার দেওয়া হবে। যাও, অমুক স্থানে পাথরের নিচে একটি দিনার রয়েছে, সেটা তুলে নাও। তাতেই তোমার জন্য বরকত নিহিত। সকালে ঘুম থেকে জেগে যুবক ওই পাথরের নিকট গিয়ে দেখলো তার নিচে সত্যিই একটি দিনার রয়েছে। খুশি মনে সে দিনারটি নিয়ে ঘরের দিকে রওয়ানা হলো। পথে এক মাছ বিক্রেতার দোকানের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় সে ভাবলো, দিনারের পরিবর্তে একটি বড় মাছ কিনে নেওয়া যেতে পারে। তাহলে স্ত্রী-সন্তানরা রান্না করে খেতে পারবে। দিনারটির বিনিময়ে সে বড় একটি মাছ ক্রয় করে নিলো। ঘরে এসে স্ত্রীর হাতে মাছটি তুলে দিলো। তার স্ত্রী মাছটি রান্নার জন্য কাটতে শুরু করলো, পেট বরাবর কাটতেই ভেতর থেকে অত্যন্ত দামী হীরা বেরিয়ে এলো। যুবক হীরা দেখে তো আহ্লাদে আটখানা। বাজারে গিয়ে সে ওই হীরাটি বিক্রি করলো বিনিময়ে প্রচুর অর্থ পেলো এবং তা দিয়েই সে স্বাচ্ছন্দ্যে বাকি জীবন কাটাতে পেরেছে।

মা-বাবার আদব ও পূর্বপুরুষদের অবস্থা

ইমাম আবু হানীফা রহ. মাকে খুব আদব ও সম্মান করতেন। কখনো মায়ের কোনো মাসআলা জানার প্রয়োজন হলে তখন তিনি এক বৃদ্ধ ফকিহ-এর শরণাপন্ন হতেন। এমন পরিস্থিতিতে ইমাম আবু হানীফা রহ. মাকে উটের পিঠে বসিয়ে লাগাম নিজের হাতে নিয়ে পায়ে হেঁটে চলতেন। লোকজন ইমাম সাহেবকে দেখে আদব ও সম্মানার্থে রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়ে যেতো ও সালাম করতো। ইমাম সাহেব রহ.-এর আম্মা ফকীহর নিকট মাসআলা জিজ্ঞেস করতেন। অনেক সময় এমন হতো যে, প্রবীণ প্রাজ্ঞ ফকিহর উক্ত মাসআলা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতো না। তখন ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিকট চুপিসারে মাসআলাটি জেনে নিতেন। অতঃপর উঁচ্চ কণ্ঠে ইমাম সাহেবের আম্মাকে মাসআলার সমাধান জানিয়ে দিতেন।

ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর বিনয় ও আদবের অবস্থা এমন ছিলো যে, জীবনভর নিজের মাকে এ কথা জানতে দেন নি যে, আপনি যার কাছ থেকে মাসআলা জিজ্ঞেস করেন সেটা তো আমিই বলে দিই। এসব তিনি এ জন্যই করতেন যে, মায়ের মন যেভাবে সন্তুষ্ট হয় সেভাবেই হওয়া উচিত। আর এই আদব ও সম্মানের বিনিময়েই তিনি ইমাম আজম হয়ে ছিলেন।

মোটকথা, যদিও মা-বাবার আদব ও সম্মান জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে জরুরী; কিন্তু যখন বার্ধক্যে উপনীত হয়, তখন সন্তানদের উচিত তাদের অধিক যত্ন নেয়া ও মনোযোগী হওয়া। এমন যেন না হয় যে, সন্তানদের একটু অবজ্ঞা মা-বাবার জন্য কষ্টের কারণ হয়।

বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সন্তানদের প্রতি বাবা-মার নির্ভরতাও বাড়তে থাকে, যার কারণে সন্তানদের দায়িত্বও তখন বেড়ে যায়। এমতাবস্থায় কোনো কথা বা কাজের দ্বারা এমন আচরণ না করা যার দ্বারা মা-বাবা কষ্ট পান।

বরং সন্তান তখন নিজের শৈশবকে স্মরণ করবে। যখন সে নিজের মা-বাবার আদর, স্নেহ ও সুন্দর আচরণের মুখাপেক্ষী ছিলো।

সে যখন নিজে কাপড় পরতে পারতো না, আর না পারতো পার্শ্ব পরিবর্তন করতে, আর না নিজের আহারের ব্যবস্থা করতে, এমনকি নিজের শরীরে লেগে থাকা মল-মূত্র পরিষ্কার করতেও পারতো না। এমন অসহায়ত্বের মুহূর্তে বাবার মায়ের স্নেহ, মায়া-মমতা ভালোবাসার ছায়ায় আগলে রেখে তাকে লালন-পালন করেছেন।

এই মা-ই তো ছিলেন যিনি প্রথমে সন্তানকে খাওয়াতেন, পরে নিজে খেতেন। যিনি সন্তানকে আগে পান করাতেন, পরে নিজে পান করতেন। যিনি সন্তানকে আগে ঘুম পাড়াতেন, পরে নিজে ঘুমাতেন। এই মা-ই তো যিনি নিজের কাপড়ের আঁচল দিয়ে সন্তানের জুতা পরিষ্কার করে দিতেন। নিজের হাতে সন্তানের পায়ে জুতা পরিয়ে দিয়েছেন। আজ এই মায়ের অনুগ্রহের বিনিময় পরিশোধ করার সময় এসেছে। এখন সন্তানের একমাত্র দায়িত্ব হলো, মা-বাবার আদব ও সম্মানের প্রতি যত্নবান হওয়া।

নবী করীম সা. ইরশাদ করেছেন,

اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتُ.

অর্থাৎ মায়ের পায়ের নিচে সন্তানের জান্নাত।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

رِضَى الرَّبِّ فِيْ رِضَى الْوَالِدِ، وَسَخَطُ الرَّبِّ فِيْ سَخَطِ الْوَالِدِ.

অর্থাৎ রবের সন্তুষ্টি নির্ভর করে সন্তানের প্রতি বাবার সন্তুষ্টির ওপর এবং রবের অসন্তুষ্টি নির্ভর করে সন্তানের প্রতি বাবার অসন্তুষ্টির ওপর।[২১৭]

বাস্তবতা হলো, সন্তান যতই মা-বাবার খেদমত করুক না কেনো তাদের অনুগ্রহের বদলা ও হক যথাযথ আদায় করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। যদি সমগ্র পৃথিবীর নেয়ামতকে এক এক লোকমা বানিয়ে মা-বাবার মুখে দিয়ে দেয়, তবুও মায়ের বুক থেকে পান করা দুধের মূল্য পরিশোধ করতে পারবে না।

এক বুযুর্গকে কেউ জিজ্ঞাসা করলো, বাবা ও সন্তানের ভালোবাসার মধ্যে পার্থক্য কী? বুযুর্গ বললেন, সন্তান যদি কোনো দূরারোগ্য ব্যধিতে আক্রান্ত হয় তখনও বাবা কেঁদে কেঁদে তার জন্য দীর্ঘ জীবনের দোয়া করেন। বাবার সাধ্যে থাকলে তিনি তার অবশিষ্ট জীবন ছেলেকে দিয়ে নিজে মৃত্যুকে গ্রহণ করে নিতেন। কিন্তু যখন বাবা অসুস্থ হন। এমন অসুস্থ যে রোগের কোনো চিকিৎসা নাই তখন কিছু দিনের মধ্যেই ছেলে হতাশ হয়ে দোয়া করে, হে আল্লাহ! আমার বৃদ্ধ পিতাকে তুমি তোমার কাছে নিয়ে যাও। কতই না আশ্চর্যের বিষয়। বিশ্বস্ততার পরিবর্তে উপেক্ষা।

আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মা-বাবার সাথে আদব ও সম্মান এবং তাদের প্রতি যত্নবান ও অনুগত থাকার তৌফিক দান করুন।

ছাত্রদের ইলমের লোভ থাকা উচিত

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বর্ণিত, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; মুমিনের ইলম থেকে তৃপ্তি অর্জিত হবে না তথাপি সে জান্নাতে পৌঁছে যাবে।

হযরত ঈসা আ.-কে একবার জিজ্ঞেস করা হলো, কতদিন পর্যন্ত ইলম অর্জন করা উচিৎ? ঈসা আ. বললেন, যতদিন জীবন থাকে।

সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রহ. বলেছেন, আমি একটি হাদীস সংগ্রহ করার জন্য দিন রাত সফর করতাম। ইমাম শাবী রহ.-এর একটি উক্তি, যদি কোনো ব্যক্তি ইলমের একটি কথা শোনার জন্য শাম দেশের শেষ প্রান্ত থেকে সুদূর ইয়েমেনের শেষ সীমানা পর্যন্ত সফর করে। আমি মনে করবো, এই সফর বৃথা যায় নি।

হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত; যে ব্যক্তি ইলম অন্বেষণের সফরকে জিহাদ মনে করে না তার জ্ঞানের অপূর্ণতা রয়ে গেছে। ইবনে আবি গাসসানের

---

২১৭. মেশকাত : ২/৪১৯।

উক্তি হলো; মানুষ ঐ পর্যন্ত আলেম থাকে যতক্ষণ সে ইলম আহরণে লিপ্ত থাকে, যখন সে ইলম অর্জন করা থেকে বিরত রইলো তখন সে অজ্ঞ রইলো।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. সম্পর্কে আবু ওসামা লিখেন; আমি আব্দুল্লাহ ইবনে মুবারক রহ. থেকে অধিক কাউকে দেশ-দেশান্তর ভ্রমণ করে ইলম অর্জন করতে দেখি নি।

ইমাম যাহাবী রহ. যখন প্রথমবার ইলম অর্জনের জন্য বের হয়েছিলেন, তখন তিনি সাত বছর পর্যন্ত সফরেই ছিলেন। বাহরাইন থেকে মিশর, মিশর থেকে রামাল্লা। সেখান থেকে তারতাউস এর সফর পায়ে হেঁটে সম্পন্ন করেছেন। তখন তাঁর বয়স ছিলো বিশ বছর। ইবনুল মুকিররী রহ. বলেন, আমি শুধু একটি বইয়ের খোঁজে সত্তর মাইল সফর করেছি। ঐ সমস্ত মহান পূর্বসুরিদের অন্তরে ইলম অর্জনের যে আগ্রহ ও অস্থিরতা ছিল যা তাঁদেরকে কোনো দেশে বা শহরে স্থির থাকতে দিতো না। তারা এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্র, এক মহাদেশ থেকে অন্য মহাদেশে ইলম অর্জনের উদ্দেশ্যে সফর করতেন।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-এর জীবনীতে আছে, তাঁর আম্মা তাঁকে জীবিকা উপার্জনের জন্য পাঠিয়েছিলেন। তিনি জীবিকার অন্বেষণে বিভিন্ন কাজ করতেন। তাঁর আম্মার উপদেশ ছিলো, যদি কাপড় ধোয়ার কাজ শিখে নিতে তাহলে জীবন চলার জন্য একটা উপার্জনের ব্যবস্থা হয়ে যেত।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. একবার ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর দরসে (ক্লাসে) শরীক হলেন। তখন তার মনে ইলম অর্জনের আগ্রহ সৃষ্টি হলো। একদিকে মায়ের কাছ থেকে কাজ করে পয়সা উপার্জনের চাপ ছিলো, অন্য দিকে তাঁর মন চাচ্ছিলো ইলম অর্জন করে আলেম হতে। তিনি তার পূর্ণ অবস্থা ইমাম আবু হানীফা রহ.-কে বললেন। ইমাম সাহেব রহ. ছাত্রের মাঝে সৌভাগ্যের নিদর্শন দেখতে পেয়ে বললেন, তুমি এখন থেকে নিয়মিত দরসে বসবে, প্রতিমাসে আমি তোমাকে কিছু টাকা দেবো, সেটা তুমি তোমার মাকে দিয়ে দেবে। সেমতে ইমাম আবু ইউসুফ রহ. সারা মাস ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর দরসে অংশ নিতেন আর ইমাম সাহেব রহ. নিজের খরচের টাকা থেকে কিছু টাকা ভাতা হিসেবে দিয়ে দিতেন, যা ইমাম আবু ইউসুফ রহ. নিজের মাকে দিয়ে দিতেন, কিছুদিন এভাবে চলতে থাকলো।

একদিন মা জেনে গেলেন, ছেলে কোনো কজকর্ম করছে না, বরং ইলম অর্জন করছে। তখন মা অসন্তুষ্ট হলেন এবং ছেলেকে বুঝালেন, তোমার বাবা ইন্তেকাল করেছেন। ঘরে দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি নেই যে উপার্জন করবে।

সুতরাং তুমি যদি কোনো কাজ করতে তাহলে ভালো হতো। উত্তম হলো কোনো কাজ শিখে নাও। ইমাম ইউসুফ রহ. পুরো ঘটনা ইমাম সাহেব রহ.-এর কাছে বললেন। ইমাম সাহেব রহ. বললেন, তোমার মাকে আমার নিকট আসতে বলো। আমি তাঁকে কিছু কথা বলবো।

ইমাম আবু ইউসুফ রহ. মাকে নিয়ে ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর নিকট উপস্থিত হলেন। মা ইমাম আবু হানীফা রহ.-এর কাছেও ওই অবস্থার কথা বর্ণনা করলেন, যা তিনি পূর্বে শুনিয়ে ছিলেন। ইমাম সাহেব রহ. বললেন, আপনার ছেলেকে আমি এমন এক বিদ্যা শেখাচ্ছি যার ফলে সে একদিন পেস্তার তৈরি ফালুদা খাবে। মা মনে করলেন, ইমাম সাহেব হয়তো রসিকতা করছেন। তাই তিনি চুপ থাকলেন। কেননা সংসার তো ইমাম সাহেবের দেয়া ভাতার টাকায় চলছেই।

যখন ইমাম আবু ইউসুফ রহ. ইলমে দীন শেখা শেষ করে ইমাম হয়ে গেলেন। তখন তাঁর ইলমের প্রশিদ্ধি দূর-দূরান্তে ছড়িয়ে পড়লো। সে সময় ইমাম আবু হানীফ রহ.-কে বাদশাহ-এর পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতির পদ অলংকৃত করার জন্য আমন্ত্রণ জানানো হলো। কিন্তু তিনি ইলমী ব্যস্ততার কারণে অপারগতা প্রকাশ করলেন। তারপরও তিনি ইমাম আবু ইউসুফ রহ.-কে বললেন, সে যেন এই প্রস্তাব গ্রহণ করে। ইমাম আবু ইউসুফ রহ. প্রধান বিচারপতি হলেন। পুরো দেশে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা ছড়িয়ে পড়লো।

তখন রাষ্ট্র এই দায়িত্ব নিলো যে, আপনার দায়িত্ব চলাকালে খাবারের ব্যবস্থা রাষ্ট্র করবে। একদিন খলিফা তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন, সাথে পেয়ালা করে ফালুদা নিয়ে এলেন। যখন ইমাম ইউসুফ রহ.-কে দিলেন তখন বললেন, জনাব এটা গ্রহণ করুন। এটা ওই নেয়ামত যা আমি নিজেই খুব অল্পসময় খেতে পাই। কিন্তু আপনি এ খাবার প্রতিদিন পাবেন। ইউসুফ রহ. জিজ্ঞেস করলেন, এটা কী? বাদশা বললেন, এটা পেস্তার তৈরি ফালুদা। ইউসুফ রহ. অবাক হয়ে গেলেন। সম্মানিত উস্তাদের মুখ নিসৃত কথা হুবহু প্রতিফলিত হলো।

দস্তরখান উপযুক্ত জায়গায় ঝাড়বে

হযরত মুফতী শফী রহ. একবার মাওলানা আসগর রহ.-এর ঘরে মেহমান হয়ে এলেন। খাবার শেষে মুফতী শফী রহ. দস্তরখান গুছাতে চাইলেন। মাওলানা আসগর হুসাইন রহ. জিজ্ঞেস করলেন, কী করতে চাচ্ছেন? তিনি বললেন; দস্তরখান ঝেড়ে দেবো। জিজ্ঞেস করলেন, দস্তরখান কি ঝাড়তে

জানো? মুফতী সাহেব অবাক হলেন। বললেন, এটা জানার মতো কী এমন বিষয়? আপনি যখন এভাবে জিজ্ঞেস করলেন, কাজেই আপনি বলে দিন কিভাবে দস্তরখান ঝাড়তে হয়।

মাওলানা আসগর হুসাইন রহ. বললেন, এটাও একটা বিদ্যা। অতঃপর হাড্ডিতে লেগে থাকা গোস্ত, রুটির টুকরো ও ছোট ছোট খাদ্যকণাগুলো পৃথক করলেন। এরপর হাড্ডিগুলো এমন স্থানে ফেললেন যেখানে কুকুর খেতে পারে। গোস্ত লেগে থাকা হাড্ডিগুলো এমন স্থানে ফেললেন যেখানে বিড়াল খেতে পারে। রুটির টুকরোগুলো দেয়ালের ওপর রাখলেন যেন পাখি খেতে পারে এবং ছোট ছোট কণাগুলো এমন স্থানে রাখলেন যেখানে পিপীলিকার চলাচলের রাস্তা ছিলো। অতঃপর বললেন, এসব আল্লাহর রিযিক তার কোনো অংশই বিনষ্ট হওয়া উচিত নয়।

হযরত হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর নিকট একজন মেহমান এলেন, তাকে খাবারের সাথে ফল দেয়া হলো। খাবারের পর মেহমান বললো, হযরত, ফলের খোসাগুলো বাইরে ফেলে দিচ্ছি। হযরত জিজ্ঞেস করলেন, ফেলতে পারবে তো? মেহমান বললো, এটা না পারার কী আছে? মাদানী রহ. বললেন, আমার পাশে গরীব লোক থাকে। যদি সমস্ত খোসা এক জায়গায় ফেলো তাহলে সেগুলো দেখে তাদের আক্ষেপ হবে। তাই কিছু কিছু করে বিভিন্ন স্থানে ফেলবে যেন কেউ দেখে বুঝতে না পারে।

কিছু লোক রুটির বড় টুকরো ময়লার স্তূপে ফেলে দেয়। এটা মস্তবড় বেআদবী। কারো চোখে পড়লে উচিৎ হলো সে যেন ওই টুকরো উঠিয়ে উঁচুস্থানে রেখে দেয়।

একজন বুযুর্গ নিজ বাহনে চড়ে কোথাও যাচ্ছিলেন। সাথে ছোলা বুটও ছিলো যা তিনি খাচ্ছিলেন। এমতাবস্থায় একটি ছোলার দানা হাত থেকে পড়ে গেলো। তখন তিনি বাহন থামিয়ে নিচে নামলেন এবং ছোলাটি উঠিয়ে খেয়ে নিলেন। আল্লাহ তাআলা তাঁর সমস্ত গুনাহ ক্ষমা করে দিলেন এ কারণে যে, বান্দা আমার রিযিকের আদব ও মর্যাদা রক্ষা করেছে।

বর্তমানে পানপাত্রে কিছুটা রেখে দেওয়া ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এটা অহংকারের বহিঃপ্রকাশ ও রিযিকের অবমাননা।

হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. একবার অসুস্থ হলেন, তখন তাঁর জন্য দুধ আনা হলো, তিনি কিছু দুধ পান করে পাশে রেখে দিলেন। এরই মাঝে তাঁর চোখে ঘুম নেমে এলো। যখন জাগ্রত হলেন তখন পাশে দুধের গ্লাস না পেয়ে খাদেমকে জিজ্ঞেস করলেন; অবশিষ্ট দুধটুকু কী করা হয়েছে?

খাদেম বললো, হযরত! খুব অল্পই তো অবশিষ্ট ছিলো তাই তা ফেলে দিয়েছি। তিনি খুব রাগান্বিত হলেন এবং বললেন, তুমি আল্লাহর রিযিকের অমর্যাদা করেছ! নিজেও তা খেয়ে নিতে পারতে! কিংবা পশু-পাখি জাতীয় প্রাণীকে খাইয়ে দিতে পারতে! তাহলে আল্লাহর মাখলুকের উপকার হতো। অতঃপর একটা মূলনীতি বুঝালেন। যে সব জিনিস দ্বারা মানুষ অধিক পরিমাণে উপকৃত হয় সেসব বস্তুর সামান্য পরিমাণ মূল্যায়ন করাও তাদের দায়িত্বে আবশ্যক হয়ে যায়।

হযরত খাজা ফজল আলী শাহ কোরাইশী মিসকীনপুরী রহ.-এর খানকায় সবসময় ভক্তের ভীড় লেগে থাকতো। একবার ভক্তদের জন্য দস্তরখান বিছানো হলো এবং তাতে খাবার রাখা হলো। তখন হযরত বললেন, হে ফকীরগণ! শোনো, এই রুটি যা তোমাদের সামনে রাখা হয়েছে এর গমের জন্য হালচাষ করা হয়েছে অযু অবস্থায়। ক্ষেতে সেচ দেয়া হয়েছে অযু অবস্থায়। যখন ফসল পেকে প্রস্তুত তখন তা কাটা হয়েছে অযু অবস্থায়। অতঃপর গমকে খোসা থেকে পৃথক করা হয়েছে ওযু অবস্থায় এবং ওই গমকে আটা বানানো হয়েছে অযু অবস্থায়। তারপর সেই আটাকে খামির বানানো হয়েছে অযু অবস্থায় এবং সেই খামির দ্বারা রুটি তৈরি করা হয়েছে অযু অবস্থায়। অতঃপর তোমাদের সামনে তা রাখা হয়েছে অযু অবস্থায়। হায়! তোমরা যদি এ রুটিগুলো অযু অবস্থায় খেতে।

মহিলাদের জন্য বিশেষ কিছু আদব

১. রাস্তায় চলার সময় পুরুষদের থেকে পৃথক চলবে।

২. রাস্তার মাঝখান দিয়ে চলবে না, বরং একপাশ দিয়ে চলবে।

[আবু দাউদ]

৩. শব্দ হয় এমন অলংকার পরবে না।

৪. যে মহিলা বড়ত্ব প্রকাশের জন্য অলংকার পরবে তার জন্য রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি।

৫. রূপার অলংকার দিয়ে কাজ চালিয়ে নেয়া উত্তম।

৬. মহিলাদের হাতে মেহেদী লাগিয়ে রাখা উচিত।

৭. মহিলাদের সুগন্ধি এমন হবে যার রং প্রকাশ পাবে; কিন্তু ঘ্রাণ যেন বেশী না ছড়ায়।

৮. এমন পাতলা কাপড় পরবে না যাতে শরীর দেখা যায়।

৯. যদি উড়না পাতলা হয় তাহলে নিচে মোটা কাপড় পরিধান করবে।

১০. যে সমস্ত মহিলা পুরুষদের বেশ-ভূষা অবলম্বন করে তারা অভিশপ্ত।

১১. কোনো পুরুষ কখনোই নির্জনে কোনো মহিলার সাথে থাকবে না। মহিলারা ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে মাহরাম ছাড়া ঘর থেকে বের হবেনা।

১২. ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে মসজিদে প্রবেশ করবে না। কুরআন মাজিদ স্পর্শ করবে না। তবে তারা যদি কোনো জিনিস স্পর্শ করে তাহলে সেটা অপবিত্র হবে না। শরীয়ত অনুযায়ী স্বামী স্ত্রীর সাথে সহবাস ব্যতীত সমস্ত কাজ করতে পারবে।

হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি এই সময়ে রাসূল সা.-এর চুল আঁচড়ে দিতাম, মাথা ধুয়ে দিতাম। একবার রাসূল সা. আমাকে কিছু একটা নিয়ে আসতে বললেন; আমি অপবিত্রতার কথা বললাম, তখন নবী সা. বললেন, অপবিত্রতা তোমার হাতে না।

১৩. আল্লাহ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা পছন্দ করেন। অতএব ঘরের সামনের খালি জায়গাগুলো (আঙ্গিনা) পরিষ্কার রাখবে। মহিলারা ঘরের ভেতর পরিষ্কার করবে আর বাইরে বাচ্চাদের দিয়ে পরিষ্কার করাবে। (তিরমিযী)

বিভিন্ন আদবসমূহ

১. অহংকারী ভাব নিয়ে চলবে না।

২. কোনো পুরুষ মহিলাদের মধ্যখান দিয়ে চলবে না। (আবু দাউদ)

৩. যে ঘরে কুকুর অথবা প্রাণীর ছবি থাকে সে ঘরে রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করেন না। (বুখারী)

৪. কারো দরজায় টোকা দেওয়ার পর ভিতর থেকে পরিচয় জানতে চাইলে 'আমি আমি' বলবে না। পুরো নাম বলবে।

৫. চুপিসারে কারো কথা শুনবে না।

৬. কারো উদ্দেশ্যে চিঠি লিখলে শুরুতে নিজের নাম লিখে দেবে।

৭. যখন কারো ঘরে যাবে অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে।

৮. তিনবার অনুমতি চাওয়ার পরও অনুমতি না পেলে ফিরে আসবে।

৯. অনুমতি নেওয়ার সময় দরজা বরাবর দাঁড়াবে না। ডানে বা বামে দাঁড়াবে।

১০. নিজের মায়ের রুমে গেলেও অনুমতি নিয়ে প্রবেশ করবে।

১১. রসিকতা করে কারো জিনিস নিয়ে আসবে না।

১২. ছুরি, চাকু ইত্যাদি কারো দিকে নিক্ষেপ করে দেবে না। দেওয়ার প্রয়োজন হলে হাতল বাড়িয়ে দেবে।

১৩. যুগকে মন্দ বলবে না। কারণ তার উত্থান পতন আল্লাহরই হাতে।

১৪. বাতাসকে মন্দ বলবে না।

১৫. অসুস্থতাকেও মন্দ বলবে না।

১৬. যখন রাত হয়ে যাবে বিসমিল্লাহ বলে দরজা বন্ধ করে দেবে। কেননা শয়তান এ বন্ধ দরজা খুলে না এবং বিসমিল্লাহ বলে জগ-ইত্যাদির মুখ ঢেকে দেবে।

১৭. রাত্রে যখন লোকজনের আনাগোনা কমে যায় তখন বাইরে কম যাবে।

১৮. সাধারণ মানুষের সামনে হাই তোলা, ঢেকুর দেওয়া ভদ্রতার পরিপন্থি।

১৯. বায়ু ত্যাগ করার প্রয়োজন হলে বাথরুমে অথবা নিরিবিলি কোথাও কর্মটি সেরে আসবে।

বর্তমানে মুসলিম উম্মাহর দুরবস্থা

বর্তমান যুগে মুসলিম উম্মাহ অভ্যন্তরীণ কোন্দল, বিশৃংখলা, অনৈক্য ও চরম চিন্তাদৈন্যের শিকার। উম্মাহর মাঝে আলেম, গবেষক, চিন্তাবিদ, বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষাবিদের অভাব নেই, কিন্তু স্বার্থচিন্তা ও বিলাসিতা পূঁজা উম্মতের শৃঙ্খলা নষ্ট করে দিয়েছে। ইলম ও জ্ঞানের চর্চা তো বাড়ছে, কিন্তু তা বাস্তব জীবনে বাস্তবায়নের চেষ্টা নেই। উপলক্ষই যেন আজ মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে। মুস্তাহাব ও সাধারণ এবং ছোট ছোট বিষয়ে বিভেদ-মতানৈক্য উম্মতের প্রাণশক্তি নিঃশেষ করে দিয়েছে। মুসলমান আজ নিজেদের মাঝে সমালোচনার শিল্প বেশ ভালোভাবেই রপ্ত করেছে। কিন্তু কুরআনের-رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ 'নিজেদের মাঝে পরস্পরে উদার' এই মূলনীতি ভুলে গেছে। ফলাফল দাঁড়িয়েছে, মুসলমান আজ পৃথিবীতে এই পরিমাণ অধঃপতন ও অবমাননার শিকার যে, উম্মাহর প্রাণবায়ু বেরিয়ে যাওয়ার উপক্রম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ.

অর্থাৎ তোমরা পরস্পরে ঝগড়া-বিবাদে জড়িয়ো না তাহলে তোমরা পরাস্ত হবে এবং তোমাদের প্রতাপ নিঃশেষ হবে।[২১৮]

মুসলমান আজ পৃথিবীতে কেবল পার্থিব উপায়-উপকরণের ভোগদাস এবং চিন্তা-চেতনা ও বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে পশ্চাদপদ ও অন্যদের অনুগামী হয়ে আছে।

---

২১৮. সূরা আনফাল, আয়াত : ৪৬।

ছয় শ্রেণীর মানুষ অভিশপ্ত

হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, ছয় ধরণের মানুষের প্রতি আমি অভিসম্পাত করি এবং আল্লাহ তাআলাও তাদের ওপর অভিসম্পাত করেন। আর প্রত্যেক নবীর দোয়া কবুল হয়।

১. আল্লাহ তাআলার কিতাবে যে নিজ থেকে সংযোজন করে।

২. যে ব্যক্তি আল্লাহর মনোনীত তাকদীরকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে।

৩. যে ব্যক্তি জোর-জবরদস্তিমূলক প্রভাব-প্রতিপত্তি অর্জন করে।

৪. যে ব্যক্তি পবিত্র হেরেম শরীফে হত্যা, রক্তপাত ও শিকারকে বৈধ মনে করে।

৫. আমার সন্তানের পক্ষে ওই বিষয়কে হালাল মনে করা যে বিষয় আল্লাহ হারাম সাব্যস্ত করেছেন।

৬. যে ব্যক্তি আমার সুন্নত বর্জন করে।

মুমিন ও মুশরিকের সন্তানদের পরিণাম

হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন, উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদিজা রা. তাঁর পূর্বের দুইজন অল্প বয়সের সন্তানের ব্যাপারে [যারা তাঁর পূর্বের স্বামীর ঔরসজাত ছিলো এবং জাহেলী যুগে মৃত্যু বরণ করেছিলো] রাসূল সা.-কে জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাদের পরিণাম কী?

রাসূল সা. বললেন, তারা দুজনই জাহান্নামের বাসিন্দা।

হযরত আলী রা. বর্ণনা করেন, হযরত খাদীজা রা. একথা শুনে কিছুটা বিষন্ন ও গম্ভির হয়ে পড়লেন। নবী করিম সা. তাঁর চেহারায় এমন গাম্ভির্যপূর্ণ ও মনক্ষুন্ন ভাব দেখে বললেন, তুমি যদি তোমার বাচ্চার প্রকৃত অবস্থা দেখতে যে, তারা আল্লাহর রহমত থেকে কী পরিমাণ দূরে তাহলে তুমি নিজেই ঘৃণা করতে।

এবার খাদিজা রা. বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার ঐ বাচ্চাদের কী অবস্থা যারা আপনার ঔরসে এসেছিলো? [অর্থাৎ কাসেম ও আব্দুল্লাহ]

রাসূল সা. বললেন, তারা জান্নাতের বাসিন্দা।

এরপর রাসূল সা. ইরশাদ করলেন, ঈমানদার ও তাদের সন্তানদের ঠিকানা জান্নাত। আর কাফের ও মুশরিক এবং তাদের সন্তানদের ঠিকানা জাহান্নাম। [আহমদ]

এরপর রাসূল সা. একথার দলিল হিসেবে এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

وَالَّذِينَ اٰمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ.

"যারা ঈমানদার এবং যাদের সন্তানরা ঈমানে তাদের অনুগামী, আমি তাদেরকে তাদের পিতৃপুরুষদের সাথে মিলিত করে দেবো এবং তাদের আমল বিন্দুমাত্রও হ্রাস করবো না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃত কর্মের জন্য দায়ী।"[২১৯] গেল

আদম আ. নিজের আয়ু দাউদ আ.-কে দিয়েছিলেন

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন, যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর পিঠের ওপর হাত বুলালেন [অর্থাৎ ফেশেতাদেরকে হাত বুলানোর নির্দেশ করলেন] অতঃপর তাঁর পিঠ থেকে ওই সমস্ত রূহ বাইরে বেরিয়ে এলো যাদেরকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর বংশ থেকে সৃষ্টি করবেন। এরপর আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক মানুষের দুই চোখের মাঝে একটি নূরের আলো রাখলেন।

এরপর সমস্ত রূহকে হযরত আদম আ.-এর সামনে আনা হলো, হযরত আদম আ. জিজ্ঞাসা করলেন; পরওয়ারদেগার! এরা কারা? আল্লাহ রব্বুল আলামীন বললেন, এরা সবাই তোমার সন্তান, যারা কিয়ামত পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে জন্ম নেবে।

হযরত আদম আ. তাদের মধ্য থেকে একজনকে যেইনা দেখলেন, তখন তার দুই চোখের উজ্জ্বলতা তাঁর খুব ভালো লাগলো। তখন তিনি বললেন; হে পরওয়ারদেগার! এ কে? আল্লাহ তাআলা বললেন, এ হলো দাউদ আ.। আদম আ. জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ! আপনি এর জন্য কত বছর নির্ধারণ করেছেন? আল্লাহ তাআলা বললেন, ষাট বছর। হযরত আদম আ. বললেন, হে আল্লাহ! আমার আয়ু থেকে চল্লিশ বছর নিয়ে এর বয়সে যোগ করে দিন। (তিরমিযী)[২২০]

---

২১৯. সূরা তূর, আয়াত : ২১।

২২০. এই সিরিজে পূর্বের একটি খণ্ডে এরচেয়ে দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ হাদীস বর্ণিত হয়েছে। দয়া করে সেটা দেখে নিন।

আল্লাহ! আমাদেরকে ডানদিকের অধিকারী বানান

হযরত আবু দারদা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন, আল্লাহ তাআলা যখন হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করলেন তখন তাঁর ডান কাঁধে কুদরতী হাতে ফেরেশতাদের দ্বারা চাপর লাগালেন, অমনি তাঁর সন্তান বেরিয়ে আসলো। যারা ছিলো সাদা শুভ্র এবং উজ্জ্বল। আর বাম পাশের দিগন্ত কয়লার মত কালো মনে হলো। অতঃপর আল্লাহ রব্বুল আলামীন ডান কাঁধের সন্তানাদির ব্যাপারে ইরশাদ করলেন; এরা সবাই জান্নাতের বাসিন্দা। তখন হযরত আদম আ. বাম পাশের সন্তানাদির ব্যাপারে জানতে চাইলে যা তাঁর বাম কাঁধ হতে বের হয়েছিলো, আল্লাহ রব্বুল আলামীন ইরশাদ করলেন; এরা জাহান্নামের বাসিন্দা। এদেরকে এক দল থেকে আরেক দলে নেওয়ার ক্ষমতা আমি ছাড়া আর কারো নেই। [আহমাদ]

তাবেয়ী হযরত আবু নাযরাহ রহ. থেকে বর্ণিত, নবী কারীম সা.-এর এক সাহাবী—যাকে আবু আব্দুল্লাহ রা. বলা হয়, তিনি অসুস্থ হলে তাঁর হিতাকাঙ্ক্ষীরা শুশ্রূষার জন্য তাঁর কাছে গেলেন। তখন তারা দেখলেন, তিনি আল্লাহ ও আখেরাতের ভয়ে কাঁদছেন।

তারা জিজ্ঞেস করলো, কাঁদছেন কেনো? আপনার নিকট কী রাসূল সা.-এর এই বাণী পৌঁছে নি যে, সব সময় যবান সংযত রাখো, কথা কম বলো এবং হাশরের মাঠে এসে আমার সাথে মিলিত হও!

আবু আব্দুল্লাহ রা. বললেন; হ্যাঁ, কিন্তু আমি তো রাসূল সা.-কে একথাও বলতে শুনেছি যে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় মাখলুক থেকে এক অংশ ডান হাতে এবং অন্য অংশকে বাঁ হাতে নিয়েছেন। অতঃপর বলেছেন, এই ডান হাতের মুঠোর লোকগুলো জান্নাতে যাবে এবং বাম হাতের মুঠোর লোকগুলো জাহান্নামে যাবে। এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার ক্ষমতা আমি ছাড়া আর কারো নেই। এরপর আবু আব্দুল্লাহ রা. বলতে লাগলেন; আমার জানা নেই, আমি এই দুই দিকের কোন দিকে আছি।

মানুষের স্বভাব অপরিবর্তনশীল

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, আমরা একদিন রাসূল সা.-এর কাছে বসে আগামীর বিভিন্ন সম্ভাব্য বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম। আমাদের কথা শুনে রাসূল সা. বললেন, যদি কখনো এ কথা শোনো যে, পাহাড় তার নিজ স্থান থেকে সরে গেছে তাহলে তা বিশ্বাস করতে পারো। কিন্তু যদি কখনো

শোনো যে, অমুকের স্বভাবে পরিবর্তন এসেছে তাহলে তা কখনোই বিশ্বাসযোগ্য নয়। কেননা যাকে যে স্বভাব দ্বারা সৃষ্টি করা হয়েছে সে ওই স্বভাব দ্বারাই পরিচালিত হয়।

জান্নাত লাভের তিনটি উপায়

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি হালাল খাবে, সুন্নত অনুযায়ী চলবে এবং তার অনিষ্টতা থেকে অন্যরা নিরাপদ থাকবে সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে।

এ কথা শুনে সাহাবায়ে কেরাম রা. বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! বর্তমানে তো এমন গুণ অনেকের মাঝেই বিদ্যমান।

রাসূল সা. বললেন, আমার পরবর্তী যুগেও এমন মানুষ থাকবে।

ঝগড়াটে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়

হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন; কোনো জাতি হেদায়াতের ওপর পরিচালিত হওয়ার পর তখনই পথভ্রষ্ট হয়, যখন তাদের ঝগড়ার অভ্যাস হয়ে যায়। এরপর রাসূল সা. এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন;

مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلاَّ جَدَلاً، بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ.

অর্থাৎ তারা আপনার সামনে যে উদাহরণ উপস্থাপন করে তা কেবল বিতর্কের জন্যই করে। মূলত তারা ঝগড়াটে জাতি।

[সূরা যুখরুফ]- আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ।

একটি বেদআতের কারণে একটি সুন্নত বিলুপ্ত হয়

হযরত গাযিফ ইবনে হারিস সুমালী রা. হতে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন; যে জাতি বা গোত্র কোনো বেদআত উদ্ভাবন করে তখন তাদের থেকে ওই ধরনের কোনো একটি সুন্নত ওঠিয়ে নেওয়া হয়। অতএব সুন্নতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা বেদআত সৃষ্টির চেয়েও উত্তম। [আহমদ]

হযরত হাসসান রা. বর্ণনা করেন— যখন কোনো জাতি নিজের দীনের মাঝে বেদআতের জন্ম দেয় তখন আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য থেকে ওই পরিমাণ সুন্নত ছিনিয়ে নেন এবং ঐ সুন্নত কিয়ামত পর্যন্ত তার কাছে আর ফিরে আসে না। [দারেমী]

দাওয়াত সম্পর্কীয় অপূর্ব প্রবন্ধ

হযরত আবু সাইদ রা. বলেন, একদিন রাসূল সা. আমাদেরকে সম্বোধন করে বললেন; দেখো! মানুষ তোমাদের অধীনস্থ (অর্থাৎ আমার পরে মানুষ তোমাদের অনুসরণ করবে)। আর পৃথিবীর চতুর্দিক থেকে কত মানুষই না দীনি ইলম অর্জন করতে ও বুঝতে তোমাদের কাছে আসবে। যখন তারা আসবে তখন তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবে এবং তাদেরকে দীনি ইলম শিক্ষা দেবে। [তিরমিযী]

অন্তর থেকে যেভাবে ইলম বেরিয়ে যায়

তাবেয়ী হযরত সুফয়ান রহ. হতে বর্ণিত, একদিন হযরত ওমর ফারুক রা. বিখ্যাত তাবেয়ী ও তাওরাত ইঞ্জিলের গবেষক হযরত কা'ব আহবার রহ.-কে জিজ্ঞাসা করলেন; আপনার মতে প্রকৃত আলেম কে?

হযরত কা'ব আহবার রহ. জবাব দিলেন; যারা ইলম অনুযায়ী আমল করে। অর্থাৎ যে ইলমের ওপর আমল করে তাকেই প্রকৃত আলেম বলে।

ওমর রা. আবার জিজ্ঞেস করলেন; কোন জিনিস আলেমদের অন্তর থেকে ইলমের নূর, বরকত ও তার প্রভাব বের করে দেয়?

হযরত কা'ব রহ. জবাব দিলেন; লোভ-লালসা। [দারেমী]

কিয়ামত দিবসে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কে

হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলার নিকট মর্যাদা অনুযায়ী সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি ঐ আলেম যে তার ইলম থেকে উপকৃত হতে পারে নি। অর্থাৎ আমল করে নি। [রাযিল]

যারা ইসলাম ধ্বংস করে

হযরত যিয়াদ ইবনে হুদাইর রহ. বলেন, আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর রা. একবার আমাকে বললেন; তুমি কী জানো কোন জিনিস ইসলামের আবাদীকে বিলিন করে দেয়?

আমি বললাম— না। তখন তিনি বললেন, আলেমের অধঃপতন (গুনাহে লিপ্ত হওয়া), মুনাফেকরা আল্লাহর কিতাব নিয়ে ঝগড়ায় লিপ্ত হওয়া এবং ভ্রষ্ট নেতা বা সরদারের বিধি-বিধান প্রকাশ করা ইসলামকে ধ্বংস করে দেয়।

জান্নাতে অসংখ্য মহল বানানোর উপায়

হযরত সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যিব রহ. মুরসাল সনদে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি সূরা ইখলাস দশবার পাঠ করবে,

আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে একটি মহল তৈরি করবেন। যে ব্যক্তি বিশ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার জন্য জান্নাতে দু'টি মহল তৈরি করবেন। যে ব্যক্তি ত্রিশ বার সূরা ইখলাস পাঠ করবে, আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার জন্য জান্নাতে তিনটি মহল তৈরি করবেন। নবীজীর পবিত্র যবান থেকে এই সুসংবাদ শুনে হযরত ওমর রা. বললেন, আল্লাহর কসম! হে আল্লাহর রাসূল! তাহলে তো আমরা জান্নাতে অসংখ্য মহলের মালিক হয়ে যাবো! (অর্থাৎ যখন এই সূরা পড়ার এতো বরকত ও এতো সওয়াব তাহলে আমরা এই সূরা বেশী বেশী পড়বো যেন এর কারণে জান্নাতে অসংখ্য মহল তৈরি হয়।) নবী সা. বললেন, এরচেয়েও অধিক। অর্থাৎ এই সূরার সাওয়াব অনেক প্রশস্ত। সুতরাং এ সুসংবাদ শুনে বিস্মিত না হয়ে বরং তা অর্জনের চেষ্টা করো। (দারেমী)

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর নাম আরশেও উচ্চারিত হয়েছে

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সা. একদিন হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা.-কে বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে আদেশ করেছেন আমি যেন তোমার সামনে কুরআন তেলাওয়াত করি।

হযরত উবাই ইবনে কা'ব রা. বললেন, আল্লাহ তাআলা কি আপনার সামনে আমার নাম নিয়েছেন?

—রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ।

উবাই ইবনে কা'ব রা. আনন্দে অভিভূত হয়ে বললেন, সমস্ত পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তার দরবারে আমার নাম স্মরণ করা হয়েছে?

—রাসূল সা. বললেন, হ্যাঁ।

একথা শোনার পর উবাই ইবনে কা'ব রা.-এর চোখ দিয়ে অশ্রু প্রবাহিত হতে লাগলো। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূল সা. উবাই ইবনে কা'ব রা.-কে বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে হুকুম করেছেন, আমি যেন তোমার সামনে সূরা বাইয়িনা তেলাওয়াত করি। উবাই ইবনে কা'ব রা. বললেন, আল্লাহ তাআলা কি আমার নাম নিয়েছেন? নবীজী সা. বললেন, হ্যাঁ। এ কথা শুনে উবাই ইবনে কা'ব রা. কাঁদতে শুরু করলেন। (বুখারী, মুসলিম)

আত্মকলহ ধ্বংস ডেকে আনে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে রাসূল সা.-এর পদ্ধতির বিপরিত কুরআন তেলাওয়াত করতে শুনলাম। তখন আমি

তাকে নবী সা.-এর খেদমতে নিয়ে এসে বললাম, এই ব্যক্তির তেলাওয়াত আপনার তেলাওয়াত থেকে ভিন্ন। অতঃপর আমি অনুভব করলাম, আমার বিরোধিতা ও ঝগড়ার কারণে রাসূল সা.-এর চেহারা মুবারকে বিস্বাদের ছাপ স্পষ্ট। তারপর রাসূল সা. ইরশাদ করলেন; তোমরা দু'জনই সঠিক ও ভালো পড়ো। দেখো! একে অপরের বৈরীত্য করবে না। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতি-গোষ্ঠি আত্মকলহের কারণে ধ্বংস হয়েছে। (বুখারী)

দোয়া শেষে চেহারায় হাত বুলানো

হযরত মালেক ইবনে ইয়াসার রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন; তোমরা যখন দোয়া চাও তখন হাতের ভিতরের দিক দ্বারা চাও, হাতের অপর দিক দিয়ে চেয়ো না। হযরত আব্বাস রা. এর বর্ণনা হলো, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন; তোমরা হাতের তালু দ্বারা দোয়া করবে, হাতের পিঠ দ্বারা দোয়া করবে না। আর যখন দোয়া শেষ হবে তখন হাত চেহারায় বুলাবে তাহলে ওই বরকত যা তোমার হাতে এসেছে তা চেহারায় পৌঁছে যাবে। (আবু দাউদ)

হযরত সালমান রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন; তোমাদের প্রতিপালক খুবই লাজুক। অর্থাৎ লাজুক স্বভাবজাত আচরণ করেন এবং তিনি খুবই দয়ালু। তিনি বান্দাদেরকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতে খুবই লজ্জা পান যখন বান্দাগণ তাঁর কাছে প্রার্থনার জন্য হাত উঠায়। (তিরমিযী, আবু দাউদ, বায়হাকী)

কঠিন হৃদয়ের ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে দূরে থাকে

হযরত ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন; আল্লাহর যিকির ব্যতীত বেশী কথা বলবে না। কেননা আল্লাহর যিকির ব্যতীত অধিক কথা অন্তর কঠিন হওয়ার কারণ। আর মনে রেখো! আল্লাহ তাআলা থেকে সবচেয়ে দূরে ওই ব্যক্তি যার হৃদয় শক্ত। (তিরমিযী)

জান্নাতী জীবন যাপনের নববী পদ্ধতি

ইমাম মালেক রহ. বলেন, আমার নিকট এই বর্ণনা পৌঁছেছে যে, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; গাফেলদের মাঝে আল্লাহর যিকিরকারী ব্যক্তি পলায়নপর সৈনিকের মাঝে লড়াইকারী ব্যক্তির মতো। অর্থাৎ ওই ব্যক্তির ন্যায় যিনি যুদ্ধের ময়দানে নিজের সৈনিকেরা পালিয়ে যাওয়া সত্ত্বেও একাই কাফেরদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে লড়ে যাচ্ছে। একথাও বলেছেন; গাফেলদের মাঝে আল্লাহর যিকিরকারী ব্যক্তি শুষ্ক গাছের মাঝে সতেজ সবুজ গাছের মতো।

আরেক জায়গায় বর্ণিত আছে, সবুজ শ্যামল বাগানের মতো। আল্লাহ তাআলার যিকিরকারী অন্ধকার ঘরে চেরাগ স্বরূপ। দুনিয়া বিমুখ জিকিরকারীদের আল্লাহ তার জীবদ্দশায়ই জান্নাতের মর্যাদা দেখিয়ে দেন। অর্থাৎ সমস্ত মাখলুকের সমপরিমাণ গুনাহ থেকে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। (রাযিন)

যে ব্যক্তিকে দেখে আল্লাহ হাসেন

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; আল্লাহ তাআলা দুই ব্যক্তিকে দেখে হাসেন। অর্থাৎ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হন এবং তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টিতে তাকান। তাদের মধ্যে একজন হলো ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা এই শহীদের হত্যাকারীকে তওবা করার তওফীক দান করেন এবং সে কুফর থেকে তওবা করে ঈমান গ্রহণ করে। অতঃপর সেও আল্লাহর রাস্তায় লড়াই করে এবং যুদ্ধের ময়দানে শহীদ হয়ে যায়। তারপর তাকেও জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়। (বুখারী, মুসলিম)

শহীদদের জন্য বিশেষ পুরস্কার

হযরত মিকদাম ইবনে মা'দিকারোবা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা.ইরশাদ করেছেন; মহান আল্লাহ রব্বুল আলামীনের নিকট শহীদদের জন্য ছয়টি বিশেষ পুরস্কার রয়েছে। সেগুলো হলো-

১. রক্তের প্রথম ফোঁটা মাটিতে পড়ার পূর্বেই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং তাকে জান্নাতের মর্যাদা দেখিয়ে দেয়া হয়।

২. তাকে কবরের আযাব থেকে নিরাপদে রাখা হয়।

৩. তাকে আগুনের ভয়াবহ আযাব থেকে নিরাপদে রাখা হয়।

৪. তার মাথায় সম্মান ও মর্যাদার বিশেষ মুকুট পরানো হবে, যার একটি ইয়াকুত পাথর যা সমগ্র পৃথিবী ও তন্মধ্যকার সকল জিনিস থেকেও মূল্যবান।

৫. তাকে ডাগর চোখ বিশিষ্ট বাহাত্তর জন হুর দেওয়া হবে।

৬. তার আত্মীয়-স্বজনদের মধ্য হতে সত্তর জনকে সুপারিশ করার অধিকার দেওয়া হবে। (তিরমিযী, ইবনে মাজা)

জান্নাতী কিছু মানুষ

হাসনা বিনতে মুআবিয়া ইবনে সালিম রা. বলেন, আমাকে আমার চাচা আসলাম ইবনে সালিম রা. বলেছেন; আমি একদিন নবী করিম সা.-কে জিজ্ঞাসা করলাম, হে আল্লাহর রাসূল! জান্নাতে কোন ধরনের মানুষ থাকবে?

নবী করিম সা. ইরশাদ করলেন, জান্নাতে নবীগণ, শহীদগণ ও বাচ্চারা থাকবে। আর জান্নাতে ওই সমস্ত বাচ্চারাও থাকবে যাদেরকে জীবন্ত মাটিচাপা দেয়া হয়েছিলো। (আবু দাউদ)

মৃতব্যক্তি জীবিতদের আওয়াজ শোনে

হযরত কাতাদাহ রা. বলেন, হযরত আবু তালহা এর সূত্রে হযরত আনাস ইবনে মালিক রা. আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, নবী করিম সা. বদরের যুদ্ধের দিন মক্কায় নিহত ২৪ সর্দারের ব্যাপারে আমাদেরকে আদেশ করলেন; এদেরকে উপযুক্ত স্থানে ফেলে দাও। তখন আমরা এই লাশগুলোকে পরিত্যাক্ত দূর্গন্ধযুক্ত এক কূপে নিক্ষেপ করলাম। নবী করিম সা.-এর একটি অভ্যাস ছিলো, তিনি যে যুদ্ধে জয় লাভ করতেন, যুদ্ধ শেষে সে যুদ্ধের ময়দানে তিন রাত অবস্থান করতেন। সে অনুযায়ী নবী করিম সা. মক্কায় ও তিন রাত অবস্থান করলেন।

যখন তিন রাত অতিবাহিত হলো তখন তিনি বাহনে জিন বাঁধতে আদেশ করলেন। অতঃপর তিনি বাহনে আরোহণ করলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. তাঁর পেছনে চলতে শুরু করলেন। কাফেলা যখন সেই কূপের কাছাকাছি পৌঁছলো— যে কূপে কাফের সর্দারদের লাশ নিক্ষেপ করা হয়েছিলো— তখন নবী করিম সা. সেই কূপের কিনারে গিয়ে দাঁড়ালেন এবং ঐ সব সর্দারদের ও তাদের পূর্বপুরুষদের নাম ধরে উচ্চস্বরে ডাকলেন, হে অমুকের সন্তান অমুক! তোমরা কী এখন এটা মনে করছো না যে, তোমাদের আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করাই ভালো ছিলো? নিঃসন্দেহে আমাদের তো ঐ জিনিস অর্জিত হয়েছে যা আমাদের রব আমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন। তোমরা কি ঐ জিনিস পেয়েছো যা তোমাদের রব তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলো?

হযরত ওমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আপনি প্রাণহীন দেহের সাথে কথা বলছেন! নবী করিম সা. বললেন; কসম ঐ সত্তার যার হতে আমার প্রাণ! ওই দেহগুলোর সাথে আমি যা বলছি তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনছো না। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, তোমরা তাদের চেয়ে বেশী শুনছো না। কিন্তু তোমরা উত্তর দিতে পারো আর তারা উত্তর দিতে পারে না। (বুখারী, মুসলিম)

গনীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করার পরিণাম

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, একদিন নবী করিম সা. আমাদের সামনে খুতবা দিলেন। খুতবায় গনীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করার কথা উল্লেখ

করলেন। নবী করিম সা. বললেন, এটা অনেক বড় গুনাহ এবং খুব গুরুত্বের সাথে এ সম্পর্কে বয়ান করলেন।

সাবধান! আমি যেন তোমাদের কাউকে কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় না দেখি যে, সে নিজের ঘাড়ে ক্রুদ্ধ উট বহন করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। (অর্থাৎ যে ব্যক্তি গণীমতের সম্পদ থেকে কোনো উট আত্মসাৎ করবে, সে ব্যক্তি হাশরের ময়দানে এ অবস্থায় উপস্থিত হবে যে, তার ঘাড়ে উক্ত উট চড়ে বসবে আর ক্রুদ্ধস্বরে আওয়াজ করতে থাকবে।) আর আমাকে বলবে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার জন্য সুপারিশ করুন। তখন আমি পরিষ্কার বলে দেবো, তোমার ব্যাপারে আমি কোনো সাহায্যই করতে পারবো না। কেননা আমি দুনিয়াতে তোমাদের কাছে শরীয়তের হুকুম পৌঁছে দিয়েছিলাম।

সাবধান! আমি যেন তোমাদের কাউকে কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় না দেখি যে, সে নিজের ঘাড়ে উন্মুক্ত ঘোড়া বহন করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। আর আমার কাছে এসে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য কিছু করেন। তখন আমি জবাব দেবো, তোমার জন্য আমার কিছুই করার নেই। আল্লাহর আযাব থেকে তোমাকে আমি রক্ষা করতে পারবো না। কারণ আমি তোমাদেরকে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায়ই শরীয়তের হুকুম বলে দিয়েছিলাম। (অর্থাৎ আমি আগেই তোমাদেরকে গনীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করার পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করেছিলাম।)

সাবধান! তোমাদের কাউকে যেন আমি কিয়ামতের দিন এই অবস্থায় উপস্থিত হতে না দেখি যে, সে নিজের ঘাড়ে অভিযোগকারী বকরী বহন করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। আর আমার কাছে এসে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য ফরিয়াদ করুন। তখন আমি জবাব দেবো, তোমার জন্য আমার কোনো সুপারিশ নেই। কারণ আমি দুনিয়াতে তোমাদেরকে শরীয়তের বিধান জানিয়ে দিয়েছিলাম।

সাবধান! তোমাদের কাউকে যেন আমি কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় উপস্থিত হতে না দেখি যে, সে তার ঘাড়ে চিৎকাররত মানুষ বহন করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। (অর্থাৎ যুদ্ধবন্দি গোলাম যাকে কোনো ব্যক্তি আত্মসাৎ করেছে।) আর আমার কাছে এসে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে সাহায্য করুন। তখন আমি তাকে বলবো; তোমার জন্য আমার কোনো সাহায্য নেই। কারণ আমি দুনিয়াতে তোমাদেরকে শরীয়তের বিধান জানিয়ে দিয়েছিলাম।

সাবধান! তোমাদের কাউকে যেন আমি কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় উপস্থিত হতে না দেখি যে, সে তার ঘাড়ে উপচে পড়া কাপড় বহন করে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হয়েছে। আর আমার কাছে এসে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য সুপারিশ করুন। তখন আমি তাকে বলবো, আমি তো তোমাদেরকে শরীয়তের বিধান জানিয়ে দিয়েছিলাম।

সাবধান! তোমাদের কাউকে যেন আমি কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় উপস্থিত হতে না দেখি যে, সে হাশরের ময়দানে নিজ কাঁধে স্বর্ণ, রূপা ইত্যাদির বোঝা বহন করে উপস্থিত হয়েছে। আর আমার কাছে এসে বলবে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার জন্য সুপারিশ করুন। তখন আমি তাকে বলবো, আমি তো তোমাদেরকে শরীয়তের বিধান দুনিয়াতেই জানিয়ে দিয়েছিলাম। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি নবী করিম সা.-কে একটি গোলাম হাদিয়া দিয়েছিলো। যার নাম ছিলো মিদআম। এক যুদ্ধে সে নবী করিম সা.-এর উটের হাওদা ঠিক করছিলো। এমন সময় হঠাৎ দূর থেকে একটি তীর এসে বিদ্ধ হলো, ফলে সে মৃত্যু বরণ করলো। এ দেখে সবাই বলতে লাগলো; মিদআম তোমার জন্য জান্নাত মুবারক হোক। (অর্থাৎ নবী করিম সা.-এর খেদমতে ব্যস্ত থাকা অবস্থায় সে শাহাদাত বরণ করলো, ফলে সে জান্নাতী)

এ কথা শুনে নবী করিম সা. বললেন, না এমনটি নয়। ঐ সত্তার কসম! যাঁর হাতে আমার প্রাণ। ওই চাদর যা মিদআম খায়বারের দিন গনীমতের সম্পদ বণ্টন হওয়ার পূর্বেই নিয়ে নিয়েছিলো, সেই চাদর আগুন হয়ে তার ওপর বর্ষিত হবে। সবাই যখন এই কঠোর শাস্তির কথা শুনলো তখন এক ব্যক্তি একটি জুতার ফিতা নিয়ে নবী করিম সা.-এর দরবারে হাযির হলো। তখন নবী করিম সা. বললেন, এই ফিতা পরিমাণ চুরি করলেও তার কারণে জাহান্নামের আগুনে জ্বলবে। (বুখারী)

হযরত আব্দুল্লাহ রা. বললেন, এক ব্যক্তির নাম ছিল 'করকরাহ'। কোনো এক যুদ্ধে নবী সা.-এর পক্ষ থেকে সে মালামাল দেখাশুনা করার দায়িত্ব প্রাপ্ত হলো। যখন তার মৃত্যু হলো তখন নবী করিম সা. বললেন, ওই করকরাহ জাহান্নামে আছে। তারপর মানুষ তার মালামাল দেখতে শুরু করলো, তখন সেখানে একটি ছোট কম্বল পাওয়া গেলো যা সে গনীমতের মাল থেকে আত্মসাৎ করেছিলো।

আবু জেহেলের তলোয়ার কে পেলো?

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সা. বদর যুদ্ধের দিন আমাকে আবু জেহেলের তলোয়ার উপহার হিসেবে দিয়েছিলেন।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা. বদরের যুদ্ধে আবু জেহেলের মাথা দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন।

তিনি অনেক দুর্বল ছিলেন। পায়ের গোড়ালি দুর্বল ছিলো। তবুও আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার কাছ থেকে অনেক বড় কাজ নিয়েছেন।

রাসূল সা.আত্মসাৎকারীর জানাযা পড়েননি

হযরত ইয়াযিদ ইবনে খালেদ রা. বর্ণনা করেন, খায়বার যুদ্ধের সময় এক সাহাবীর ইন্তেকাল হলো। নবীজীর কাছে এসে সাহাবায়ে কেরাম এ সংবাদ দিলেন। নবী করিম সা. বললেন, তোমরা তার জানাযা পড়ে নাও। আমি তার জানাযা পড়বো না। এ কথা শুনে সবাই আশ্চর্য হলেন। তখন নবী করিম সা. বললেন, তোমাদের এই সাথী মালেগনীমত আত্মসাৎ করেছে। সুতরাং আমি তার মালপত্র খুঁজে দেখলাম তার মধ্যে ইহুদী নারীর হীরা থেকে কিছু হীরা পাওয়া যায়। যার মূল্য দুই দিরহামের কিছু কম। (মালিক, আবু দাউদ, নাসাঈ)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন, যখন নবী করিম সা. গনীমতের সম্পদ একত্র করে সাহাবায়ে কেরামের মাঝে বণ্টন করার ইচ্ছা করতেন তখন হযরত বেলাল রা.-কে ঘোষণা করার আদেশ করতেন। তখন লোকদের মাঝে ঘোষণা করা হতো এবং সবাই নিজ নিজ গনীমতের মাল এক জায়গায় জমা করতেন। নবী করিম সা. পাঁচ ভাগের একভাগ রেখে বাকী সম্পদ মুজাহিদদের মাঝে বণ্টন করে দিতেন।

একবার এ রকম গনীমতের সম্পদ জমা দেওয়ার ঘোষণা ও সাহাবায়ে কেরামের মাঝে তা বণ্টন করার একদিন পর নবী করিম সা.-এর নিকট একজন সাহাবী এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! গনীমতের সম্পদ কুড়ানোর সময় আমি উটের এই রশিটি পেয়েছিলাম, এটা আমার হাতে ছিলো। নবী করিম সা. তাকে জিজ্ঞাসা করলেন; বেলাল যখন তিনবার ঘোষণা করলো, তখন তুমি তা শোনো নি? সাহাবী বললেন; জি শুনেছিলাম। নবী করিম সা. বললেন, তোমাকে তখন কোন জিনিস এটা জমা দেওয়া থেকে বিরত রেখেছিলো? সাহাবী কিছু অপারগতার কথা পেশ করলেন। তখন নবী করিম সা. বললেন, এটা এখন এভাবেই রাখো। কাল কিয়ামতের ময়দানে এটা

নিয়ে আসবে এবং আল্লাহ তাআলার নিকট এই বিলম্বের কারণ দর্শাবে। আমি তোমার কাছ থেকে এটা এখন কিছুতেই নেবো না। (আবু দাউদ)

গনীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করার শাস্তি

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব রা. তাঁর বাবা থেকে এবং তিনি তাঁর বাবা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সা., হযরত আবু বকর রা. ও হযরত ওমর রা. গণীমতের সম্পদ থেকে আত্মসাৎকারীর সম্পদ জ্বালিয়ে ভস্ম করে দিতেন এবং তাকে প্রহারও করতেন। (আবু দাউদ)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; পূর্ববর্তী যামানার একজন নবী (হযরত ইউশা ইবনে নূন আ.) জিহাদে বের হওয়ার ইচ্ছা করলেন, জিহাদে রওয়ানা হওয়ার পূর্বে তিনি গোত্রের মাঝে ঘোষণা করলেন, আমার সাথে ঐ ব্যক্তি জিহাদে যাবে না যে নতুন বিবাহ করেছে এবং এখনো সে স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হয় নি। অথচ তার অন্তরে স্ত্রীর সাথে মিলিত হওয়ার ইচ্ছা রয়েছে।

আমার সাথে যেন ঐ ব্যক্তি জিহাদে বের না হয় যে নতুন ঘর নির্মাণ করেছে কিন্তু এখন পর্যন্তও তাতে ছাদ দিতে পারেনি।

আমার সাথে যেন ঐ ব্যক্তি জিহাদে বের না হয় যে গর্ভবতী ছাগল বা উট ক্রয় করেছে এবং সে ওইসব জন্তুর বাচ্চাপ্রসব হওয়ার অপেক্ষায় আছে। (এজন্য যে, এ ধরনের ব্যক্তি জিহাদে গেলে তখন তার মনে স্ত্রী, ঘর এবং বাচ্চা প্রসবের চিন্তা থাকবে।)

তারপর তিনি বাকি সাথীদেরকে নিয়ে জিহাদে বের হলেন। যখন ওই এলাকার নিকটবর্তী হলেন যেখানে তিনি জিহাদ করার ইচ্ছা পোষণ করলেন, তখন সেখানে আসরের নামাযের সময় হয়ে গিয়েছিলো। অতঃপর তিনি সূর্যকে লক্ষ্য করে বললেন, তুমি চলার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত আর আমি এই এলাকাকে জয় করার জন্য নির্দেশপ্রাপ্ত। হে আল্লাহ! তুমি সূর্যকে থামিয়ে দাও। সেমতে সূর্য থেমে গেলো। যুদ্ধ শেষে আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিজয় দান করলেন।

তারপর গনীমতের সম্পদ জমা করার পর ভস্ম করার জন্য আগুন আসলো। কিন্তু ওই আগুন গনীমতের মালকে ভস্ম করলো না। তা দেখে নবী তাঁর সাথীদেরকে বললেন, নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্য থেকে কেউ গনীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করেছে। তাই তা আগুনে ভস্ম হচ্ছে না। তখন নবী সা. তাদেরকে বললেন; প্রত্যেক গোত্রের একজন করে আমার সাথে হাত মিলাবে। তারপর সবাই যখন হাত মিলাতে শুরু করলো তখন একজনের

হাত নবীর হাতের সঙ্গে লেগে গেলো। তখন নবী বললেন; তোমার গোত্রের কেউ আত্মসাৎ করেছে। তখন সেই গোত্রের লোকেরা স্বর্ণের একটি টুকরো এনে দিলো যা ষাড়ের মাথার ন্যায় ছিলো। তা গনীমতের সম্পদে রাখা হলো এবং আগুন এসে তা ভস্ম করলো।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে যে, নবী করিম সা. বলেছেন; আমাদের পূর্বে অন্য কোনো উম্মতের জন্য গনীমতের সম্পদ বৈধ ছিলো না। আমরা দূর্বল ও অসহায় হওয়ায় আল্লাহ্ তাআলা আমাদের জন্য তা হালাল করেছেন।

ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ.-এর ন্যায়পরায়ণতা

হযরত মুগিরা ইবনে মুকসিম রহ. বর্ণনা করেন, ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ রহ. যখন খলিফা মনোনীত হলেন তখন তিনি মারওয়ান পরিবারের ছেলেদের একত্র করে বললেন; নবী করিম সা. সরকারী ভূমি নিজ মালিকানায় রাখতেন এবং সেখান থেকে প্রাপ্ত আয় পরিবার-পরিজন ও গরীব-মিসকিনদের জন্য খরচ করতেন।

সেখান থেকে বনু হাশেম গোত্রের ছোট বাচ্চাদের জন্য ও দরিদ্র নারী-পুরুষের বিবাহের জন্যও খরচ করতেন। তাদের সাথে উত্তম ব্যবহার করতেন। একবার হযরত ফাতেমা রা. নবী করিম সা.-এর কাছে এসে সরকারী জমি তাঁর নামে লিখে দেওয়ার আবেদন করলেন। তখন নবী করিম সা. তা প্রত্যাখ্যান করেন। এভাবেই নবী করিম সা.-এর জীবন চলছিল। আর এভাবেই তিনি দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছিলেন।

তারপর যখন হযরত আবু বকর রা. খলিফা হন তিনিও রাসূল সা.-এর সিদ্ধান্ত ও নীতির ওপর অটল থাকেন। (এখান থেকে প্রাপ্ত আয় রাসূল সা.-এর পরিবার-পরিজন ও বনু হাশেমের ছোট বাচ্চাদের জন্য এবং ছিন্নমূল নারী-পুরুষদের বিয়ের জন্য ব্যয় করতেন এবং তাদের সাথে ভালো আচরণ করতেন।) হযরত আবু বকর রা. আমৃত্যু উক্ত নীতির ওপর অবিচল ছিলেন।

তারপর যখন হযরত ওমর রা. খলিফা হন তিনিও হযরত নবী করিম সা. ও আবু বকর রা.-এর নীতির ওপর অটল থাকেন। এভাবে এক সময় ওমর রা.ও ইন্তেকাল করলেন।

তারপর মারওয়ান হযরত ওসমান রা.-এর রাষ্ট্রপরিচালনা কালে সরকারী জমি নিজের ও নিজের উত্তরসূরিদের জন্য প্রশাসক কর্তৃক প্রাপ্ত জমি হিসেবে লিখে নিলেন। সুতরাং ওই প্রশাসক কর্তৃক প্রাপ্ত জমি এখন আমি ওমর ইবনে আব্দুল আজিজ ইবনে মারওয়ানের ওপর ন্যাস্ত হলো। কিন্তু আমি মনে করছি, যে জিনিস স্বয়ং আল্লাহর রাসূল সা. নিজ কন্যা ফাতেমাকে দেন নি, তার যোগ্য

আমি হতে পারি না। সুতরাং আমি তোমাদেরকে আমার এই নিষ্পত্তিমূলক সাক্ষী বানাচ্ছি যে, আমি সরকারী সম্পত্তিকে ওই অবস্থায় ফিরিয়ে দিচ্ছি, যে অবস্থা নবী সা.-এর যুগে ছিলো এবং এখান থেকে ওই নিয়মেই ব্যয় করা হবে। আর সরকারী জমি কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি হবে না। (আবু দাউদ)

ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমানদের সালামের রীতি

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব রা. তাঁর বাবা থেকে, আর শুয়াইব তাঁর দাদা হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি বিধর্মীদের সাথে সাদৃশ্য রাখে সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তোমরা ইহুদী ও খৃস্টানদের সাথে সাদৃশ্য রাখবে না। ইহুদীদের সালাম হলো আঙুল দিয়ে ইশারা করা এবং খৃস্টানদের সালাম হলো হাত দ্বারা ইশারা করা। আর মুসলমানদের সালাম হলো 'আসসালামু আলাইকুম ওয়ারহমাতুল্লাহ' বলা।

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; যখন আল্লাহ রব্বুল আলামীন হযরত আদম আ.-কে সৃষ্টি করলেন এবং তাঁর শরীরে প্রাণসঞ্চার করলেন তখন তাঁর হাঁচি এলো। আল্লাহ তাআলার তাওফিক ও অনুমতিতে তিনি হাঁচি দেয়ার পর 'আলহামদুলিল্লাহ' বললেন। জবাবে আল্লাহ তাআলা বললেন; 'ইয়ারহামুকাল্লাহ' অর্থাৎ তোমার প্রতি আল্লাহ তাআলার রহমত বর্ষিত হোক।

তারপর আল্লাহ তাআলা বললেন, হে আদম! তুমি ফেরেশতাদের ঐ জামাআতের কাছে যাও, যারা ওখানে বসে আছে এবং গিয়ে বলো; 'আসসালামু আলাইকুম'। তখন হযরত আদম আ. ফেরেশতাদের নিকট গিয়ে সালাম দিলে ফেরেশতাগণ জবাবে বললেন, عليك السلام ورحمة الله তারপর আদম আ. পূর্বের জায়গায় ফিরে এলেন। যেখানে বসে আল্লাহর সাথে কথা হচ্ছিলো। তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, এই "السلام عليكم ورحمة الله" তোমার ও তোমার সন্তানাদির পরস্পর সালাম।

তখন আল্লাহ তাআলা নিজ উভয় কুদরতি হাত বন্ধ থাকা অবস্থায় আদম আ.-কে বললেন, আমার এ দুটো বন্ধ হাতের যেটি তোমার ইচ্ছা পছন্দ করো। আদম আ. বললেন; আমি আমার রবের ডান হাত পছন্দ করলাম। তবে আমার রবের দুটো হাতই বরকতময়। তখন আল্লাহ তাআলার এই হাত খুললেন এবং আদম আ. তাঁতে তাঁর মতো অসংখ্য প্রতিকৃতি দেখতে পেলেন। আদম আ. বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া আল্লাহ! এরা কারা?

আল্লাহ তাআলা বললেন. এরা তোমার সন্তান-সন্ততি। আদম আ. এটাও দেখতে পেলেন যে, প্রত্যেকের দুই চোখের মাঝে তাদের বয়স লেখা রয়েছে। তারপর আদম আ.-এর দৃষ্টি এমন এক মানুষের ওপর পড়লো যে সবচেয়ে বেশী উজ্জ্বল ছিলো। আদম আ. জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া আল্লাহ! এ কে? আল্লাহ তাআলা বললেন; তোমার সন্তান 'দাউদ'। আমি তাঁর বয়স নির্ধারণ করেছি চল্লিশ বছর। হযরত আদম আ. আরজ করলেন; ইয়া আল্লাহ! এর বয়স আরেকটু বাড়িয়ে দিন। আল্লাহ তাআলা বললেন; এটা ওই জিনিস যা আমি তার প্রাপ্ত অধিকারের সাথে লিখে ফেলেছি। আদম আ. বললেন, ইয়া আল্লাহ! আমি আমার বয়স থেকে ষাট বছর একে দিয়ে দিচ্ছি। আল্লাহ তাআলা বললেন; তুমি জানো আর তোমার কৃতকর্ম জানে।

নবী করিম সা. বললেন, এরপর হযরত আদম আ. জান্নাতে ছিলেন যতদিন আল্লাহ চেয়েছেন। অতঃপর এক সময় জান্নাত থেকে পৃথিবীতে নামিয়ে দেয়া হলো। আদম আ. সবসময়ই বয়সের হিসাব রাখতেন। যখন তাঁর বয়স নয়শ' চল্লিশ হলো তখন মালাকুল মওত তাঁর জান কবজ করার জন্য আসলেন। আদম আ. বললেন, তুমি অনেক আগে চলে এসেছো। আমার বয়স তো সৃষ্টির সময় এক হাজার নির্ধারণ করা হয়েছিলো। ফেরেশতা বললেন, আপনি ঠিক বলেছেন। আপনার বয়স এক হাজার নির্ধারণ করা হয়েছিলো। কিন্তু আপনি আপনার সন্তান 'দাউদ'কে সেখান থেকে ষাট বছর দিয়ে দিয়েছিলেন। তখন আদম আ. তা অস্বীকার করলেন। এ জন্যই আদম সন্তানও অস্বীকার করে। হযরত আদম আ. মৃত্যুর কথা ভুলে গিয়েছিলেন। তাই তাঁর সন্তানও ভুলে যায়। তারপর নবী করিম সা. বলেন, ওই দিন থেকেই লেখা ও সাক্ষ্য বানানোর আদেশ দেয়া হয়।

অধীনস্থদের তারবিয়াত ও সতর্কীকরণ

হযরত কালাদা ইবনে হাম্বল রা. বর্ণনা করেন, আমার মারফত সাফওয়ান ইবনে উমাইয়া নবী করিম সা.-এর জন্য দুধ, হরিণের বাচ্চা, শষা ইত্যাদি পাঠালেন। এ সময় নবী করিম সা. মক্কার উপকণ্ঠে মা'লা নামক স্থানে অবস্থান করছিলেন। সাফওয়ান রা. বলেন, আমি নবী করিম সা.-এর খেদমতে হাজির হলাম এবং ভেতরে প্রবেশকালে আমি নবী সা.-কে সালামও দেই নি এবং অনুমতিও গ্রহণ করি নি। সুতরাং নবী করিম সা. আমাকে বললেন, তুমি আবার দরজার বাইরে যাও এবং সেখানে দাঁড়িয়ে বলো, আসসালামু আলাইকুম, আমি কি ভিতরে আসতে পারি? (তিরমিযি, আবু দাউদ)

"লোকে বলে" এই কথাটি খারাপ

হযরত আবু মাসউদ আনসারী রা. বর্ণনা করেন, আমি আবু আব্দুল্লাহ রা.-কে জিজ্ঞেস করলাম; আপনি নবী করিম সা.-কে زَعَمُوْا "লোকে বলে" এ কথা বলে কথোপকথনকারীদের ব্যাপারে কী বলতে শুনেছেন? তিনি জবাব দিলেন; আমি নবী করিম সা.-কে বলতে শুনেছি, এটা মানুষের মন্দ কথা বলার মাধ্যম। (কারণ লোকজন এ জাতীয় কথা বলে প্রায় সময় মিথ্যা কথা বলে) (আবু দাউদ)

অতিরিক্ত কথা বলার পরিণাম

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি নানান ধরনের কথার ব্যবহার শেখে এই জন্য যে, সে ওই কথার দ্বারা মানুষের মন জয় করবে। আল্লাহ তাআলা কিয়ামত দিবসে তার ফরজ নফল কোনো আমলই গ্রহণ করবেন না। (আবু দাউদ)

যবান সংযত রাখুন

হযরত আবু যর রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি কাউকে কাফের বা আল্লাহর দুশমন বলে অভিহিত করে আর বাস্তবে সে এমন না হয় তাহলে এই বলা কথা তার নিজের দিকেই প্রত্যাবর্তন করে। (বুখারী, মুসলিম)

আগুনের দুই জিভ থেকে বাঁচো

হযরত আম্মার রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; দুনিয়াতে যে ব্যক্তি দু'মুখো কথা বলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের দুটো জিহ্বা দিবেন। (দারেমী)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন, কিয়ামতের দিন সেই ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট হবে, যে দুনিয়াতে ফেতনা সৃষ্টির জন্য দুই রকমের কথা বলতো। এক দলের কাছে এক রকম কথা বলতো, অন্য দলের কাছে অন্য রকম কথা বলতো। (বুখারী, মুসলিম)

আফসোস তোমার প্রতি

হযরত মিকদাদ ইবনে আসওয়াদ রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; যখন তোমরা প্রশংসাকারীকে প্রশংসা করতে দেখবে তখন তার মুখে মাটি নিক্ষেপ করবে। (অর্থাৎ তার মুখ বন্ধ করে দেবে এবং প্রশংসা থেকে তাকে বিরত রাখবে।) (মুসলিম)

হযরত আবু বকর রা. বর্ণনা করেন, একবার এক ব্যক্তি রাসূল সা.-এর সামনে একটু অতিরঞ্জিত করে একজন সম্পর্কে খুব প্রশংসা করছিলো। যার সম্পর্কে প্রশংসা করা হচ্ছিলো সে সামনেই ছিলো। রাসূল সা. তখন ঐ প্রশংসাকারীকে লক্ষ্য করে বললেন; আফসোস হয় তোমার ওপর! তুমি তোমার ভাইয়ের ঘাড় কেটে দিলে! রাসূল সা. এই কথা তিনবার বললেন। তারপর তিনি ইরশাদ করলেন; যদি কারো প্রশংসা করার প্রয়োজন হয় তাহলে বলো যে, আমি অমুকের ব্যাপারে এমন ধারণা পোষণ করি। আর আল্লাহ তাআলাই এ বিষয় সম্পর্কে পূর্ণ অবগত। আর তিনিই তার আমলের হিসাব নেবেন। যদি প্রশংসাকারী এই ধারণা রাখে যে, সে যে ব্যক্তির প্রশংসা করছে বাস্তবে সে এমনই এবং আল্লাহর ওপর বাধ্য করা হয় এভাবে কারো প্রশংসা করো না। অর্থাৎ পূর্ণ আস্থার সাথে কারো প্রশংসা করো না, নচেৎ আল্লাহকে আদেশ করা মনে হবে। (বুখারী, মুসলিম)

দুটো জিনিস জান্নাতে আর দুটো জিনিস জাহান্নামে পৌঁছায়

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; তোমরা কি জানো মানুষকে সাধারণত কোন জিনিসটি জান্নাতে প্রবেশ করায়? সেটা হলো তাকওয়া। অর্থাৎ আল্লাহ ভীতি ও উত্তম চরিত্র।

আর জানো কোন দুটো জিনিস মানুষকে সাধারণত জাহান্নামে প্রবেশ করায়? সেটা হলো দুটো মাংসের পিণ্ড। একটি হলো জিহ্বা আর অপরটি হলো লজ্জাস্থান। (তিরমিযি, ইবনে মাজা)

আক্ষেপ ওই ব্যক্তির জন্য

বাহনার ইবনে হাকীম তার বাবা হাকীম ইবনে মুয়াবিয়া থেকে এবং হাকীম বাহনার-এর দাদা হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা রা. থেকে বর্ণনা করেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; আফসোস ওই ব্যক্তির জন্য যে কথা বলার সময় (রসিকতা করে) মিথ্যা কথা বলে, যেন তার কথার দ্বারা মানুষকে হাসাতে পারে। (আহমাদ, তিরমিযি, আবু দাউদ, দারেমী)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি শুধু মানুষকে বিনোদন দেওয়ার উদ্দেশ্যেই কোনো কথা বলে সে তার এই কথা বলার কারণে আসমান ও জমিনের মাঝখানের যে দূরত্ব এরচেয়ে অধিক দূরত্বে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। নিশ্চয় মানুষ পায়ের তুলনায় জবান দ্বারাই অধিক পরিমাণে পদস্খলনের শিকার হয়। (বায়হাকী)

কোনো ব্যক্তি যদি কাউকে এমন কারণে লা'নত করে যার সে যোগ্য নয় তখন তা লানতকারীর দিকে ফিরে আসে।

হযরত আবু দারদা রা. হতে বর্ণিত, আমি রাসূল সা.-কে এই ইরশাদ করতে শুনেছি যে, যখন কোনো বান্দা কোনো জিনিসের (মানুষের ওপর বা অন্য কিছুর) প্রতি অভিশাপ দেয় তখন উক্ত অভিশাপ আকাশের দিকে গমন করে। তখন আকাশের দরজা ওই অভিশাপের কারণে বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর নিচের দিকে নামতে থাকে তখন জমিনের দরজাও বন্ধ করে দেয়া হয়। তারপর তা ডানে ও বায়ে ঘুরতে থাকে। এ অভিশাপ যখন কোথাও রাস্তা না পায় তখন ওই জিনিসের দিকে প্রত্যাবর্তন করে যার প্রতি অভিশাপ করা হয়েছে। যদি তা অভিশাপের যোগ্য হয়, তাহলে তা তার ওপর পতিত হয়, নচেৎ যে অভিশাপ দিয়েছে তার ওপর উক্ত অভিশাপ পতিত হয়। (আবু দাউদ)

হযরত ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, একদিন এক ব্যক্তির চাদর বাতাসে উড়িয়ে নিয়ে গেলো। সে ব্যক্তি বাতাসকে অভিশাপ দিলো। তখন নবী করিম সা. বললেন; বাতাসকে অভিশাপ দিয়ো না। কেননা সে তো হুকুম পালনকারী মাত্র। তার নিজের কোনো ক্ষমতা নেই। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই, যে ব্যক্তি এমন জিনিসকে অভিশাপ দেয় যা অভিশাপের যোগ্য নয় তাহলে উক্ত অভিশাপ তার দিকেই ফিরে আসে। (তিরমিযি,আবু দাউদ)

কারো বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে না

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; আমার সাহাবীদের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি কারো সম্বন্ধে আমার কাছে এমন কোনো অভিযোগ করবে না যার দ্বারা ওই ব্যক্তির মন্দ প্রকাশ পায়। অর্থাৎ আমার কাছে এসে কারো বিরুদ্ধে এভাবে বলবে না যে, অমুক ব্যক্তি এই খারাপ কাজটি করেছে, অথবা এই খারাপ কথাটি বলেছে, অথবা সে এই খারাপ কাজে লিপ্ত। কেননা আমি এটা পছন্দ করি যে, আমি যখন ঘর থেকে বের হয়ে তোমাদের কাছে আসি তখন যেন সবার জন্য আমার ভিতরটা পরিষ্কার থাকে। অর্থাৎ আমার অন্তরে তোমাদের কারো প্রতি অসন্তুষ্টি, রাগ ও ঘৃণা না জন্মায়। (আবু দাউদ)

গীবত সাগরকেও দূষিত করে দেয়

হযরত আয়েশা রা. বলেন, একদিন আমি নবী করিম সা.-এর নিকট গিয়ে বললাম, আপনার স্ত্রী সাদিয়্যা তো এমন এমন করেছে। সে তার মন মতো চলে। তখন নবী করিম সা. বললেন, তোমার মুখ থেকে এমন কথা বের হয়েছে যা সাগরের চেয়ে বেশী প্রবল। (আহমদ, তিরমিযি, আবু দাউদ)

কাউকে গুনাহের জন্য লজ্জা দেবে না

হযরত খালেদ ইবনে মা'দান রা. হযরত মুয়াবিয়া রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি নিজের মুসলমান ভাইকে কোনো গুনাহের জন্য লজ্জা দেয় (অর্থাৎ এমন গুনাহ যার ওপর অনুতপ্ত হয়ে সে তওবা করেছে) তাহলে ওই ব্যক্তি মৃত্যুর আগে কোনো না কোনোভাবে উক্ত গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়বে। (তিরমিযি)

কারো কষ্টে খুশি হবে না

হযরত ওয়াসেলা রা. বলেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন; নিজের মুসলমান ভাইয়ের বিপদে কখনো খুশি হবে না। হতে পারে তোমার অনর্থক খুশির কারণে আল্লাহ তাআলা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তার প্রতি রহমত বর্ষণ করবেন। অর্থাৎ তাকে উক্ত কষ্ট ও বিপদ থেকে মুক্তি দেবেন এবং তোমাকে ওই বিপদে নিপতিত করবেন। (তিরমিযি)

ফাসেকের প্রশংসায় আরশ কেঁপে ওঠে

হযরত আনাস রা. বলেন, নবী করিম সা. বলেছেন, যখন ফাসেকের (গুনাহে লিপ্ত ব্যক্তি) প্রশংসা করা হয়। তখন আল্লাহ তাআলা ওই ব্যক্তির ওপর রাগান্বিত হন। আর তার প্রশংসার কারণে আরশ কেঁপে ওঠে।

সাতটি অমূল্য উপদেশ

হযরত আবু যর রা. বলেন, একদিন আমি রাসূল সা.-এর খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাকে কিছু নসিহত করুন। তখন রাসূল সা. বললেন;-

১. আমি তোমাকে তাকওয়া ও আল্লাহভীতির নসীহত করছি। কেননা তাকওয়া তোমার দীনি ও দুনিয়াবী সমস্ত কর্মকাণ্ডকে অনেক বেশী শোভা বর্ধন করবে।

২. কুরআন মাজিদের তেলাওয়াত ও আল্লাহর জিকিরকে আবশ্যক মনে করবে। কেননা এ দুটি কাজ তোমার জন্য আসমানবাসীদের নিকট আলোচনা ও জমিনে নূরের কারণ হবে।

৩. অধিক পরিমাণে চুপ থাকা নিজের ওপর আবশ্যক করে নাও। কেননা চুপ থাকা শয়তানকে বিতাড়িত করে ও দীনি কর্মকাণ্ডে তোমার সাহায্যকারী হয়।

৪. অধিক হাসা থেকে বিরত থাকো। কেননা অধিক হাসার কারণে অন্তর মরে যায় ও চেহারার সৌন্দর্য হারিয়ে যায়।

৫. সত্য বলো। যদিও তিক্ত হয়।

৬. আল্লাহ তাআলার দীন ও তাঁর বার্তা প্রচার করতে কোনো নিন্দুকের নিন্দাকে ভয় করবে না।

৭. অপরের দোষ তালাশ করো না, বরং নিজের ভিতরে তা সন্ধান করো। অর্থাৎ অপরের দোষ চোখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভিতর তা খুঁজে বের করার চেষ্টা করো। অপরের দোষ বর্ণনা করে কী লাভ? (বায়হাকী)

গীবতের কাফফারা আদায় করো

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন যে, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন; গীবতের কিছু কাফফারা হলো, ওই ব্যক্তির জন্য মাগফেরাত ও ক্ষমার দোয়া চাও, তুমি যার গীবত করেছো। আর তা এভাবে চাও,

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا

হে আল্লাহ! আপনি আমাকে ও যার গীবত করেছি তাকে ক্ষমা করে দিন। (বায়হাকী)

ওয়াদা রক্ষার একটি বিরল ঘটনা

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবি হামসা রা. বলেন, রাসূল সা. নবুয়তপ্রাপ্তির পূর্বে একটি জিনিস ক্রয় করার পর কিছু মূল্য আমার যিম্মায় বাকী ছিলো। আমি ওয়াদা করলাম যে, বাকি টাকা নিয়ে আমি এই স্থানে আপনার কাছে আসবো। কিন্তু আমি ওয়াদার কথা ভুলে গেলাম। তিনদিন পর আমার ওয়াদার কথা মনে হলে আমি উক্ত স্থানে গিয়ে বিস্মিত হলাম! দেখলাম, নবী করিম সা. সে জায়গায়ই বসে আছেন। আমাকে দেখে তিনি শুধু এতটুকু বললেন; তুমি তো আমাকে কষ্টের মধ্যে ফেলে দিলে! আমি তিন দিন যাবৎ এই জায়গায় তোমার অপেক্ষায় বসে আছি। (আবু দাউদ)

সুন্দর জীবন যাপনের দৃষ্টান্ত

হযরত নোমান ইবনে বশির রা. বলেন, হযরত আবু বকর রা. একদিন নবী করিম সা.-এর ঘরে এসে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। এমন সময় ভিতরে হযরত আয়েশা রা. উঁচু আওয়াজে কথা বলছিলেন। আবু বকর রা. ঘরে প্রবেশ করে আয়েশা রা.-কে প্রহার করতে উদ্যত হলেন এবং রাগত স্বরে বললেন, খবরদার! সামনে কখনো যেন তোমাকে নবী করিম সা.-এর সাথে উঁচু আওয়াজে কথা বলতে না শুনি।

এদিকে নবী করিম সা. তাঁকে প্রহার করা থেকে বিরত রাখলেন। তখন আবু বকর রা. রাগত অবস্থায় ঘর থেকে বের হয়ে গেলেন। তিনি ঘর থেকে

চলে যাওয়ার পর নবী করিম সা. আয়েশা রা.-কে বললেন; দেখলে! আমি তোমাকে কিভাবে তাঁর হাত থেকে রক্ষা করলাম?

আয়েশা রা. বলেন; এ ঘটনার পর বেশ কয়েকদিন আবু বকর রা. আর নবী করিম সা.-এর ঘরে আসেন নি।

তারপর একদিন তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাইলেন। তিনি ভিতরে এসে দেখলেন আমাদের দু'জনের মধ্যে আপোষ হয়ে গেছে। তখন আমাদের দুইজনকে লক্ষ্য করে বললেন; আপনাদের এই আনন্দঘণ পরিবেশে আমাকেও সঙ্গী করে নিন। যেভাবে ঝগড়ার সময় যেভাবে সঙ্গী করে নিয়েছিলেন! নবী করিম সা. বললেন; অবশ্যই, আমরা এমনটাই করলাম। অবশ্যই আমরা এমনই করেছি। (অর্থাৎ আপনাকে আমাদের মিমাংসার সঙ্গী করে নিলাম।) (আবু দাউদ)

মা বাবার হক আদায়ের ফজিলত

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেছেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি বাবা-মার সেবারত অবস্থায় সকাল করলো এবং এর মাধ্যমে আল্লাহর নির্দেশ পালন করলো, সে ওই অবস্থায় সকাল করলো যে, তার জন্য জান্নাতের দুটি দরজা খোলা আছে। আর যদি তার মা-বাবার যে কোনো একজন জীবিত থাকে আর সে তার সেবা-যত্ন করে তাহলে তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খোলা হয়।

আর যে ব্যক্তি এই অবস্থায় সকাল করলো যে, সে তার মা-বাবার হক আদায় করলো না, আল্লাহ তাআলার নাফরমানি করলো (অর্থাৎ মা-বাবার হক আদায় করা আল্লাহর আদেশ, সে এই আদেশ মানলো না) সে মূলত এই অবস্থায় সকাল করলো যে, তার জন্য জাহান্নামের দুটো দরজা খোলা আছে। আর যদি তার মা-বাবার যে কোনো একজন জীবিত থাকে আর সে তার খেদমত না করার মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ অমান্য করে তাহলে তার জন্য জাহান্নামের একটি দরজা খোলা হয়।

এই ইরশাদ শুনে একজন আরজ করলো, যদি মা-বাবা সন্তানের ওপর অত্যাচার করে? নবী করিম সা. বললেন; যদিও মা-বাবা সন্তানের ওপর অত্যাচার করে। এভাবে তিনবার একথাটি বললেন।

মুসলমান ভাইয়ের হক

হযরত ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; এক মুসলমান অপর মুসলমানের দীনি ভাই। তার ওপর অত্যাচার করবে না আর তাকে শত্রুর হাতে তুলে দেবে না। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ রব্বুল আলামীন তার প্রয়োজন পুরা করে দিবেন। যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের চিন্তা দূর করে দিবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন বড় পেরেশানী থেকে তাকে মুক্তি দিবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের দোষ লুকিয়ে রাখবে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তার দোষ লুকিয়ে রাখবেন। (বুখারী, মুসলিম)

কারা জান্নাতী হবে

হযরত আয়াজ ইবনে হাম্মার রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; তিন ধরনের মানুষ জান্নাতী হবে। যথা-

১. ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠাকারী এবং সবার ওপর অনুগ্রহকারী শাসক। যাকে ভালো কাজ করার তৌফিক দেয়া হয়েছে।

২. যে ব্যক্তি ছোটদের স্নেহ করে, বড়দের শ্রদ্ধা করে এবং প্রতিবেশী ও মুসলমানদের প্রতি দয়ালু ও আন্তরিক হয়।

৩. যে ব্যক্তি নাজায়েয জিনিস থেকে বেঁচে থাকে। কারো সামনে হাত প্রসারিত করে না। অর্থাৎ অভাবগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও নাজায়েয বিষয় থেকে বেঁচে থাকে এবং আল্লাহ ছাড়া আর কারো সামনে হাত পাতে না।

পাঁচ শ্রেণীর মানুষ জাহান্নামী

১. ঐ দুর্বল ব্যক্তি যে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকতে পারে না এবং মানুষের সাহায্যের প্রতি মুখাপেক্ষী থাকে। স্ত্রীর সন্ধান করে না এবং সম্পদ উপার্জনের চিন্তা ও চেষ্টা করে না। অন্যের অনুগ্রহে জীবন যাপন করে ও খারাপ কাজে লিপ্ত থাকে।

২. ওই আত্মসাৎকারী ব্যক্তি যে গোপন জিনিস খুঁজে বের করে এবং তা আত্মসাৎ করে। চাই আত্মসাৎকৃত বস্তু সাধারণই হোক না কেনো।

৩. সকাল-সন্ধ্যা যে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার ফন্দি-ফিকিরে থাকে।

৪. কৃপন ও মিথ্যুক। (চতুর্থ প্রকারটি বর্ণনাকারীর ঠিক মনে নেই, তাই বলেছেন ; এটি হতে পারে।)

৫. খারাপ চরিত্র ও বাজে কথায় অভ্যস্ত ব্যক্তি। (মুসলিম)

প্রতিবেশীকে কষ্ট দানকারী পূর্ণ মুমিন নয়

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, রাসূল সা. ইরশাদ করেছেন; আল্লাহর কসম! সে পূর্ণ ঈমানদার নয়! আল্লাহর কসম! সে পূর্ণ ঈমানদার নয়! আল্লাহর কসম! সে পূর্ণ ঈমানদার নয়। যখন নবী করিম সা. এ কথা বারবার উচ্চারণ করছিলেন, কিন্তু কে সে ব্যক্তি তা স্পষ্ট করছিলেন না তখন সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন; সে কে ইয়া রাসূলাল্লাহ! নবী করিম সা. বললেন, সে ঐ ব্যক্তি যার অনিষ্টতা থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ ও নিশ্চিত নয়। (বুখারী, মুসলিম)

জান্নাতে নবী সা.-এর প্রতিবেশী হওয়ার উপায়

হযরত আবু উমামা রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহকে রাজি-খুশি করার জন্য কোনো এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দেয় তার জন্য প্রতিটি চুলের বিনিময়ে (যেখানে হাত বুলিয়েছে) একটি করে নেকী লিখে দেওয়া হয়। আরো সুসংবাদ হলো, যে ব্যক্তি এমন এতিম সন্তানের লালন-পালন করবে, উত্তম শিক্ষা দেবে ও ভালো আচরণ করবে সে এবং আমি জান্নাতে এইভাবে থাকবো, একথা বলে রাসূল সা. স্বীয় শাহাদাত ও মধ্যমা আঙ্গুল মিলিত করে দেখালেন। যেভাবে এই দুটি আঙ্গুল কাছাকাছি, তদ্রূপ আমি ও সেই ব্যক্তি জান্নাতে পরস্পর কাছাকাছি থাকবো। (আহমদ, তিরমিজি)

যে কাজ করলে জান্নাত আবশ্যক হয়

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তি তার খাবারের মধ্যে কোনো এতিমকে শরীক রাখে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাত আবশ্যক করে দেন। (তবে যদি সে এমন কোনো গুনাহ করে যা ক্ষমার অযোগ্য তাহলে আবশ্যক হবে না)

আর যে ব্যক্তি তিন কন্যাসন্তান অথবা তিন বোনকে লালন-পালন করে, তাদেরকে উত্তম শিক্ষা দান করে, তাদের প্রতি স্নেহ-মমতার আচরণ করে এবং তাদের জীবিকার ব্যবস্থা করে দেয় তার জন্যও আল্লাহ তাআলা জান্নাত আবশ্যক করে দেন। সাহাবায়ে কেরাম রা. আরজ করলেন; যদি দুইজনকে এভাবে লালন-পালন করে তাহলেও কি এই প্রতিদান পাওয়া যাবে? রাসূল সা. ইরশাদ করলেন; হ্যাঁ, দুইজনকে লালন-পালন করলেও এই প্রতিদান পাওয়া যাবে। বর্ণনাকারী বলেন; যদি সাহাবায়ে কেরাম একজনের ব্যাপারেও এই প্রশ্ন করতেন তাহলেও নবী করিম সা. এমন উত্তরই দিতেন। তারপর নবী করিম সা. বললেন, আল্লাহ তাআলা যার দুটি প্রিয় জিনিস নিয়ে নিয়েছেন

তার জন্যও জান্নাত ওয়াজীব। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন; ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুটি প্রিয় জিনিস কী? নবী করিম সা. বললেন; দুটি চোখ।

বিধবা নারী সন্তানের প্রতি মনোযোগী হবে

হযরত আউফ ইবনে মালেক আশজায়ী রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেন; আমি এবং ওই মহিলা যার চোখের নিচে কালো রেখা বা দাগ পড়েছে, কিয়ামতের দিন আমার ও তার অবস্থান এমন হবে অর্থাৎ কাছাকাছি।

এই হাদীসের বর্ণনাকারী ইয়াযিদ ইবনে যারী' রহ. এই কথা বলার পর শাহাদাত আঙ্গুল ও মধ্যমা আঙ্গুল একত্র করে ইঙ্গিত করলেন; যেভাবে এই দুটি আঙ্গুল পরস্পর কাছাকাছি; অনুরূপ কিয়ামতের দিন রাসূল সা. ও বিধবা মহিলা এমন কাছাকাছি থাকবে। আর চোখের নিচে কালো দাগ পড়ার দ্বারা উদ্দেশ্য হলো (বর্ণনাকারী বলেন) ঐ মহিলা যার স্বামী ইন্তেকাল করেছে কিংবা তালাক দেয়ার কারণে বিধবা হয়েছে কিংবা নিজের এতিম সন্তানদের স্বার্থে বিবাহ করা থেকে বিরত থাকা অবস্থায় সন্তানরা পৃথক হয়েছে (অর্থাৎ উপার্জন সক্ষম হয়েছে) বা মারা গেছে। (আবু দাউদ)

প্রতিবেশী ভালো বললেই তুমি ভালো

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, এক ব্যক্তি নবী করিম সা.-এর নিকট এসে আরজ করলো; ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কিভাবে বুঝবো আমি ভালো না মন্দ? নবী করিম সা. ইরশাদ করলেন; যখন তোমার প্রতিবেশীকে বলতে শুনবে যে তুমি ভালো, তখন বুঝবে তুমি নিঃসন্দেহে ভালো মানুষ। আর যখন তোমার প্রতিবেশীদেরকে বলতে শুনবে তুমি খারাপ, তাহলে বুঝে নেবে তুমি নিঃসন্দেহে খারাপ মানুষ। (ইবনে মাজা)

অন্যের প্রয়োজন পূরণ করার ফযিলত

হযরত আনাস রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; যে বিপদগ্রস্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করে আল্লাহ তাআলা তার জন্য তিহাত্তরটি প্রতিদান নির্ধারণ করেন। তন্মধ্যে একটি প্রতিদানই তার (দুনিয়া ও আখেরাতের) সমস্ত বিষয়ের সমাধান করবে। আর অবশিষ্ট বাহাত্তরটি প্রতিদান কিয়ামতের দিন তার উন্নত মর্যাদার কারণ হবে। (বায়হাকী)

যা করলে সত্তরহাজার ফেরেশতা সঙ্গ দেয়

হযরত আবু রাজিন রহ. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; আমি কি তোমাকে দীনের মূল বিষয় বলে দেবো না, যার দ্বারা তুমি উভয় জাহানের কল্যাণ অর্জন করতে পারো।

অতঃপর রাসূল সা. বললেন–

১. জিকিরকারীদের মজলিসে অবশ্যই বসবে। (তাহলে তোমারও আল্লাহর জিকিরের সৌভাগ্য অর্জন হবে)

২. যখন তুমি একাকী থাকো তখন যতটুকু সম্ভব আল্লাহর জিকির দ্বারা স্বীয় জিহ্বা ব্যস্ত রাখো। অর্থাৎ লোকালয়ে হোক বা নির্জনে সর্বদা আল্লাহর জিকিরে ব্যস্ত থাকো।

৩. কাউকে ভালোবাসলে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য বাসো।

৪. ঈর্ষা পোষণ করলে তাও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করো।

এরপর নবী করিম সা. বললেন, আবু রাজিন! তুমি কি জানো! যখন কোনো ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশে ঘর থেকে বের হয় তখন তার পেছনে সত্তর হাজার ফেরেশতা চলতে শুরু করে এবং তার জন্য দোয়া ও ইস্তেগফার করতে থাকে এবং বলে, হে আমাদের রব! আপনার এই বান্দা শুধু আপনার রাজি-খুশির জন্য তার মুসলমান ভাইয়ের সাক্ষাতের উদ্দেশে বের হয়েছে। অতএব তাকে আপনি স্বীয় রহমত ও মাগফেরাতের ছায়াতলে আশ্রয় দিন। যদি তোমরা এ কাজটি করতে পারো তাহলে অবশ্যই করবে। (বায়হাকী)

সাতটি বদ অভ্যাস সমাজ নষ্ট করে

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন;

১. কারো সম্বন্ধে খারাপ ধারণা পোষণ করা থেকে বিরত থাকো। কেননা এটা নিকৃষ্ট মিথ্যা।

২. কারো অবস্থা অনুসন্ধানে লিপ্ত হয়ো না।

৩. কারো দোষ তালাশ করবে না।

৪. কোনো কিছু সুদের শর্তে ক্রয় করতে সম্মত হয়ো না।

৫. পরস্পর হিংসা করবে না।

৬. পরস্পর ঈর্ষা করবে না।

৭. পরস্পর গীবত করবে না। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ও পরস্পরে ভাই ভাই সম্পর্ক রাখবে।

বিদ্বেষ রাখবে না

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার জান্নাতের সদর দরজা খোলা হয় এবং যারা আল্লাহর

সাথে কাউকে শরীক করে নি এমন প্রত্যেক মুসলমানকে ক্ষমা করা হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি স্বীয় মুসলমান ভাইয়ের সাথে বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ করে, তাদের সম্বন্ধে ফেরেশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়। যাতে করে পরস্পর মিমাংসা করে নিতে পারে। (মুসলিম)

আল্লাহ্‌র দরবারে আমলনামা পেশ করা হয়

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; প্রতি সপ্তাহে সোম ও বৃহস্পতিবার আল্লাহর দরবারে বান্দার আমলনামা পেশ করা হয়। তখন প্রত্যেক মুমিন বান্দাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের প্রতি শত্রুতা ও বিদ্বেষ পোষণ করে তার ব্যাপারে ফেরেশতাদেরকে আদেশ দেওয়া হয় যেন তাদেরকে সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে করে পরস্পর মিলমিশ করে নিতে পারে এবং পূর্বের শত্রুতা থেকে ফিরে আসে। (মুসলিম)

সম্পর্ক ছিন্ন করা ও হত্যা করা সমান গুনাহ

হযরত খারাশ আবু সালামী রা. হতে বর্ণিত, তিনি নবী করিম সা.-কে এ কথা বলতে শুনেছেন; যে ব্যক্তি রাগ করে নিজের মুসলমান ভাইয়ের সাথে এক বছর পর্যন্ত সম্পর্ক ছিন্ন রাখবে, সে যেন তাকে হত্যা করলো। (অর্থাৎ দীর্ঘদিন সম্পর্ক ছিন্ন রাখার গুনাহ কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করার নামান্তর। (আবু দাউদ)

ঝগড়া মীমাংসা করার ফযিলত

হযরত আবু দারদা রা. ইরশাদ করেন, একদিন নবী করিম সা. ইরশাদ করলেন; আমি কি তোমাদেরকে এমন একটি আমলের কথা বলে দেবো না! যার সওয়াব নফল রোযা, নফল সদকা ও নফল নামায থেকেও অনেক বেশী? আবু দারদা রা. বলেন; আমরা আরজ করলাম; অবশ্যই বলুন। তখন নবী করিম সা. ইরশাদ করলেন; পরস্পর শত্রুতা পোষণকারী দুই ব্যক্তির মাঝে মীমাংসা করে দেওয়া। পরস্পর বিবাদ সৃষ্টি করা এমন স্বভাব যা দীনকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। (তিরমিযি, আবু দাউদ)

ঈমান চলে যাওয়ার আলামত

হযরত ইবনে ওমর রা. বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; লজ্জা ও ঈমান একে অপরের সাথে অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে জড়িত। তাই যখন দুটোর যে কোনো একটি ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন অপরটিও উঠিয়ে নেয়া হয়। (অর্থাৎ

যখন কোনো মুমিন থেকে লজ্জা ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন ঈমানও বিদায় নেয়) হযরত ইবনে আব্বাস রা.-এর বর্ণনায় এমন আছে, যখন দুটির কোনো একটি ছিনিয়ে নেয়া হয় তখন দ্বিতীয়টি পেছনে রওনা হয়। (বায়হাকী)

তিনটি বিষয় লক্ষণীয়

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, একদিন নবী করিম সা. বসা ছিলেন। এক লোক হযরত আবু বকর রা.-কে বাজে কথা বলতে শুরু করলো। হুযুর সা. তার কথা শুনে অবাক হলেন এবং হাসলেন। যখন সে ব্যক্তি খুব বেশী বাজে বকছিল তখন হযরত আবু বকর রা. কিছু কথার উত্তর দিলেন, তখন নবী করিম সা. অসন্তুষ্ট হলেন এবং সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন।

আবু বকর রা.ও নবী সা.-এর পেছনে পেছনে গেলেন এবং রাসূলের খেদমতে হাজির হয়ে আরজ করলেন; ইয়া রাসূলাল্লাহ! যখন ওই ব্যক্তি আমাকে বাজে কথা বলছিল, তখন আপনি সেখানে বসা ছিলেন, কিন্তু যখন আমি কিছু কথার উত্তর দিলাম তখন আপনি অসন্তুষ্ট হলেন এবং সেখান থেকে উঠে চলে এলেন।

নবী করিম সা. বললেন; তোমার সাথে একজন ফেরেশতা ছিলেন। যিনি তোমার পক্ষ থেকে উত্তর দিচ্ছিলেন; কিন্তু যখন তুমি নিজেই তার কথার উত্তর দিলে তখন শয়তান লাফ দিয়ে মধ্যখানে চলে এলো। তাই আমি সেখান থেকে উঠে চলে এলাম। এরপর নবী করিম সা. ইরশাদ করলেন; আবু বকর! তিনটি কথা শুনে রাখো, তিনটি কথাই পরম সত্য।

১. যে ব্যক্তির ওপর কেউ অত্যাচার করলো আর সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য অত্যাচার চুপচাপ সহ্য করলো আল্লাহ তাআলা ওই অত্যাচার সহ্য করার কারণে তাকে পরিপূর্ণ সাহায্য করেন।

২. যে ব্যক্তি দান-দক্ষিণার হাত বাড়িয়ে দেয় এবং অভাবীদের সাথে উত্তম আচরণ করে আল্লাহ তাআলা তার সম্পদ বৃদ্ধি করেন।

৩. যে ব্যক্তি দরিদ্রতার হাত বাড়িয়ে দেয় এ উদ্দেশ্যে যে, যেন এর দ্বারা নিজের সম্পদ বৃদ্ধি পায়। তাহলে আল্লাহ তাআলাও তার সম্পদ কমিয়ে দেন। (আহমদ)

অন্যকে তুচ্ছ মনে করা অহংকার

হযরত হারেসা ইবনে ওয়াহাব রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; আমি কি তোমাদেরকে বলে দেবো না জান্নাতী কারা! শোনো! প্রত্যেক ওই ব্যক্তি জান্নাতী যাকে মানুষ দূর্বল ও তুচ্ছ মনে করে এবং (তার দূর্বলতা ও

অসহায়ত্বের কারণে তার সাথে অহংকার ও নিপীড়নমূলক আচরণ করে। কিন্তু ওই অসহায় ব্যক্তি আল্লাহর কাছে উঁচু মর্যাদার অধিকারী হয়) আর সে যদি আল্লাহর ওপর ভরসা করে কোনো কথার কসম করে বসে তখন আল্লাহ তাআলা তার কসম সত্য করে দেন।

আমি কি তোমাদেরকে ওই লোকদের কথা বলে দেবো না যারা জাহান্নামী? শোনো! প্রত্যেক ওই ব্যক্তি জাহান্নামী যারা ঝগড়াটে, কঠোর মেজাজের অধিকারী এবং অহংকার ও আত্মম্ভরিতার কারণে বাস্তবতাকে অস্বীকার করে। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; যে ব্যক্তির অন্তরে বিন্দু পরিমাণ অহংকার থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না। এ কথা শুনে এক ব্যক্তি আরজ করলো, কেউ যদি মনে করে তার পোশাক সুন্দর হবে, জুতা উন্নত হবে এবং সে তার পছন্দমতো সুন্দর পোশাক পরবে তবুও কি সে অহংকারী হবে? নবী করিম সা. ইরশাদ করলেন; আল্লাহ তাআলা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। অহংকার হলো, বাস্তবতা অস্বীকার করা আর মানুষকে তুচ্ছ মনে করা। (মুসলিম)

সীমাতিরিক্ত অহংকারের পরিণাম

হযরত সালামা ইবনে আকওয়া রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; কিছু মানুষ নিজের আজ্ঞাকে উন্নত করতে থাকে। (অর্থাৎ এতোটা অহংকার করে যে,) তার নাম অত্যাচারী ও অহংকারীর তালিকায় লিখে দেয়া হয়। তারপর যে বিপদ ও সংকট ওই আত্মম্ভরিতার কারণে আসে, সেটা ওই ব্যক্তিকেও গ্রাস করে। (তিরমিযি)

হযরত আমর ইবনে শুয়াইব তাঁর বাবা থেকে, তিনি তার বাবা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী করিম সা.-কে একথা বলতে শুনেছেন; কিয়ামতের দিন অহংকারী ব্যক্তিকে ছোট পিপীলিকার মতো ক্ষুদ্র আকারের মানুষের আকৃতিতে একত্রিত করা হবে। (অর্থাৎ তাদের আকৃতি মানুষের মতোই থাকবে কিন্তু শরীর পিপীলিকার মতো ছোট হবে) এবং চতুর্দিক থেকে লাঞ্ছনা ও অপদস্থতা তাকে সম্পূর্ণরূপে বেষ্টন করে নেবে। তারপর তাদেরকে জাহান্নামের এক কয়েদখানার দিকে (যার নাম হবে বুলিস) হাঁকিয়ে নেওয়া হবে। সেখানে তাদের ওপর জাহান্নামের উত্তাপ ছেয়ে যাবে এবং জাহান্নামে তাদেরকে তাদের শরীর থেকে নির্গত পুঁজ পান করানো হবে। (তিরমিযি)

নিকৃষ্ট ব্যক্তি

হযরত আসমা বিনতে উমাইস রা. বলেন, আমি নবী করিম সা.-কে এই ইরশাদ করতে শুনেছি—

১. নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে অন্যের চেয়ে উত্তম মনে করে, আল্লাহর বড়ত্ব ও শান ভুলে যায় এবং অহংকার করে।

২. নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে যুলুম ও অত্যাচার করে এবং তা সীমা ছাড়িয়ে যায়। আল্লাহর শক্তিমত্তাকে ভুলে যায়।

৩. নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে দীনদারী ভুলে যায়। দুনিয়াদারীতে ব্যস্ত থাকে এবং সে কবর ও মাটির সাথে মিশে গলে পঁচে যাওয়া শরীরের কথা ভুলে যায়। (অর্থাৎ সে তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেনি যে, কত ধরনের মানুষকে হাজার মণ মাটির নিচে দাফন করে দেয়া হয়েছে। আর তাদের শরীর কীট-পতঙ্গের খাবারে পরিণত হয়েছে।

৪. নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজগতা সৃষ্টি করে এবং সীমালঙ্ঘন করে। আর নিজের প্রথম অবস্থার কথা ভুলে যায়। (অর্থাৎ না তার একথা স্মরণ আছে যে, সে কত নিকৃষ্ট জিনিস থেকে সৃষ্টি হয়েছে এবং প্রথম অবস্থায় সে কেমন অসহায় ও অক্ষম ছিলো। আর না একথা স্মরণ আছে যে, আমিও একদিন মাটির সাথে মিশে যাবো।)

৫. নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে দীনকে পুঁজি করে দুনিয়া অর্জন করে, (অর্থাৎ দুনিয়া উপার্জনের জন্য সে দীনি বিষয়-কে মাধ্যম বানায়। বুযুর্গদের বেশভূষা ধারণ করে দুনিয়াদারদের ধোঁকা দেয় এবং সম্পদ-খ্যাতি অর্জনের নেশায় লিপ্ত হয়।)

৬. নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে সন্দেহে লিপ্ত হয়ে দীনকে বিনষ্ট করে দেয়।

৭. নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহকে ছেড়ে দুনিয়া ও দুনিয়াদার দের থেকে কিছু পাওয়ার লোভ ও আকাঙ্ক্ষা করে এবং লোভ-লালসা তাকে দুনিয়াদারদের দরজায় দাঁড় করায়।

৮. নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যাকে মনের ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করে দেয়।

৯. নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যাকে দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ, দুনিয়ার সম্পদ অর্জনের লোভ এবং অঢেল ধন-সম্পদের লিপ্সা তাকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করে। (তিরমিযি, বায়হাকী)

ক্রোধ ঈমান নষ্ট করে

হযরত বাহনুর ইবনে হাকীম তাঁর বাবা থেকে এবং তিনি বাহনুর-এর দাদা হযরত মুয়াবিয়া ইবনে হায়দা কুশাইরী রা. থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; নিঃসন্দেহে রাগ ঈমান নষ্ট করে দেয় যেমনিভাবে ভীমরুল মধু নষ্ট করে। (বায়হাকী)

জালেমদের আয়ু সাধারণত দীর্ঘ হয়

হযরত আবু মূসা আশআরী রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা অত্যাচারীদেরকে অবকাশ দেন। অর্থাৎ দুনিয়ায় তাদেরকে দীর্ঘ আয়ু দেওয়া হয়। (যেন তারা অত্যাচার করতে থাকে এবং আখেরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হয়) তারপর নবী করিম সা. প্রমাণ স্বরূপ এই আয়াত তেলাওয়াত করলেন;

وَكَذٰلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ اِذْ أَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ أَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ.

অর্থাৎ আপনার রবের পাকড়াও এমনই, যখন তিনি কোনো জনপদকে পাকড়াও করেন এমন অবস্থায় যে তারা জুলুমকারী। নিশ্চয়ই তাঁর পাকড়াও অনেক কষ্টদায়ক ও কঠিন। (বুখারী, মুসলিম)

মন্দের প্রতিদান ভালোর দ্বারা দেওয়া উচিত

হযরত হুযায়ফা রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; তোমরা 'ইম্মাআহ' হয়ো না। অর্থাৎ এমনটা বলবে না যে, যদি সে আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে তাহলে আমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করবো। যদি সে আমার ওপর জুলুম করে তাহলে আমিও তার ওপর জুলুম করবো। বরং এ নীতির ওপর অটল থাকো যে, যদি সে আমার সাথে ভালো ব্যবহার করে তাহলে আমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করবো। আর যদি সে আমার ওপর জুলুম করে তবুও আমি তার সাথে ভালো ব্যবহার করবো। (তিরমিযি)

হযরত আবু উমামা রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; কিয়ামতের দিন মর্যাদার দিক থেকে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে হবে, যে অন্যের দুনিয়া অগ্রগতি করে দেয়ার লক্ষ্যে নিজের আখেরাত ধ্বংস করে ফেলে। (ইবনে মাজাহ)

জালেমকে মদদকারী পূর্ণ ঈমান থেকে বঞ্চিত

হযরত আউস ইবনে শারজিল রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সা.-কে এই ইরশাদ করতে শুনেছি; যে ব্যক্তি কোনো অত্যাচারীর সমর্থনের জন্য তার সঙ্গ

দেয়, (অর্থাৎ তার সাহায্য করে) আর সে এটা জানে (আমি যার সঙ্গ দিচ্ছি সে অত্যাচারী), তাহলে সে ঈমানদারদের থেকে বের হয়ে যায়। (অর্থাৎ পূর্ণ ঈমান থেকে বঞ্চিত হয়) (বায়হাকী)

জালেমের অকল্যাণ

হযরত আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি এক ব্যক্তিকে এ কথা বলতে শুনেছেন, অত্যাচারী সত্যিকারার্থে সে নিজেই নিজের ক্ষতি করে। অন্যের ওপর তার অত্যাচারের কোনো প্রভাব পড়ে না। এ কথা শুনে হযরত আবু হুরায়রা রা. আরজ করলেন; কেনো নয়? আল্লাহর কসম! অত্যাচারী তার অত্যাচারের কারণে অপরকেও ক্ষতি করে। এমনকি হারারা পাখি তার নিজ গৃহে অত্যাচারীর অত্যাচারের কারণে দূর্বল হয়ে মারা যায়। (বায়হাকী)

অত্যাচারীকে বোঝানো উচিৎ

আবু দাউদ-এর বর্ণনায় আছে, যদি কেউ কোনো ব্যক্তিকে অত্যাচার করতে দেখে এবং তাকে বাধা প্রদান না করে, তাহলে হতে পারে খুব শীঘ্রই তাদের সবাইকে স্বীয় আযাব গ্রাস করে নেবে।

নবী করিম সা.-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ বয়ান

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, একদিন আসর নামাযের পর নবী করিম সা. আমাদের সামনে বয়ান করার জন্য দাঁড়ালেন। বয়ানে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ই উল্লেখ করলেন। যে স্মরণ রাখার সে স্মরণ রাখলো আর যে ভুলে যাবার সে ভুলে গেলো। নবী করিম সা. যা কিছু বললেন তার মধ্যে একটি কথা ছিলো; "দুনিয়া খুব মিষ্টি, সুন্দর ও সুজলা-সুফলা। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে এই দুনিয়ায় স্বীয় প্রতিনিধি হিসেবে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং তিনি দেখবেন তোমরা কেমন আমল করো। সাবধান! তোমরা দুনিয়ার ধোঁকা থেকে বাঁচো এবং মহিলাদের থেকে দূরে থাকো।"

নবী করিম সা. আরো বললেন; কিয়ামতের দিন প্রতিটা চুক্তি ভঙ্গের জন্য আলাদা আলাদা নিশানা (শনাক্তকরণ পতাকা) তৈরি করা হবে। যা দুনিয়াতে তার চুক্তি ভঙ্গের পরিমাণ অনুযায়ী দীর্ঘ হবে। আর তা তার শরীরের সাথে সেঁটে দেওয়া হবে। যা তাকে আলাদা করে পরিচয় করিয়ে দেবে যেন সে অধিক অপমানিত হয়। নবী করিম সা. এও বলেছেন, তোমাদের মধ্য থেকে কেউ যেন মানুষের ভয়-ভীতির কারণে সত্য বলা হতে বিরত না থাকে। অথচ সে সত্য সম্পর্কে জ্ঞাত।

অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যদি তোমাদের মধ্যে কেউ কোনো শরীয়ত বিরোধী বিষয় দেখে তাহলে সে যেন মানুষের ভয়ে শরীয়ত বিরোধী বিষয়কে সংশোধন করা থেকে বিরত না থাকে। এ কথা বলে আবু সাঈদ খুদরী রা. কাঁদতে শুরু করলেন এবং বললেন; আমি তো শরীয়ত বিরোধী বিষয় নিজ চোখে দেখেছি, মানুষের ভয়ে সেই সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারিনি। এরপর আবু সাঈদ খুদরী রা. বললেন, নবী করিম সা. এও বলেছেন; জেনে রাখো! মানুষকে বিভিন্ন শ্রেণী, ধরণ ও প্রকারে সৃষ্টি করা হয়েছে। যেমন-

১. কিছু লোক এমন যাদেরকে ঈমানদার হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈমান অবস্থায় জীবন যাপন করে এবং ঈমানের ওপরই মৃত্যুবরণ করে।

২. তাদের মধ্যে কিছু এমন যাদেরকে কাফের হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, কাফের অবস্থায় জীবন যাপন করে এবং কাফের অবস্থায়ই মৃত্যুবরণ করে।

৩. তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন যাদেরকে ঈমানদার হিসেবে সৃষ্টি করা হয়েছে, ঈমান অবস্থায় জীবন যাপন করেছে কিন্তু মৃত্যু হয়েছে কাফের অবস্থায়।

৪. তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন যাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে কাফের হিসেবে, জীবন-যাপন করেছে কাফের হিসেবে, কিন্তু মৃত্যুবরণ করেছে ঈমানদার অবস্থায়।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, এরপর নবী করিম সা. ওই মজলিসে মানুষের রাগ ও ক্রোধের প্রকারসমূহ বর্ণনা করলেন। যেমন-

১. কিছু লোক খুব অল্পতেই রেগে যায়, আবার খুব অল্পতেই থেমে যায়। এমন ব্যক্তিকে ভালোও বলা যাবে না, খারাপও বলা যাবে না।

২. কিছু লোক এমন যাদের রাগ আসতেও দেরী, যেতেও দেরী হয়। এমন ব্যক্তিকেও ভালো-মন্দ কিছুই বলা যাবে না।

৩. তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যার রাগ আসতে সময় লাগে কিন্তু অল্পতেই রাগ চলে যায়।

৪. আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে দ্রুত রেগে যায় এবং তা শেষ হতে সময় লাগে।

এরপর নবী করিম সা. বললেন, তোমরা রাগ করা থেকে বেঁচে থাকো, কেননা রাগ হলো মানুষের হৃদয়ে নিভুনিভু জ্বলতে থাকা অঙ্গার। তোমরা দেখনি যখন কোনো ব্যক্তির রাগ হয় তখন তার ঘাড়ের রগ ফুলে যায়, চোখ লাল হয়ে যায়। সুতরাং কারো রাগ অনুভূত হলে তৎক্ষণাৎ সে শুয়ে পড়বে এবং জমিনের সাথে আঁকড়ে থাকবে।

রাসূল সা. ঋণের ব্যাপারেও আলোচনা করলেন। বললেন—

১. তোমাদের মধ্যে কিছু লোক ঋণ শোধ করার ক্ষেত্রে খুব ভালো, কিন্তু অন্য কেউ ঋণ নিলে তা উদ্ধার করার ব্যাপারে খুব কঠোরতা করে। এ দুটোই একটা অপরটার বদলা হয়ে যায়।

২. তোমাদের মধ্যে কিছু লোক ঋণ শোধ করার ব্যাপারে সঠিক হিসাব রাখে কিন্তু কারো থেকে নিজের ঋণ উসূল করার ক্ষেত্রে সঠিক হিসাব রাখে না। এই দুটোও একটা অপরটার বদলা হয়ে যায়।

৩. তোমাদের মধ্যে উত্তম ঐ ব্যক্তি যে ঋণ পরিশোধ করার ক্ষেত্রে ভালো মানুষ হিসেবে বিবেচিত এবং নিজের পাওনা আদায় করার ক্ষেত্রেও ভালো মানুষ হিসেবে বিবেচিত।

৪. আর তোমাদের মধ্যে নিকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি যে ঋণ শোধ করার ক্ষেত্রে মন্দ এবং কারো কাছ থেকে পাওনা আদায়ের ক্ষেত্রও মন্দলোক হিসেবে বিবেচিত।

হুযূর সা. যখন উপদেশ দিচ্ছিলেন, তখন সূর্যের আলো খেজুর গাছের শিখরে এবং দেয়ালের গায়ে এসে পড়লো, অর্থাৎ দিন শেষ হয়ে গেলো।

তখন নবী সা. বললেন, মনে রেখো! এই দুনিয়ায় যে যুগ অতিবাহিত হয়েছে সে তুলনায় শুধু এতটুকু সময়ই অবশিষ্ট রয়েছে, যতটুকু সময় আজ অতিবাহিত হওয়ার পর অবশিষ্ট আছে। অর্থাৎ যেভাবে আজকের এই দিনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে এবং অল্প সময়ই অবশিষ্ট রয়েছে, তেমনিভাবে যুগের অধিককাল অতিবাহিত হয়ে গেছে আর খুব অল্প সময়ই অবশিষ্ট রয়ে গেছে।

আখেরী যামানা সম্পর্কিত কিছু নসিহত

হযরত ওমর ইবনে খাত্তাব রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; অবশ্যই আমার উম্মতকে শেষ যুগের শাসকবর্গের পক্ষ থেকে অনেক কঠোরতা ও বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। সেই কঠোরতা থেকে মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের মাঝে একজন তো সে হবে, যে আল্লাহর দীনকে উত্তমরূপে শিখলো এবং তা মানুষের কাছে পৌঁছালো। তারপর দীনকে সমুন্নত রাখার জন্য নিজ হাতের দ্বারা, মুখের দ্বারা ও অন্তর দ্বারা জিহাদ করলো। অতএব দুনিয়া ও আখেরাতের সৌভাগ্য তার দিকে অগ্রসর হবে।

দ্বিতীয় ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর দীন শিখলো এবং মুখ ও অন্তর দ্বারা এর সত্যায়ন করলো। অর্থাৎ শুধু মুখ ও অন্তর দ্বারা জিহাদ করলো, শক্তি প্রয়োগ করলো না।

আর তৃতীয় ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহর দীনকে শিখলো এবং এর ওপর চুপ রইলো। সে কাউকে নেক কাজ করতে দেখলে তা সঠিক বলে গণ্য করলো আর কাউকে খারাপ কাজ করতে দেখলে তাকে ঘৃণা করলো। অতএব এই ব্যক্তিও নেক কাজের প্রতি ভালোবাসা আর খারাপ কাজের প্রতি অন্তরে ঘৃণা রাখার জন্য মুক্তি পাবে।

ক্ষমা লাভের আকাঙ্ক্ষা

হযরত আবু সাঈদ খুদরী রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; আল্লাহ্ তাআলা বান্দাকে কিয়ামতের দিন জিজ্ঞেস করবেন; তোমাদের কী হয়েছিল যখন তোমরা শরীয়ত বিরোধী কর্মকাণ্ড হতে দেখলে তখন তা বাধা প্রদান করলে না কেনো?

নবী করিম সা. বলেন; তখন তাদেরকে উত্তর শিখিয়ে দেওয়া হবে। আর তারা আরজ করবে, ইয়া আল্লাহ! আমরা লোকদের ব্যাপারে আশংকা করতাম আর তোমার ক্ষমা ও করুণার আশা রাখতাম।

ঈর্ষার উপযুক্ত ব্যক্তি

হযরত আবু উমামা রা. নকল করেছেন যে, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; আমার নিকট আমার বন্ধু অর্থাৎ মুমিনদের মধ্য হতে সবচেয়ে ঈর্ষণীয় ঐ ব্যক্তি যে বিনয়ী, খুব সুন্দর রূপে নামায আদায় করে এবং আপন রবের ইবাদত খুবই একাগ্রতার সাথে আদায় করে, প্রকাশ্যে ইবাদতের মতো নির্জনেও আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে, আর সে মানুষের মাঝে পরিচয়হীন ভাবে থাকে যেন তাকে বিশেষভাবে সমীহ করা না হয়। যতটুকু রিযিক আসে তাতেই সে সন্তুষ্ট থাকে এবং ধৈর্য ধারণ করে। এই বক্তব্য দেয়ার পর নবী করিম সা. হাতের আঙ্গুলে মৃদু আঘাত করে বললেন; তার মৃত্যুও এমন সহজ হবে। আর তার মৃত্যুতে ক্রন্দনকারী মহিলার সংখ্যা কম হবে এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিও খুব কম হবে। (আহমদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা)

ধনীদের চল্লিশ বছর পূর্বে দরিদ্ররা জান্নাতে যাবে

হযরত আনাস রা. বর্ণনা করেন যে, নবী করিম সা. দোয়ার মধ্যে এ কথা বলছিলেন; হে আল্লাহ! আপনি আমাকে দরিদ্র বানিয়ে দুনিয়াতে রাখুন। দরিদ্র অবস্থায় মৃত্যু দান করুন এবং দরিদ্রদের সাথেই হাশর নসীব করুন। নবী করিম সা.-কে এই দোয়া করতে শুনে হযরত আয়েশা রা. বললেন; হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এই দোয়া কেনো করেছেন? নবী

করিম সা. বললেন; এই জন্য করেছি যে, দরিদ্ররা সম্পদশালীদের থেকে চল্লিশ বছর পূর্বে জান্নাতে প্রবেশ করবে। হে আয়েশা! কোনো মিসকীনকে ঘরের দরজা থেকে আশাহীনভাবে ফিরিয়ে দিয়ো না। যদিও তোমার কাছে খেজুরের একটি টুকরাই অবশিষ্ট থাকে। হে আয়েশা! অন্তরে দরিদ্রদের প্রতি ভালোবাসা রেখো এবং তাদেরকে কাছে টেনে নিও। যদি তুমি এমনটি করো তাহলে কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ তোমাকে স্বীয় নৈকট্য প্রদান করবেন। (বায়হাকী, তিরমিযি, ইবনে মাজা)

সাতটি অমূল্য উপদেশ

হযরত আবু যর রা. বলেন, প্রিয় নবী সা. আমাকে সাতটি উপদেশ দিয়েছেন, তা হলো-

১. আমি যেন গরীব-মিসকীনদের ভালোবাসি এবং তাদের নৈকট্য অর্জন করি।

২. দুনিয়ার ধন-সম্পদ যার আমার চেয়ে কম আমি যেন তার দিকে লক্ষ্য করি। আর ওই দিকে যেন ভ্রুক্ষেপ না করি যার ধন-সম্পদ ও মর্যাদা আমার চেয়ে অনেক বেশী।

৩. আমি যেন আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখি, যদিও আত্মীয়-স্বজন সম্পর্ক ছিন্ন রাখে।

৪. কোনো মানুষের কাছে যেন হাত প্রসারিত না করি।

৫. আমি যেন সদা সত্য কথা বলি, যদিও কারো তিক্ত লাগে।

৬. আমি যেন কখনো সৎ কাজের আদেশ ও মন্দ কাজ নিষেধ করতে গিয়ে তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে ভয় না করি।

৭. যেন বেশী বেশী لَاحَوْلَ وَلَاقُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ পাঠ করি। কেননা এটা ওই বাক্য যার ভাণ্ডার আল্লাহর আরশের নিচে। (আহমদ)

মানুষের চিরন্তন আশা

হযরত আনাস রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; মানুষ বৃদ্ধ হয়ে যায়; কিন্তু তার মধ্যে দুটি ইচ্ছা প্রবল থাকে। একটি হলো সম্পদ জমা করার লোভ, অপরটি হলো দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা। (বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; বৃদ্ধ মানুষের মন সবসময় দুটো জিনিসের প্রত্যাশায় থাকে। এক হলো দুনিয়ার মহব্বত; অপরটি হলো দীর্ঘ জীবনের আকাঙ্ক্ষা।

হালাল উপার্জন ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষা

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. থেকে নকল করা হয়েছে, তিনি বলেছেন; মোটা বা শক্ত কাপড় পরিধান করা বা শুকনো ও স্বাদহীন খাদ্য গ্রহণ করার নাম দুনিয়াবিমুখতা নয়, বরং দুনিয়াবিমুখতা হলো দুনিয়ার প্রতি অমুখাপেক্ষী হওয়া ও অল্পে তুষ্ট থাকা। (বাগাবী)

হযরত যায়েদ ইবনে হুসাইন রা. বলেন, যখন হযরত ইমাম মালেক রহ.-কে প্রশ্ন করা হলো যুহূদ (দুনিয়া বিমুখতা) কাকে বলে? তখন আমি ইমাম মালেক. রহ.-কে বলতে শুনেছি; হালাল উপার্জন ও কম আশা করার নাম দুনিয়া বিমুখতা। (বায়হাকী)

দুনিয়া চার শ্রেণীর মানুষের জন্য

হযরত আবু কাশবা আনমারি রা. থেকে বর্ণিত, তিনি নবী করিম সা.-কে এই ইরশাদ করতে শুনেছেন; তিনটি বিষয় এমন যার বাস্তবতা ও সত্যতার ওপর আমি কসম খেতে পারি। আর আমি তোমাকে এমন কিছু কথা বলবো, তুমি তা মনে রাখবে।

যে তিনটি বিষয়ের ব্যাপারে আমি কসম খেতে পারবো তা হলো;

১. বান্দার সম্পদ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার কারণে তা কমে না।

২. যে বান্দার ওপর জুলুম করা হয় এবং তার সম্পদ অন্যায়ভাবে নিয়ে যাওয়া হয় আর সে ওই অত্যাচার ও অতিরঞ্জিতের ওপর ধৈর্য ধারণ করে তাহলে আল্লাহ তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেন।

৩. যে ব্যক্তি নিজের নফসের ওপর দারিদ্রতার দরজা খুলে আল্লাহ তাআলা তার জন্য অভাব ও দরিদ্রতার দরজা খুলে দেন।

আর যে কথাগুলো আমি তোমাকে মনে রাখতে বলেছিলাম সেগুলো হলো –

১. যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ধন-সম্পদ দান করেছেন এবং ইলমের মতো মূল্যবান সম্পদও দান করেছেন। আর সে এই ধন-সম্পদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করে (অর্থাৎ এগুলো সে নাজায়েজ কাজে খরচ করে না), আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে এই সম্পদ দ্বারা উত্তম ব্যবহার করে, তাদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করে আর ওই সম্পদ থেকে সে আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী আল্লাহর কাজে ব্যয় করে। অতএব এই বান্দা মর্যাদার দিক থেকে পরিপূর্ণ।

২. কিছু মানুষ আছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা ইলমের সম্পদ তো দিয়েছেন; কিন্তু ধন-সম্পদ দেন নি। তো সে (নিজের ইলমের কারণে ভালো

নিয়ত রেখো) এ কথা বলে যে, যদি আমার কাছে সম্পদ থাকতো তাহলে আমিও অমুকের মতো এই ভালো কাজগুলো করতাম, অতএব ওই দুই ব্যক্তির সওয়াব ও প্রতিদান সমান।

৩. কিছু মানুষ আছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সম্পদ দিয়েছেন; কিন্তু ইলম দেন নি। সে ব্যক্তি ইলম না থাকার কারণে নিজ সম্পদ সম্বন্ধে আল্লাহর ভয় হারিয়ে ফেলে। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধবদের সাথে উত্তম ব্যবহার করে না এবং সম্পদের হক আদায় করে না অবশ্যই তারা নিকৃষ্ট পর্যায়ের লোক।

৪. আর কিছু মানুষ আছে যাদেরকে আল্লাহ তাআলা সম্পদও দেন নি ইলমও দেন নি। তারা বলে যদি আল্লাহ আমাকে সম্পদ দান করতেন তাহলে আমিও অমুক ব্যক্তির মতো (মন্দ কাজে) কাজে খরচ করতাম। অতএব এই ব্যক্তি আর পূর্বের ব্যক্তি মন্দ নিয়তের দিক থেকে সমান। (তিরমিযি)

ধন-সম্পদও মুসলমানদের হাতিয়ার

হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ. বলেন, আগের যামানায় ধন-দৌলতকে খারাপ ভাবা হতো কিন্তু যখন এ যুগের সাথে সম্পৃক্ত হলো, তখন তো ধন-সম্পদও মুসলমানদের প্রতিরোধ শক্তি হলো।

সুফিয়ান সাওরী রহ. একথাও বলেছেন; আমাদের কাছে যদি ধন-সম্পদ, দিনার-দিরহাম, টাকা-পয়সা না থাকতো তাহলে বর্তমান যুগের শাসকবর্গ ও ধনাঢ্য ব্যক্তিরা আমাদেরকে লাঞ্ছিত ও অপদস্থ করতো। তিনি এও বলেছেন, যদি কারো নিকট কমবেশী সম্পদ থাকে তাহলে তার উচিত সে যেন সম্পদের সদ্ব্যবহার করে। অর্থাৎ ওই সম্পদকে যেন নষ্ট না করে, বরং নানা ফন্দি-ফিকির ও অভিজ্ঞতা দিয়ে তা ব্যবসা ইত্যাদিতে লাগিয়ে যেন বৃদ্ধির চেষ্টা করে। কেননা আমাদের এই যুগ এমন যে, যদি কেউ দরিদ্র ও অসহায় হয় তখন সে দুনিয়া অর্জন করার জন্য নিজের দীনকে নিজ হাতে ধ্বংস করতে সর্বাগ্রে ছুটবে। হযরত সুফিয়ান সাওরী রহ.-এর আরো একটি বাণী হলো, 'হালাল সম্পদ' অপচয়কে সহ্য করে না। অর্থাৎ হালাল সম্পদ অপচয় করা উচিত নয়।

কিয়ামত দিবসের ঘোষণা

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; কিয়ামতের দিন ঘোষণাকারী ফেরেশতা আল্লাহর আদেশে এই ঘোষণা করবে যে, ষাট বছর প্রাপ্ত ব্যক্তিরা কোথায়? (অর্থাৎ দুনিয়ায় যারা ষাট বছর পেয়েছে তারা যেন স্বীয় বয়সের হিসাব দেওয়ার জন্য নিজেকে

হিসাবের সম্মুখীন করে) আর এটাই হলো ঐ বয়স যার ব্যাপারে আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন;

أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَايَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَائَكُمُ النَّذِيْرُ.

আমি কি তোমাদেরকে এই পরিমাণ বয়স দেই নি যাতে উপদেশ গ্রহণকারী উপদেশ গ্রহণ করতে পারে? আর তোমাদের নিকট সতর্ককারী আসে নি?[২২১]

আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় ব্যক্তি

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ রা. বর্ণনা করেন— বনী উযরাহ গোত্রের তিন ব্যক্তি নবী করিম সা.-এর খেদমতে এসে ইসলাম গ্রহণ করলেন। (তারপর তারা দীন শেখার জন্য আল্লাহর রাস্তায় কষ্ট-মোজাহাদার নিয়তে রাসূল সা.-এর দরবারে অবস্থান করলেন। তাদের আর্থিক অবস্থা যেহেতু খুবই খারাপ ছিলো) নবী করিম সা. ইরশাদ করলেন; তোমাদের মধ্যে কে আছো যে এদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিয়ে আমাকে চিন্তামুক্ত করবে? হযরত তালহা রা. আরজ করলেন; আমি এদের দায়িত্ব গ্রহণ করতে প্রস্তুত। তখন থেকে এই তিনজন হযরত তালহা রা. এর নিকট থাকতে শুরু করলেন। কিছুদিন পর নবী করিম সা. কোনো এক এলাকায় মুজাহিদ বাহিনী পাঠালেন। তখন তিনজনের একজন ব্যক্তি সে জিহাদে শরীক হলেন এবং দুশমনের সাথে লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন।

তারপর নবী করিম সা. আরো একটি বাহিনী পাঠালেন। এতে দ্বিতীয় ব্যক্তি শরীক হলেন এবং লড়াই করতে করতে শহীদ হয়ে গেলেন। তার বেশ কিছু দিন পর তৃতীয় ব্যক্তি নিজ বিছানায় আল্লাহর সান্নিধ্যে চলে গেলেন। বর্ণনাকারী বলেন, হযরত তালহা রা. বলেছেন; তারা তিনজন শহীদ হওয়ার পর একদিন আমি স্বপ্নে দেখি যে, তিনজনই জান্নাতে বিচরণ করছে। তবে যে ব্যক্তি সবার শেষে শহীদ হয়েছেন তিনি সবার আগে। যিনি দ্বিতীয় বাহিনীতে শহীদ হয়েছেন তিনি তার পেছনে, আর যে ব্যক্তি সবার আগে শহীদ হয়েছেন সে সবার পেছনে। তাদের এভাবে আগে-পিছনে অবস্থান হওয়ায় আমার মনে কৌতূহল জাগলো। আমি নবী করিম সা.-এর দরবারে হাজির হয়ে এই স্বপ্ন ও কৌতূহল বর্ণনা করলাম। নবী করিম সা. ইরশাদ করলেন; এতে সন্দেহ, সংশয় ও কৌতূহলের কী আছে? তুমি তাদের

---

২২১. সূরা ফাতির : ৩৭, বায়হাকী।

জান্নাতে যে ধারাবাহিকতায় দেখেছো তা একেবারেই ঠিক আছে। কেননা আল্লাহর নিকট এই মুসলমানদের মধ্যে সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ ঐ ব্যক্তি যে মুসলমান থাকা অবস্থায় বেশী হায়াত পেয়েছে। এতে সে আল্লাহর যিকির, তাসবীহ আদায় করার সময় ও সুযোগ বেশী লাভ করেছে। (মুসনাদে আহমদ)

আল্লাহর অবাধ্য হওয়াকে ভয় করো

হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন, জান্নাত আবশ্যককারী ও জাহান্নাম দূরকারী প্রতিটি নেক আমলের বিবরণ আমি তোমাদেরকে জানিয়েছি। তদ্রুপ জাহান্নাম আবশ্যককারী ও জান্নাত দূরকারী প্রতিটি বদ আমল থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছি। আর রুহুল আমিন (অপর এক বর্ণনায় আছে রুহুল কুদুস অর্থাৎ হযরত জিবরাইল আ.) আমার অন্তরে এ কথা ঢেলে দিয়েছেন যে, নিঃসন্দেহে কোনো ব্যক্তি ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করে না যতক্ষণ না সে নিজের রিযিক পূর্ণ করে নেবে। সুতরাং মনোযোগ দিয়ে শোনো, তোমরা আল্লাহর অবাধ্য হওয়া থেকে ভয় করতে থাকো এবং জীবিকা উপার্জনের চেষ্টা ও মেহনতের ক্ষেত্রে সততা ও মধ্যপন্থা অবলম্বন করো (যেন তোমাদের রিযিক তোমাদের নিকট জায়েয ও হালাল পদ্ধতির মাধ্যমে আসে) আর রিযিক আসতে বিলম্ব হলে তোমাদেরকে যেন এ বিষয়ে প্ররোচিত না করে যে, তুমি গুনাহের কর্মকাণ্ড দ্বারা অসৎ উপায়ে জীবিকা উপার্জনের চেষ্টায় লেগে যাও। কেননা যে রিযিক আল্লাহর নিকট আছে সেটা তাঁর আনুগত্য ও সন্তুষ্টির দ্বারাই অর্জন করা যেতে পারে। (বাগাবী)

আল্লাহভীতির অপূর্ব ঘটনা

হযরত জাবির রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করিম সা.-এর সাথে আমি একটি জিহাদে শরীক ছিলাম যা নজদ অভিমুখে সংঘটিত হয়েছিলো। জিহাদ শেষে আমিও নবী করিম সা.-এর সাথে ফিরে আসছিলাম। এর মাঝে একটি ঘটনা ঘটলো। একদিন দ্বিপ্রহরে সাহাবায়ে কেরামের জামাআত এমন একটি জঙ্গলে পৌঁছলো যেখানে অসংখ্য বাবলাগাছ ছিলো। নবী করিম সা. সাহাবায়ে কেরামের সাথে সেখানেই নেমে পড়লেন আর সবাই গাছের ছায়ার খোঁজে এদিক-সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। নবী করিম সা. বড় একটি বাবলাগাছের নিচে শুয়ে পড়লেন। এ সময় তিনি গাছের একটি ডালে নিজের তলোয়ার ঝুলিয়ে রাখলেন।

জাবের রা. বলেন, আমরা সবাই ঘুমিয়ে গিয়েছিলাম। এমন সময় হঠাৎ নবী করিম সা.-এর কথার আওয়াজ আমাদের কানে ভেসে এলো। আমরা দৌড়ে

নবী করিম সা.-এর খেদমতে পৌঁছে দেখি এক গেঁয়ো কাফের তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। নবী করিম সা. ইরশাদ করলেন; আমি যখন ঘুমিয়ে ছিলাম তখন এই গ্রাম্য লোকটি আমার তলোয়ার হাতে নিয়ে আমার পাশে দাঁড়ালো। যখন আমার চোখ খুললো তখন আমি তাকিয়ে দেখি আমার কোষমুক্ত তরবারি তার হাতে। সে বললো, এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? আমি তৎক্ষণাৎ জবাব দিলাম; আমার আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করবে। নবী করিম সা. এ কথা তিনবার বললেন। আর এই গ্রাম্য লোকটিকে কোনো সাজা না দিয়ে বসে পড়লেন। (বুখারী, মুসলিম)

আবু বকর ইসমাঈলী তাঁর "সহীহ" গ্রন্থে এই ঘটনা এভাবে বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন; এই গ্রাম্য লোকটি নবী করিম সা.-এর দিকে তলোয়ার কোষমুক্ত করে বললো, এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? নবী করিম সা. বললেন, আল্লাহ্ আমাকে রক্ষা করবেন। এই কথা শোনার পর গ্রাম্য লোকটির হাত থেকে তরবারি পড়ে গেলো। নবী করিম সা. তরবারি উঠিয়ে নিয়ে বললেন, এখন কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? গ্রাম্য লোকটি জবাব দিলো; আপনি উত্তম তরবারি ধারণকারী। (অর্থাৎ আপনি আমাকে ক্ষমা করে দিন) নবী করিম সা. বললেন; তাহলে এই কথার সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই। অবশ্যই মুহাম্মদ আল্লাহর রাসূল। গ্রাম্য লোকটি বললো, আমি মুসলমান তো হবোই না; তবে আপনার সাথে এই অঙ্গীকার অবশ্যই করবো, আমি নিজে আপনার সাথে লড়াই করবো না আর ওই লোকদের সঙ্গ দেবো না যারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করবে। নবী করিম সা. তাকে ছেড়ে দিলেন। যখন সে তার গোত্রের মাঝে ফিরে এলো তখন সে বললো, আমি তোমাদের নিকট এমন এক ব্যক্তির কাছ থেকে এসেছি যিনি সর্বোত্তম মানুষ। (বুখারী)

মানুষের মনের বনে বিভিন্ন শাখা আছে

হযরত আমর ইবনে আস রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; অবশ্যই মানুষের মনের বনে বিভিন্ন শাখা আছে। (অর্থাৎ মানুষের মনে রিজিক তালাশের বিভিন্ন চিন্তা-ফিকির রয়েছে) তো যে ব্যক্তি মনের শাখা-প্রশাখার দিকে ঝুঁকে থাকে (অর্থাৎ মনকে সবসময় জীবিকার চিন্তায় ব্যস্ত রাখে) সন্দেহ নেই যে, আল্লাহ অবশ্যই তাকে এমনই কোনো এক বনে নিঃশেষ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ তাআলার ওপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা রাখে তার জন্য আল্লাহ তাআলাই যথেষ্ট হবেন। (ইবনে মাজা)

রিজিক বান্দাকে খুঁজে বেড়ায়

হযরত আবু দারদা রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, রিজিক বান্দাকে খুঁজে বেড়ায়। যেভাবে মানুষকে তার মৃত্যু খুঁজে বেড়ায়। (আবু নুআইম)

মানুষ দীনের নামে দুনিয়া উপার্জন করবে

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; শেষ যুগে এমন কিছু লোক সৃষ্টি হবে যারা দীনের নামে দুনিয়া কামাই করবে। মানুষের সামনে কোমলতা প্রকাশ করার জন্য পশুর চামড়ার পোশাক পরিধান করবে। (যাতে লোকজন তাকে আবেদ, যাহেদ, দুনিয়াবিমূখ, আখেরাত সন্ধানী মনে করে মুরিদ হতে পারে) তাদের মুখের ভাষা হবে চিনির চেয়েও মিষ্টি, কিন্তু তাদের অন্তর হবে বাঘের অন্তরের মতো শক্ত। আল্লাহ রব্বুল আলামীন এইসব লোককে সতর্ক করে বলেছেন; এইসব লোক কি আমার পক্ষ থেকে ছাড় দেয়ার কারণে সন্দেহের মধ্যে আছে, নাকি আমার বিরোধিতা করার জন্য বদ্ধপরিকর? অতএব আমি আমার কসম খেয়ে বলছি; আমি তাদের মধ্য থেকে কিছু লোককে তাদের ওপর ঝগড়া-ফাসাদের আকৃতিতে চাপিয়ে দেবো, যারা বড় থেকে বড় বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকেও অস্থির করে তুলবে। (তিরমিযি)

হযরত ইবনে ওমর রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; আল্লাহ তাআলা বলেন, আমি এমন এক মাখলুক সৃষ্টি করেছি যাদের মুখের ভাষা চিনির চেয়ে বেশী মিষ্টি এবং যার অন্তর ইলওয়ে (বিশেষ প্রজাতির ফল) থেকেও বেশী তিক্ত। অতএব আমি কসম খেয়ে বলছি; অবশ্যই তাদের ওপর এমন বিপদ অবতীর্ণ করবো, যা বড় থেকে বড় বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তিদেরকেও অস্থির এবং অসহায় করে তুলবে। এইসব লোক কি আমাকে ধোঁকা দিতে চায়? এরা কি আমার সামনে শক্তি ও বড়াই প্রদর্শন করতে চায়? (তিরমিযি)

বন্ধুত্বের অন্তরালে শত্রুতা

হযরত মুয়াজ ইবনে জাবাল রা. থেকে বর্ণিত, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; শেষ যুগে এমন দল সৃষ্টি হবে যাদেরকে প্রকাশ্যে বন্ধুই মনে হবে কিন্তু অন্তরে থাকবে শত্রুতা।

আরজ করা হলো; ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে এমন হবে এবং কোন কারণে হবে?

নবী করিম সা. ইরশাদ করলেন; এটা এ কারণে হবে যে, তারা কেউ কারো থেকে স্বার্থ ও লোভ অন্তরে রাখবে আবার কেউ কারো থেকে ভয়ে থাকবে। (আহমদ)

দাজ্জালের চেয়েও ভয়ানক বিষয়

হযরত আবু সাঈদ রা. বলেন, একদিন আমরা দাজ্জালের বিষয়ে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় আমাদের মাঝে নবী করিম সা. তাশরীফ রাখলেন। তারপর আমাদের কথা শুনে বললেন; আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস বলে দেবো না যা দাজ্জালের চেয়েও অনেক বেশী ভয়াবহ? আমরা আরজ করলাম, অবশ্যই বলুন। তখন নবী করিম সা. ইরশাদ করলেন, তা হলো শিরকে খফী। (অপ্রকাশ্য শিরক) যেমন এক ব্যক্তি নামাযে দাঁড়িয়েছে। তো সে শুধু এইজন্যই নামায দীর্ঘ করেছে যে, তাকে অন্যরা নামায পড়তে দেখছে। (ইবনে মাজা)

নয়টি বিষয়ের আদেশ

হযরত আবু হুরায়রা রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; আল্লাহ তাআলা আমাকে নয়টি বিষয়ের আদেশ করেছেন-

১. প্রকাশ্যে ও নির্জনে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে ভয় করবো।
২. রাগ ও অসন্তুষ্ট অবস্থায় সঠিক কথা বলবো।
৩. অভাব ও সচ্ছলতা উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করবো।
৪. যে আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে তার সাথে আমি যেন সদাচারণ করি।
৫. যে আমাকে বঞ্চিত করে তাকে যেন আমি দান করি।
৬. যে আমার ওপর অত্যাচার করে তাকে যেন আমি ক্ষমা করি।
৭. যেন চুপ থাকি ও চিন্তামগ্ন থাকি।
৮. আমার কথায় যেন জিকির হয়।
৯. আমার দেখা যেন শিক্ষাগ্রহণ মূলক হয়। (রাজিন)

কিয়ামতের একটি আলামত

হযরত হুযাইফা রা. বলেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; ঐ সময় পর্যন্ত কিয়ামত আসবে না যতক্ষণ না অসভ্য, নির্বোধ ও অসভ্যদের সন্তানকে বুদ্ধিমান বলে বিবেচনা করা হবে।

কোন পাপের কী শাস্তি

হযরত ইবনে আব্বাস রা. বলেন, যখন কোনো জাতি গনীমতের সম্পদ আত্মসাৎ করতে শুরু করে তখন আল্লাহ তাদের অন্তরে শত্রুর প্রভাব ও

ভয় সৃষ্টি করে দেন। আর যে জাতির মাঝে যিনা-ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়ে তখন তাদের মাঝে অধিক মৃত্যু দেখা দেয়। যে জাতি মাপে কম দেয় তাদের রিযিক উঠিয়ে নেওয়া হয়। (অর্থাৎ বরকত উঠিয়ে নেওয়া হয় অথবা হালাল রিযিক থেকে বঞ্চিত করা হয়) যে জাতি অন্যায়ভাবে সংবিধান চালু করতে থাকে তাদের মাঝে হত্যাযজ্ঞ ছড়িয়ে পড়ে। যে জাতি চুক্তিভঙ্গ করে আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্য থেকেই তাদের ওপর শত্রুতা পোষণকারী ব্যক্তি তৈরি করে দেন। (মুসলিম)

ইহুদীদের বৃক্ষ

হযরত আবু হুরায়রা রা. বর্ণনা করেন, নবী করিম সা. ইরশাদ করেছেন; কিয়ামত ততক্ষণ পর্যন্ত সংঘঠিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ইহুদীদের সাথে মুসলমানদের যুদ্ধ না হবে। সে যুদ্ধে মুসলমানরা ব্যাপকভাবে ইহুদীদেরকে হত্যা করবে। এমনকি ইহুদীরা পাথর ও বৃক্ষের আড়ালে গিয়ে লুকাবে এবং বৃক্ষ একথা বলবে; হে মুসলমান! হে আল্লাহর বান্দা! এই যে, এই দিকে! আমার পিছনে একটা ইহুদী আত্মগোপন করেছে, তাকে মেরে ফেলো! কিন্তু গারকাদ বৃক্ষ এমনটি বলবে না। কেননা সেটা ইহুদীদের বৃক্ষ। (মুসলিম)

কা'বার ধনভাণ্ডার হাবশী উদ্ধার করবে

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. নবী করিম সা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি ইরশাদ করেছেন; তোমরা হাবশীদেরকে আপন অবস্থায় ছেড়ে দাও এবং তাদের সাথে কোনো প্রকার বিরোধিতা করো না। যতক্ষণ না তারা তোমাদেরকে কিছু বলে ও তোমাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত না হয়। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কা'বার ধনভাণ্ডার এক হাবশীই উদ্ধার করবে। যার দু'টি পায়ের গোছাই হবে ছোট ছোট। (মুসলিম)

পৃথিবীতে প্রথম যে প্রাণী বিলুপ্ত হবে

হযরত জাবের রা. বলেন, যে বছর হযরত ওমর রা.-এর ইন্তেকাল হয় সে বছর হঠাৎ গিরগিটি শূন্য হয়ে গেলো। কোথাও গিরগিটি না পাওয়া যাওয়ায় ওমর রা. খুব চিন্তিত ও পেরেশান হয়ে পড়লেন। তখন তিনি ইয়েমেন, শাম ও ইরাক-এর দিকে এক দল আরোহীকে পাঠালেন। যেন তারা মানুষকে জিজ্ঞেস করে, কোথাও গিরগিটি পাওয়া যায় কি না?

সেমতে ইয়েমেনের দিকে যে দল পাঠানো হয়েছিল, তারা কিছু গিরগিটি এনে হযরত ওমর রা.-এর সামনে উপস্থাপন করলো। তখন হযরত ওমর রা. গিরগিটি দেখে খুশিতে উচ্চকণ্ঠে আল্লাহু আকবার বললেন।

অতঃপর তিনি বললেন, গিরগিটি সম্পূর্ণভাবে বিলীন হওয়ার অশঙ্কায় এজন্য চিন্তিত হয়েছিলাম যে, আমি নবী করিম সা.-কে একথা বলতে শুনেছি; আল্লাহ্ তাআলা হাজারো রকমের প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তন্মধ্যে ছয়শ' সামুদ্রিক প্রাণী আর চারশ' স্থলজ প্রাণী।

অতএব যখন কিয়ামত নিকটবর্তী হবে তখন সর্বপ্রথম গিরগিটি বিলীন হয়ে যাবে। আর যখন গিরগিটি বিলীন হয়ে যাবে তখন অন্যান্য প্রাণীও একের পর এক বিলীন হতে শুরু করবে। যেভাবে মুক্তার মালা ছিড়ে গেলে একের পর এক ঝরতে থাকে।

রাকাত ছুটে যাওয়ার চারটি ধরণ

প্রশ্ন : যদি এক রাকাত ছুটে যায় তাহলে কিভাবে তা আদায় করবে?

উত্তর : যদি জামাআতে এক রাকাত ছুটে যায় তাহলে তা পুরা করার নিয়ম হলো, যখন ইমাম সাহেব দুই দিকে সালাম ফিরাবে তখন দাঁড়িয়ে যাবে। মনে রাখতে হবে, ইমাম সাহেব এক দিকে সালাম ফিরানোর পরই দাঁড়িয়ে যাওয়া ঠিক নয়। কেননা হতে পারে, ইমাম সাহেব সেজদায়ে সাহুর জন্য সালাম ফিরিয়েছেন। যে রাকাত ছুটে গেছে সেটা আপনার প্রথম রাকাত। দাঁড়িয়ে প্রথম রাকাতের মতোই সানা পড়বেন। তারপর সূরা ফাতেহা পড়ে অন্য একটি সূরা মিলাবেন। ছোট হলে তিন আয়াত আর বড় হলে এক আয়াত মিলাবেন। অবশিষ্ট রাকাত স্বাভাবিক নিয়মেই পুরা করবেন।

প্রশ্ন : যদি দুই রাকাত ছুটে যায় তাহলে কিভাবে তা আদায় করবে?

উত্তর : এটা আদায় করা খুবই সহজ। স্বাভাবিক অন্যান্য নামাযের মতোই তা আদায় করবে। একাকী নামায পড়ার সময় যেমনটি করে থাকে।

অর্থাৎ প্রথম রাকাতে সানা পড়বে, সূরা ফাতেহা পড়বে ও সূরা মিলাবে আর দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা পড়বে আর সূরা মিলাবে।

যদি যোহর, আসর বা এশার নামায হয় তাহলে যে দুই রাকাত ইমাম সাহেবের সাথে পড়েছে তা তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাত গণ্য হবে। আর সে এখন প্রথম ও দ্বিতীয় রাকাত আদায় করেছে। অধিকাংশ মানুষ ইমাম সাহেবের সাথে পাওয়া শেষ দুই রাকাতকে তার প্রথম দুই রাকাত মনে করে ভুল বুঝে থাকেন। এজন্য সে ছুটে যাওয়া রাকাতে সূরা মিলায় না, যার কারণে তার নামায হয় না।

প্রশ্ন : যদি তিন রাকাত ছুটে যায় তাহলে কিভাবে তা আদায় করবে?

উত্তর : তিন রাকাত ছুটে গেলে অধিকাংশ মানুষ তা আদায় করতে গিয়ে ভুল করে। তাই এটাকে ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে। তিন রাকাত ছুটে গেলে প্রথমে ছুটে যাওয়া প্রথম রাকাত আদায় করবে। অর্থাৎ ইমাম সাহেব সালাম ফিরানোর পর দাঁড়িয়ে প্রথম রাকাতের মতোই প্রথম রাকাতের সানা, সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পাঠ করবে। এই রাকাত শেষ হলে তার দুই রাকাত হলো। তাই এবার সে প্রথম বৈঠক করবে। এই বৈঠকে সে শুধু তাশাহুদ পড়বে। তারপর দাঁড়িয়ে যাবে। এবার তার ছুটে যাওয়া দ্বিতীয় রাকাত দ্বিতীয় রাকাতের মতো করে আদায় করবে। অর্থাৎ সূরা ফাতেহার পর অন্য একটি সূরা মিলাবে। তারপর তার তৃতীয় রাকাত আদায় করবে। যাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে। চতুর্থ রাকাত তো ইমাম সাহেবের সাথেই আদায় করেছে। তাই এই তৃতীয় রাকাত আদায়ের পরেই তার চার রাকাত নামায পূর্ণ হলো। এবার সে শেষ বৈঠক করবে, এরপর তাশাহহুদ, দুরুদ শরীফ ও দোয়ায়ে মাসুরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নিবে।

প্রশ্ন : যদি চার রাকাত ছুটে যায় তাহলে কিভাবে তা আদায় করবে?

উত্তর : চার রাকাত ছুটে গেলে একাকী ফরজ নামায আদায়ের মতোই আদায় করবে। অর্থাৎ প্রথম রাকাতে সানা, সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। দ্বিতীয় রাকাতে সূরা ফাতেহা ও অন্য একটি সূরা পড়বে। আর তৃতীয় ও চতুর্থ রাকাতে শুধু সূরা ফাতেহা পড়বে।

হযরত ওমর পালনপুরী রহ.-এর জীবনী

জন্মস্থান, জন্ম ও শৈশবকাল

তাঁর মাতৃভূমি পালনপুর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে গাঠামন গ্রামে। বাবা ব্যবসার উদ্দেশ্যে মুম্বাই শহরে থাকতেন। বাবার নাম ছিলো ওয়াজিরুদ্দীন। তাঁর জন্ম মুম্বাই শহরে ১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯ খৃস্টাব্দে রবিবার দিবাগত রাত বারোটার দিকে। অর্থাৎ সোমবার রাতে। নাম রাখা হয় মোহাম্মদ ওমর। সাত বছর বয়সে তাঁকে মুম্বাই হানাফিয়া স্কুলে ভর্তি করা হয়। এর এক বছর পরই তাঁর বাবা ওয়াজিরুদ্দীন ইন্তেকাল করেন। আট বছর বয়সেই তিনি এতিম হয়ে যান। পরিবারের অবস্থা খুবই সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে। চরম আর্থিক অনটনে দিন অতিবাহিত হয়। কিন্তু আল্লাহ যাকে দিতে চান কুদরতিভাবেই তার সবকিছু সুবিন্যস্ত করে দেন। মমতাময়ী মা-ই হলেন তাঁর শিক্ষাদীক্ষার যোগান দাতা।

মহল্লায় মারয়াম নামে তাঁর এক খালা থাকতেন। তিনি একজন আল্লাহভীরু, ইবাদতগুজার ও পুণ্যবতী মহিলা ছিলেন। মেশকাত শরীফ পর্যন্ত দীনি শিক্ষা অর্জন করে ছিলেন তিনি। মাওলানার আম্মা মারয়াম খালার সংশ্রবে থাকতেন এবং তার কাছ থেকে দীনি ও ঈমানী কথাবার্তা শুনতেন। যে কারণে অসম্ভব রকমের আখেরাতের চিন্তা এবং আল্লাহর ভয়-ভীতি অন্তরে সৃষ্টি হয়ে গিয়ে ছিলো। আল্লাহর ভয় ও আখেরাতের চিন্তায় নিজের ছেলেকে গড়ে তোলার চেষ্টা করতেন এবং সে জন্য জানপ্রাণ দিয়ে চেষ্টা করছিলেন। মাওলানা বলতেন, সম্মানীতা মাতা যদিও লেখাপড়া জানতেন না, কিন্তু আমার ব্যাপারে তাঁর এই আশা ছিলো যে, আমি যেন আলেম হই। তিনি আরো বলতেন, আম্মাজানকে তো কুরআন আমিই পড়িয়েছি কিন্তু এই কুরআনের ওপর আমল করতে তিনিই আমাকে শিখিয়েছেন। প্রতিদিন তিনি কোনো না কোনো ঈমানী কথা শোনাতেন। শৈশবেই কুরআনে বর্ণিত নবী আ.-দের ঘটনা মা আমাকে শোনাতেন এবং কিয়ামতের ভয়াবহ আযাবের কথা বলে ভয় দেখাতেন।

একবার আম্মাজান বললেন; কবরে দুইজন ফেরেশতা আসবে এবং তিনটি প্রশ্ন করবে। তারপর তিনটি প্রশ্ন ও উত্তর আমাকে বলে দিলেন। অন্য

এক সময় যখন আমাকে কবরের আযাবের ভয় দেখাতে শুরু করলেন। তখন আমি আম্মাজানকে বললাম— আমার ফেরেশতাদের প্রশ্ন ও উত্তরগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে। তখন উত্তরে আম্মাজান বললেন; কবরে চামড়ার মুখ কোনো কাজে আসবে না, বরং সেখানে আমলের মুখ উত্তর দিবে। অতএব তুমি আমল করো এবং কোনটা হালাল কোনটা হারাম তা আমাকে বলো। কারণ আমি তো মূর্খ আর তুমি সবেমাত্র পড়তে শুরু করেছো। আমার আম্মা বলতেন; বৎস! গীবত করতে চাইলে আমার গীবত করো। এতে ঘরের আমল ঘরেই থাকবে। তোমার নেকীগুলো আমি পাবো। মাওলানা বলতেন, এর দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো গীবত থেকে ভয় দেখানো ও তা থেকে বেঁচে থাকা। কেননা মানুষ খুবই অসচেতন ও অসতর্ক। শত্রুর গীবত করে নিজের অর্জিত নেকীগুলো শত্রুকে দিয়ে দেয়। আম্মাজান আরো বলতেন; সদকার দ্বারা বিপদ দূর হয়। আর দানশীল হাত সর্বদা ওপরে থাকে। মাওলানা যখন শৈশবকালে মায়ের কাছ থেকে দীনি কথা শুনতেন তখন নম্র স্বভাবের হওয়ার কারণে পুরো প্রভাবই তাঁর মধ্যে বিদ্যমান ছিলো।

একবারের একটি ঘটনা, যা মাওলানা নিজেই বয়ান করেছেন; আমার আম্মা কিয়ামতের দৃশ্য তুলে ধরলেন। আকাশ ভেঙ্গে পড়বে, জমিন হেলে পড়বে ইত্যাদি। একদিন রাতে আমি মেঝেতে বিছানা করে শুয়ে ছিলাম আর আমার ছোট ভাই চৌকিতে শুয়ে ছিলো। আমি স্বপ্নে কিয়ামতের দৃশ্য দেখতে শুরু করলাম। ঘটনাক্রমে ছোট ভাই চৌকি থেকে আমার ওপর পড়ে গেলো। আমি চিৎকার করতে শুরু করলাম যে, কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে! হিসাব দিতে হবে। আম্মাজান বাতি জ্বালিয়ে বলতে লাগলেন, ওমর কাঁদছো কেনো? তোমার ছোট ভাই-ই তো পড়েছে। মাওলানা চোখ বন্ধ করেই কান্না করে যাচ্ছেন আর বলছেন কিয়ামত শুরু হয়ে গেছে। যেন শৈশব থেকেই আল্লাহর ভয় ও কিয়ামতের ভয় মাওলানার শিরা-উপশিরায় স্থান করে নিয়েছিলো।

একবার তাঁর আম্মা খালা মারয়াম থেকে একটি হাদীস শুনলেন, যে কুরআন শিখবে তার মা-বাবাকে কিয়ামতের ময়দানে নূরের মুকুট পরিধান করানো হবে। এই হাদীস শুনে তিনি কাঁদলেন আর বললেন; বৎস! তুমি কুরআন শরীফ ও বুখারী শরীফ পড়ে নাও। তিনি বললেন, তাহলে স্কুলের পড়ার কী হবে? মা বললেন, যা হবার হবে। এখন তুমি শুধু ইলমে ইলাহী অর্জন করে নাও।

স্কুলের অবকাশকালীন ছুটিতে বাড়ি ফেরা

স্কুলে পড়াকালীন শৈশবে মা নিজে তাঁকে লালন-পালন করতে থাকেন। এভাবে স্কুলের পাঁচ বছর পূর্ণ করে ১৯৪২ সালে ছুটি কাটানোর জন্য তিনি মায়ের সঙ্গে নিজ গ্রামে গাঠামনে ফিরে এলেন। অপরদিকে মাওলানা আব্দুল হাফিজ জালালপুরী সাহেবও গাঠামনে আগমন করলেন। তিনি ছিলেন খুবই মুখলিস ও দুনিয়াবিমূখ আলেমে দীন। যখন মাওলানার মা তাঁকে মাদরাসায় পাঠানো শুরু করেন তখন শিক্ষক তাঁর মেধা ও প্রতিভা দেখে তাঁর প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হন। এক বছরেই পঞ্চাশটি কিতাব পড়ে ফেলেন। যখন বার্ষিক পরীক্ষার সময় এলো তখন পরীক্ষা নেওয়ার জন্য পালনপুর থেকে মাওলানা নাজির আহমদ সাহেব এলেন। যখন তাঁর পড়া কিতাব থেকে পরীক্ষা নেয়া হলো, তখন তিনি ভালো নাম্বার পেয়ে পাশ করলেন। এতে মাওলানা নজির আহমদ সাহেব বিস্মিত হয়ে জানতে চাইলেন সে কার ছেলে?! বাবার চেয়ে দাদা এলাকায় বেশী পরিচিত থাকায় দাদা হাজী নাসিরুদ্দীন খরোত্তিয়ার নাম উল্লেখ করে বলা হলো, তার নাতি। তিনি অবাক হয়ে বললেন, কেনই বা হবে না! হাজি নাসিরুদ্দীন খরোত্তিয়া এর অবদান হলো, যখন মাওলানা নাজির আহমদ সাহেব রহ. এ এলাকায় আত্মশুদ্ধির কাজ শুরু করেন, তখন ওই ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে হাজি নাসির উদ্দিন খারোত্তিয়া গাঠামনের ওই চার ব্যক্তিত্ববানদের একজন যারা সর্বাগ্রে মাওলানা নাজির আহমদ সাহেবের ডাকে সাড়া দিয়ে দীন ও ঈমানের পথ অবলম্বন করেন। হাজি নাসিরুদ্দীন সাহেবের ত্যাগ স্মরণে এলো। আর ওই ত্যাগের ফলাফল আজ নিজ চোখে দেখেছেন।

দুনিয়াবিমূখতা ও ইখলাসের গুণে গুণান্বিত মাওলানা আব্দুল হাফিজ সাহেবের ওই সময় মাসিক বেতন ছিলো বিশ রূপি। তিনি নিজের সাথে তাঁর ছোট দুই সন্তানকেও নিয়ে এসেছিলেন। প্রতি শুক্রবার পায়ে হেঁটে পালনপুর যেতেন এবং প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের সাথে ছয়টি মূলাও নিয়ে আসতেন। যা তাঁর পুরো সাপ্তাহের তরকারীর প্রয়োজন মেটাতো। মূলা আলমারীতে তালাবদ্ধ করে রেখে দিতেন এবং প্রতিদিন একটি মূলা দিয়ে তরকারী পাকাতেন। এভাবে পুরো সপ্তাহ অতিবাহিত করতেন।

মাওলানা আব্দুল হাফিজ সাহেব একবার ক্লাসের বাইরে অর্থাৎ ভিন্ন সময় মসজিদের হাউজের পাশে বসে হেদায়াতুন্নাহু পড়াচ্ছিলেন, তাঁর ছেলে আব্দুল হাসিব তখন খুবই ছোট। তখন সে কাছে এসে বলতে লাগলো আব্বাজী!

ক্ষুধা লেগেছে তাড়াতাড়ি ঘরে চলো। না হয় সব মূলা খেয়ে ফেলবো। স্বল্প বেতনে তিনি শুধু মাদরাসার সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে নিয়মিত ক্লাসই নিতেন না, বরং ক্লাসের সময় ব্যতীত ভিন্ন সময়েও পড়াতেন। ছাত্রদের পড়ার আগ্রহ উনার মতো এমন মুখলেছ শিক্ষককে পড়াতে বাধ্য করেতো।

মাওলানা ইউনুস পালনপুরী বলেন, আমার আব্বা মাওলানা ওমর পালনপুরী বলতেন, একবার আমার মা সম্মানিত শিক্ষকের কাছে পাঁচ টাকা হাদিয়া স্বরূপ পাঠালেন তখন তিনি কান্না করলেন এবং ফেরত পাঠিয়ে বললেন, আমি মোহাম্মদ ওমরের ওপর নিজের আখেরাতের জন্য পরিশ্রম করছি। বছরের মধ্যবর্তী সময়ে একবার মাওলানা আব্দুল হাফিজ সাহেব নিজ বাড়ি যাচ্ছিলেন। তখন দাদীর কাছে প্রস্তাব পাঠালেন– আমি আপনার ছেলেকে আমার সাথে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে চাচ্ছি। যেন তার পড়ার কোনো ক্ষতি না হয়। আলেম বানানোই তো ছিলো মায়ের আকাঙ্ক্ষা ও স্বপ্ন। সুতরাং এতো অভাব-অনটনের মাঝেও পঞ্চাশ রূপি ধার করে আব্বার হাতে দিলেন এবং তিনি স্বীয় উস্তাদের সাথে রওয়ানা হলেন।

দুনিয়া পায়ের নীচে এসে পড়বে

এমতাবস্থায় মুম্বাই থেকে আত্মীয়-স্বজন মাওলানার মায়ের কাছে এসে বোঝাচ্ছিলেন যে, স্কুলের ফলাফল তাঁর ভালো। ২৬টি রাণী মার্কা কয়েন পুরস্কার হিসেবে সে পেয়েছে। তাঁকে মাদরাসায় পড়িয়ে মোল্লা মৌলভী বানিয়ে কী করবে? মাওলানার "মা" তাদেরকে বললেন, তোমরা দুনিয়া দুনিয়া করো, দুনিয়া তো ওর পায়ের নিচে আসবে। ইনশাআল্লাহ!

অতএব আব্বা উনার শিক্ষকের সাথে তাঁদের বাড়িতে গেলেন। শিক্ষক পাঁচ ছয়মাস পড়ালেন এবং তারপর আব্বাকে প্রথমবারের মতো ১৯৪৪ সনে দারুল উলুম দেওবন্দে ভর্তি করালেন। উনার ভর্তি পরীক্ষা আদরের উস্তাদ মাওলানা এ'যায আলী সাহেব রহ. নিয়েছিলেন। আব্বার কাঙ্ক্ষিত কিতাবগুলোর মধ্যে কানযুদ দাকায়েক ইত্যাদি পেলেন। তখন তিনি ইলমে দীন অর্জনের জন্য খুব পরিশ্রম করলেন। এমনকি বাইশ ঘণ্টা পড়তেন আর শুধু দুই ঘণ্টা বিশ্রাম নিতেন। যে কারণে আব্বার শারীরিক অবস্থায় এর প্রভাব পড়লো এবং টি.বি রোগে আক্রান্ত হলেন। বাৎসরিক পরীক্ষার পর তিনি মোম্বাই ফিরে গেলেন। আর এটা ১৯৪৫ সনের কথা। কিছুদিন মুম্বাই থাকার পর এক চিল্লার জামাআতের সাথে দিল্লি এলেন। ওই সময় হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহ. তাঁর বিশেষ প্রতিভা ও মানসিকতা আঁচ করতে পেরে

আব্বাকে পরামর্শ দিলেন যেন মুম্বাই থেকে লেখাপড়া সম্পন্ন করে। আব্বা ওই সফরে হযরতজী ইউসুফ রহ.-এর বায়আত হন।

তিনি মুম্বাই এ নিজের কিছু ব্যবসায়িক ব্যস্ততার সাথে মাদরাসার শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। আল্লাহ তাআলা সর্বাবস্থায় উনার জন্য কোনো না কোনো মাধ্যম সৃষ্টি করে দিতেন। যা আব্বাকে সময় মতো পথ দেখাতো। আব্বা শুরু থেকেই বড়দের কথা মনোযোগী হয়ে শুনতেন এবং তার ওপর আমল করার প্রতি সচেষ্ট ছিলেন। এটাই হলো তাঁর সার্বিক উন্নতির আসল রহস্য। আসল কথা হলো, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রতিমুহূর্ত উপায় ও মাধ্যম বিরাজমান। কিন্তু প্রত্যেকে তার চেষ্টা ও তৌফিক অনুযায়ী সেখান থেকে উপকৃত হয়।

মুম্বাইয়ে পড়াশোনা ও বিবাহ

তাঁর বিবাহ হয় ৩ মে ১৯৪৬ সালে। আর স্ত্রীবরণ হয় ৫ মে ১৯৫০ সালের শুক্রবারে। তিনি হযরতজী রহ.-এর কথামতো মুম্বাইয়ে লেখাপড়া অব্যাহত রাখেন। তিনি জালালাইন শরীফ-এর বছর 'বয়ানুল কুরআন' পাঠ সম্পন্ন করেন। ১৯৫২ সালে মঙ্গোলী কেন্দুরী মসজিদে ইমামতি নেন। তখন তিনি সপ্তাহে ছয়দিনই ধারাবাহিকভাবে পড়ালেখায় মগ্ন থাকতেন আর একদিন বাড়িতে সময় দিতেন। ঘরে গিয়ে মাকে দীনি কথা শোনাতেন। তখন মা বলতেন, তোমার কথা আজ আমি একা শুনছি; কিন্তু একদিন এমন হবে যে, লক্ষ মানুষ তোমার কথা শুনবে।

তাঁর মায়ের দু'টি ভবিষ্যদ্বাণীই আল্লাহ তাআলা হুবহু বাস্তবায়ন করে দেখালেন। প্রথম ভবিষ্যদ্বাণী ছিলো, দুনিয়া তাঁর পায়ে এসে পড়বে। আর দ্বিতীয়টি হলো, দীন ও ঈমানের কথা তোমার থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ শুনবে। আব্বাজান রহ. এ সম্বন্ধে বলতেন, যে দীন ও ঈমানের মেহনত ইখলাছের সাথে করবে আল্লাহ তাআলা দুনিয়া তার পায়ের কাছে এনে দেবে। আর যে দীন ও ঈমানের মেহনত করবে না সে যদিও দুনিয়া অর্জন করবে তবে তা অসম্মানের সাথে পাবে। (এই কথাগুলো আব্বার নিজের মুখের কথা) আর উনার সম্পূর্ণ জীবনই তার সাক্ষী।

তাঁর শিক্ষাজীবন চলছিলো। এদিকে তখন পারিবারিক অবস্থা ছিলো খুবই দুর্দশাগ্রস্থ। কিন্তু তিনি দৃঢ়তা ও সাহসিকতার পাহাড় হয়ে সর্বদা লেখা পড়ায় মগ্ন থাকেন। তিনি 'মেশকাতে'র বছর মাজাহেরে হক আদ্যোপান্ত অধ্যয়ন করেন। কখনো কখনো তাবলীগের কাজে অংশ নিতেন।

চার মাস তাবলীগ জামাআতে

এরই মাঝে দিল্লী মারকায থেকে মুম্বাইয়ে একটি জামাআত এলো। যার আমীর কারী আব্দুর রশীদ খুরযুবী রহ.। তিনি আমার আব্বাকে চার মাসের জন্য তাশকীল করলে তিনি চার মাসের জন্য তৈরি হয়ে যান। জামাআতের সাথে তাঁর বিছানাপত্র নিয়ে স্টেশনে গেলেন। আব্বার আত্মীয়-স্বজনরা জানতে পেরে তারাও স্টেশনে উপস্থিত হলেন। তারা আব্বাকে ঘরের অভাব অনটনের অবস্থার কথা বলে সফরে না যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করলেন। কিন্তু ওই জামাআতের এক সঙ্গী (এদারায়ে এশায়াতের কর্ণধার মুনশী আনিছ) আব্বাকে এক পাশে নিয়ে গিয়ে বললেন, নবীওয়ালা কাজ করবে তো আল্লাহ তোমাকে নৈরাশ করবেন না, বরং আল্লাহ তোমাকেও আলোকিত করবেন এবং তোমার পরিবারকেও আলোকিত করবেন।

مطلق آں آواز حق از شہ بود ☆ گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود

ওই স্বাধীনচেতা কণ্ঠ তো বাস্তবে আল্লাহরই হয়
যদিও সেটা মানুষের কণ্ঠ থেকে বের হয়।

আব্বাজান অবশেষে দৃঢ়তার সাথে স্থির করলেন এবং বিছানাপত্র নিয়ে জামাআতের সাথে রওয়ানা হলেন। আব্বা বলতেন, আমার ওই চার মাস আজ পর্যন্ত পূর্ণ হয়নি। আর আল্লাহ যেন পুরা না করেন। আর আল্লাহ তাআলা উনার এই দোয়া কবুল করে নিলেন। তবে তিনি মৃত্যু পর্যন্ত এই পথেরই যাত্রী ছিলেন। এমনকি আল্লাহর রাস্তায়ই মৃত্যুর পরওয়ানা এসে পৌঁছে।

এই জামাআত যখন কাজ করে দিল্লি মারকাযে পৌঁছলো তখন এখানে আব্বার মুরুব্বী ও পৃষ্ঠপোষক হযরত ইউসুফ রহ. বললেন, মোহাম্মদ ওমর! এখন তুমি লেখাপড়া শেষ করে নাও। কেননা আব্বার লেখাপড়া তখন মেশকাত পর্যন্ত হয়েছিলো এবং দাওরায়ে হাদীস তখনও অবশিষ্ট ছিলো।

আব্বাজান জামাআতের সময় পূর্ণ করে মুম্বাই পৌঁছলেন। উনার এই কার্যক্রম করতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হলো। এমনকি তিনি ঋণগ্রস্থও হয়ে গেলেন। এদিকে সন্তানাদির ভরণ-পোষণের প্রশ্ন কিন্তু আখেরাতের চিন্তা এবং উম্মতের প্রতি সহমর্মিতা সৃষ্টি হয়েছিলো। আর লেখাপড়া শেষ করাটা প্রয়োজন মনে করছিলেন। কেননা এই আকাঙ্ক্ষা উনার মমতাময়ী মায়েরও ছিলো এবং এই আশা তাঁর মুরুব্বী হযরত ইউসুফ রহ.-এরও ছিলো।

আব্বাজান-এর মা শয্যাশায়িনী। তিনি চলাফেরা করতে, দেখতে ও শুনতে অপারগ হয়ে গিয়েছিলেন। সবদিক থেকে অবস্থা কঠিন থেকে কঠিনতর ছিলো। এতোকিছুর পরও তিনি শিক্ষার জন্য বের হওয়ার মনস্থ করে ফেললেন এবং মায়ের কাছে অনুমতি চাইলেন। মা বললেন, বেটা আমাদেরকে ছেড়ে যাবে? বললেন, আল্লাহর দীন শিখতে যাচ্ছি। মা বললেন, বেটা! যাও, মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে দিলেন এবং তিনি আল্লাহর সত্তার ওপর নির্ভর করে শিক্ষা সমাপন করতে দেওবন্দ রওয়ানা হলেন।

দ্বিতীয়বার দেওবন্দে ভর্তি

মুম্বাই থেকে দিল্লী মারকায মসজিদে পুরো রমযান এতেকাফ করে তিনি দারুল উলুম দেওবন্দে দ্বিতীয়বার ১১ই জুন ১৯৫৫ সালে ভর্তি হলেন। ভর্তি পরীক্ষায় সফল হয়ে দাওরায়ে হাদীসে ভর্তি হলেন। ওই সময় দারুল উলুম দেওবন্দে তাঁর অনেক আত্মীয়স্বজন, কর্মজীবি, শিক্ষক ছিলেন। বিশেষ করে আব্বার বুখারী শরীফের উস্তাদ শাইখুল ইসলাম মাওলানা হোসাইন আহমদ মাদানী রহ.ও ছিলেন। তিনি লেখাপড়ায় মগ্ন হয়ে গেলেন। কিন্তু নিজের পৃষ্ঠপোষক ও মুরুব্বী মাওলানা ইউসুফ রহ.-এর উপদেশ সর্বদা স্মরণ রাখতেন। তিনি বলেছিলেন, তোমাকে ইলমও অর্জন করতে হবে, তাবলীগও করতে হবে। তাবলীগে এতো বেশী মগ্ন হবে না যেন লেখাপড়ার ক্ষতি হয়। আর লেখাপড়ায়ও এতো বেশী মগ্ন হবে না যে, তাবলীগের ক্ষতি হয়। তিনি ওই উপদেশের পরিপ্রেক্ষিতে নিজের সময়ের রুটিন এভাবে করলেন যে, প্রতি সপ্তাহে চার ঘণ্টা তাবলীগের জন্য বের করতেন। আর পুরো সাপ্তাহের কাজের রুটিন এই চার ঘণ্টায় জমাতেন। এভাবেই উনার তাবলীগ ও লেখাপড়া দুটোই চলতে থাকে।

ওই সময় দেওবন্দ কেনো; পুরো দেশেই তাবলীগের পরিবেশ এতো ব্যাপক ছিলো না। এ জন্য কিছু ছাত্র আব্বাকে তিরস্কার করতো, কিন্তু আব্বা তাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে লেখাপড়া ও তাবলীগ দুটোই চালিয়ে যাচ্ছিলেন। ছাত্রদের সাধারণ মানসিকতা ছিলো, মেধাহীন ছাত্ররা তাবলীগের কাজ করে অথবা মেধাবীরা একাজে জড়িত হয়ে মেধাহীন হয়ে যায়। যখন ত্রিমাসিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ হলো, তখন তিনি সম্মানজনক নাম্বার পেয়ে দাওরায়ে হাদীসে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ছাত্ররা তারপর থেকে তাঁর অনুসারী হয়ে যায়। তিনি এহেন পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে তাবলীগের প্রতি আরো মনোযোগী হন।

মা মৃত্যুশয্যায়

যখন তাঁর আম্মাজান মৃত্যুশয্যায় শায়িত তখন আত্মীয়স্বজন বললেন, দেওবন্দ থেকে মোহাম্মদ ওমরকে ডেকে পাঠাও। তখন তিনি বললেন, না না! তাঁকে ডাকবে না। সে তো দীনের কাজে গিয়েছে। আমার তো এমনিতেই খালি হাত, এই একটি উপায়ই তো আছে আখেরাতে আমার মুক্তির জন্য। যদি আল্লাহ আমাকে জিজ্ঞেস করে, কী নিয়ে এসেছো? তখন আমি বলবো, আমার সন্তানকে তোমার রাস্তায় রেখে এসেছি। যাকে আমি তোমার জন্য পৃথক করেছি।

যখন মৃত্যুর সময় ঘনিয়ে এলো তখন তিনি বললেন, আমি সুঘ্রাণ পাচ্ছি। অথচ নাক-কান তখন অবশ হয়ে ছিলো। এরপর তিনি সালাম দিলেন এবং হাসলেন। অতঃপর জ্ঞান হারালেন। জ্ঞান ফেরার পর ঘরের লোকজন জিজ্ঞেস করলো, আম্মা! আপনি কাকে সালাম দিলেন এবং কেনো হাসলেন? তখন বললেন, আমি আমার ছেলে মোহাম্মদ ওমরকে দুই ফেরেশতার মাঝে দেখেছি। তা দেখে আমি তাকে সালাম দিই এবং হেসে উঠি। তারপর এই ইবাদতগুজার ও দুনিয়াবিমূখ মহিলা দুনিয়ার অভাব-অনটন সহ্য করে নিজের ছেলেকে আখেরাতের চিন্তায় সজ্জিত করে আল্লাহর কাছে সঁপে দিয়ে পরপারে পাড়ি জমালেন। رحمها الله رحمة واسعة

ওই দিনটি ছিলো ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৫৫ সাল।

এদিকে তিনি নিজের মা'কে স্বপ্নে দেখে তখন জিজ্ঞেস করলেন, মা! আপনি কোথায়? তখন আরবীতে উত্তর দিলেন, اَنَا فِى الْجَنَّةِ 'আমি জান্নাতে'। আর বললেন, তুমি আমাকে হজ করাও নি। পরবর্তীকালে তিনি নিজের মায়ের পক্ষ থেকে হজ আদায় করে সাওয়াব পৌঁছে দিলেন।

কিছু মহিলার মাধ্যমে পুরো বংশে ঈমানের আলো জ্বলে ওঠে

তিনি বলতেন, শৈশবে আম্মাজান আমাকে সবসময় সঙ্গে রাখতেন এবং রাতেও পৃথক করতেন না। দীন ও ঈমানের অনেক কথা শোনাতেন। দীর্ঘ নামায পড়াতেন, দীর্ঘ দোয়া করাতেন এবং আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা ও মালিক সে কথা বোঝাতেন। একবার আমাদের এলাকায় একটি ঘর বিক্রি হলো। তখন আম্মা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কার ঘর বিক্রি হয়েছে? আমি উত্তরে বললাম, ওই ঘরের মালিক পারস্য দেশীয় ছিলো।

আমার মুখ থেকে 'মালিক' শব্দ শুনে অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হলেন। মালিক তো 'আল্লাহ'। তুমি পারসীকে মালিক কেনো বলো? অবশেষে মারয়াম খালা সুপারিশ করাতে আম্মার রাগ কমলো। এই ছিলো তাঁর মায়ের শৈশবকালে সন্তান লালন-পালনের ধরণ। যা আমাদের জন্য শিক্ষণীয়।

جسے تو غم سمجھتا ہے خزانہ ہے مسرت کا ☆ جسے تو چشم تر کہتا ہے سرچشمہ ہے رحمت کا

যাকে তুমি কষ্ট বলছো, সেটি আসলে সুখের উৎস
যাকে বলছো আদ্র নয়ন, সেটি মূলতঃ রহমতের উৎস।

সময়ের মূল্য

তিনি ছাত্রজীবনের সময়গুলোও অত্যন্ত অভাব অনটনে অতিবাহিত করেছেন। অনেক সময় প্রদ্বীপ জ্বালানোর জন্য তেল ক্রয় করতে পারতেন না। তখন তিনি রাস্তার বাতির আলোতে পড়তেন। নিজের কোনো সময় নষ্ট হতে দিতেন না। এমনকি কোনো আত্মীয়স্বজন যদি দেখা করার জন্য মাদরাসায় চলে আসতো তখন মুখ থেকে 'ইন্নালিল্লাহ' বের হয়ে যেতো। কারণ, এখন তো সময় নষ্ট হবে। মাদরাসা ঘুরে দেখানোর মতো কোনো সাথী পাওয়া গেলে তিনি খুব খুশী হতেন যে, সময় নষ্ট হওয়া থেকে বেঁচে গেলো। এভাবে সময়ের মূল্যায়ণ করার কারণে দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষায়ও সন্তোষজনক নাম্বার অর্জন করেন।

মাওলানা এর কারণ বর্ণনা করেন যে, পরীক্ষার খাতায় প্রতিটি প্রশ্নের উত্তরে আমি হাশিয়া ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাখ্যা লিখতাম। এছাড়া হাদীসের উত্তরে হযরতজী ইউসুফ রহ. থেকে শোনা ইলমী কথাও যথাস্থানে জুড়ে দিতাম। আর এ সমস্ত কথা পরীক্ষক-এর জন্য নতুন মাত্রা যোগ করতো। এভাবে বার্ষিক পরীক্ষায়ও ভালো নাম্বার পেয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে ছিলেন। ১৮ এপ্রিল ১৯৫৬ সালে দাওরায়ে হাদীস পাশ করেন।

লক্ষ মানুষের সামনে দীন ও ঈমানের বয়ান

ভারত ও অন্যান্য দেশে যে সমস্ত ইজতেমা হতো সেখানে বিশেষ করে উনার বয়ান নির্দিষ্ট করা থাকতো। লক্ষ লক্ষ মানুষ মনোযোগ দিয়ে তাঁর দীনি ও ঈমানী কথা শুনতো। তাঁর দীনি ও ঈমানী কথাগুলো পূর্ণ ইখলাছ ও দরদমাখা ছিলো। ফলে হাজারো মানুষের জীবনের মোড় পাল্টে যেতো। হাজারো পথভ্রষ্ট মানুষ সঠিক পথের দিশা পেতো। হাজারো মৃত অন্তর

সজীবতা ফিরে পেতো। হাজারো মানুষ নিজের জানমাল আল্লাহর রাস্তা ব্যয় করার দৃঢ় সঙ্কল্প করতো এবং প্রচুর মানুষ তৎক্ষণাৎ আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে যাওয়ার জন্য তৈরি হয়ে যেতো।

দাওয়াতের মেহনতের জন্য তিনি প্রায় একাশি বার বিদেশ সফর করেছেন এবং হজের জন্য বিশ বার সফর করেছেন। তাঁর এই তাবলীগী মেহনত ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে প্রায় চল্লিশ বছর পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। কখনো লক্ষাধিক মানুষ তাঁর বয়ান শুনতো। এতোগুলো স্থানে এ জাতীয় বয়ান এবং অগণিত শ্রোতা ইতিহাসে খুবই বিরল। একজন মানুষ হয়ে অগণিত মানুষের নিকট দীন ও ঈমানের কথা পৌঁছে দিয়েছেন।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ.

এটা আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ, যাকে ইচ্ছা তাকেই শুধু তা দান করেন। আর আল্লাহ তাআলা অশেষ অনুগ্রহের অধিকারী।

এই সফরসমূহ, অক্লান্ত পরিশ্রম ও তার পরিণামে দীনের সম্পর্কের ওপর মানুষের কর্মকাণ্ড একজন মানুষের পক্ষে সম্ভব না। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাআলার সাহায্য না থাকবে। এটা তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় কারামত যা আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছিলেন।

আল্লাহর তাআলার ওয়াদা হলো. اِنْ تَنْصُرُاللّٰهَيَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ. যদি তুমি আল্লাহকে সাহায্য করো তাহলে আল্লাহ তাআলা তোমাকে সাহায্য করবেন।

যে ব্যক্তি দীন ও ঈমান জীবিত রাখার মেহনত করবে আল্লাহ তাআলা তার সাহায্য করবেন। কিন্তু দরদ ও ইখলাছ যে পরিমাণ থাকবে সে পরিমাণ উপকৃত হবে। তাঁর সত্তার মাঝে আল্লাহর পক্ষ থেকে উম্মতের জন্য অনেক দরদ ছিলো। দীন ও ঈমানের দাওয়াত দেওয়া ব্যতীত তাঁর অস্থির হৃদয় কখনো প্রশান্ত হতো না। তিনি তাঁর অধিকাংশ বয়ানে এই কবিতা আবৃতি করতেন।

دردِدل کے واسطے پیدا کیا انسان کو☆ورنہ طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کروبیاں

মানুষকে তো সৃষ্টিই করা হয়েছে অন্তর ও আন্তরিকভাবে বিভূষণে,

নতুবা শুধু হুকুম মানার জন্য তো ক্ষুদ্র পাখিই যথেষ্ট।

ক্ষুধার্তকে খাবার দেওয়া, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দেওয়া এবং অভাবগ্রস্তের অভাব পূর্ণ করা এটাও অন্তরের ব্যথার অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু সবচেয়ে বড় সহমর্মিতা হলো, মানুষকে জাহান্নামের পথ থেকে ফিরিয়ে জান্নাতের পথে ধাবিত করা। তার অনন্তকালের জীবনকে সফল করার জন্য অন্তরে চিন্তা ও দরদ সৃষ্টি করা। উলামায়ে কেরাম এরই উত্তরাধিকারী।

উম্মতের প্রতি এই দরদ তাঁর মধ্যে ছিলো প্রচণ্ড রকমের। যার ওপর ভিত্তি করে অনেক অপরাগতা সত্ত্বেও ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে দৌড় ঝাপ করে সমস্ত উম্মতের মাঝে দীন ও ঈমানকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করেছেন। জীবনের শেষ নিঃশাস পর্যন্ত এই চেষ্টায় ব্যস্ত থাকেন।

ইজতেমায় তাঁর বয়ানের ধরণ

তিনি বয়ানের শুরুতে খুতবায়ে মাসনুন পড়তেন। খুতবা আরম্ভ হওয়ার সাথে সাথেই ব্যস্ত ও এদিক-সেদিক চলে যাওয়া মানুষগুলো পরিচিত কণ্ঠ শুনে ইজতেমার দিকে ছুটে এসে একত্রিত হতো এবং বয়ান শেষ না হওয়া পর্যন্ত আদবের সাথে বসে বয়ান শুনতো। তাঁর বয়ানে সাধারণত কুরআনের ঘটনা থাকতো। যার মধ্যে আল্লাহর বিধান অনুযায়ী চলে জীবন অতিবাহিতকারীর সফলতা ও আল্লাহর অবাধ্য হয়ে জীবন অতিবাহিতকারীর ধ্বংসের বর্ণনা রয়েছে সেগুলো বর্ণনা করতেন। আর জান্নাত ও জাহান্নামের বর্ণনাও বিস্তারিত করতেন। জান্নাতের আলোচনা এভাবে করতেন যেমন জান্নাতের নেয়ামতসমূহ তাঁর সামনে বিদ্যমান আর তিনি তা দেখে দেখে বয়ান করছেন।

বয়ান চলাকালে কুরআনের আয়াত বিশেষ সুললিত কণ্ঠে তেলাওয়াত করতেন। তখন পুরো মজলিসে এক ধরণের পরিবেশ সৃষ্টি হতো। আর এমন মনে হতো যেন কুরআন অন্তরে প্রবেশ করছে। তারপর আধ্যাত্মিক জ্ঞানের কথাগুলো অনুভব করা যায় এমন উদাহরণ দিয়ে বুঝাতেন এবং আল্লাহর কুদরতের কঠিন বিষয়গুলো সহজ ভাষায় উপস্থাপন করতেন। মোটকথা একটি পূর্ণাঙ্গ সুন্দর বয়ান হতো। যা থেকে সাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিরা একইভাবে উপকৃত হতো। কখনো এই কবিতাও আবৃতি করতেন,

در فیض محمد ﷺ وا ہے آئے جس کا جی چاہے

نہ آئے آتش دوزخ میں جائے جس کا چاہے

যে ভালোবাসে সে তো আসে মুহাম্মদের পুণ্যছায়ায়,

না হয় অনেকেই যায় জাহান্নামের অগ্নিপাড়ায়।

ইজতেমার সঙ্গে ছিলো তাঁর হৃদয়ে গভীর সম্পর্ক। ইজতেমার নাম আসলেই তাঁর কথা অন্তরে ও মস্তিষ্কে চলে আসতো। পৃথিবীর যে প্রান্তেই ইজতেমা হতো সেখানেই তাঁর বয়ান হতো। বয়ানে দীনের বিভিন্ন বিষয়কে খুব সহজ সরলভাবে উদাহরণ দিয়ে বোঝাতেন। বয়ান শুনে প্রত্যেকেই নিজের ভেতর আত্মিক পরিবর্তন অনুভব করতো। নতুন মানুষও এমনভাবে প্রভাবিত হতো যে, সে দাওয়াতের কাজের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যেতো।

আল্লাহর পক্ষ থেকে তাঁকে বয়ানের বিশেষ যোগ্যতা দান করা হয়েছিলো। তিনি বয়ানের শুরুতে দীনের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করতেন এবং নিজের জান মাল দীনি কাজের জন্য আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করাটা জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য, সেটা প্রমাণ করতেন। এভাবে পুরো মজমায় মানসিকতা তৈরি করে বয়ানের শেষে আরো বেশী উৎসাহ দিতেন। এতে করে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়া সহজ হয়ে যেতো। আর সবশেষে সম্মিলিতভাবে তাশকিল করতেন। সম্মিলিত তাশকিলে এমন পন্থা অবলম্বন করতেন যেন তিনি একজন একজন করে তাশকিল করছেন।

প্রত্যেকে চিন্তামগ্ন হয়ে যেতো। যারা নাম লেখাত তাদেরকে সাথে রাখতেন এবং তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়া করতেন। আর ওই সময় তিনি খুব খুশী হতেন। যতবেশী নাম লেখাত তত বেশী তিনি প্রফুল্ল হতেন। তাঁর তাশকিলে উদ্বুদ্ধ হয়ে লাখো মানুষ আল্লাহর রাস্তায় বের হয়ে নিজের অতীত কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হতো এবং সঠিক পথে ফিরে আসতো। তাঁর সারাজীবনের কর্মকাণ্ডে দৃষ্টি দিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, আল্লাহ তাঁকে এই কাজের জন্যই সৃষ্টি করেছেন। বাস্তবতাও এমনই ছিলো। বুঝ হওয়ার পর থেকেই তিনি দাওয়াতের এ কাজকে নিজের কাজ বানিয়ে নিয়ে ছিলেন। জীবনভর এটাই ছিলো তাঁর একমাত্র ব্যস্ততা। মনে হতো, এর সঙ্গে তাঁর জীবন-মরণের সম্পর্ক। তাঁর সঙ্গে সাধারণ বা বিশেষ ব্যক্তিবর্গ যেই সাক্ষাত করতে আসতো তাকেই তিনি এই কাজের দাওয়াত দিতেন।

সুযোগ অনুযায়ী কমপক্ষে তিনদিনের তাশকিল করতেন। ওই পরিমাণ সুযোগ না হলে তখন একদিন-একরাতের তাশকিল করতেন। আর তাও না হলে সকালের বয়ান শোনার তাশকিল করতেন। রাত-দিন সাধারণ ও বিশেষভাবে এটাই ছিলো দাওয়াতের ব্যস্ততা। তিনি বলতেন, এই দাওয়াতের কাজ সত্যিকারের মূলনীতির পর্যায়ে ছিলো। এ কারণে সাহাবায়ে কেরামগণ দাওয়াতের কাজকে গ্রহণ করে নিয়েছেন এবং সমস্ত পৃথিবীতে বিচরণ

করেছেন। যদি আজও মুসলিম উম্মাহ এই কাজকে মূল কাজ বানিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহর ওয়াদা যে বিষয় সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর বেলায় পূর্ণ হয়েছে সেটা আজও পূর্ণ হবে।

আল্লাহ তাআলা তাঁর অনুগ্রহ ও দয়ায় দীনি ও দুনিয়াবী সজীবতা সৃষ্টি করে দিবেন। তাঁর চিন্তা-চেতনা, দরদ ও চেষ্টার ফলে আল্লাহ তাআলা তাঁকে এই কাজের উন্নতি ও উৎকর্ষের জন্য নিত্য নতুন কৌশল উদ্ভাবনের পথ দেখিয়ে ছিলেন। তিনি ওই ভাবে উম্মতে মুসলিমাকে পথ দেখাতেন।

জীবনের শেষ দিনগুলো

তাঁর সর্বশেষ হজ হয়েছিলো ১৯৯৭ সালে। বাইতুল্লাহর সফর থেকে ফিরে আসেন ২৯ এপ্রিল ১৯৯৭ সালে বস্তি নিজামুদ্দিনে। তাঁর শারীরিক অবস্থা অনেক দিন যাবত খারাপ ছিলো। কখনো সুস্থ কখনো অসুস্থ থাকতেন। কিন্তু তিনি দৃঢ়চেতা ও হিম্মতের পাহাড় ছিলেন। যখনই কিছুটা সুস্থতা অনুভব করতেন তখনই অভ্যাস অনুযায়ী বয়ান চালিয়ে যেতেন।

ওই সময় মাওলানার বাড়ি 'ঘাটামন' থেকে কিছু বন্ধুবর্গ ও আপনজন নিজামুদ্দীনে এলেন। উদ্দেশ্য ছিলো ঘাটামনের ইজতেমায় যেন মাওলানা অংশগ্রহণ করেন। তাদের পীড়াপীড়িতে তিনি ঘাটামন ইজতেমার উদ্দেশে রওনা হলেন। দিল্লী থেকে প্লেনে আহমাদাবাদ এবং সেখান থেকে 'কাকোসী' মাদরাসায়ে নাযীরিয়ায় পৌঁছলেন। সেখানে তাঁর সংক্ষিপ্ত বয়ান হলো। যে বয়ানে তিনি ছাত্রজীবনের প্রাথমিক অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেন। তারপর তিনি নিজের বাড়ি ঘাটামন গেলেন। ইজতেমা তিন দিনের জন্য ছিল। আলহামদুলিল্লাহ! সেদিন শরীর সুস্থ ছিলো। গ্রামের সবার সাথে পরিচয় ও সাক্ষাত হলো, এমনকি নিজের শৈশবকালের হিন্দু সাথীদের সাথেও সাক্ষাত করলেন এবং তাদেরকে দীনের দাওয়াত দিলেন।

স্বদেশবাসী ও কওমের উদ্দেশ্যে শেষ বয়ান

দিনটি ছিলো আনুমানিক ১৯৯৭ সালের ১৭ই মে। তাঁর ইন্তেকালের প্রায় চারদিন আগে নিজ গ্রামে ঘাটামন এলাকার লোকদের উদ্দেশ্যে বয়ান করেন। কার জানা ছিলো যে, দীন ও ঈমানের আলো বিকিরণকারী এই সূর্য এত শীঘ্রই অস্ত যাবে। তিনি এই বয়ানে প্রথমে বিদেশ সফরের আলোচনা করছিলেন এবং ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর যে সমস্যা এসেছে তার উদাহরণে সিদ্দিকী যুগের সমস্যার কথা পুনরাবৃত্তি করছিলেন। ওই সময়

সাহাবায়ে কেরাম রা. কোন ধরনের আমল করেছেন, আমাদেরও ওই কার্যক্রমগুলো অবলম্বন করতে হবে। তার ওপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। জাতির প্রতি দরদি ও চিন্তাশীল এই ব্যক্তি যে শেষ বয়ান করে চিরদিনের জন্য সফর করবে এটা তো আল্লাহ ছাড়া কারো জানা ছিলো না।

বয়ানের পর পূর্ণ আগ্রহ ও উদ্দীপনার সাথে পুরো মজমায় তাশকিল করলেন এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা বের হওয়ার নিয়ত করেছেন তাদের জন্য বিশেষভাবে দোয়াও করেছেন। সর্বশেষ পুরো মজমার লোকদেরকে উচ্চ কণ্ঠে তিনবার সালাম দিলেন এবং মজমার সবাই এক বাক্যে সালামের উত্তর দেন। দোয়ার মধ্যে তিনি এ কথাও বললেন, হে আল্লাহ! আমি এখন দূর্বল হয়ে গেছি। অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে এ মজমা অনুষ্ঠিত হচ্ছে, তুমি তাদেরকে নিরাপদে রেখো।

এরপর চারদিন পর ঘাটামন থেকে গাড়ি করে আহমাদাবাদ আসেন। সেখান থেকে দিল্লীর উদ্দেশে রওয়ানা করলেন এবং দিল্লী মারকায বস্তি নিজামুদ্দীন পৌঁছলেন। সকালে আশুরার দিবস অনুযায়ী বয়ান হলো। ১৪১৮ হিজরীর ১০,১১,১২ মহররম, মাদরাসার ইজতেমার জন্য তাঁর সফরের প্রয়োজন হয়। প্রথমে গাঙ্গোরা জেলায় ইজতেমা ছিলো, সেখানে অংশগ্রহণের জন্য গাড়িতে করে রওনা হন।

১৯৯৭ সালের ২১ মে ফজর নামাযের পর খাদেমকে বললেন, আমাকে গাড়িতে বসিয়ে দেয়া হোক। যেন আমার কারণে কারো অপেক্ষা করতে না হয়। তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী গাড়িতে বসানো হলো। কিন্তু তিনি খুব চুপচাপ ছিলেন। সফর শুরু হলো। ওই সফরে তাঁর সঙ্গে দু'জন খাদেম ছিলো। গাড়ি খুরজা পৌঁছলে কথা অনুযায়ী সেখানে দোয়ায় শরীক হন। সেখানে এসে তিনি ইস্তিঞ্জা করেন। ওই সময় মনবল একদম ভেঙ্গে গিয়ে ছিলো। কিছু খাওয়ার সাহস হচ্ছিলো না। তিনি বললেন, আমাকে ঔষধ খাইয়ে গাড়িতে বসিয়ে দাও। যখন তাঁকে বলা হলো, এক ঘণ্টা বিশ্রাম করে নিন পরে যাবো। তখন তিনি বললেন, আমি এখানে থাকতে চাইনা। কাফেলা থেকে আলাদা হয়ে থাকবো কেনো? আমাকে সাথে নিয়ে যাও।

গাড়িতে বসার পর খাদেম তাঁর অবস্থা খারাপ দেখে আরজ করলো, হযরত! আমরা আপনাকে মারকায বস্তি নিজমুদ্দীনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবো। তিনি বললেন, কাফেলার সাথে তো কথা হয় নি। অথচ তাঁর শারীরিক অবস্থা খুবই দূর্বল অনুভূত হচ্ছিলো। এ জন্য খাদেম বললো, কাফেলাকে আমি

জানিয়ে দিচ্ছি। তিনি বললেন, হ্যাঁ। আমার কারণে যেন তারা পেরেশান না হয় এবং অপেক্ষা করার যে কষ্ট তা যেন না হয়। এটা তাঁর মৃত্যুর আগের দিনের ঘটনা। এতো কষ্টের পরও অন্যকে কষ্ট দেওয়া পছন্দ করেন নি। যখন খাদেম বললো যে, আলীগড়ে ফোন করে জানিয়ে দেয়া হয়েছে। তখন তিনি বললেন, তাড়াতাড়ি ফিরে চলো। এটাই খুরজা থেকে তাঁর চির বিদায় নিয়ে ফিরে আসা। যেখান থেকে দারুল উলুম দেওবন্দে লেখাপড়া শেষ করার পর তাঁর তাবলীগের প্রথম সফর হয়েছিলো এবং যেই জামাআতের আমীর তাঁর প্রথম চার মাসের তাশকিল করে ছিলেন তিনিও খুরজার অধিবাসী ছিলেন। অর্থাৎ ক্বারী আব্দুর রশিদ সাহেব রহ. তাঁদের দু'জনের কবরই পাশাপাশি বিদ্যমান।

দীন ও ঈমানের আলো বিকিরণকারী চিরদিনের জন্য অস্ত গেলেন

খুরজা থেকে ফিরে আসার পর তাঁকে সোজা হাসপাতালে নেয়া হলো। চিকিৎসা শেষে দ্বিতীয় দিন সুস্থ হওয়ার কারণে সকাল এগারোটায় বস্তি নিজামুদ্দীনে নিয়ে আসা হলো। ভক্তবৃন্দ ভালোবাসার অতিশয্যে তাঁকে দেখে খুশিতে সবাই হাতে হাত রেখে উঠিয়ে নিয়ে এলো এবং তাঁর ঘরে শুইয়ে দিলো। কার জানা ছিলো যে, এই পৃথিবীর জেলখানা থেকে পাখি নিজের পিঞ্জিরা ছেড়ে চলে যাবে। সবাই তাঁর সুস্থতা লাভে উৎফুল্ল ছিলো। তিনি বিশ্রাম করছিলেন। প্রায় বারোটার দিকে দীন ও ঈমানের আলো বিকিরণকারী সূর্য চিরদিনের জন্য অস্ত গেলো। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন..।

اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ، اَللّٰهُمَّ أْجُرْنَا فِيْ مُصِيْبَتِنَا وَاخْلُفْ لَنَا خَيْرًا مِنْهُ.

১৯৯৭ সালে ২২ মে এই দিনটি মুসলমানদের জন্য অনেক বড় দুর্দিন ছিলো। বিদ্যুৎ গতিতে চার দিকে খবর ছড়িয়ে পড়লো। এই দুর্ঘটনা অসংখ্য মানুষের অন্তরকে আহত করেছে। তিনি ছিলেন উম্মতে মুসলিমার জন্য খুব বেশী চিন্তাশীল ব্যক্তি। রাতে উঠে অসীম দয়াময় আল্লাহর সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ক্রন্দন করতেন। রাসূল সা.-এর নিয়ে আসা দীনের প্রতি তাঁর হৃদয়ে অসামান্য ব্যথা-বেদনা ছিলো। উম্মতের দুর্দশা তাঁকে পেরেশান করতো। বাস্তবতা হলো, তাঁর ইন্তেকালের মাধ্যমে এ যুগের সবচেয়ে বড় দীনি আলো নিভে গেলো। মুসলিম উম্মাহ মহান অভিভাবক থেকে বঞ্চিত হলো। আর গোটাপৃথিবী মৃত্যু শোকে শোকাহত হয়ে গেলো। কবির ভাষায়— বাজার ফেকাশে হয়ে গেছে তার উজ্জ্বলতা হারিয়েছে। মাহফিলের আলো নিভে গেলো।

চতুর্দিক উদাসীনতায় ছেঁয়ে গেলো এবং সর্বদিক থেকে পৃষ্ঠপোষক ও ভক্তবৃন্দ দলে দলে শেষ দেখার জন্য আসতে লাগলো। সবাই আখেরাতের এই যাত্রীর সাথে শেষ দেখার পর্ব শেষ করে তেলাওয়াতে মগ্ন হলো। কেউ আহ্ আহ্ করছিলো। আর কেউ বলছিলো, আমাদের অবস্থা কে জিজ্ঞেস করবে? আমাদেরকে কে পথ দেখাবে? কে হবে স্বয়ংসম্পূর্ণ পথ প্রদর্শক? যিনি আল্লাহর দিকে এমন উত্তম পন্থায় নিয়ে চলবে যেভাবে এই মর্দে মুজাহিদ চলতেন। হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহ., হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান রহ., হযরতজী মাওলানা আযহারুল হাসান রহ. সবাই তো একের পর এক পরপারে চলে গেছেন। তাই চিন্তা করার ও সান্ত্বনা দেওয়ার মতো তিনিই ছিলেন। যিনি সমস্ত উম্মতের উপকার করেছেন এবং দাওয়াতের কাজ আগলে রেখে সমৃদ্ধি করেছেন। আজ তিনিও বিচ্ছেদের গ্লানী দিয়ে গেলেন। প্রত্যেকে চিন্তিত ও হতভম্ব ছিলো। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট হওয়া ছাড়া তো কোনো উপায়ও নেই।

এশার নামায পর্যন্ত বস্তি নিজামুদ্দীনের অলি-গলি লোকে লোকারণ্য ছিলো। লোকসমাগম বেশী হওয়ার কারণে হুমায়ূন মাকবারার সামনের পার্কে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। সেখান থেকে পাঁচপিরা কবরস্থানে জানাযা নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানে একদিকে হযরত মাওলানা উবায়দুল্লাহ রহ.-এর কবর, অন্য দিকে কারী আব্দুর রশিদ খুরজুরী রহ.-এর কবর এবং সামনের দিকে জনাব মুনশী বশির আহমদ রহ.-এর কবর। আর সবার মাঝে সমস্ত পৃথিবীকে নির্বাককারী ও আল্লাহর কথা যিনি মানুষের নিকট পৌঁছে দিতেন ক্লান্ত মুসাফির নিজেই নিশ্চুপ নিস্তব্ধ হয়ে ঘুমিয়ে রইলেন।

শোক জ্ঞাপন

[রায়েবেণ্ড শূরার সাথীদের পক্ষ থেকে শোক প্রকাশ]

ঠিক দুপুর দেড়টায় হৃদয় বিদারক এই দুর্ঘটনার খবর পেলাম। إِنَّا لِلّٰهِ تَعَالٰى مَاأَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمّٰى. আমাদের সবার অন্তরেই আঘাত লেগেছে। আমরা সবাই তখনই বিভিন্ন আমল ও দোয়ায়ে মাগফেরাতে মগ্ন হই। যোহরের পর মাদরাসায় কুরআন খতম হলো। এখনও পর্যন্ত ইসালে সাওয়াবের ধারাবাহিকতা চলছে। তাঁর বিদায়ে সাধারণভাবে মুসলিম উম্মাহ এবং বিশেষভাবে তাবলীগী ভাইদের বড় ক্ষতি হয়েছে। اَللّٰهُمَّ أَجِرْنَا فِيْ مُصِيْبَتِنَا هٰذِهٖ وَاخْلُفْ لَنَا خَيْرًا مِّنْهَا.

হযরত মাওলানা ইউসুফ রহ.-এর যুগে তিনি তাবলীগে অংশ নিয়েছেন। আর পর্যায়ক্রমে অনেক ত্যাগ স্বীকারের মাধ্যমে তিনি সামনে অগ্রসর হতে থাকেন এবং ওই মেহনতের সাথে মিশে গিয়েছিলেন। মারকাযে নিজামুদ্দীনের শোভা ছিলেন এবং হযরত মাওলানা এনামুল হাসান রহ.-এর যামানায়ই বয়ানের দায়িত্ব তাঁর ওপরই ন্যস্ত হয়।

হযরতজী রহ. যে শূরা গঠন করেন তিনিও ওই শুরায় সম্পৃক্ত ছিলেন। মোটকথা আল্লাহ তাআলা এই তাবলীগের মেহনতকে পরিচালনা ও সমৃদ্ধি করার জন্য যাদের থেকে কাজ নিয়েছেন তিনিও তাদের মধ্যে অন্যতম।

আমাদের বাৎসরিক ইজতেমায় তিনিই ছিলেন বিশেষ আকর্ষণ। মাওলানা তো এখন চলে গেছেন আর তাঁর চলে যাওয়াতে কষ্ট হওয়াটা স্বভাবগত বিষয়— ধৈর্য ধরতে হবে। এমন পরিস্থিতিতে বীরত্ব ও সাহসের সাথে কাজ করতে হবে। আর আল্লাহর ইচ্ছার ওপর সন্তুষ্ট থাকা মুমিনের পরিচয়। যখন আমরা নবী সা.-এর চলে যাওয়াকে ধৈর্য ধারণ করতে পেরেছি। যিনি ছিলেন আমাদের জান-মাল, সন্তান-সন্ততি, পরিবার-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন, উস্তাদ ও মুরুব্বী সবার চেয়েও অধিক প্রিয়। তাই মাওলানার বিদায়ও আমাদেরকে উত্তমরূপে ধৈর্য ধারণ করা উচিত। আমরা দোয়া করি, যেন আল্লাহ তাআলা তাঁর সাথে বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহপূর্ণ আচরণ করেন। পরিপূর্ণ

ক্ষমা করে দেন এবং উঁচু মর্যাদা দান করেন। তাঁর পরিবার-পরিজন ও শুভার্থীদের ধৈর্য ধারণের তৌফিক ও উত্তম প্রতিদান দান করুন। তাঁর উপস্থিতিতে আল্লাহ তাআলা মানুষকে যে বরকত ও রহমতের বারিধারায় সিঞ্চিত করছিলেন। এখনো তা অব্যাহত রাখুন। আমীন।

اَللّٰهُمَّ لاَ تَحْرِمْنَا اَجْرَهٗ وَلاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهٗ وَاغْفِرْ لَنَا وَلَهٗ.

যে আল্লাহ নববী মেহনতকে ওই যুগে আরম্ভ করে এ পর্যন্ত পৌঁছিয়েছেন এবং মাওলানাকে এই মেহনত ও উন্নতির মাধ্যম বানিয়েছেন। তিনিই মাওলানাকে কাঙ্ক্ষিত গুণে গুণান্বিত করেছিলেন। ওই সত্তা মাওলানা মরহুমের মতো গুণী হাজার নয়, বরং লক্ষ লক্ষ উম্মতে মুসলিমাকে দিতে পারেন।

আল্লাহর দরবারে আবেদন করছি, তিনি স্বীয় বিশেষ দয়া ও অনুগ্রহে এই তাবলীগের মেহনতকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করেছেন। তাঁর দ্বারা দীনকে পুরো পৃথিবীতে উজ্জীবিত করেছেন। আর এই কাজের জন্য সমস্ত উম্মতে মুসলিমাকে কবুল করে তাবলীগের গুণে গুণান্বিত করেছেন। যারা তাবলীগ করেন তাদেরকে কাঙ্ক্ষিত ত্যাগের সাথে মেহনতের মধ্যে বাহ্যিকভাবে ও অভ্যন্তরীণভাবে উন্নতি-উৎকর্ষ দান করুন। আমীন।

নিজামুদ্দীন মারকাযের খেদমতে সালাম ও শোক জ্ঞাপন। এই মুহূর্তে সবারই ভাঙ্গা হৃদয়। আপনাদের দোয়াই আল্লাহর দরবারে বিশেষভাবে কবুলযোগ্য। আমাদেরকেও আপনাদের বিশেষ দোয়ায় শরীক রাখবেন। - মাআস সালাম।

লিখন: জনাব আব্দুল ওয়াহাব সাহেব দা. বা.।

দারুল উলুম দেওবন্দের
মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে শোকবার্তা

মজলিসে শূরা দারুল উলুম দেওবন্দের এই বৈঠক হযরত মাওলানা ওমর পালনপুরী রহ.-এর মৃত্যুতে দুঃখ-বেদনা প্রকাশ করছে। আল্লাহর দরবারে হযরত মরহুমের মাগফেরাত এবং মর্যাদা উন্নতির জন্য দোয়া করছি। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ওমর পালনপুরী সাহেব রহ. দারুল উলুম দেওবন্দের পুরাতন আলেম এবং শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমদ মাদানী রহ.-এর ছাত্র ছিলেন। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর উন্নত চরিত্র, প্রতিভা, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ওপর অবিচলতা ও নেককারদের সঙ্গে সুম্পর্কের কারণে তিনি সবার প্রশংসা পেয়েছেন।

ছাত্রজীবনে একবার তিনি মারাত্মক অসুস্থ হয়ে পড়েন। ফলে বাধ্য হয়েই পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয়। তবে পড়াশোনার প্রতি তীব্র বাসনা ও আগ্রহের কারণে ক'বছর পর পুনরায় পড়াশোনায় মনোনিবেশ করেন এবং সফলতার সাথে উত্তীর্ণ হন। দারুল উলুম থেকে শিক্ষা সম্পন্ন করার পর তিনি তাবলীগ জামাআতের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন এবং পুরো জীবনটাকে তাবলীগের কাজের জন্য ওয়াক্‌ফ করে দেন।

আল্লাহ তাআলা তাঁর কথার মধ্যে খুব বেশী প্রভাব দান করেছিলেন। তাঁর বয়ানে হাজার হাজার মানুষের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসেছে। তিনি দেওবন্দের পূর্বপুরুষদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিজের সমস্ত শক্তি-সামর্থ আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে থাকেন। মরহুম মাওলানা কয়েক বছর যাবত দারুল উলুম দেওবন্দে আগমন করে ইলমী বুনিয়াদকে ঈমানী খাজনা দিয়ে যেতেন এবং দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য ছাত্রদের মানসিকতা তৈরি করতেন।

দারুল উলুম দেওবন্দের অন্যতম কৃতিসন্তান, তাবলীগ জামাআতের সাড়া জাগানো মুখপাত্র মাওলানা ওমর পালনপুরী রহ.-এর মৃত্যুতে দারুল উলুম দেওবন্দের মজলিসে শূরা আন্তরিকভাবে শোক প্রকাশ করছে। আর মরহুমের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গ ও তাঁর সাথে যারা সম্পৃক্ত বিশেষ করে তাবলীগ জামাআতের সঙ্গী-সাথীদের খেদমতে সুন্নত মোতাবেক শোক জ্ঞাপন করছি। মহান রাব্বুল আলামীনের দরবারে মিনতি হলো, তিনি যেন মরহুমকে মাগফেরাত দান করেন। উঁচু মর্যাদা দান করেন। আর তিনি যে খেদমত করে গেছেন তা যেন কবুল করে নেন। আমীন।

-মাওলানা মারগূবুর রহমান সাহেব
মুহতামিম, দারুল উলুম দেওবন্দ, ভারত

মাওলানা আবরারুল হক রহ.-এর শোকবার্তা

আজ দুপুরেই দীর্ঘ সফর থেকে ফিরলাম। আসরের সময় জানতে পারলাম হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ওমর পালনপুরী সাহেব-এর ইন্তেকাল হয়েছে। মনে খুবই কষ্ট পেলাম ও আফসোস হলো। আল্লাহ তাআলা মরহুমের মর্যাদাকে উঁচু করুন এবং তাঁর পরিবারবর্গ, আত্মীয়স্বজন সকলকে ধৈর্য ধারণ করার তৌফিক দান করুন। আকাঙ্ক্ষা ছিলো, তাড়াতাড়ি গিয়ে উপস্থিত হই। কিন্তু কষ্ট ও ক্লান্তি এতটাই তীব্র ছিলো যে, এই মুহূর্তে বাড়ির পাশের মসজিদেও উপস্থিত হতে পারছি না। তাই কিছু ঈসালে সাওয়াব ও শোক জ্ঞাপনের জন্য প্রার্থনা করছি।

হযরত মাওলানা মুফতী আব্দুর রহীম লাজপুরী রহ.-এর শোকবার্তা

মাওলানা মোহাম্মদ ওমর পালনপুরী রহ. ছিলেন অত্যন্ত মুখলেছ ও উম্মতের প্রতি দরদী আলেমে রাব্বানী। আল্লাহ তাআলা মাওলানা মরহুমকে বিভিন্ন গুণ দ্বারা সজ্জিত করেছিলেন। নিজেকে দীনের জন্য বিলীন করে দিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত দীনি চিন্তা-চেতনা ও উম্মতের দরদে অতিবাহিত হতো। তিনি বিভিন্ন রকম অসুস্থতায় ভূগছিলেন। তবুও এসবের কোনো গ্রাহ্য না করে সর্বদা দীনি কাজে মগ্ন থাকতেন। নিজের আরামকে দীনের জন্য ত্যাগ করেছিলেন। মরহুমের সাথে আমার খুবই মুহাব্বত ছিলো কেবল আল্লাহর জন্য এবং খুবই ইখলাসের সাথে সাক্ষাত হতো। ছিলো সত্যিকারের ইখলাস। রূহানী শক্তি ও আল্লাহর সাথে সম্পর্কের শক্তি ছিলো কার্যকর। অন্যথায় এতো অসুস্থ থাকা সত্যেও এতো বড় দায়িত্বপালন করা মানুষের সাধ্যের বাইরে ছিলো। নিঃসন্দেহে তিনি শুধু দীনের জন্যই জীবিত ছিলেন। "إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ." তিনি ছিলেন এই আয়াতের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তাঁর ইন্তেকাল মুসলমানদের জন্য একটি দূর্ঘটনা এবং এমন একজন আলেমের মৃত্যু মানে পৃথিবীর মৃত্যু আখ্যায়িত করার মত। আল্লাহ তাআলা আমাদের সবার পক্ষ থেকে মরহুমকে উত্তম প্রতিদান দিন। উঁচু মর্যাদা দান করুন। মরহুম যে চিন্তা চেতনা ও উম্মতের জন্য যে দরদ নিজের ভেতর লালন করেছিলেন, আল্লাহপাক আমদের ভেতরও দীনের ও উম্মতের ওই দরদ নসীব করুন আর আমাদের সবাইকেও জিন্দেগীর শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত দীনের জন্য কবুল করুন।

আপনাদের সবার প্রতি আবেদন রইল, আমার জন্যও অবশ্যই দোয়া করবেন। যেন আল্লাহ পাক আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাকেন এবং মৃত্যুর সময় যেন এই পৃথিবী থেকে সুন্দরভাবে নিয়ে যান। তেমনিভাবে আল্লাহ যেন আমার পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধব, যাদের সাথে আমার সম্পর্ক আছে তাদের প্রতিও সন্তুষ্ট হন এবং সবাই যেন ঈমান ও নেক আমলের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে পারে। পুরো মুসলিম উম্মাহকে ঈমান, ইয়াকীন ও হেদায়াত দান করুন। আমীন।

মাওলানা হাবীবুল্লাহ পিরোজপুরী-এর শোকবার্তা

নিজামুদ্দীনের মুরুব্বীদের সম্প্রতি গুজরাট সফরের আলোচনা এখনো চলছিল। হঠাৎ অন্তরাত্মাকে প্রচণ্ড রকমের আঘাত করা এই খবরটি পেলাম। হযরত মাওলানা মোহাম্মদ ওমর পালনপুরী যাঁকে এখন 'রহমতুল্লাহি আলাইহি' বলতে অত্যন্ত কষ্ট হচ্ছে। শান্ত মন ও অস্থির হৃদয়ের এই মহান ব্যক্তিত্ব যিনি হাজার হাজার বান্দাকে কাঁদিয়ে আখেরাতের সফরে রওনা হয়ে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

এ কথা মানতে কষ্ট হচ্ছে যে, মাওলানার স্বদেশভূমিতে তাঁর সাথে এই সাক্ষাতই শেষ সাক্ষাত হবে! দাওয়াত ও তাবলীগের মাধ্যমে দীন প্রচারের এই প্রদীপ বহুদিন যাবৎ শারীরিক সমস্যা ও অসুস্থতার কারণে চিরকালের জন্য নির্বাপিত হয়ে গেলো। আর এই ধারাবাহিকতা, উন্নতি ও বরকত শিঘ্রই শেষ হবার পথে। মরহুমের ইখলাছ, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক, দাওয়াতের কাজে নিবীড়ভাবে নিজেকে সম্পৃক্ত করা, অন্যের উপকার করা, বিনয়, সরলতা অতঃপর ওই পথেই মৃত্যু এসব আমাদের অন্তরে অস্থিরতা তৈরি করছে এবং তাঁর কথা খুব স্মরণ হচ্ছে। تِلْكَ الدَّارُالْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْأَرْضِ وَلَافَسَادًا، وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. সংবাদ পাওয়ার সাথে সাথে প্রতিষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত ও সাওয়াব পৌঁছানোর বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর এই ধারাবাহিকতা এখন পর্যন্ত চলছে।

اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَارْحَمْهُ وَادْخِلْهُ جَنَّاةُ الْفِرْدَوْسِ عِنْدَكَ، وَنَوِّرْ قَبْرَهٗ

وَبَرِّدْ مَضْجَعَهٗ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهٗ وَأَمْطِرْعَلَيْهِ شَآبِيْكَ رَحْمَتِكَ. (أمين)

হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান রহ. চলে যাওয়ার পর এমন নাযুক পরিস্থিতিতে মাওলানা মোহাম্মদ ওমর পালনপুরী রহ.-এর চলে যাওয়া দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য এমন এক শূন্যতা, যার রেশ ও প্রভাব বহুদিন থাকবে। দোয়া করছি, দয়াময় আল্লাহ যেন মরহুমকে মাগফেরাত ও উঁচু মর্যাদা দান করেন। এ কাজের সাথে সম্পৃক্ত সবাইকে এই কষ্টের প্রতিদান দান করুন এবং দীনের মেহনতের এই উঁচু কাজকে পূর্ণ নিরাপদে রেখে আপনাদের সবাইকে পুরোপুরি পথ দেখান। আমীন।

হযরত মাওলানা হাবীবুল্লাহ পিরোজপুরী পালনপুরী
মুহতামিম: মা'হাদে ইলমী, কানজ মারগুব, পাটনা, গুজরাট

মরিসাসের মজলিসে শূরার পক্ষ থেকে শোকবার্তা

মাসনূন সালামের পর, হযরতের সংশ্রব থেকে আল্লাহ তাআলা আমাদের উপকৃত করুন এবং আপনাদের জীবনে বরকত দান করুন, আমীন।

গতকাল সকালে কিছু সাথী ফোন করে মাওলানা মোহাম্মদ ওমর পালনপুরী রহ.-এর ইন্তেকালের সংবাদ জানালেন। সত্যতা যাচাইয়ের জন্য আমরা বিভিন্ন স্থানে ফোন করে জানতে পারলাম, সংবাদটি সত্য। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

তাঁর ইন্তেকালের মাধ্যমে উম্মতের পথ প্রদর্শনে এমন অপূরণীয় ক্ষতি হয়, যা আর কখনো পূরণ হবার নয়। হযরত সারাটি জীবন দাওয়াত ও তাবলীগে অতিবাহিত করেছেন এবং উম্মতকে এমন এক পথ দেখালেন যে পথে মানুষ তার গন্তব্যে পৌঁছতে পারবে। আল্লাহ তাআলা সমস্ত উম্মতের পক্ষ থেকে তাঁকে উত্তম প্রতিদান দান করুন এবং জান্নাতে উঁচু মর্যাদা দান করুন, আমীন।

সমস্ত উম্মত তাঁর শূন্যতা অনুভব করছে। বিশেষ করে মরিসাসবাসীর দূর্ভাগ্য যে, ইজতেমার দিনক্ষণ নির্দিষ্ট হওয়ার পর সবাই হযরতের দর্শন ও উপকার লাভের আশায় গভীর প্রতীক্ষার প্রহর গুনছিলো, ঠিক সেই মুহূর্তেই তিনি আমাদের থেকে বিদায় নিলেন। আল্লাহ তাআলা সমস্ত উম্মতকে ধৈর্য ধারণ করার, জীবিত বুযুর্গদের ইজ্জত করার ও তাদের থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। আমীন।

মরিসাসের মজলিসে শূরা ও মরিসাসবাসী সমস্ত মুসলমানের পক্ষ থেকে হযরত রহ.-এর শোকাকুল পরিবার ও সাথীবর্গের প্রতি এই সমবেদনা ও শোকবার্তা, সকলের প্রতি দোয়ার নিবেদন। মা'আস সালাম।

চাপাটায আম্বিয়া মসজিদের পক্ষ থেকে শোকবার্তা

মুহতারাম ও মুকাররম মাওলানা ইউনুস সাহেব,

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রহমাতুল্লাহ,

আজ দুপুরে ফোনের মাধ্যমে হযরত মাওলানা ওমর পালনপুরী রহ.-এর ইন্তেকালের সংবাদ জানতে পারলাম। এ খবরে গোটা দেশ শোকাহত। কিভাবে শোক প্রকাশ করবো। লাখো হৃদয় শোকাকুল ও অশ্রুসিক্ত হয়ে আছে। তিনি ছিলেন গোটা উম্মতের সঞ্জীবনী শক্তি। যিনি ছিলেন পৃথিবীতে আলোর মিনার এবং লাখো হৃদয়ের আস্থাভাজন। যিনি প্রতিনিয়ত মাধুর্যময় বয়ানের মাধ্যমে হাজার হাজার মানুষকে দাওয়াতের মূলনীতি বলে দিতেন।

যিনি লক্ষ মানুষের জন্য ফি সাবিলিল্লাহ সফর করাটা নিজের প্রিয় কর্ম বানিয়ে নিয়ে ছিলেন। সেই চির জীবনের ক্লান্ত মুসাফির সমস্ত দল ছেড়ে গন্তব্যে পৌঁছে গেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

আল্লাহ তাআলা মরহুমকে জান্নাতুল ফেরদাউসে উঁচু মর্যাদা দান করুন। বিশেষ করে তাঁর সাথীদেরকে এই আঘাতের ধৈর্য ধারণ করার তাওফিক দান করুন এবং এর প্রতিদান দিন। আর অবশিষ্ট মুরুব্বিদের হায়াতে বরকত দান করুন এবং তাদের ছায়াতলে আমাদের সবাইকে এবং সমস্ত মুসলমানকে দীর্ঘদিন অবস্থান করিয়ে সমস্ত উম্মতকে মাওলানা রহ.-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার তাওফিক দান করো। আমীন।

ব্যক্তিত্ব, গুণাবলী ও অমলসমূহ

اس کے نفس کرم کی تاثیر ہے ایسی ☆ ہو جاتی ہے خاک چمنستاں شرر آمیز

তাঁর অন্তরের দয়া ও প্রভাব এমন
মরুভূমি হয়ে যায় ফুলের বাগান।

১. দাওয়াতি কাজে পূর্ণ মনোযোগ সহকারে মূলনীতির প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। পূর্ণ উদ্যোমে ফলাফল কী হবে সে দিকে লক্ষ্য না করে দীনি দাওয়াতের কাজে যে সুযোগ পেতেন সে কাজকে সৌভাগ্য মনে করে পৌঁছেই দিতেন। সাথে সাথে কাজের শৃঙ্খলার প্রতি লক্ষ্য রাখতেন। পুলিশের মতো মানুষের পেছনে লেগে যেতেন না। বরং নিজের কথা সে ব্যক্তির ওপর যেন প্রভাব পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রেখে কথাগুলো বলে চলে আসতেন। কিন্তু না কারো ওপর চাপিয়ে দেয়ার পদ্ধতি অবলম্বন করতেন, আর না হতাশ হয়ে বসে যেতেন।

যাকে দাওয়াত দিতেন তার সাথে কথা বলার সময় বন্ধুসুলভ কণ্ঠ অবলম্বন করতেন। যে কথায় নিজের আত্মম্ভরিতা ও শ্রোতার প্রতি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেতো না। দীনের কথা বলার জন্য এমন পরিবেশ ও পরিস্থিতি খুঁজে নিতেন যেন শ্রোতার জন্য কথাগুলো উপকারী হয় ও প্রভাব পড়ে। বয়ানের মাঝে এমন পদ্ধতি ও পন্থা অবলম্বন করতেন যার মধ্যে বিনয়, মহানুভবতা এবং আত্মশুদ্ধির প্রতিচ্ছবি পরিলক্ষিত হয়। শ্রোতা তাঁর ইখলাসের মাধুর্য অনুভব করতো এবং তাদের অন্তরও অনিচ্ছায় বলে উঠতো, যা কিছু বলা হচ্ছে তাতে শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি ও মঙ্গল ব্যতীত অন্য কোনো লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নাই। সুতরাং সে আশ্বস্ত ও উপকৃত হয়ে আমলের জন্য প্রস্তুত হয়ে যেতো।

حکمت و دانائی و عشق و محبت کا نشاں ☆ پھونک دیتا تھا رگوں میں زندگی جس کا بیاں

প্রজ্ঞা, পারঙ্গমতা, ইশক ও ভালোবাসার প্রমাণ তার বয়ান।
জেগে উঠতো তাতে নিভে যাওয়া জীবনের অনাবিল জয়গান।

২. আব্বাজান রহ. দীনের দাওয়াতি কর্মকাণ্ডের জন্য যেভাবে মানুষকে তাশকিল করতেন তেমনিভাবে নিজেও প্রয়োজন অনুসারে মারকাযের বাইরে থাকতেন এবং মেহমানদের সঙ্গেও বাইরে সময় দিতেন। অথচ মারকাযে তাঁর থাকাটা ছিলো অত্যন্ত প্রয়োজন। তখনও দীনের দাওয়াতের গুরুত্ব সামনে রেখে হিন্দুস্তান, পাকিস্তানের অগণিত ইজতেমা এবং মাদরাসা ও মারকাযের বিশেষ সমাবেশে এবং আফ্রিকা, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া ও ইউরোপ ইত্যাদি দূর দূরান্ত দেশ সফর করতেন এবং ইজতিমায় অংশ নিতেন। ফরজ হজ করার পরও নফল হজ এবং উমরার জন্য জামাআত নিয়ে অনেক বার হেজাযে গিয়েছেন এবং সেখানে সারা বিশ্ব থেকে আগত মুসলমানদের জন্য পরিপূর্ণ মেহনত করতেন। বিভিন্ন দেশের জন্য সেখান থেকে জামাআত পাঠাতেন। দোয়া কবুল হওয়ার স্থানসমূহে সমস্ত মুসলমানদের জন্য এবং বিশেষভাবে হিন্দুস্তানী মুসলমানদের জন্য সফলতা, নিরাপত্তা ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য দোয়া করতেন। নিজের পূর্ণাঙ্গ চিন্তা ও দূরদর্শিতার দ্বারা বিশ্ব মুসলিম সম্প্রদায়ের সাথে বিশেষ সম্পর্ক সৃষ্টি করে দেশে দেশে দীনের দাওয়াতের দ্বার উন্মুক্ত করার চেষ্টা করতেন।

৩. আরব ও অনারব রাষ্ট্রে এভাবে দীনি দাওয়াতের প্রচার হওয়া এবং তাঁর ব্যক্তিত্ব গ্রহণযোগ্য ও প্রসিদ্ধ হওয়ার পরও কখনো তিনি নিজে তো নয়ই অন্যকেও অনুমতি দেন নি যে, তাদের ব্যক্তি বিশেষের প্রতি দাওয়াত দেওয়া হোক এবং ইজতেমাগুলোতে তাঁদের বয়ানের ঘোষণা করা হোক। বরং সর্বদা আল্লাহর বান্দাকে আল্লাহর কাজের সাথে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা করতেন। এই উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর মাঝে ঐক্য তৈরি করার যে শিক্ষা তিনি দিয়ে ছিলেন, এর উত্তম দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই ছিলেন।

একবার কোনো এক মজলিসে হাদীসের পাঠ দানকালীন সময় তাঁর এক সাথীর ঠোঁটে চুম্বন করে বললেন, এই ঠোঁট থেকে সর্বদা রাসূলের হাদীস বের হয়। তাই এই ঠোঁট থেকে বরকত নেওয়ার উপযুক্ত।

৪. দীনি দাওয়াতের মেহনতে তাঁর জীবনের শেষদিকে বিশ্ব ব্যাপী কাজের পরিধি বেড়ে যাওয়ার কারণে প্রত্যেক এলাকায় ও দেশে মসজিদ ভিত্তিক জামাআত ও পরামর্শকদের (মাশওয়ারার) জামাআত তৈরি হয়ে গিয়েছিলো।

পরস্পর পরামর্শে ভিন্ন মত এবং নাজুক পরিস্থিতিতে অনৈক্য ও মতপার্থক্য সৃষ্টি হলে এমনভাবে সমাধান করতেন, যার দ্বারা সাথীদের মধ্যে পূর্বের তুলনায় বেশী মিল মোহাব্বত তৈরি হতো এবং কাজের পরিমাণও বেড়ে যেতো।

যদি কোনো এলাকায় অথবা ব্যক্তির মাঝে বিশৃঙ্খলা দেখা যেতো তখন তাকে তৎক্ষণাৎ কিছুই বলতেন না, বরং উত্তম পন্থায় ধীরে ধীরে তাকে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনতেন। এতে করে এলাকায় দাওয়াতের কাজও চলমান থাকতো এবং ওই ব্যক্তিও কাজের সাথে সম্পৃক্ত থাকতো। আর শৃঙ্খলার উদ্দেশ্যও অর্জন হয়ে যেতো। কখনো পরিস্থিতি ভিন্ন হলে তার দূষিত রক্ত বের করার জন্য অস্ত্রপাচার করতেন। এরপর ব্যান্ডেজ করার যে পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করতেন তাতে অস্ত্রপাচারের সমস্ত কষ্ট দূরীভূত হয়ে যেতো।

৫. তিনি এ কথা পূর্ণ বিশ্বাস করতেন যে, ঈমান ও ইয়াকীন ব্যতীত মুসলমানদের মধ্যে কোনো পরিবর্তন এবং বিপ্লব সৃষ্টি হতে পারে না। ঈমান ব্যতীত চেষ্টা করা ইসলামের প্রাণ ও উম্মতের স্বভাবের পরিপন্থি। সুতরাং এই উম্মত প্রথম যুগে ঈমানী শক্তিতেই সফলতা অর্জন করে ছিলেন এবং জলে ও স্থলে প্রাধান্য বিস্তার করেছিলেন। আর ঈমান দূর্বল হওয়াতেই অনৈক্য এবং বিশৃঙ্খলায় লিপ্ত হয়ে পরস্পরে বন্ধন ছিন্ন হয়ে পড়ে। সুতরাং সর্বদাই তাঁর বয়ানের বিষয় ছিলো ঈমান ও ইয়াকীন। আর এই ইয়াকীন রগ-রেশায় মিশে গিয়ে ছিলো। লক্ষ মানুষের সমাবেশে পূর্ণ শক্তি ও আন্তরিকতার সাথে ঈমান ও ইয়াকীনের বয়ান করতেন। আখেরাতের বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলার ওয়াদার ওপর আস্থা, জান্নাত ও জাহান্নামের বিস্তারিত আলোচনা, মানুষের রূহ-এর বাস্তবতা ও গুরুত্ব, অদৃশ্য বস্তুর স্বীকারোক্তি এবং কোনো বস্তুকে অস্বীকার, রাসূল সা. ও সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর পবিত্র জীবন ও তাঁদের দেখা স্পষ্ট উদাহরণ, দাওয়াতের শক্তি এবং তার প্রভাব ও আকর্ষণ এই সমস্ত কথার ওপর থাকতো তাঁর বয়ানের সীমাবদ্ধতা। এতে করে প্রত্যেক শ্রেণী ও প্রত্যেক দলকে কোনো না কোনো অংশ অবশ্যই প্রভাবিত করতো। বয়ানে তাঁর ঈমান ও ইয়াকীনের অবস্থার অনেক বড় দখল থাকতো।

আল্লাহ তাআলা তাঁকে মুসলিম উম্মাহর প্রতিটি শ্রেণী ও দলের মাঝে ভালোবাসা ও গ্রহণযোগ্যতা দান করে ছিলেন। লাখো মানুষ তাঁর প্রতি আসক্ত ছিলো। বিভিন্ন দেশের ব্যক্তিরাও এই আকাঙ্ক্ষা করতো যে, তিনি যেন আমাদের দেশে আগমন করেন এবং আমাদেরকে তাঁর অমূল্য বয়ান দ্বারা উপকৃত করেন। তাঁর বয়ান দ্বারা উপকৃত হতে পেরে গর্ব করতো।

৬. তিনি নিজ মুরুব্বীদের জন্যে উৎসর্গপ্রাণ ছিলেন। তাদেরকে শ্রদ্ধা, সমীহ ও সেবা করতেন। বিশেষ করে হযরত শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. ও হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান রহ.-এর সাথে সীমাহীন মোহাব্বত ও আন্তরিকতা ছিলো। তাঁদের মৃত্যুতে আব্বাজান রহ. যে আঘাত পেয়ে ছিলেন তা ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। তিনি ওই সমস্ত বুযুর্গদের অত্যন্ত আদব, শ্রদ্ধা ও সম্মান করতেন। বর্তমান যুগে বুযুর্গদের সাথে এই ধরণের ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও এমন ভক্তিপূর্ণ আচরণ দুষ্প্রাপ্য না হলেও বিরল তো বটেই।

৭. তিনি ওই সমস্ত বুযুর্গদের সাথে যারা সম্পর্ক রাখতেন, তাদেরকে খুব সম্মান করতেন। মারকাযের সমস্ত সাথী এবং মারকাযের বাইরে কর্মরত লোকদেরকে যাদের মধ্যে গরীব, ধনাঢ্য ব্যবসায়ী, কৃষক, চাকরিজীবি, কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র-শিক্ষক, মাদরাসার ছাত্র-শিক্ষক, ডক্টর, ইঞ্জিনিয়ার সকল শ্রেণীর মানুষকে মর্যাদা অনুযায়ী অন্তর থেকে সম্মান ও স্নেহের আচরণ করতেন। সমস্ত কর্মীদের প্রতি তিনি অত্যন্ত সদয় ছিলেন এবং সেদিকে খুব লক্ষ্য রাখতেন। যদি কারো কোনো ভুলত্রুটি দৃষ্টিগোচর হতো তাহলে দূরদর্শীতার সাথে এর মীমাংসা করতেন। নিজের কোনো ভুলের জন্য বড় হোক বা ছোট ক্ষমা চাইতে তিনি লজ্জাবোধ করতেন না। আর ওলামায়ে দীন থেকে উপকৃত হতে কোনো প্রকার কষ্ট ও লজ্জাবোধ করতেন না।

৮. হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান রহ. থেকে কুরআন শরীফ হিফজ করার ব্যাপারে অনুমতি চাইলে তিনি উত্তরে বললেন, দাওয়াতের কাজের ফাঁকে ফাঁকে হলে উত্তম। সুতরাং মসজিদে নববীতে অবস্থিত রিয়াজুল জান্নায় হযরতজী থেকেই কুরআন হেফজ শুরু করেন এবং দাওয়াতের কাজে ব্যস্ত থেকেই চার বছরের মধ্যে পুরো কুরআন শরীফ মুখস্থ করেন। আর শেষ আয়াতও রিয়াজুল জান্নায় হযরতজী রহ.-এর নিকট পাঠ করেন।

যেহেতু তিনি বড় হয়ে কুরআন শরীফ মুখস্থ করেছিলেন। তাই তিনি প্রায় বয়ানে বলতেন, সাধারণত হাফেজ হয় বাচপানে (শৈশবে) আর আমি হাফেজ হয়েছি পাঁচপানে (পঞ্চান্নতে)। অর্থাৎ আমি বাচপানের হাফেজ না পাঁচপানের হাফেজ।

৯. কুরআন শরীফের সাথে আব্বাজান রহ.-এর গভীর সম্পর্ক ছিলো। যেখানেই সুযোগ পেতেন কুরআন তেলওয়াত শুরু করে দিতেন। এই সম্পর্কের ভিত্তিতেই তিনি দাওয়াত ও তাবলীগে ব্যস্ততা থাকা সত্ত্বেও বয়স

হওয়ার পরও কুরআন হিফজ করার মতো সম্পদ অর্জন করেছেন। তাঁর প্রায় সব বয়ানেই খুৎবার পর ও বয়ানের মাঝে অত্যন্ত মত্ততা ও প্রফুল্লতার সাথে কুরআন তেলাওয়াতের ব্যঞ্জনা থাকতো। মনে হতো যেন তিনি বলছেন,

قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں

'হে মরদে মুসলমান কুরআনে আছে মিলনের গভীর সুখানুভূতি।'

বিনয় ও নম্রতা

তাঁর সত্তার মাঝে সরলতা ও বিনয় ছিলো। যখন দিল্লি মারকাযে পরিবার ব্যতীত একা অবস্থান করতেন তখন এমন ঘরে থাকতেন যেখানে তাঁর সাথে আরো দু'তিন সাথী অবস্থান করতো। তিনি চৌকি ছাড়া নিচে বিছানা করে শয়ন করতেন। সাধারণ শিক্ষার্থীদের মতো নির্দ্বিধায় থাকতেন। বিভিন্ন দেশ থেকে বড় বড় ব্যক্তিত্ববান লোকজন আসলে তিনি ওই সাধারণ বিছানায় বসেই নির্দ্বিধায় কথা বলতেন। এতো উঁচু মর্যাদার অধিকারী হয়েও এমন সাদামাটা এবং বিনয়ী ছিলেন যে, সবাইকে মুগ্ধ করতো।

দুনিয়ার বিষয়-আশয়ের প্রতি নির্লিপ্ততার কারণে দুনিয়ার ব্যাপারে এতোই অসচেতন ছিলেন যে, একবার আমিও ওই মজলিসে ছিলাম, তিনি মজলিসে বসা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করলেন, আমার জামা উল্টানো না ঠিক আছে? সবাই উত্তরে বললো, জামাতো ঠিকই আছে। ওই প্রশ্নের কারণ জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, গত বছর আমার আফ্রিকার সফর হয়েছিলো। যখন আমি আফ্রিকার বিমানবন্দরে নামলাম তখন সেখানকার সাথীরা বললো, মাওলানা! জামাতো উল্টো পরে আছেন। তখন আমি বিমানবন্দরেই জামা ঠিক করে নিলাম। আর আজও আমার আফ্রিকার সফর, তাই জানতে চাইলাম যে, গত বছরের ন্যায় আবার যেন এমন না হয়। কেননা বর্তমানে কাপড়ের উল্টো-সোজা বুঝতে পারি না।

এতো গুণের অধিকারী হওয়া সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত বিনয়ী স্বভাবের ছিলেন। তিনি নিজেকে কখনো অন্যের ওপর প্রাধান্য দিতেন না। সবার সাথে মিলে-মিশে থাকতেন। কখনো নিজের জন্য বিশেষ বৈশিষ্ট্যকে পছন্দ করতেন না। নবী করিম সা.-এর বাণী- مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ. যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য বিনয় অবলম্বন করে আল্লাহ তাকে উঁচু মর্যাদা দান করেন। তিনি ছিলেন ওই হাদীসের উত্তম উপমা। তাঁর সরলতা ও বিনয়ের কারণে আল্লাহ তাআলা

মানুষের অন্তরে তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদার স্থায়ী চিত্রাঙ্কন করে দিয়েছেন এবং অযুত ভালোবাসা দান করেছেন। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকেও ওই এখলাছের ধারক-বাহকের কদম অনুসরণ করে চলার তাওফিক দান করুন।

ধৈর্যধারণ ও মায়া-মমতা

তাঁর জীবনের সিংহভাগ সময় দীনি দাওয়াতের কাজে কেটেছে। মাঝে মধ্যে এমন অনেক উদ্ভট লোকের ও অপছন্দনীয় কর্মকাণ্ডের মুখোমুখী হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি কখনো ধৈর্যহারা হননি। কখনো কোনো অভিযোগ মুখে আনেন নি। সাধারণ মানুষের পক্ষ থেকে কখনো সাক্ষাত ও মুসাফাহার এমন পরিস্থিতি হতো যা তাঁর ব্যস্ততা বা কর্মতৎপরতার পরিপন্থি হতো অথবা নিজের প্রয়োজনীয়তাকে প্রকাশ করার জন্য তাঁকে সর্বদা বিরক্ত করতো। তা সত্ত্বেও তিনি তাদেরকে সন্তুষ্ট করে দিতেন। আর মনোযোগ দিয়ে সবার কথাও শুনতেন। বলতেন, দরিদ্র ও অভাবীদের দোয়ায় চলছি। কারো কি কোনো অনুভূতি ছিলো? যে, তাঁর ওপর কি ধকল যাচ্ছে। তাদের কথা শুনে তিনি কাঁদতেন এবং নিজের শুরুর জীবনের কথা শোনাতেন।

তিনি বলতেন, আমার শ্রদ্ধেয়া মা জননী যদিও দরিদ্র ছিলেন। কিন্তু গরিব ও মিসকিনদের প্রতি দয়া ও মায়া করার কথা বলতেন। আর আম্মাজানের কাছে যাই থাকতো সেখান থেকেই দিয়ে দিতেন। তিনিও উপযুক্ত ব্যক্তিকে সাহায্য করতেন। তিনি মানুষের সহযোগীতা করাকে সবচেয়ে উত্তম আমল মনে করতেন। আর সে দিকে খুব লক্ষ্য রাখতেন। তিনি রীতিমতো উপযুক্ত ব্যক্তিদের তালিকা করে রেখেছিলেন এবং সময়মতো তাদেরকে সাহায্য করতেন। গরীব ছাত্রদেরও সাহায্য করতেন। আর আলেমগণের নিকট হাদিয়া পৌঁছানোরও অভ্যাস ছিলো।

একদিন কোনো এক ছাত্র আম্মাজানের কাছ থেকে কিছু টাকা ধার নিয়ে ছিলো। পরে তা ফেরৎ দিতে আসলে ওই ছাত্র থেকে টাকা নিলেন না, বরং তাকে ওই টাকা দিয়ে দিলেন। তারপর মজলিসের সবাইকে বললেন, নবীদের উত্তরসূরী ও নবীওয়ালা কাজে সম্পৃক্তদের দেয়া টাকার হিসাব রাখা উচিত না।

طریقت بجز خدمت خلق نیست ☆ ز تسبیح سجادہ و دلق نیست

তরীকত তো খেদমতে খালক্বের নাম,
তাসবীহ ও জায়নামাযের নাম তো নয়।

তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে সুন্নতের অনুসরণ করতেন। তাঁর জীবন সুন্নতের অনুসরণ ও রাসূল সা.-এর মোহাব্বতের প্রতিবিম্ব ছিলো। সর্বদা প্রতিটি কাজে মাসনুন দোয়ার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। তাঁর জীবনের প্রিয় কাজই ছিলো সুন্নতের ওপর চলা। নিজের বয়ানে সুন্নতের ওপর গুরুত্ব ও প্রতিটি সুন্নতের ওপর আমল করার দাওয়াত দিতেন। বিশেষ করে একথা বলতেন যে, নবী আ.-এর এক একটি সুন্নত পূর্ণ করা মানে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আসা। আর এক একটি সুন্নত ছেড়ে দেওয়া মানে আল্লাহর গায়েবী সাহায্য সরে যাওয়া।

আব্বাজান রহ.-এর রাত-দিনের প্রতিটি সময় আমল ইবাদতে পরিপূর্ণ থাকতো। একটি মুহূর্তও নষ্ট করা পছন্দ করতেন না। সকালে আড়াই ঘণ্টার বয়ান ও মাশওয়ারা, চিঠির উত্তর, অজিফা, দোয়া-দরূদ ও জিকির-আজকারের ব্যস্ততা ব্যতীত কিতাব অধ্যয়নের জন্যও অবশ্যই সময় বের করে নিতেন। বিশেষ করে হায়াতুস সাহাবা সম্পর্কে বলতেন, সেখান থেকে কিছু অংশ হলেও অবশ্যই পড়তাম। আর আমার অভিজ্ঞতা হলো, এ কিতাবে সাহাবায়ে কেরামের জীবনের উত্থান-পতন বা উন্নতি-অবনতির প্রতিটি দিকের ওপর স্পষ্ট আলোচনা রয়েছে। দিক-নির্দেশনাও রয়েছে। যার কারণে সেখানে দাওয়াতের মেহনতের মূল্যবান মূলনীতি পাওয়া যায়। সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর অবস্থা ও ঘটনাসমূহ বরকতের কারণ হয়। সমস্ত উম্মতের জন্য অনুকরণ করার উপযুক্ত উদাহরণ সেখানে স্পষ্টাকারে আলোচিত হয়েছে।

আব্বাজান রহ. মৃত্যুর সময় আমাকে বললেন, মারকায নিযামুদ্দিনে প্রায় পয়ত্রিশটি বছর অবস্থান করেছি এবং মারকাযের বিদ্যু পানি ব্যবহার করেছি। সুতরাং আমার ইন্তেকালের পর পঞ্চাশ হাজার টাকা মারকাযের হিসাবের খাতায় জমা করে দিও। আল্লাহ তাআলার শোকর, আব্বাজান রহ.-এর ওসিয়ত অনুযায়ী উল্লেখিত টাকা তখনই জমা করে দিয়েছি।

যদিও দাওয়াত ও তাবলীগ ছিলো তাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। তাই যেখানে তিনি দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য পুরো পৃথিবীকে নিয়ে চিন্তা করতেন, আবার তিনিই পরিবার ও খান্দানের শিক্ষাদীক্ষার চিন্তায় চিন্তিত থাকতেন। দাওয়াত ও তাবলীগের জন্য মানুষদেরকে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার তাশকিল করতেন। দীনি ইলম থেকে বঞ্চিত এলাকার মকতব ও মাদরাসাসমূহে বেশী বেশী অবস্থান করারও যথাসাধ্য চেষ্টা করতেন। আর নিজের প্রভাব ও পৃষ্ঠপোষকতায় ওই ভালো কাজের উন্নতি এবং সহযোগীতা করতেন।

আব্বাজান রহ.-এর ইচ্ছা ছিলো, জীবনের প্রতিটি স্তরে দীন প্রতিষ্ঠিত হোক। আরো বলতেন, দীনি দাওয়াতের চেষ্টা ফিকিরের উদ্দেশ্যও এটাই যে, মানুষের মধ্যে দীনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হোক, যার দ্বারা দীনের সর্বস্তরে উন্নতি সাধিত হয়। এই কথার অন্যতম একটি অংশ হলো, নিজের এলাকা ও বংশের লোকদের মাঝে লেনদেন, ওঠাবসা, আচার-ব্যবহার ইসলামী রীতিনীতি অনুযায়ী চালু করা। এলাকার সাধারণ স্তরের লোকজন থেকে শুরু করে প্রভাবশালী ও আলেমগণের মাঝে আব্বাজানের এই চিন্তার প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিলো। মানুষের জীবন যাপনের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ যা কিছু সংশোধন হয়েছে, সেখানে আব্বাজান রহ.-এর মনোযোগ ও চিন্তার একটি বড় অবদান ছিলো।

آں لطافت پس بدان کز آپ نیست ☆ جز عطاء مبدع وہاب نیست

এই দয়া ও অনুগ্রহ পানি ও ফুলের নয়,
এ যে শুধু সৃষ্টিকর্তারই অবদান।

নিজামুদ্দীন মারকাযে লাগাতার তেইশ বছর

মারকায নিজামুদ্দিনে ফজরের পর আম বয়ানের দায়িত্ব আজীবন পালন করেছেন মাওলানা ইউসুফ রহ.। তাঁর পূর্বে মাওলানা ইলিয়াস রহ. এই বয়ান করতেন। কিন্তু হযরত মাওলানা এনামুল হাসান রহ. নিজের নেতৃত্বকালেই এই গুরুত্বপূর্ণ মহান দায়িত্ব নিজে গ্রহণ না করে আব্বাজান রহ.-কে অর্পণ করেছিলেন। আর আব্বাজান রহ. নিজের বন্ধুত্বের হক পূর্ণাঙ্গরূপে পালন করে এই বয়ানকে লাগাতার তেইশ বছর পর্যন্ত গুরুদায়িত্ব হিসেবে পালন করেন। দাওয়াত ও তাবলীগের ইতিহাসে যা কখনো ভোলা যাবে না।

হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান রহ.ও দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে তাঁর ওপর পূর্ণ আস্থা রাখতেন। বিশেষ করে আব্বাজানের বয়ানে যখন তাবলীগের মেহনত আরো প্রাণবন্ত হয়ে উঠলো, তখন তিনি আরো আশ্বস্ত হলেন। কখনো বিশেষ মজলিসে তাঁর এই বয়ানকে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশও করে দিতেন। তাঁর প্রথম জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সামনে আরব অঞ্চলে তাবলীগের কর্মীদের এক নির্বাচিত দল ছিলো। হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান রহ. তাদের সাথে মুসাফাহা করে আমার আব্বার পরিচয় এভাবে দিলেন যে, هَاذَا شَيْخ عُمَرْ لِسَانُ الدَّعْوَةُ وَالتَّبْلِيْغُ "তিনি হলেন শায়েখ ওমর, যিনি দাওয়াত ও তাবলীগের মুখপাত্র।"

হযরতজী মাওলানা ইউনুস রহ.-এর ইন্তেকালের পর মারকায নিজামুদ্দীনে ফজরের পর লম্বা ও বিস্তারিত বয়ান যখন আব্বাজান রহ.-এর দায়িত্বে আসলো, তখন শুরুর দিকে অবস্থা এমন হতো যে, মারকাযে আব্বার বয়ানের সময় এক দিকে শাইখুল হাদীস জাকারিয়া রহ. এসে বসতেন, অন্য দিকে হযরত মাওলানা এনামুল হাসান রহ.। এই দুই বুযুর্গ পনেরদিন পর্যন্ত বয়ান শুনলেন। তারপর তিনদিন পর্যন্ত দু'জন বুযুর্গ হযরতজী মাওলানা ইলিয়াস রহ.-এর কবরের পাশে বয়ান শেষ না হওয়া পর্যন্ত ধ্যানে থাকতেন।

শাইখুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া রহ. যখন সাহারানপুর চলে যাচ্ছিলেন তখন হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান রহ.-কে বললেন, মৌলভী সাহেব! ওমরের বয়ানে তোমার চল্লিশদিন পর্যন্ত গুরুত্ব সহকারে বসা উচিত। যখন চল্লিশদিন পূর্ণ হলো তখন শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. সাহারানপুর থেকে চলে এলেন। তারপর এক সপ্তাহ পর্যন্ত দু'জন বুযুর্গ ধ্যানে বসে বয়ান শুনলেন। তারপর হযরতজী মাওলানা এনামুল হাসান রহ.-কে বললেন, এখন বয়ান শোনার প্রয়োজন নেই। দুনিয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁর কথা সঞ্চালন করে দিয়েছেন।

অন্য এক সময় শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ. মারকাযে আসলেন। মারকাযে অবস্থানকালীন আব্বাজান রহ.-কে জিজ্ঞেস করলেন, কার কাছে বাইয়াত (শিষ্যত্ব) গ্রহণ করেছ? আব্বাজান রহ. উত্তরে বললেন, প্রথমে হযরতজী ইউসুফ রহ.-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছিলাম, এখন হযরতজী এনামুল হাসান সাহেব রহ.-এর নিকট বাইয়াত গ্রহণ করেছি। শাইখুল হাদীস মাওলান যাকারিয়া রহ. বললেন, প্রিয় বৎস! আমার হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে নাও। তখন মাওলানা এনামুল হাসান রহ.-এর পরামর্শে হযরত শাইখুল হাদীস রহ.-এর বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং হযরত শাইখুল হাদীস রহ. খেলাফতও দিয়ে ছিলেন।

ওই ঘটনার পর হযরত শাইখুল হাদীস রহ.-এর প্রতি আব্বাজান রহ.-এর অকৃত্রিম ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গেলো এবং সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি পেলো। যার ভিত্তিতে হযরত শাইখুল হাদীস যাকারিয়া রহ.-এর নিকট নিজের গুরুত্বপূর্ণ ও সাধারণ অবস্থা জানাতেন এবং পরামর্শ করাটা বাধ্যতামূলক বানিয়ে ছিলেন। এমনকি নিজের ঘরোয়া সমস্যার ব্যাপারেও পরামর্শ করতেন। দেশে বা বিদেশে থাকলেও নিজের অবস্থার কথা চিঠি লিখে জানাতেন।

বিদেশে দীর্ঘ সফরের কারগুজারীর চিঠি যেভাবে মারকায নিজামুদ্দীনে পাঠাতেন, সেভাবে হযরত শাইখুল হাদীস রহ.-কেও লিখে পাঠাতেন। তিনি

স্বপ্নযোগে অনেকবার রাসূল সা.-এর সাক্ষাত লাভ করেন এবং দীনি দাওয়াত সম্পর্কে অনেকবার রাসূল সা. সুখবর শুনিয়ে ছিলেন। তখন এই স্বপ্ন এবং এর বাস্তব চিত্র হযরত শাইখুল হাদীস রহ.-কে অবশ্যই বলতেন। হযরত শাইখুল হাদীস রহ. খুশি হতেন এবং মোবারকবাদ দিয়ে সাথে সাথে দোয়ার শব্দগুলো চিঠিতে লিখতেন। মোটকথা তিনি শাইখুল হাদীস রহ.-এর দয়ার্দ্রতা ও মনোযোগের বিশেষ মধ্যমণি হয়ে গিয়েছিলেন।

আব্বাজান রহ.-এর বিশেষ বাণী

১. আমরা নিজের জন্য আল্লাহ তাআলা থেকে যা চাই, আল্লাহর বান্দাদের সাথে যেন সেই আচরণই করি। যদি চাই যে আল্লাহ তাআলা আমাদের ওপর রহম করুক, তাহলে আমাদেরও উচিত অন্যের ওপর রহম করা। আর যদি আমরা চাই যে, আল্লাহ তাআলা আমাদের ভূল-ত্রুটি ক্ষমা করে দিক, তাহলে আমাদেরও উচিত অন্যের ভূল-ত্রুটিগুলো ক্ষমা করা।

২. যদি দুঃখ-কষ্ট আসে তাহলে ঘাবড়াবে না, আর যদি স্বচ্ছলতা ও নেয়ামত প্রাপ্ত হও তখন উচ্ছ্বসিত হবে না। আল্লাহর প্রতি মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। আর তা অর্জন করতে হলে আল্লাহর জিকির করতে হবে, কুরআন তেলাওয়াত করতে হবে এবং দোয়া চাইতে হবে।

৩. যদি এমন হয় যে, কিছু লোকের সাথে সুসম্পর্ক, আর কিছু লোকের সাথে সাথে সম্পর্ক নেই। তাহলে এতে কোনো সমস্যা নেই। এ জন্য যে, কোনো মানুষ এমন নেই, যাকে সকলেই ভালোবাসে। হযরত সিদ্দিক আকবর রা. শাসন ক্ষমতা যখন হযরত ওমর রা.-কে অর্পণ করেন, তখন এই তাৎপর্যপূর্ণ কথাটি বলেছিলেন, اَحَبَّكَ مُحِبٌّ وَ اَبْغَضَكَ مُبْغِضٌ. কিছু মানুষ আপনাকে পছন্দ করবে আর কিছু মানুষ আপনাকে অপছন্দ করবে। প্রত্যেকেই তার স্বভাব অনুযায়ী আচরণ করবে। তাহলে আমার-আপনার কী মূল্য আছে? আমরা এমনটা কেনো ভাবি যে, সবাই আমার কথা মানবে। এমনটি কখনোই হবে না।

৪. মহিলারা সাধারণত উল্টাপাল্টা কথা বলে, তাদের সাথে পরামর্শ করবে, কিন্তু সে যে সিদ্ধান্ত দেবে তার উল্টো করবে। যখন উল্টানোটাকে উল্টা করবে তখন সোজা হয়ে যাবে। 'না' আর 'না' মিলে 'হ্যাঁ' হয়।

হযরত ওমর রা.-এর বাণী ঃ شَاوِرُوْهُنَّ وَخَالِفُوْهُنَّ. তোমরা মহিলাদের সাথে পরামর্শ করো এবং এর বিপরীত কাজ করো। কিন্তু এই বাণীটি চিরন্তন নিয়মে পরিণত হবে এমনটি নয়, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে হতে পারে।

৫. পরিস্থিতি দ্বারা প্রভাবিত হওয়া দোষের কিছু নয়। কিন্তু এভাবে প্রভাবিত হওয়া যে, আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘিত হবে; এটা দোষণীয়।

৬. নিজের দলের অন্যায়ের পক্ষপাতিত্ব করা এবং অন্য দলের প্রতি অবিচার করার নাম স্বজনপ্রীতি। আর এই স্বজনপ্রীতি মানুষকে আল্লাহ থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

৭. নিজেকে এতো কঠিন প্রকৃতির বানাবে না। (অর্থাৎ মন ও মস্তিষ্কে খারাপ চিন্তা রাখবে না) যে, কেউ উপদেশ দিতে চাইলে তখন তা দিতে পারবে না, বরং নিজেকে বিনয়ী বানিয়ে রাখবে। যেন যে কেউ নির্দ্বিধায় উপদেশ ও ভালো কথা বলতে পারে।

৮. কিছুলোক দেখা যায়, তারা অন্যের কথা মানাকে নিজের জন্য নাক কাটা তথা অসম্মানজনক মনে করে। তাই নাক এতো লম্বা বানাবে না যে, কেটে যাবার ভয় থাকে। (অর্থাৎ নিজের ভেতর এমন দুর্বলতা রাখবে না যে, সে সুযোগ পেয়ে যায়।)

৯. আল্লাহর কাছ থেকে নিতে শেখো। আল্লাহর প্রিয় হও এবং মানুষের সাহায্যকারী হও ও মানুষের প্রিয় হও। তখন আল্লাহরও প্রিয় হবে এবং মানুষেরও প্রিয় হবে।

১০. যে গুনাহগার ব্যক্তি তওবা ও এস্তেগফার করে আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করে। সে ব্যক্তি আল্লাহর কাছে বেশী প্রিয় ওই ব্যক্তি থেকে যিনি নেক কাজ করে গর্ব ও অহংকারে লিপ্ত হয়।

১১. প্রত্যেকেই সম্মানপ্রত্যাশী হলে পরস্পরের মাঝে সম্পর্ক খারাপ হবে। পক্ষান্তরে অন্যের মাঝে সম্মানের দিকগুলো খুঁজলে আন্তরিকতা ও মিল মোহাব্বত সৃষ্টি হবে।

১২. যে ব্যক্তি তাকওয়া অবলম্বন করবে এবং শেষ রজনীতে আল্লাহর দরবারে কান্নাকাটি করবে আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষের অন্তরে তার প্রতি ভয় ঢুকিয়ে দিবেন।

১৩. সঙ্গবদ্ধ কাজে ভালো খারাপ সবাইকে নিয়েই চলতে হবে। এ কাজ কারো ভালো-মন্দ বাছ-বিচার করার নয়। যদি বাছ-বিচার করো তাহলে ধীরে ধীরে মানুষ কমতে থাকবে। আর এই বাছাইকৃতদের মধ্যেও যদি কেউ দুর্বল হয় তখন অন্যজন তাকেও বাদ দিয়ে দেবে। ফলাফল এই হবে যে, মানুষই থাকবে না, কাজ আর নিয়মনীতি, পরিবেশও থাকবে না।

১৪. শয়তান এবং নফস (মনের চাহিদা ইচ্ছা) এই দুটোই মানুষের শত্রু। কিন্তু নফস তুলনামূলকভাবে বড় শত্রু। কারণ শয়তানকেও পথভ্রষ্ট করেছে নফস। শয়তানের দম্ভোক্তি "انا خير" 'আমিই উত্তম' এই দাবী নফস থেকেই উদ্গত। আর মানুষের মন্দ আচরণের অভ্যাস শৈশব থেকেই গড়ে ওঠে। এ জন্য শিশুদের মেলামেশা ও পরিবেশের ব্যাপারে সজাগ থাকা কর্তব্য। এই অনিষ্টতার উৎস অনেক চেষ্টা তাদবীরের পরই মানুষের মধ্য থেকে সবার পরে বের হয়।

১৫. এমন অনেকেই আছে, যারা দীনের কাজে ব্যস্ত ব্যক্তি বুযুর্গদের কাছাকাছি থাকে কিন্তু তাঁদের অন্তরের নৈকট্য অর্জন করতে পারে না। আবার এমন অনেক ব্যক্তি আছে, যারা দীনের বহুদূরে থেকেই বুযুর্গদের হৃদয়ের নৈকট্য অর্জনে সক্ষম হয়।

১৬. বিয়েতে খরচ কম করো এবং সহজ করো। তাহলে যিনার অস্তিত্ব থাকবে না। (অর্থাৎ হ্রাস পাবে) আর বিয়ে-শাদীতে খরচ বৃদ্ধি পেলে যিনা সাধারণ ব্যাপার হয়ে যায়। শরীয়তের চাহিদা হলো, বিয়ে হবে সহজ সংক্ষিপ্ত ও সাদামাটা।

১৭. নিজ জীবনে দীনকে অধিক গুরুত্ব দেবে। আর দুনিয়াকে সামান্য গুরুত্ব দেবে। তাহলে তুমি দীনের জন্য হয়ে গেলে। আর যদি দুনিয়াকে প্রাধান্য দেওয়া হয় তাহলে জীবনটা দুনিয়ার জন্য হয়ে যাবে।

১৮. আপনাকে এটা বলছি না যে, আপনার সন্তানকে মৌলভী বানান বা মাস্টার বানান। আপনার যা মনে চায় বানান, কিন্তু পরামর্শ হলো, তাকে দীনদার বানান। যদি মৌলভী হয় এবং দীনদারী না থাকে তাহলে ঘরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে।

১৯. আপনি মর্যাদা চান? তাহলে মানুষদের সাথে ভালোবাসা ও উত্তম আচরণ করুন। আর যদি অযথা কঠোরতা অবলম্বন করেন, তাহলে আপনার সমমান ব্যক্তিরা আপনার সাথে ঝগড়া করবে। আর যদি আপনার চেয়ে ছোট ও অক্ষম হয় তাহলে তার মনে আপনার প্রতি কষ্টবোধ থাকবে। যা আপনাকে আল্লাহর রহমত থেকে দূরে সরিয়ে দেবে।

২০. হযরত ওমর রা. নিজ খেলাফতকালে গভর্নরদের নিকট প্রেরিত চিঠিতে লিখেছিলেন; তোমরা মানুষের প্রিয়ভাজন হওয়াকে অপ্রয়োজনীয় মনে করবে না। অর্থাৎ কখনো এমন করবে না যে, মানুষ আমাকে ভালোবাসুক আর নাই বাসুক; আমি তো ভালোই আছি। বরং নিজের আচার-ব্যবহার দ্বারা প্রিয় হওয়ার চেষ্টা করবে।

২১. হযরত আলী রা. বলতেন, যদি কারো জানার ইচ্ছা থাকে যে, আসমানে আমার মর্যাদা কেমন? তাহলে সে যেন তার সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তি এবং বন্ধুদের প্রতি লক্ষ্য করে। যদি তারা সবাই সন্তুষ্ট ও খুশি থাকে তাহলে তোমার আসমানে মর্যাদা আছে। আর যদি তাদের অন্তরে তোমার কারণে কষ্টে থাকে তাহলে আসমানে তোমার কোনো মর্যাদা নেই।

২২. আল্লাহ তাআলা কাউকে কঠোর স্বভাবের বানিয়েছেন আর কাউকে কোমল স্বভাবের বানিয়েছেন। এ ক্ষেত্রে কোন পদ্ধতি অবলম্বন করে আমাদের চলতে হবে? কঠোর স্বভাবের কঠোরতার ওপর ধৈর্য ধারণ করে চলতে হবে। কঠোর স্বভাবের মানুষদের সাথে কঠোর হলে ঝগড়া ও সম্পর্ক ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকে। পক্ষান্তরে নম্রতা ভালোবাসার কারণ হয়। যেমন দাঁত শক্ত কিন্তু জিহ্বা নরম। তবুও সে বত্রিশ শত্রুর মাঝে নিরাপদ থাকে। কিন্তু এতো বেশী নম্রতা ভালো না যে, যে চাইবে অনিষ্ট করবে আর যথেচ্ছা ব্যবহার হবে।

نہ حلوہ بن کہ چٹ کر جائیں بھوکے ☆ نہ کڑوا بن کے جو چھکے سو تھوکے

'তুমি এতো সুমিষ্ট হয়ে যেয়ো না, যাতে সবাই চেটে খেতে পারে, তুমি এতো তেতো হয়ো না, যেন স্বাদ নিতে গিয়ে থুথু করে ফেলে না দেয়।'

২৩. সম্পদ প্রাপ্তি আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টির লক্ষণ নয়। তদ্রূপ দুঃখ-কষ্ট আসাও আল্লাহ তাআলার অসন্তুষ্টির লক্ষণ নয়। বরং দেখার বিষয় হলো, আমাদের জীবন আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর রাসূল সা.-এর দেখানো পথে চলছে কি না।

২৪. আল্লাহর আনুগত্যশীল বান্দাকে আল্লাহ নেয়ামত দেন সন্তুষ্ট হয়ে, যেভাবে সোলায়মান আ. এবং দাউদ আ.-কে দিয়েছিলেন। আর অবাধ্য বান্দাকে আল্লাহ নেয়ামত দেন অসন্তুষ্ট হয়ে। যেমন ফেরাউন ও কারুনকে দেয়া হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ, তোতা পাখিকে খাঁচায় খাবার দেয়া হয় সন্তুষ্টচিত্তে। আর ইঁদুরকে খাবার দেয়া হয় মনের ঝাল মেটানোর জন্যে।

২৫. নেয়ামত পেয়ে যে কৃতজ্ঞতার স্বীকার করলো সে সফল। আর অকৃতজ্ঞ ব্যক্তি ব্যর্থ ও পরাজিত।

২৬. আখেরাতের পরীক্ষায় সফল হওয়া নির্ভর করে দুনিয়ার পরীক্ষায় সফল হওয়ার ওপর। আর প্রতিটি মুহূর্ত আল্লাহ হুকুম অনুযায়ী অতিবাহিত হওয়াই দুনিয়ার পরীক্ষায় সফল হওয়ার প্রমাণ।

২৭. আম্বিয়া আ.-দের দরদ ও চিন্তা অন্তরে লালন করাটা মানুষকে কাজের উপযুক্ত বানিয়ে দেয়। এই অস্থিরতাই মানুষকে দীনের কাজে উদ্বুদ্ধ করবে। নবীদের হৃদয়ের অস্থিরতা যার অন্তরে পয়দা হবে আল্লাহ্ তাআলা তাকে দিয়েই দীনের কাজ নিবেন। চাই সে যোগ্য কিংবা অযোগ্য হোক। স্বচ্ছল কিংবা অস্বচ্ছল হোক। আলেম কিংবা সাধারণ হোক। কারণ কাজ করার তাওফিক তো আল্লাহই দিয়ে থাকেন।

২৮. প্রতিটি কাজ নিয়ম অনুসারে ধীরে ধীরে হয়, দীনও নিয়ম অনুযায়ী মেহনতের দ্বারা অর্জিত হয়। যদি দীনের বৃক্ষ লাগাতে চাও তাহলে প্রথমে দাওয়াতের জমিন প্রস্তুত করো। ঈমানের চারা রোপন করো। তারপর সেখানে তালীমের মজলিসের দ্বারা পানি সিঞ্চন করো। ত্যাগের সার দাও। আর গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার বেড়া দাও। জিকির, তেলাওয়াত, কান্নাকাটি, কাকুতি-মিনতি, উষ্ণ অশ্রু প্রবাহিত করো। আর ঠাণ্ডা ও দীর্ঘশ্বাস তৈরি করতে হবে। আর ইসলামের মূল বিষয়গুলো কায়েম করতে হবে। জীবন যাপন ও আচার ব্যবহারকে ন্যায়নীতির সাথে পরিচালনা করার মাধ্যমে শাখা-প্রশাখা প্রসারিত করতে হবে। এমন উত্তম চরিত্রের ফলে শিল্পকর্ম হবে। তখন গিয়ে দীনের বৃক্ষ তৈরি হবে। আর মানুষ উপকৃত হবে।

২৯. দীনের ওপর দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্ব অর্জন করার জন্য বিভিন্ন কষ্ট স্বীকার করা আবশ্যক। এই সমস্যা ও বাধাগ্রস্থতা ডিমের খোসার ন্যায় আবশ্যক। যেভাবে ডিম থেকে বাচ্চা হওয়ার জন্য খোসা আবশ্যক। খোসা ব্যতীত যেমন শুধু সাদা ও হলুদ অংশ দ্বারা বিশ বছরেও বাচ্চা তৈরি হবে না। তেমনিভাবে দীনের মধ্যে দৃঢ়তা অর্জন করার জন্য সমস্যার সম্মূখীন ও বাধা প্রাপ্ত হওয়ার খোসা আবশ্যক। ডিমের মধ্যে বাচ্চা তৈরি হওয়ার পরই খোসা ফেটে যায়। তেমনিভাবে দীনের মধ্যে দৃঢ়তা অর্জন করার পরই সমস্যার খোসা ফেটে যায়। অর্থাৎ সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায়।

৩০. আবেগ ও বুদ্ধিমত্তার সমন্বয় আবশ্যক। যুবক ভাইয়েরা খুব আবেগী হয়। তাদেরকে বুদ্ধিমত্তার লাগাম দিতে হয়।

৩১. প্রতিটি নেক কাজের প্রভাব সমস্ত পৃথিবীতে অনুভূতিহীন ভাবেই ছড়িয়ে পড়ে। শর্ত হলো, কাজ নবী সা.-এর পদ্ধতিতেই হতে হবে। তাহলেই নেক আমলের প্রভাব দুনিয়াব্যাপী ছড়াবে। যেভাবে একটি বড় হাউজের মধ্যে পাঁচ বালতি পানি ঢালার পর ওই হাউজের ওপরের অংশ অদৃশ্যভাবেই চতুর্দিকে কিছু না কিছু বৃদ্ধি পায়। তদ্রূপ পাঁচ বালতি পানি উঠিয়ে ফেললেও

পুরো হাউজের চারদিক থেকেই পানি কমে যায়। চাই পানি হাউজের একদিক থেকে উঠানো হোক বা ঢালা হোক।

৩২. অন্যের জান-মালের প্রতি অমুখাপেক্ষী হবে এবং নিজের জান-মাল দ্বারা অন্যের খেদমত করবে। এতে করে পরস্পরে সুসম্পর্ক ও ঐক্য তৈরি করে।

৩৩. অধ্যাত্মিক নেয়ামতে যদি অহংকার সৃষ্টি হয়, তখন সেটা আর অধ্যাত্মিক নেয়ামত থাকে না, বরং অহংকার মিশ্রিত হয়ে যায়।

৩৪. সুখ-শান্তি ও ধন-সম্পদ যেমন বরকতের কারণ হয়। তেমন পরীক্ষারও কারণ হয়। যদি সুখ-শান্তি ও ধন-সম্পদ আল্লাহ তাআলার আনুগত্য থেকে আসে তাহলে বুঝতে হবে, এটা রহমত ও বরকতের কারণ। আর যদি ধনপ্রাপ্ত ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্য বান্দা হয় তাহলে বুঝতে হবে, বিলম্বিত করে সুযোগ দেয়া হয়েছে।

৩৫. কখনও যদি নামায আদায় করার পর উদ্দেশ্য পূরণ হয় তাহলে ওই কারণে নিজে নিজেকে বুযুর্গ এবং নিষ্কলুস মনে করবে না। যদি মনে করো তবে সেটি হবে চরম অবক্ষয়। কারণ সেখানে তোমার কোনো কৃতিত্ব নেই, বরং এটি হলো আমলের নিদর্শনের বহিঃপ্রকাশ এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদার পূরণ।

আল্লাহ তাআলা বলেছে- لَا تُزَكُّوْا اَنْفُسَكُمْ. তোমরা নিজেকে নিজে নিষ্কলুষ মনে করবে না। যে গুনাহগার ব্যক্তি তাওবা ও এস্তেগফার করে আল্লাহর সামনে কান্নাকাটি করে, সে আল্লাহ তাআলার নিকট ওই ব্যক্তি থেকে বেশী প্রিয় যে নেক আমল করে তার ওপর গর্ব ও অহংকার করে।

৩৬. কষ্ট ও পরিশ্রমের নাম মোজাহাদা নয়। এই ধরণের মুজাহাদা শরীয়তের চাহিদা ও পছন্দ না। মুজাহাদা বলা হয়, আল্লাহর কোনো আদেশ এবং দীনের চাহিদা সামনে আসলে তা ইচ্ছার বিরুদ্ধে হওয়া সত্ত্বেও কষ্ট স্বীকার করে সেটা পূর্ণ করা। কিন্তু এই কষ্ট স্বীকার করতে গিয়ে যেন আল্লাহর আদেশ লঙ্ঘিত না হয়। এই ধরণের মুজাহাদা মানুষের উন্নতির কারণ হবে।

৩৭. আল্লাহ যাকে নম্র স্বভাবের বানিয়েছেন, সে নম্রই থাকবে। কিন্তু নম্রতাকে অন্যায়ভাবে ব্যবহার না করা চাই। আর যাকে কঠোর স্বভাবের বানিয়েছেন সে কঠোরই থাকবে। কিন্তু এই কঠোরতার কারণে কারো মনে

কষ্ট না দেওয়া চাই। বরং ঐক্যবদ্ধ সংঘবদ্ধ হয়ে এবং মিল মোহাব্বতকে বহাল রেখে পরস্পর সহযোগীতা চালিয়ে যাওয়া অবশ্যক।

হযরত আবু বকর রা. ছিলেন নম্র প্রকৃতির আর হযরত ওমর রা. ছিলেন কঠিন প্রকৃতির। এতদ্সত্ত্বেও উভয়ের সহাবস্থান ছিলো শিক্ষণীয়। হযরত আবু বকর রা. যাকাত অস্বীকারকারী মুরতাদদের মোকাবেলা করার আদেশ দিলেন। তখন হযরত ওমর রা. নবী পত্নিগণ, মহিলা ও বাচ্চাদের সমস্যার বিষয়টি লক্ষ্য রাখার পরামর্শ দিলেন। তখন হযরত আবু বকর রা. উত্তেজিত হয়ে কঠোরতার সাথে হযরত ওমর রা.-কে বললেন,—

جَبَّارٌ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خَوَّارٌ فِى الْاِسْلَامِ.

ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তো খুব বাহাদুর ছিলে, আর এখন ইসলাম গ্রহণ করে হয়ে যাচ্ছো কাপুরুষ। তখন হযরত ফারুকে আজম রা. এই কঠোরতাকে হজম করে নিলেন এবং হযরত আবু বকর রা.-এর আদেশ মেনে নিলেন।

অন্য এক সময় হযরত আবু বকর রা. উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম রা.-এর পরামর্শে দু'জন সাহাবাকে জমি হস্তান্তরের দলিল লিখে দিলেন। যখন এই দুইজন সাহাবা রা. হযরত ওমর রা.-এর সাক্ষর নেওয়ার জন্য গেলেন তখন তিনি কঠোরতার সাথে দলিল ছিড়ে ফেললেন এবং বলে দিলেন এই জমি সমস্ত মুসলমানের হক। শুধু হযরত আবু বকর রা. মালিক নন। যখন এই দু'জন সাহাবা হযরত আবু বকর রা.-এর কাছে গিয়ে হযরত ওমর রা.-এর কঠোরতার কথা বর্ণনা করলো। আর বললো, রাষ্ট্রপ্রধান কে? আপনি নাকি হযরত ওমর রা.? তখন হযরত আবু বকর রা. কতই না উত্তম কথা বলেছেন; রাষ্ট্র প্রধান হওয়ার উপযুক্ত তো ওমরই ছিলেন, কিন্তু এই ভার আমার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে।

৩৮. দীনের মেহনতের ক্ষেত্রে মর্যাদার দায়িত্বের মতো খেদমতও সমান জরুরী, বরং খেদমতের অংশ বাদ দিলে তো মূল কাজেও ঘাটতির আশঙ্কা প্রবল। কেননা খেদমতের সাথীদের কারণেই পুরো মজমা আরামে ও শান্তিতে মেহনত চালিয়ে যেতে পারছে। (খেদমত বলতে এখানে উদ্দেশ্য হলো, রান্না-বান্না, বাতি-সামিয়ানা ইত্যাদির ব্যবস্থা করা। আর মর্যাদার দায়িত্ব মানে হলো তালীম, গাশ্ত, বয়ান ইত্যাদি।)

অভিজ্ঞতার চেয়ে দৃঢ় বিষয়

যেমনিভাবে আল্লাহ তাআলা প্রতিটি জিনিসের মধ্যে প্রভাব রেখেছেন, তেমনিভাবে আমলের মধ্যেও প্রভাব রেখেছেন। কিন্তু বস্তুর প্রভাব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলাই মানুষকে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দিয়েছেন আর আমলের প্রভাব সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা ওয়াদা করেছেন। মানুষের অভিজ্ঞতার চেয়ে অধিক দৃঢ় এবং সত্য হলো আল্লাহ তাআলার ওয়াদা। মানুষের অভিজ্ঞতা ভুল হতে পারে, কিন্তু আল্লাহ তাআলার ওয়াদা নির্ভুল ও শাশ্বত।

সঠিক কাজ

দীনি দাওয়াতের কাজ যদি নবী করিম সা.-এর দেখানো পথ অনুযায়ী হয় তাহলে সর্বত্র আউলিয়া সৃষ্টি হবে। আর যদি দীনি দাওয়াতের আমল না থাকে তাহলে নবীগণের মেহনত করে যাওয়া ভুখণ্ডেও বদদীনি সৃষ্টি হবে।

রাসূলের সাথে তাঁর ভাবনাকেও স্মরণ করা

রাসূল সা.-এর স্মরণ করার সাথে সাথে তাঁর চিন্তা ভাবনা কি ছিলো সেটা স্মরণ রাখাও আবশ্যক। রবিউল আউওয়াল মাস শুধু তাঁর জন্মের আলোচনা করার জন্য নয়, বরং নবী সা.-এর চিন্তা ভাবনা কি ছিলো সেই চিন্তা-ভাবনা কিভাবে আমার মধ্যে আসবে তাও স্মরণ করা দরকার।

তাই শুধুমাত্র রবিউর আউওয়াল মাসেই স্মরণ করার জন্য যথেষ্ট মনে না করা। বরং প্রতিটি মুহূর্তে নবী করিম সা.-এর স্মরণ এবং তাঁর চিন্তা-চেতনা কি ছিলো সেটা ভাবা আবশ্যক।

ফতোয়া ও তাকওয়া কী

ফাতাওয়া শরীয়তের সীমারেখা বলে দেয়। আর তাকওয়া শরীয়তের চাহিদা প্রকাশ করে। হযরত সিদ্দিকে আকবর ও হযরত ওমর ফারুক রা. শরীয়তের চাহিদা কী তা বলে দিয়েছেন। আর উসমান রা. ও আলী রা. শরীয়তের সীমারেখা কী তা বলে দিয়েছেন।

মূলনীতি

দাওয়াত ও তাবলীগের সাধারণ নিয়মনীতির মধ্যে সংযোজন বিয়োজন করা যেতে পারে। এ নিয়মনীতি এমন নয় যে, এর মধ্যে পরিবর্তন হবে না। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী তার মধ্যে সংযোজন ও বিয়োজনের সুযোগ রয়েছে।

মূল বিষয় উসূল অনুযায়ী চলা

দাওয়াতের কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পেলে তখন সেখানে কঠোর হস্তে দমন করতে যেওনা, তাহলে শৃঙ্খলা ফিরে আসবে না। এতে করে যা-ই অল্পস্বল্প কাজ হচ্ছিলো তাও বন্ধ হয়ে যাবে। তেমনিভাবে কোনো ব্যক্তি থেকে বিশৃঙ্খলা প্রকাশ পেলে তাকে সুন্দরভাবে শৃঙ্খলায় ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করবে। তাকে কাজ থেকে বিরত ও বিতাড়িত করার কথা চিন্তাও করো না। কোনো ব্যক্তি বা দলের বিশৃঙ্খলা হলে এমন পদ্ধতি গ্রহণ করবে যাতে করে শৃঙ্খলা ফিরে আসে। যেন পরস্পরে ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক ও দীনি কাজ উভয়টাই বিদ্যমান থাকে এবং শৃঙ্খলা ফিরে আসে।

ইজতেমায়ী জীবনের পদ্ধতি

দীনি দাওয়াতের কাজ সকলের জন্য প্রযোজ্য। এজন্য পরস্পরে মিল মোহাব্বত, ওঠাবসা, চালচলন, লেন-দেনের ক্ষেত্রে উত্তম ব্যবহার আবশ্যক। বিশেষ করে জবানের হেফাজত করা খুবই জরুরী। খোশামদ করে ভালোবাসা অর্জন করা আল্লাহ তাআলার কাছে অপছন্দনীয়। কেননা, খোশগল্পের দ্বারা যেই ভালোবাসা অর্জন হয়, তাতে নিজের স্বার্থপরতা ও অন্যের প্রতি অবিচার করা হয়। তাই এ ইজতেমায়ী কাজ সুশৃঙ্খল রাখার জন্য এমন স্পর্শকাতর দিকগুলোর প্রতি লক্ষ্য রাখা খুবই জরুরী।

শুধু মেহনত অব্যাহত রাখতে হবে

পৃথিবীতে কোনো মাদরাসা, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার পূর্বে প্রশ্নপত্র প্রকাশ করা হয় না। আর প্রশ্নপত্র প্রকাশ হয়ে যাওয়ার পরও যদি কোনো ছাত্র ফেল করে তাহলে তাকে নিতান্তই নির্বোধ মনে করা হয়। তবে আল্লাহ তাআলা নিজ অনুগ্রহে কবরের প্রশ্ন প্রকাশ করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় অতিরিক্ত এই দয়াও করেছেন যে, এর উত্তরও জানিয়ে দিয়েছেন। এখন আমাদের কর্তব্য হলো, এই দুনিয়াতে শুধু প্রস্তুতি গ্রহণ করা।

দীন যিন্দা রাখার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়

আল্লাহ তাআলার শক্তির তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত শক্তি মাকড়সার জালের ন্যায়। আল্লাহ তাআলার ধন-ভাণ্ডারের তুলনায় দুনিয়ার সমস্ত ধন-ভাণ্ডার মশার পাখার ন্যায়। সুতরাং আল্লাহর দেয়া শক্তি ও ধন-ভাণ্ডারের সাথে সম্পর্ক হবে দীনের কারণে। এই দীনকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য রাজত্ব, সম্পদ ও শক্তির প্রয়োজন নেই; বরং এর জন্য প্রয়োজন হলো, মানুষের চেষ্টা-ফিকির, ত্যাগ ও উৎসাহ-উদ্দীপনা।

যোগ্যতা থাকা জরুরী নয়

দীন অর্জনের জন্য সাধনা ও কষ্ট করার অভ্যাস করতে হবে। সহায়হীন, নিঃস্ব মানুষ যদি সাধনা ত্যাগের মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে আল্লাহ তাআলা ও তাঁর দীনের সাথে সম্পর্ক গড়ে। তাহলে আল্লাহ তাআলা তার দ্বারাও দীন প্রতিষ্ঠা করে দেবেন। আল্লাহ তাআলার কাছে পদ-পদবী, ধন-সম্পদ এবং যোগ্যতা শর্ত নয়। শুধু আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, তাওফিক ও সাহায্য জরুরী। তাই নবী করিম সা. বলেছেন, আমি রাজকীয় নবুয়ত চাই না। আমি গরিবানা নবুয়ত চাই।

শয়তানের ধোঁকা

দাওয়াতের মেহনতকারীরা অনুর্বর ময়দান রেখে মৃত্যুবরণ করে না। অনুর্বর ময়দান মানে হলো, অমুক ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার কারণে দীনের কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া। এমনভাবে কাজ করতে হবে যেন আরো কর্মী তৈরি হয়। অনেকেই একাকী এতকাজ করে যে, নিজেকে ক্লান্ত করে ফেলে। কিন্তু যদি কর্মী তৈরি না হয় তাহলে এটা হবে শয়তানের ধোঁকা।

আল্লাহ তাআলা আপন সত্তা থেকে লুকিয়ে আছেন। কিন্তু দলিল-প্রমাণের দ্বারা বুঝা যায় তিনি নিরাকার। আল্লাহর অস্তিত্ব অস্বীকারকারীকে তাঁর নিদর্শনসমূহ বুঝিয়ে স্বীকৃতি অর্জন করো, অতঃপর আল্লাহর উদ্দেশ্য কী সেটা বর্ণনা করে দীনের প্রতি আকৃষ্ট করো, তারপর দাওয়াতের কাজে দাঁড় করিয়ে তাকে নিয়ন্ত্রণ করো।

আজকের দিন চলে যাওয়া মানে মৃত্যুর দিকে এক কদম এগিয়ে যাওয়া। মৃত্যুর সময় ঈমান ও আমলের মূল্য অনেক বেশী। এদিকে লক্ষ্য রাখা জরুরী।

জিহাদের উদ্দেশ্য কী

হুযুর সা.-এর পবিত্র কর্মপদ্ধতি সর্বসাধারণের নিকট পৌঁছানোর জন্য সাহাবায়ে কেরামের দল কে বাইরে পাঠালেন এবং এ নির্দেশ দিলেন যে, আমাদের উদ্দেশ্য মারামারি না। দীনের পথে বাঁধা সৃষ্টিকারীর উদাহরণ হলো শরীরের ফোঁড়ার মতো। তার চিকিৎসা ভিতরে দাওয়াতের তেঁতো সিরাপ দ্বারা এবং বাইরে উত্তম চরিত্রের ব্যান্ডেজ দ্বারা করতে হবে। এতদ্সত্বেও যদি ফোঁড়ার এ চিকিৎসায় কাজ না হয়, তখন অপারেশন করতে হবে। যেমনিভাবে মক্কী জীবনে ভিতরের চিকিৎসা দাওয়াতের তেঁতো সিরাপ দ্বারা এবং বাহিরের চিকিৎসা উত্তম আচরণের মলম দ্বারা করা হয়েছিলো। কিন্তু ফোঁড়া ভালো না হওয়ার কারণে বদরে এর অপারেশন করতে হয়েছিলো।

মোটকথা মারামারি উদ্দেশ্য না। পবিত্র পয়গাম পুরো দুনিয়ায় ছড়িয়ে দেয়ার পথে বাঁধা প্রদানকারীদের দমন করা উদ্দেশ্য।

দীন কিভাবে প্রসার হবে

বর্তমান পৃথিবীতে চলছে ঝগড়া ফাসাদের যুগ। কোথাও মিথ্যা নবুয়তের দাবীদার, কোথাও হাদীসের অস্বীকৃতি, কোথাও হযরত আলী রা.-এর ভালোবাসায় অস্বাভাবিক বাড়াবাড়ি। কারো কারো ধারণা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হবে তো দীনের প্রসার ঘটবে। এর বিপরীতে আমরা এভাবে বলি যে, রাষ্ট্র থাকবে তো দীন প্রসার হবে। আর রাষ্ট্রের চাহিদা হলো, এই কুরআন ও হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী সত্যিকার দীনের দাওয়াতকে গ্রহণ করা। যেখানে সমস্ত ঝগড়া ও মতানৈক্যের সমাধান রয়েছে।

রাত-দিনের অভিজ্ঞতা

দোজাহানের সৃষ্টিকর্তা ও অধিপতি একজন। মানুষ পৃথিবীতে আগমনের পদ্ধতিও একটি। এই পৃথিবী থেকে প্রত্যেকের যাওয়ার পদ্ধতিও একটি। দোনো জাহানের সুখশান্তি অর্জন করার পদ্ধতিও এক। যাকে শক্তিশালী একক সত্তা অনুমোদন দিয়েছেন। যে ব্যক্তি স্বীয় বুদ্ধি-বিবেক দ্বারা জীবন পরিচালনা করে, সে ভুল-ভ্রান্তির স্বীকার হয়। এ কারণে জীবন পরিচালনার জন্য আম্বিয়া আ.-এর শরণাপন্ন হতে হয়, যার সম্পর্ক ওহির সাথে।

ত্যাগের সিঁড়ি

দীনের কাজ যে পরিমাণে হচ্ছে তা অবশ্যই শুকরিয়া আদায়ের যোগ্য। কিন্তু অনেক কাজই অবশিষ্ট রয়ে গেছে, সে ব্যাপারে চিন্তা করা প্রয়োজন। যারা দীনের জন্য চেষ্টা-ফিকির করছেন তাদের ত্যাগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। ত্যাগের সিঁড়ি বানাও, বাসা বানিও না, কেননা নতুন মেহনতকারীরা এসে থেমে যাবে। যেমনিভাবে নবী করিম সা. ওহুদ যুদ্ধের সময় আহত সাহাবাদেরকে সঙ্গে নিয়ে কাফেরদের ধাওয়া করে ছিলেন। অন্যান্য সুস্থ সাহাবা রা.-দের সাথে নেন নি। যখন ত্যাগীদের পরিমাণ বৃদ্ধি করলেন, তখন আল্লাহর সাহায্য নেমে আসলো।

হেদায়াতের জন্য দোয়া ও মেহনত জরুরী

আল্লাহ তাআলা সমস্ত মানুষের অবস্থা তাদের আমলের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। এমনিভাবে আমলকে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের সাথে এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে অন্তরের সাথে সম্পৃক্ত করেছেন। আর অন্তরকে আপন হাতের কব্জায় রেখেছেন। যদি অন্তর

আল্লাহমুখী হয় তাহলে সমস্ত আমল আল্লাহর জন্য হবে এবং তা দুনিয়া ও আখেরাতে সৌভাগ্যের কারণ হবে। আর যদি অন্তর গাইরুল্লাহমুখী হয় তাহলে তার আমল গাইরুল্লাহর জন্য হবে এবং তার দুর্ভাগ্যের কারণ হবে। এমনকি দানশীল, কুরআন পাঠকারী ও শহীদও জাহান্নামে প্রবেশ করবে।

এজন্য অন্তর যদি আল্লাহমুখী হয় তাহলে তা হেদায়াত লাভের মাধ্যম হয়। যা একটি নূর, যা মানুষের অন্তরে দেওয়া হয়। যেমনিভাবে চাঁদ-সূর্যের আলোয় মানুষ বাইরের ভালো-মন্দ দেখে তেমনিভাবে বাতেনী আমলের ভালো-মন্দ দেখার জন্যও হেদায়াতের নূর জরুরী। অন্তরে যদি হেদায়াতের আলো থাকে তাহলে মানুষ আমানত, সত্যবাদিতা ইত্যাদির উপকার ও খেয়ানত, মিথ্যাবাদিতা ইত্যাদির ক্ষতি দেখবে। এ থেকে বোঝা যায় যে, মানুষের জন্য সবচেয়ে জরুরী হলো হেদায়াত। আর হেদায়াত আল্লাহর হাতে।

اِنَّكَ لَا تَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِيْنَ

আপনি তো হেদায়াত দিতে পারেন না, যাকে আপনি ভালোবাসেন, কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দেন, আর তিনিই হেদায়াত গ্রহণকারীদের ব্যাপারে অধিক অবগত।

আল্লাহর কাছে হেদায়াতের দোয়া করা ছাড়া কোনো উপায় নেই। এ জন্যেই তো সবার জন্য সবসময় সূরা ফাতেহা পড়ার হুকুম দেওয়া হয়েছে। প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাযের পরপর হেদায়াতের দোয়া করতে বলা হয়েছে। اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ। আমাদেরকে সঠিক পথের দিশা দিন।

কিন্তু এই ব্যাপক প্রার্থনা, হেদায়াতের দোয়ার সাথে সাথে মেহনত ও মোজাহাদা জরুরী। মোজাহাদা করা হলে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াতের ওয়াদা করা হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

আর যারা আমার পথে মোজাহাদা করবে তাদের জন্য আমি হেদায়াতের পথ সমূহ খুলে দিব।

একদিকে মোজাহাদা, অপর দিকে দোয়া, যদি এমন হয় তাহলে অন্যদিকে আল্লাহর পক্ষ থেকে হেদায়াত লাভ করবে।

جز نیاز و جز تضرع راہ نیست ☆ زیں تقلب ہر قلب اکاہ نیست

দোয়া আর অক্ষমতা পেশ করা ছাড়া কোনো রাস্তা নেই। ঘুরে ফিরে একই কথা, অন্য কোনো ঠিকানা নেই।

বিশ্বজগত সৃষ্টির চারটি উপযোগিতা

১. বিশ্বজগত সৃষ্টির চারটি উপযোগিতার একটি হলো, মানুষের শরীর বানানো হয়েছে এই জগতের উপাদানসমূহ দিয়ে। সুতরাং জগতের সৃষ্টি হয়েছে মানুষের শরীর প্রতিপালনের মাধ্যম হবার কারণে।

২. দ্বিতীয় কারণ হলো, আল্লাহর পরিচয় লাভের নিদর্শন রয়েছে এখানে। আল্লাহর সত্তা তো দেখা যায় না। তাই পৃথিবী, আকাশ, চন্দ্র, সূর্য, তারা, মানুষের ভাষা ও চেহারা ভিন্ন ভিন্ন হওয়া, রাত ও দিন থাকা— এ জাতীয় অসংখ্য নিদর্শন আল্লাহর অপার কুদরত প্রকাশ করে; যার মাধ্যমে মানুষ আল্লাহর পরিচয় লাভ করতে পারে। সতুরাং বিশ্বজগতের সৃষ্টি প্রকারান্তরে আল্লাহর পরিচয় জানার একটি মাধ্যম।

৩. তৃতীয় উপযোগিতা হলো, বিশ্বজগত সৃষ্টি করা হয়েছে পরীক্ষা করার জন্যে— মানুষ দুনিয়ার বিষয়-আশয় নিয়ে পড়ে থাকে নাকি আল্লাহর কথা মান্য করতে গিয়ে এইসব বিষয়-আশয়কে কোরবান করে।

৪. চতুর্থ উপযোগিতা হলো, জগতের সামগ্রী, রাজ্য ও সম্পদ, স্বর্ণ ও রৌপ্য, অর্থ ও বিত্ত, পদ ও পদবী, দোকান-ক্ষেত— এ সবকিছুই হলো পাত্র, অর্থাৎ একটা থালার মতো। এই থালায় সেটাই পাওয়া যাবে যা, আল্লাহর পক্ষ থেকে দেওয়া হবে। ফেরআউনের রাজত্ব ও সম্পদের পাত্রে ব্যর্থতা ঢেলে দেওয়া হয়েছে এবং সোলায়মানের রাজত্ব ও সম্পদে নাজিল করা হয়েছে সফলতা। সুতরাং সম্মান ও লাঞ্ছনা এবং সফলতা ও ব্যর্থতার মাপকাঠি ছোট বা বড় হওয়া, কিংবা বেশী বা কম হওয়ার ওপর নির্ভর করে না। বরং মাপকাঠি হলো, মানুষের দেহ থেকে বেরিয়ে আসা আমল। সে-অনুযায়ী আল্লাহর ফয়সালা হয়ে থাকে।

আজকের দুনিয়ার সবচে' মূল্যহীন সৃষ্টি

মানুষ আজ মলমূত্র থেকে শুরু করে চন্দ্র পর্যন্ত গবেষণা করছে বটে, কিন্তু নিজেই নিজের কাছে উপেক্ষিত থেকে গেছে। চিকিৎসকগণ মল নিয়ে গবেষণা করেছেন, বিজ্ঞানীরা গবেষণা করেছেন চন্দ্র; কিন্তু এই মানুষ নিজেকে নিয়ে গবেষণা করে নি। এর ফল এই দাঁড়িয়েছে যে, পৃথিবীতে আজ সবচে' মূল্যহীন সৃষ্টি হয়ে পড়েছে মানুষ। ঘর, দোকান ও এক টুকরো ভূমির জন্যে মানুষকে হত্যা করা হচ্ছে। সেই সাথে জন্মনিরোধের পদ্ধতি মানুষের ওপর চাপিয়ে দিয়ে আল্লাহর সৃষ্টিকে আগামির পৃথিবীতে আসার পথ রুদ্ধ করবার চেষ্টা চলছে।

অথচ দেখুন— গাছের বেলায় কিন্তু এই নিয়ম নেই যে, এমন গাছ লাগাবে, যাতে শুধু তিনটি ফল ধরবে। কিংবা এমনভাবে জমি চাষ করবে, যেন শুধু তিন মণ শষ্য উৎপন্ন হবে। কিন্তু মানুষ এতটা নির্মূল্য যে, তিনের অধিক সন্তান যেন না আসে, সেই রীতি অবলম্বন করছে তারা। কারণ একটাই, মানুষ তার মূল্য হারিয়ে ফেলেছে। অথচ আল্লাহ তাআলা মানুষকে এতটা মূল্যবান বানিয়েছিলেন যে, ফেরেশতাদের দিয়ে সেজদা করিয়েছেন এবং তাদের ওপর মর্যাদা দিয়েছেন। মানুষ যখন জন্তু-জানোয়ারের মতো কাজ করা শুরু করেছে, তখন মানুষের মধ্য থেকে মনুষ্যত্ববোধ ধ্বংস হওয়া শুরু করেছে এবং মানুষ হয়ে চলেছে মূল্যহীন পদার্থের মতো।

পুনরুত্থান সম্পর্কে শক্তিশালী দলিল

মানুষের আত্মা চিরায়ত ও চিরন্তন। কেবল আত্মার স্থান পরিবর্তন ঘটে। রুহের জগত থেকে দেহ-জগতে এবং দেহ-জগত থেকে নশ্বর দুনিয়াতে। এর সর্বশেষ মঞ্জিল হবে আখেরাতের জগত। মানুষের দেহ তৈরি করা হয়েছে বিশ্বজগতের উপাদান থেকে। দেহের প্রতিটি অংশ-কণা সারা দুনিয়ায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো।

ছিলো সূর্যের রশ্মিতে ও চাঁদের কিরণে, তারকার আবেশে ও বাতাসের তরঙ্গে, বৃষ্টির ফোঁটা ও মাটির বিন্দুতে। আর ছিলো দুর্গন্ধ আবর্জনার মধ্যে। আল্লাহ তাআলার নিপুণ ব্যবস্থাপনা এই সকল অংশ-বিন্দু-কণাকে একত্র করে জীবিকা ও অন্য পথ তৈরি করেছেন। নর-নারী তা ব্যবহার করেছে এবং তাতে বীর্য তৈরি হয়েছে; যা দিয়ে মানুষের দেহ গঠন করা হয়েছে। এরপর তার আত্মা এসেছে রুহের জগত থেকে। অতঃপর মানুষ অস্তিত্বে এসেছে। এর কালসীমা হলো মৃত্যু। এরপর দেহ মিটিয়ে ফেলা হবে। কিয়ামতের দিন পুনরায় সব অংশ একত্র করে অস্তিত্ব দান করা হবে। যেই আল্লাহ বিশ্বজগতের অণু-বিন্দু একত্র করে একবার সৃষ্টি করে দেখিয়েছেন, তার জন্যে দ্বিতীয়বার সৃষ্টি করা নিতান্তই সহজ।

অজস্র কোটি মানুষ এই মর্মকথা সম্পর্কে জানে না। আর যারা জানে তারাও আজ উদাসীনতার শিকার।

ত্যাগ ও ভোগের বিপরীতমুখী স্বভাব

রাসূল সা.-এর প্রদর্শিত পথে ত্যাগ ও কোরবানির প্রেরণা সৃষ্টির শিক্ষা রয়েছে। যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে দান-দক্ষিণা অর্থাৎ বিতরণ ও বিলানোর

স্বভাব তৈরি হয়ে থাকে। এই স্বভাব হৃদ্যতা ও ভালোবাসা, সহমর্মিতা ও আত্মত্যাগ এবং কৃতজ্ঞতা ও পারস্পরিক নির্ভরতার প্রবৃদ্ধি ঘটায়। যা নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা এবং উভয় জগতের উন্নতির কারণও বটে।

ব্যতিক্রম ঘটে দুনিয়াদারদের ক্ষেত্রে। তাদের মধ্যে রয়েছে চুরি, ছিনতাই, সুদ, ঘুষ, শঠতা, প্রতারণা ও মাপ-পরিমাপে কম দিয়ে লুণ্ঠন করা ও ছিনিয়ে নেওয়ার স্বভাব। যার ফলে শত্রুতা ও বাড়াবাড়ির সঙ্গে সঙ্গে বিশৃঙ্খলা ও অস্থিরতার বৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং দুনিয়াটা জাহান্নামের গর্তে পরিণত হয়। যেমন, সুদ সম্পর্কে আল্লাহ এরশাদ করেছেন—

يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ.

আল্লাহ তাআলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান বর্ধিত করেন।[২২২]

কিন্তু মানুষের মধ্যে অপরাধের জীবাণু ঢুকে পড়ায় এবং পশুর বৈশিষ্ট্য গড়ে ওঠার কারণে সুদের মধ্যে সম্পদের বৃদ্ধি এবং সদকার মধ্যে সম্পদের হ্রাস পরিলক্ষিত হচ্ছে। যদি চেষ্টা ও কষ্ট স্বীকার করে অপরাধ থেকে বেঁচে থেকে পশুর বৈশিষ্ট্য দূর করা যায় এবং ফেরেশতাসুলভ গুণাগুণ গড়ে তোলা হয়, তাহলে তখন সেটাই পরিলক্ষিত হতে থাকবে, যা আমাদের মালিক ও স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা এরশাদ করেছেন। অর্থাৎ— দানের কারণে সম্পদ বৃদ্ধি এবং সুদের কারণে সম্পদের বিনাশ পরিষ্কারভাবে বোঝা যাবে।

প্রার্থনা ও প্রচেষ্টায় সমন্বয় থাকতে হবে

প্রার্থনা ও প্রচেষ্টার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা আবশ্যক। নবী আ.-দের মতো দোয়া করার বেলায় মুখের ভাষার খর্চা হয় শুধু আড়াই তোলা। বলা হয় যে,

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ.

তুমি আমাদের সরল পথ দেখাও (হে মাবুদ)।[২২৩]

আর বাজারের মধ্যে আড়াই মণ ওজনের শরীর—

الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ.

যাদের প্রতি গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।'[২২৪]

---

২২২. সূরা বাকারা : আয়াত- ২৭৬।

২২৩. সূরা ফাতেহা : আয়াত- ৬।

২২৪. সূরা ফাতেহা : আয়াত- ৭।

এখন শ্রম ও দোয়া দুটোই করতে হবে—

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا.

যারা আমার পথে সাধনায় আত্মনিয়োগ করে, আমি
অবশ্যই তাদেরকে আমার পথে পরিচালিত করবো।[২২৫]

আল্লাহর পথে শ্রম দিন। দূর থেকে পথ বন্ধ মনে হবে। চলতে শুরু করুন, খুলতে থাকবে। দোয়া ও শ্রমের মধ্যে সমন্বয় তৈরি হয়ে যাবে এবং সুফল বয়ে নিয়ে আসবে।

কিয়ামতের দিন আল্লাহ কেমন আচরণ করবেন ?

কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাআলা কেমন আচরণ করবেন, ইনসাফের না কি অনুগ্রহের? আপসের না নিয়মের? করুণার না কানুনের? যদি মুসলমানদের সঙ্গে ইনসাফের আচরণ করা হয়, তাহলে গুনাহ পরিমাণ তাদের জাহান্নামে রাখা হবে। যেন গুনাহ থেকে তাদের নিষ্কলুষ ও পবিত্র করে আনা যায়। আর যদি করুণার বিচার করা হয়, তাহলে সোজা তাদের জান্নাতে দাখিল করা হবে। ইনসাফের দাবি হলো, নেক আমল বেশী করা। ইনসাফ-এর অর্জন হলো ভয় এবং অনুগ্রহের অর্জন হলো আশা। এপরিমাণ ভয়ও ভালো নয়, যা ধ্বংসের কারণ হয়। একইসাথে আশাও এই পরিমাণ ভালো নয়, যা গুনাহের ওপর উদ্বুদ্ধ করে। বরং আশা ও ভয়ের মধ্যকার অবস্থার নামই হলো ঈমান—

اَلْإِيْمَانُ بَيْنَ الْخَوْفِ وَالرَّجَاء

রহস্যের কথা ঘোষণা হলো জগতের সামনে

যে কেউ রহস্য ও ভেদের কথা বলে দেয় না; বরং গোপন রাখে। আমরা প্রকাশ্যে ঢাক বাজিয়ে সারা পৃথিবীর অধিবাসী মানুষকে বলে দিচ্ছি— যদি মানুষের মধ্যে দু'টি বিষয়ের যোগ্যতা তৈরি হয়ে যায়, তবে এই আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহ তাআলা বলছেন, আমি তোমাদের ধ্বংস করবো না, বরং প্রতিষ্ঠিত করবো।

১. আল্লাহর সামনে দাঁড়ানোর ভয় অন্তরে সৃষ্টি হওয়া।

২. মন্দ কাজের জন্যে আল্লাহর শাস্তির ভয় সৃষ্টি হওয়া।

---

২২৫. সূরা আনকাবুত : আয়াত- ৬৯।

وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ۚ ذَٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ.

'তাদের পর তোমাদের পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করবো। এটা সে ব্যক্তির জন্যে, যে আমার সামনে দণ্ডায়মান হওয়াকে এবং আমার শাস্তির প্রতিশ্রুতিকে ভয় করে।'

এখানে ذَٰلِكَ (এটা) দ্বারা নির্দেশ করা হয়েছে وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ-কে। মানুষের মধ্যে পরকালের ভাবনা ও ভয় জাগিয়ে তোলার জন্যে সারা পৃথিবীতে আন্দোলন ও দৌড়ঝাঁপ করে এ বিষয়টির আলোচনা অব্যাহত রাখতে হয়। যেন মানুষের মধ্যে পরকালের ভাবনা তৈরি হয় এবং মানুষ ধ্বংসের পথ থেকে বেঁচে সফলতার পথের অভিযাত্রী হয়।

দুনিয়ার শাসকবর্গের কাছেও কোনো পন্থা নেই

বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার জন্যে এ যুগের কোর্ট-কাচারি, বিভিন্ন বিচারালয়, নীতিমালা ও ব্যবস্থাপনা ইতোমধ্যে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য হয়েছে। সারা বিশ্বের রাষ্ট্রব্যবস্থা নীতিহীনতা ও হতবুদ্ধিতায় নিমজ্জিত, যেহেতু তাদের কাছে শান্তি ও নিরাপত্তার কোনো পন্থা নেই। যার কারণে কারো প্রাণ, সম্পদ ও সম্মান কিছুই সুরক্ষিত নয়।

তাই বলে মুসলিম উম্মাহর হতাশ হবার কিছু নেই। আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মাদ সা.-এর চেয়েও বেশী হতাশাজনক পরিস্থিতিতে স্বীয় বিশুদ্ধ পন্থা মানুষের সামনে উপস্থাপন করেছেন। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র সেই পন্থা অবলম্বন করে শান্তি ও নিরাপত্তা সানুরাগে বরণ করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমান পৃথিবীতে নবীজী সা.-এর আনীত সেই পবিত্র পন্থা অবলম্বন করে এবং সেই পন্থায় দাওয়াত দেওয়ার কোনো বিকল্প নেই। যদি তা করা যায় তাহলে আজও সারা বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার বলয়ে আসতে সক্ষম এবং চিরস্থায়ী শান্তির ফল্গুধারা লাভেও সক্ষম।

জাহান্নাম ঈমানদারের জন্য নিরাময়কেন্দ্র

ঈমানদারের প্রকৃত নিবাস হলো জান্নাত। তার জন্যে জাহান্নাম কেবল হাসপাতাল ও নিরাময়কেন্দ্রের মতো। যেহেতু জান্নাত হলো পবিত্র আবাসগৃহ এবং জান্নাতের স্থানসমূহ পবিত্র, যেমন বলা হয়েছে, وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً পবিত্র বাসগৃহ।[২২৬] জান্নাতের নারীরা হবে পবিত্র, أَزْوَاجٌ مُّطَهَّرَةٌ পবিত্র বিবিগণ।[২২৭]

---

২২৬. সূরা সফ : আয়াত- ১২।

২২৭. সূরা বাকারা : আয়াত- ২৫।

জান্নাতের শরাবও হবে পবিত্র, شَرَابًا طَهُورًا পবিত্র শরাব।[২২৮] ঈমানদার জাহান্নামে যখন পাপ ও কলুষতা থেকে পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে, তখন জান্নাতে তাকে প্রবেশ করানো হবে এবং বলা হবে—

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ.

তোমাদের প্রতি সালাম, তোমরা সুখে থাকো, এরপর সদাসর্বদা বসবাসের জন্যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো।[২২৯]

কিন্তু মনে রাখতে হবে, জাহান্নামের নিরাময় ব্যবস্থা কিন্তু অত্যন্ত কঠিন। তাই এই দুনিয়াতেই পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন রাখার জন্যে নিরাময় হিসেবে বান্দাকে তিনটি বিষয় বলে দেয়া হয়েছে—

১. নেক কাজ পাপকে দূরীভূত করে দেয়।

২. বান্দার ইচ্ছাধীন নয় এমন রোগ-বালাই ও দুঃখ-কষ্টে ধৈর্যধারণ করলে পাপ মোচন হয়।

৩. তাওবার মাধ্যমে কবিরা গুনাহও মাফ হয়।

জাহান্নাম কুফর ও শিরকের পাপ নিরাময়ের অযোগ্য। দুনিয়াতে আশি বছর বয়সের মুশরিকও যদি তাওবা করে, তবে ক্ষমা পেতে পারে। খাঁটি তাওবার জন্যে চারটি বিষয় জরুরি—

১. পাপের জন্যে অনুশোচনা।

২. ভবিষ্যতে পাপ না করার সংকল্প।

৩. অতীত পাপের প্রতিকার করা।

৪. তাওবার সময় পাপে লিপ্ত না থাকা।

দুনিয়াতে এই সকল কল্যাণকর বিষয়সমূহ অর্জন করার জন্যে পরিবেশ লাগে। আর দীনের দাওয়াতের পরিবেশ আমলের মাধ্যমে প্রাণময় হয়।

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে নিষেধ

সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজ করতে বারণ করার ক্ষেত্রে সর্বোত্তম পন্থা হলো ভালো ব্যবহার ও ভালোবাসার সঙ্গে পারস্পরিক সু-সম্পর্ক বজায় রাখা। উত্তম চরিত্রের অতুলণীয় প্রভাব হয়ে থাকে। ইসলামের সূচনালগ্নে যতক্ষণ পর্যন্ত পরস্পরের মধ্যে বিশৃংখলা ও ঝগড়া ছিলো, তখন দেখা গেছে,

---

২২৮. সূরা ইহসান: আয়াত- ২১।

২২৯. সূরা যুমার: আয়াত- ৭৩।

হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত ঊনিশ বছরে মুসলমান হয়েছিলো মাত্র দেড় হাজার। কিন্তু এরপরে, অর্থাৎ হুদায়বিয়ার সন্ধির পরে মক্কা বিজয় পর্যন্ত দুই বছরে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে দশ হাজারে। এর এক বছর পরেই তাবুক যুদ্ধের সময় সংখ্যাটি হয়েছে ত্রিশ হাজার এবং তার এক বছর পরে বিদায় হজ্জের সময় সোয়ালাখ মানুষের জমায়েত হয়েছিলো। তার রহস্য এটাই ছিলো যে, ভালোবাসা ও আন্তরিকতার সঙ্গে পারস্পরিক সম্পর্ক ছিলো। কিন্তু শর্ত হলো, সত্যিকারের ভালোবাসার সম্পর্ক হতে হবে। ভণিতা বা তোষামোদ যেন না হয়। নয়তো মানুষ মাথার ওপর চেপে বসবে এবং লাভের বদলে তা ক্ষতি বয়ে আনবে।

প্রতিটি মানুষের জন্যে চারটি স্টেশন

প্রতিটি মানুষকে তার জীবনের যাত্রাপথে চারটি স্টেশন অতিক্রম করতে হয়।

প্রথম স্টেশন হলো, মায়ের গর্ভ। এটা হলো তার অস্তিসত্তা তৈরি হবার স্থান, যেখানে তার ইচ্ছার কোনো মূল্য নেই।

দ্বিতীয় স্টেশন হলো, পৃথিবীর পেট। এটি হলো তার গুণাবলি অর্জনের স্থান। এখানে এই পরিমাণ স্বাধীনতা তাকে দেয়া হয়, যেন ভালো ও মন্দের তফাৎ বুঝে ভালোটা গ্রহণ করতে পারে।

তৃতীয় স্টেশন হলো, কবর।

চতুর্থ স্টেশন হলো, কিয়ামতের দিন। সেদিন পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আগত সকল মানুষ সমবেত হবে।

إِنَّ اللهَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَّا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ.

(আল্লাহ) মানুষকে একদিন অবশ্যই একত্রিত করবেন, এতে কোনোই সন্দেহ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর ওয়াদার অন্যথা করেন না।[২৩০]

প্রত্যেকের সঙ্গে তার অর্জিত বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী আচরণ করা হবে। এই জমায়েত থেকে অবাধ্য পাপীরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে জাহান্নামের দিকে যাবে।

وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ زُمَرًا.

জাহান্নামের দিকে কাফেরদের দলে দলে হাঁকিয়ে নেওয়া হবে।[২৩১]

---

২৩০. সূরা আলে-ইমরান : আয়াত- ৯।

২৩১. সূরা যুমার : আয়াত- ৭১।

আর অনুগত নেক বান্দারা বিভিন্ন দলে আবদ্ধ হয়ে জান্নাতের দিকে যাবে।

وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا.

যারা তাদের পালনকর্তাকে ভয় করত তাদেরকে দলে দলে জান্নাতের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে।[২৩২]

আগত স্টেশনগুলোতে বান্দার অর্জিত গুণাবলি অনুযায়ী বিভিন্ন বিষয়ের সম্মুখীন হওয়াটা ইন্দ্রিয়াতীত বটে, কিন্তু ইন্দ্রীয়-বিরুদ্ধ নয়। যেমনিভাবে এই পৃথিবীতে দু'বছর আগের অনেক বিষয়ই আমাদের জ্ঞানের বাইরে ছিলো, বুঝে আসেনি, এখন সেটা বুঝে এসেছে। তেমনি মৃত্যু-পরবর্তী বোধশক্তির বিষয়গুলো মৃত্যুর সময় স্পষ্টাকারে বুঝে আসবে। এই সকল বিষয় নবী আ.-গণ মহান স্রষ্টা ও আমাদের প্রতিপালক সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় আল্লাহ তাআলা অহির মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, যা অবশ্যম্ভাবী ও অলঙ্ঘনীয়।

ঈমানের শক্তি কী

আল্লাহর অস্তিত্বের বিশ্বাস এতটা দৃঢ় থাকবে, যেন অন্তরে আল্লাহ ব্যতিত অন্যকিছুর বিশ্বাস না থাকে। এই ঈমানের শক্তির বলেই নামায, দোয়া এবং যাবতীয় নেক আমল আসমানে যাবে। যেমনিভাবে চাঁদে পাঠানোর জন্যে বিজ্ঞানীদের রকেট নিক্ষেপণ শক্তির প্রয়োজন হয়েছে, তেমনিভাবে আমল ও দোয়াগুলি আসমানে পৌঁছানোর জন্যে ঈমানের শক্তির প্রয়োজন হয়।

إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ.

তাঁরই দিকে আরোহণ করে সৎবাক্য এবং সৎকর্ম তাকে তুলে নেয়।[২৩৩]

ঈমানের শব্দ ও বুলি শুধু মুখে আওড়ানোই যথেষ্ট নয়। অন্তরে ঈমান থাকার নিদর্শন হলো, মুমিন সর্বাবস্থায় আল্লাহর নির্দেশিত বিষয়ে আমল করে যাবে এবং নিষিদ্ধ বিষয় থেকে বেঁচে থাকবে। এজন্যে তাকে যত আরামই ত্যাগ করতে হোক না কেনো?

কুরআনে যতগুলো প্রতিশ্রুতির কথা রয়েছে, তার সবগুলোর জন্যেই শর্ত হলো ঈমান।

---

২৩২. সূরা যুমার : আয়াত- ৭৩।

২৩৩. সূরা ফাতির : আয়াত- ১০।

সফলতা ও সাহায্যের প্রতিশ্রুতি, সম্মান ও মর্যাদার প্রতিশ্রুতি, মুক্তি ও নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি, আল্লাহর সঙ্গীত্ব ও জান্নাতের প্রতিশ্রুতি, সুবিশাল অনুগ্রহ ও ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি। ঈমানের গুণাবলি অর্জনের ক্ষেত্রেও আল্লাহর সঙ্গীত্ব লাভের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। আর সেটা আল্লাহভীরুতা, ধৈর্য ও অনুগ্রহ।

১. ঈমানদারদের জন্যে সফলতার প্রতিশ্রুতি—

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ.

মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে।[২৩৪]

২. ঈমানদারদের জন্যে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি—

إِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ.

আমি সাহায্য করবো রাসূলগণকে ও মুমিনগণকে পার্থিব জীবনে ও সাক্ষীদের দণ্ডায়মান হওয়ার দিবসে।[২৩৫]

৩. ঈমানদারদের জন্যে বিজয়ের প্রতিশ্রুতি—

وَأَنتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ.

যদি তোমরা মুমিন হও তবে, তোমরাই জয়ী হবে।[২৩৬]

৪. ঈমানদারদের জন্যে মর্যাদার প্রতিশ্রুতি—

وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ.

মর্যাদা তো আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুমিনদেরই।[২৩৭]

৫. ঈমানদারদের জন্যে মুক্তির প্রতিশ্রুতি—

وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ.

আমি এমনিভাবে বিশ্ববাসীদের মুক্তি দিয়ে থাকি।[২৩৮]

---

২৩৪. সূরা মুমিনূন : আয়াত- ১।
২৩৫. সূরা গাফির : আয়াত- ৫১।
২৩৬. সূরা আলে ইমরান: আয়াত- ১৩৯।
২৩৭. সূরা মুনাফিকুন : আয়াত- ৮।
২৩৮. সূরা আম্বিয়া : আয়াত- ৮৮।

৬. ঈমানদারদের জন্যে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি—

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ.

যারা ঈমান আনে এবং স্বীয় বিশ্বাসকে শিরকের সাথে মিশ্রিত করে না, তাদের জন্যেই শান্তি এবং তারাই সুপথগামী।[২৩৯]

৭. ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহর সঙ্গে থাকার প্রতিশ্রুতি—

وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ.

আল্লাহ রয়েছেন ঈমানদারদের সাথে।[২৪০]

৮. ঈমানদারদের জন্যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি—

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ.

আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত।[২৪১]

৯- ঈমানদারদের জন্যে সুবিশাল অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি—

وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا.

আপনি মুমিনদেরকে সুসংবাদ দিন, তাদের জন্য রয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুবিশাল অনুগ্রহ।[২৪২]

১০- ঈমানদারদের জন্যে আল্লাহর ভালোবাসার প্রতিশ্রুতি—

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَٰنُ وُدًّا.

যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম সম্পাদন করে, তাদেরকে দয়াময় আল্লাহ ভালোবাসা দেবেন।[২৪৩]

---

২৩৯. সূরা আনআম : আয়াত- ৮২।
২৪০. সূরা আনফাল: আয়াত- ১৯।
২৪১. সূরা তাওবা : আয়াত- ১১১।
২৪২. সূরা আহযাব : আয়াত- ৪৭।
২৪৩. সূরা মারয়াম : আয়াত- ৯৬।

ঈমানী গুণাবলি অর্জনের শর্তে প্রতিশ্রুতি

١- إِنَّ اللهَ مَعَ الصَّابِرِينَ.

নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সঙ্গে।[২৪৪]

٢- إِنَّ اللهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ.

নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণদের সঙ্গে আছেন।[২৪৫]

٣- أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ.

নিশ্চয় আল্লাহ মুত্তাকীদের সঙ্গে আছেন।[২৪৬]

জনৈক ইউরোপিয়ানের প্রশ্নের প্রশান্তিদায়ক উত্তর

আমার আব্বাজান রহ.-এর কাছে একবার এক ইউরোপিয়ান এলো। বললো— আমি আপনার সামনে কয়েকটি প্রশ্ন করতে চাই, যদি আপনি বিরক্তি মনে না করেন। আব্বাজান তাকে নিশ্চিন্ত হতে বললেন এবং নির্ভয়ে প্রশ্ন করার অনুমতি দিলেন। সে বললো— তাওরাত, যাবুর ও ইঞ্জিল এই আসমানী গ্রন্থগুলো সে-যুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী নাজিল হয়েছিলো। সর্বশেষে নাজিল হওয়া কুরআনও তো উট-তরবারির যুগের গ্রন্থ। এখন তো রকেট ও পারমাণিক এর যুগ। অতএব এখন মুহাম্মাদী কুরআনের পরিবর্তে কোনো আধুনিক গ্রন্থ থাকা উচিত। অথবা এভাবে বোঝা যেতে পারে যে, তাওরাতের কোনো ঘাটতি ছিলো, যা যাবুরে পূর্ণ করে দেয়া হয়েছে এবং যাবুরের ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে ইঞ্জিলে। একইভাবে ইঞ্জিলের ঘাটতি পূরণ করা হয়েছে কুরআনের মাধ্যমে। আজ এ যুগের পরিস্থিতি অনুযায়ী যে সকল অপূর্ণতা অনুভূত হচ্ছে, তার জন্যে একটা আধুনিক গ্রন্থ প্রকাশ করে পূর্ণ করা উচিত। অথবা যেমনটা আপনাদের বিশ্বাস, আল্লাহ তাআলা সবকিছু জানেন এবং তিনি প্রজ্ঞাবানও বটে, আর এই কুরআন তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সময়ের জন্যে অবতীর্ণ করা হয়েছে। তাহলে আল্লাহ তাআলা শুরু থেকেই সব নবীর জন্যে একটা কিতাব নির্ধারণ করে দিলেই তো হতো।

ইউরোপীয়ান লোকটি একটি প্রশ্নেরই কয়েকটি ধরন বের করে উত্তর কামনা করলেন।

---

২৪৪. সূরা আনফাল : আয়াত- ৪৬।
২৪৫. সূরা আনকাবুত : আয়াত- ৬৯।
২৪৬. সূরা তাওবা : আয়াত- ১২৩।

আব্বাজান রহ. উত্তরের শুরুতে তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার বয়স কত?

—সে বললো, আমার বয়স ত্রিশ।

আব্বাজান বললেন, এখন আপনার পরিপূর্ণ যৌবনকাল চলছে। এখন আপনার এই দৈহিক গঠন বাড়বেও না, কমবেও না। যার ফলে আপনার পোশাকের সাইজ এখন যা আছে, সেই সাইজ-ই মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকবে। যখন আপনার বয়স এক বছর ছিলো, তখন আপনার জামাটি আপনার বাবা নিতান্ত ছোট বানিয়েছিলেন। এইভাবে সাইজ বড় হতে হতে বর্তমান সাইজ পর্যন্ত এসে পৌঁছেছে। আপনি এখন যেই বয়সে উপনীত হয়েছেন সেই বয়সে আপনার দৈহিক গঠন মৃত্যু পর্যন্ত এমনই থাকবে। পোশাকের সাইজও এটাই বহাল থাকবে। তাহলে আপনি এখন এটা বলতে পারেন না যে, এক বছর বা দু'বছর বয়সকালের ছোট যে জামা আপনার বাবা বানিয়ে দিয়েছিলেন, এটা বাবার ভুল বা বিচ্যুতি ছিলো। বরং আপনি সেটাকে মেনে নিচ্ছেন যে, সেটা ছিলো শিশুকাল। আপনার আকৃতি যতুটকু করে বৃদ্ধি পেতে থাকলো, পোশাকও সে অনুযায়ী বড় হতে থাকলো। এভাবেই যৌবন বয়স এসেছে। এসেছে এমন বয়স, যখন আপনার শারীরিক আকার বড় হওয়া বা কমে যাওয়ার প্রশ্ন শেষ হয়ে গেছে। কেননা, এই সাইজটিই মৃত্যু পর্যন্ত থাকবে।

সুতরাং আল্লাহ তাআলা তো অবশ্যই সর্ববিজ্ঞ ও প্রজ্ঞাবান। তিনি প্রতিটি যুগে যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু করে চলেছেন, এতে না কোনো ভুল আছে, না আছে বিচ্যুতি। আছে শুধু বুঝের পার্থক্য।

বিষয়টা হলো, হযরত আদম আ. সর্বপ্রথম নবী ও মানুষ। মানব জগতের বিবেচনায় সেটা ছিলো শিশুকাল। তাঁকে সে সময়ের পরিস্থিতি অনুযায়ী উপযুক্ত বিধান দেয়া হয়েছে। এরপর নূহ আ.-এর যুগ এলো। মানব জগতের মাপকাঠিতে যতটা পরিবর্তন এসেছে, তখন সেই মোতাবেক নির্দেশাবলি তাঁকে দেয়া হয়েছে। এইভাবে তাওরাত, ইঞ্জিল ও যাবুরের মধ্যে প্রয়োজন পরিমাণ আনুষাঙ্গিক বিধানাবলিতে রদবদল ঘটানো হয়েছে। এরপর সর্বশেষে হযরত মুহাম্মাদ সা. যখন এসেছেন, তখন ছিলো একেবারে মানব-জগতের যৌবনকাল। তাকে কুরআনে সেই সকল মৌলিক বিষয়াবলি দান করা হয়েছে, যে-সকল ক্ষেত্রে সকল নবী ও রাসূল একমত ও অভিন্ন। যেমন– তাওহিদ, রিসালাত, আখেরাত ইত্যাদি। এ ছাড়া আনুষাঙ্গিক বিষয়াবলিতে পরিমার্জনা ও সম্পাদনা করে মুহাম্মাদ সা.-কে সেই সকল বিধান ও

রীতিনীতি দেয়া হয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বের জন্যে এবং কিয়ামত পর্যন্ত চলার জন্যে যথেষ্ট। তাই মুহাম্মাদ সা.-এর নবুয়তের ওপর রহমাতুল্লিল আলামীন (বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত) ও খাতামুন নাবীয়্যিনের (সর্বশেষ নবী) সিলমোহর সেঁটে দেয়া হয়েছে।

কুরআনেও ঘোষণা করা হয়েছে,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا.

> আজ আমি তোমাদের জন্যে তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্যে দীন হিসেবে পছন্দ করলাম।[২৪৭]

এর মানে হলো, এখন আর মুহাম্মদ সা.-এর পরে কোনো নবী আসবে না। মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত পথ-পদ্ধতিই কিয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে এবং এই পথ-পদ্ধতি সমগ্র বিশ্বের জন্যে কল্যাণ ও রহমতের কারণ হবে।

ইউরোপীয়ান লোকটি সম্পূর্ণ আলোচনা মনোযোগের সহিত শোনার পরে দ্বিতীয় প্রশ্ন উত্থাপন করলো— নবীদের আগমন যেহেতু রহমতের কারণ এবং নবীদের আগমনধারা বন্ধ হয়ে যাওয়া রহমতের বিপরীত কারণ। তাহলে রাসূল সা. সর্বশেষ নবী হওয়া এটা মর্যাদাকর হয় কী করে? তাঁকে যখন সর্বশেষ নবী মেনে নেওয়া হবে, তখন তাঁকে বিশ্বজগতের রহমত বলা কী করে সঠিক হতে পারে?

আব্বাজান রহ. জবাব দিলেন, সন্দেহ নেই মুহাম্মাদ সা. নবীদের আগমনধারা বন্ধ করে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি নবীসুলভ কাজ কিন্তু বন্ধ করেন নি। তিনি সকল নবীদের কাজ নিজের বিশেষ পন্থায় এই উম্মতকে সোপর্দ করে গেছেন, যেন মুহাম্মাদী উম্মত কিয়ামত পর্যন্ত সকল নবীর দ্যুতিসমূহ এবং তাদের রহমত ও বরকত মুহাম্মাদী সিলমোহরসহই লাভ করতে পারে। এ জন্যেই কুরআনে নবী আ.-দের আলোচনা করার পরে মুহাম্মাদ সা.-এর মহিমা বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে,

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۖ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهْ.

---

২৪৭. সূরা মায়িদা : আয়াত- ৩।

> (হে মুহম্মাদ,) এরা (সকল নবী) এমন ছিলো, যাঁদেরকে আল্লাহ পথ প্রদর্শন করেছিলেন। অতএব, আপনিও তাঁদের পথ অনুসরণ করুন।[২৪৮]

এবং যে বিধান আপনার জন্যে থাকবে, আপনার উম্মতের ওপরও সেই বিধান অর্পিত হবে। শর্ত হলো, যদি একান্ত আপনার জন্যে সেই বিধান বিশেষভাবে না দেওয়া হয়ে থাকে। সুতরাং মুহাম্মাদ সা.-এর উম্মত সকল নবীর চলন অনুসরণ করবে মুহাম্মাদী পন্থায়। নবী সা. সমস্ত আম্বিয়া আ.-দের কাজও করেছেন এবং বিশেষ কাজ এটা করেছেন যে, নবী সা. কর্মী তথা দাঈ বানিয়েছেন। রাসূলের অনুসরণ করতে গিয়ে তাই প্রথমত এই উম্মত দীনের ওপর আমল করবে এবং দ্বিতীয়ত অন্যদের মধ্যে আমল অব্যাহত রাখার জন্যে চেষ্টা করবে। এ ছাড়া তৃতীয় আরেকটি বিশেষ কাজ এই উম্মতের জন্যে থাকবে যে, দীনের দাওয়াত দেওয়ার জন্যে তারা দাঈ তৈরি করবে; যেন সমগ্র বিশ্বে কিয়ামত পর্যন্ত দীন অব্যাহত ও প্রাণবন্ত থাকে। পূর্ববর্তী নবীদের মধ্যে ইসমাঈল আ. তাঁর বংশের জন্যে প্রেরিত হয়েছেন। এই উম্মতও নিজ বংশের মধ্যে দীনের দাওয়াত প্রদান করার মাধ্যমে ইসমাঈলি রৌশনি লাভ করবে মুহাম্মাদী সিলমোহরসহ। নূহ আ., হূদ আ., সালেহ আ. নিজ নিজ জাতির জন্যে প্রেরিত হয়েছিলেন। এই উম্মতও নিজ নিজ জাতির মধ্যে দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে সেই সকল নবীদের দ্যুতিময়তা লাভ করবে মুহাম্মাদি সিলমোহরসহ। শোয়াইব আ. প্রেরিত হয়েছেন ব্যবসায়ীদের মধ্যে এবং সাবা জাতির তেরজন নবী প্রেরিত হয়েছেন কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে। এই উম্মতও এই সকল শ্রেণির মধ্যে দাওয়াত পৌঁছে দিয়ে সেই সকল নবীর জ্যোতির্ময়তা লাভ করবে মুহাম্মাদী সিলমোহর নিয়েই। হযরত মূসা আ. আবির্ভূত হয়েছেন রাজন্যবর্গের মধ্যে। এই উম্মতকেও শাসক ও রাজাদের মধ্যে দীনের দাওয়াত দিতে হবে। তাহলে সে মূসার জ্যোতির্ময়তা লাভ করবে মুহাম্মাদী সিলমোহরসহ। মোটকথা জগতের প্রতিটি শ্রেণির মধ্যে কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মত দীনের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার কাজ করে সকল নবীর জ্যোতির্ময়তা লাভ করতে থাকবে। পাবে তাঁদের রহমত ও বরকতও এবং তা পাবে মুহাম্মাদী সিলমোহরসহই।

---

২৪৮. সূরা আনআম : আয়াত- ৯০।

সুতরাং রহমাতুল্লিল আলামিন ও খাতামুন নাবীয়্যিন হওয়াটা তার মর্যাদা, রহমত ও বরকতের কারণ এবং মুহাম্মাদী উম্মতের জন্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্যের পালক। একই সাথে সম্মান ও গর্বেরও কারণ বটে। তা ছাড়া মুহাম্মদ সা.-এর নির্দেশিত পন্থা বর্তমান যুগেও শান্তি ও নিরাপত্তার উৎস; শর্ত হলো, দীনের দাওয়াত প্রদানের এই কাজ নববী পদ্ধতি অনুসারে করতে হবে। বর্তমান যুগের যাবতীয় অস্থিতিশীলতা, বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা মূলত আধুনিক পথ ও পদ্ধতির উদ্ভাবিত ফসল এবং এই অধুনা আবিষ্কৃত পথ ও আধুনিক পদ্ধতি শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখতে ব্যর্থ ও অকৃতকার্য প্রমাণিত হয়েছে।

ইউরোপীয়ান লোকটি আব্বাজান রহ.-এর কথা শুনে বললো, আমাকে এই জীবনে এমন উত্তর দিয়ে কেউ আশ্বস্ত করতে পারে নি। আজ আপনি আমাকে পরিপূর্ণ আশ্বস্ত করে দিয়েছেন। আজ আমি মুহাম্মাদ সা.-কে সর্বশেষ নবী ও বিশ্ববাসীর জন্যে রহমত হিসেবে মিনে নিচ্ছি।

এখন শুধু একটি কথা জানতে চাচ্ছি, সেটা হলো— এই যুগে মুহাম্মাদী পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করার পরে স্থিতিশীলতা ও শান্তিময়তা এবং নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কোনো দৃষ্টান্ত কি কোথাও পাওয়া যাবে?

এর উত্তরে আব্বাজান বললেন, পৃথিবীর নানা প্রান্তে যেখানে দীনের দাওয়াতের কাজ নবুয়তি পদ্ধতিতে করা হয়েছে, বহু দেশ ও জাতির অযুত কোটি মানুষ মুহাম্মাদ সা.-এর আনীত পথ ও পদ্ধতি অবলম্বন করেছে, যার ফলে তারা লাভ করেছে ভালোবাসা ও সৌহার্দ্য এবং শান্তি ও নিরাপত্তার জীবন। এ ক্ষেত্রে আমাদের এক জামাআতের অভিজ্ঞতার কাহিনী সংক্ষেপে শুনানো যথেষ্ট মনে করছি, যারা আফ্রিকা গিয়েছিলো। এরপর আব্বাজান আফ্রিকায় যাওয়া সেই জামাআতের অভিজ্ঞতার কাহিনী শোনালেন।

জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কে গভীর আলোচনা

سینہ روشن ہو، تو ہے سوز سخن عین حیات ☆ ہو نہ روشن، تو سخن مرگ دوام اے ساقی

নামাযের সময় সম্পর্কে জানার জন্যে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত সম্পর্কে জ্ঞান থাকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি, তা কে না জানে। আব্বাজান রহ. শাস্ত্রীয়ভাবে সূর্যাস্ত ও সূর্যোদয়ের সময় বের করতে এতটা দক্ষ ছিলেন যে, তিনি বিভিন্ন এলাকার উদয়-অস্ত এবং মধ্যাহ্ন-অপরাহ্নের সময়গুলো সহজে বের করতে পারতেন। অথচ এই শাস্ত্র সম্পর্কে আগ্রহ আছে এমন লোকের সংখ্যা এ যুগে খুবই বিরল। আব্বাজানের হিসেবে সৌদি আরবের উদয়-অস্তের ব্যাপারে

সামান্য পার্থক্য ধরা পড়েছিলো। তিনি তাই এ ব্যাপারে দক্ষ অন্যান্য শাস্ত্রবিদদের মাধ্যমে নিজের হিসাব যাচাই করে নেন। যাচাইতে এই তত্ত্ব বেরিয়ে আসে যে, হেরেম শরিফের উদয়-অস্তের সময়ের ক্ষেত্রে মামুলি তারতম্য রয়েছে, যার কারণে নামাযের ক্ষেত্রে ভুল হওয়ার কঠিন সম্ভাবনা ছিলো। তাই এর সংশোধনের নিমিত্তে তিনি মক্কার হেরেমের ইমাম শায়েখ আব্দুল্লাহ আস-সাবীলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে নামাযের ওয়াক্তের মাসয়ালাটির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেন। কিন্তু ওয়াক্ত সংশোধনের বিষয়টি কেবল ইমামের আয়ত্তাধীন ছিলো না, যতক্ষণ ওয়াক্ত সম্পর্কে দক্ষ লোকদের এ দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা না হবে, সংশোধন হওয়া দুরূহ ব্যাপার থেকে যাবে। এর জন্যে তিনি চেষ্টা ও পরিশ্রম অব্যাহতভাবে চালিয়ে যেতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত নানা মাধ্যম পেরিয়ে হেরেম শরিফের ওয়াক্ত অভিজ্ঞ লোকদের কাছে এই কথা পৌঁছে যায় এবং এ ক্ষেত্রে সেখানকার অভিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ চিন্তা-ভাবনা করে যতটুকু ভুল ছিলো, সেটা সংশোধন করে নেন। আল-হামদুলিল্লাহ, নামাযের ওয়াক্তসমূহ সংশোধনের বিষয়টি এভাবেই চূড়ান্তভাবে সম্পন্ন হয়।

এভাবেই আব্বাজান রহ.-এর এই চিন্তা সবসময়েই লেগে থাকতো যে, যে দেশেই মুসলমানগণ বসবাস করেন, সেখানকার রমজানের শুরু, ঈদুল ফিতর, কোরবানির ঈদ যেন সঠিক সময়ে আদায় হয়। বাহ্যতই এর সম্পর্ক চাঁদ দেখার সাক্ষীর ওপর নির্ভরশীল। আর শরীয়তের বিশুদ্ধ বর্ণনামতে চাঁদ দেখা গেছে কি, যায় নি– সেটা নির্ভর করবে সাক্ষ্যদানের ওপর। সুতরাং সাক্ষ্য দানের ক্ষেত্রেই যদি সতর্কতা অবলম্বন করা না হয়, তাহলে বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চল ও দেশসমূহে গড়মিল তৈরি হবে, অন্তত বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে নিশ্চিত। এমনটা কয়েকবার হয়েছেও বটে। এই জন্যে আব্বাজান রহ. তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকজন ও দায়িত্বশীলদের সাক্ষ্যদানের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করার প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। বিশেষ করে এই সকল দিনগুলোর সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে সর্বোচ্চ পর্যায়ের তদন্ত ও অনুসন্ধান চালানো দরকার মনে করতেন।

এগুলিকে আব্বাজানের বক্তব্য অনুযায়ী ফিকহি পরিভাষায় বলা হয়, 'কিরানে শামস ওয়া-কামার' (চন্দ্র-সূর্যের মিলন) বা 'তাওলীদে কামার' (চাঁদের জন্ম) এবং ইংরেজিতে একে বলে নিউমুন। অর্থাৎ প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখগুলিতে চাঁদ ও সূর্য মুখোমুখি অবস্থানে এসে যায় এবং কয়েক মিনিটের জন্যে চাঁদের অস্তিত্ব আর দেখা যায় না। এরপরে চাঁদ পৃথক হচ্ছে

বলে অনুভূত হয়। এই পৃথক হওয়ার সূচনালগ্ন পার হলে অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদদের মতে, সর্বনিম্ন সতেরো ঘণ্টা এবং সাধারণত বিশ-বাইশ ঘণ্টা পরে চাঁদ দেখার মতো আকার লাভ করে।

অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদদের মতে, কিরান বা নিউমুনের দিন চাঁদ দেখতে পাওয়া অসম্ভব বিষয়।[২৪৯] তাই সে-দিনের সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সতর্কতা ও তত্ত্বানুসন্ধানের প্রয়োজন হয়, যেন সাক্ষ্য দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো ধারণা বা অস্পষ্টতা থেকে না যায়। চাঁদ দেখার সম্ভাবনা এবং এ সম্পর্কিত বিষয়াবলি নিয়ে আব্বাজান রহ. এই শাস্ত্র সম্পর্কে আগ্রহী যারা, তেমন কিছু মানুষকে চিঠিপত্র লিখে বিশেষভাবে মনোযোগী করে তুলতেন।

জনাব হযরত মাওলানা বুরহানুদ্দিনের নামে লেখা একটি চিঠিতে আব্বাজান রহ. লিখেছেন— সাক্ষ্যদানের বিষয়টি নিঃসন্দেহে শরীয়তের সরাসরি ঐকমত্য ও অকাট্য দলিলের ভিত্তিতে নিঃসৃত মাসয়ালা এবং এই ভিত্তিতে দেয়া ওলামায়ে কেরামের সিদ্ধান্তকে সর্বাবস্থায় গ্রহণ করতে হবে, চাই সেটা নিশ্চিত অবস্থার বিপরীতই হোক না কেনো। তবে এতটুকু অবশ্যই যে, নিশ্চিত হওয়াটাকে একেবারেই উপেক্ষা করার যে মানসিকতা আজকাল দেখা যাচ্ছে, তার মধ্যে যেন পরিবর্তন আসে। একই সঙ্গে কুরআনের পবিত্র আয়াতে এসম্পর্কীয় যে অকাট্য দলিল রয়েছে—

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ.

সূর্য ও চন্দ্র হিসাবমতো চলে।[২৫০]

এই আয়াতের দিকে মন-মস্তিষ্কগুলো ফিরিয়ে এর গুরুত্বের অনুভূতি ও এর ফিকহি তাৎপর্য নির্ধারণ করা জরুরি।

আব্বাজান রহ.-এর একান্ত বাসনা ছিলো, শাস্ত্রীয় নিশ্চিন্ততা অর্থাৎ, সাক্ষ্যগ্রহণকারী দায়িত্বশীলগণও যেন চাঁদ দেখার সম্ভব্য সময়গুলো সম্পর্কে বাস্তবিকই ভালোভাবে অবগত থাকেন, যেন সাক্ষ্যদানের ফিকহি বিধানাবলি এবং শাস্ত্রীয় অবস্থার বিবেচনায় কিরান বা নিউমুনের পর পরই চাঁদ দেখার সম্ভাব্য দিনগুলি উভয় পক্ষের ফিকহি গুরুত্বের মধ্যে কার্যকরভাবে মিলমিশ সাধিত হয়।

---

২৪৯. চাঁদ দেখা যেতে পারে সেদিন দিনের বেলা পার হয়ে সন্ধ্যা নামলে। অথবা এখানে অসম্ভব দ্বারা দুঃসাধ্য উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে।

২৫০. সূরা আর-রহমান : আয়াত- ৫।

উল্লিখিত চিঠিতে আব্বাজান লিখেছেন— হৃদয়ে এমন আকাঙ্ক্ষা জাগে; হায়, এমন কোনো গ্রন্থ বা পুস্তিকা লেখা যেতো, যা সহজ ভাষায় রচিত হবে এবং যার মধ্যে পৃথিবীর সব দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সম্ভাব্য চাঁদ দেখার দিন লিপিবদ্ধ থাকবে। যে গ্রন্থে প্রতিটি মাসের কিরানে শামস ওয়া-কামার বা তাওলীদে কামার বা নিউমুনের দিন ও সময়ও দেখানো হবে। এরপর সেই গ্রন্থকে প্রতিটি দেশের চাঁদ দেখার ঘোষণার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্তব্য ব্যক্তিদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হবে। যেন তারা যেই দিন তাদের অঞ্চলের আকাশে চাঁদ ওঠার ও দেখার সম্ভাবনাই নেই, সেই দিন চাঁদ দেখার সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করার প্রতি পূর্ণ মনোযোগী হতে পারে।

এই বিষয়টি নিয়ে তিনি কতটা চিন্তিত থাকতেন, তার অনুমান করা যেতে পারে মালয়েশিয়ার প্রফেসর ড. মোহাম্মদ ইলিয়াসের প্রতি লেখা একটি চিঠির ভাষ্য থেকে। তিনি লিখেছেন— এখন আমি এই বিষয়টি নিয়ে অত্যন্ত চিন্তিত যে, এই বছর ব্রিটেন, দিল্লি ও আমেরিকায় চাঁদ দেখা গেছে এমন সময়, যখন নাকি চাঁদের বয়স মাত্র সাত-আট ঘণ্টা হয়েছিলো। আর দিল্লিতে তো নিউমুনের পূর্বে চাঁদ দেখার সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। কয়েকজন আলেম বলছেন— এই ধারণা ভুল যে, বিশ-বাইশ ঘণ্টা পরেই চাঁদ দেখা যেতে পারে; অথচ এই শাস্ত্রে অভিজ্ঞ-ব্যক্তিদের কাছে এটা অবশ্যই হতে হবে। এর দুটি কারণ হতে পারে— হয়তো শাস্ত্রাভিজ্ঞদের হিসাবে কোথাও ভুল-চুক হয়েছে কিংবা আলেমগণের সামনে সাক্ষ্যদানকারীদের তদন্তে কোনো বিচ্যুতি ঘটেছে।

এই চিঠিতে তিনি সামনে আরও লিখেছেন— আমি চাচ্ছি সংক্ষেপে এমন একটি গ্রন্থের লেখাজোখা সাজানো হবে, যার মধ্যে ষাট বছরের নিউমুনের যে হিসাব আমার কাছে আছে, তা থাকবে এবং মাওলানা বুরহানুদ্দিন সাহেবের বিষয়বস্তুও থাকবে।

এরপর আপনি সহজে একটি নিয়ম ও রীতি সাজিয়ে দেবেন যে, ১. কতটুকু বয়স হলে চাঁদ দেখতে পাওয়া সম্ভব ২. সূর্য অস্ত যাওয়ারও কত সময় পরে চাঁদ দৃষ্টিগোচর হতে পারে। এটাও লিখবেন— দেশের দৈর্ঘ ও প্রস্থের (স্থানের দূরত্বের) ব্যবধানের ফলে সময়ের পার্থক্য কতটা হতে পারে এবং ঋতু বদলের কারণে কেমন তারতম্য দেখা যাবে।

আমার যতটুকু জ্ঞান, তাতে মনে হয়, যদি এই দুটি বিষয় আয়ত্তে এসে যায়, তবে কাজটি সহজ হবে। যদিও এগুলো ছাড়াও আরও বহু বিষয়

রয়েছে, কিন্তু এই দুটি বেশী গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া আর কোনো বিষয় যদি আপনি লিখতে চান, তবে লিখে জানাতে পারেন।

আরেকটি কথা হলো, সূর্যের হিসাব রাখার জন্যে স্থায়ী যন্ত্রের আবিষ্কার করা সম্ভব, কিন্তু চাঁদের জন্যে কোনো স্থায়ী যন্ত্র তৈরি সম্ভব নয়। বরং প্রত্যেক বছরের জন্যে পৃথক যন্ত্র বানাতে হবে। কী বলেন, এটা ঠিক তো? এই সংক্ষিপ্ত গ্রন্থে যদিও ষাট বছরের হিসাব থাকে, এরপরও লোকজন প্রত্যেক মাসের সৌর ও চন্দ্রপঞ্জি নিজ নিজ এলাকার পর্যবেক্ষণাগার (Observatory) থেকে জেনে নেবেন। এ ছাড়া আর কী বিষয় আপনি যথাযথ মনে করেন? কিন্তু একটি কথা মনে রাখবেন, এই গ্রন্থে শাস্ত্রীয় আলোচনা মোটেই থাকবে না। কেবল আপনার বড় গ্রন্থটির উদ্ধৃতি থাকবে।

যেহেতু পবিত্র রমজানের সূচনা এবং দুই ঈদসহ হজ্জের সময় আরাফার দিন নির্দিষ্টকরণ ইত্যাদি সমস্ত মৌলিক বিষয়ের সম্পর্ক চাঁদ দেখার সাক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে, তাই এই শরয়ী গুরুত্বে প্রতি লক্ষ্য রেখে তিনি বিভিন্ন মাধ্যমে এমনকি নানান নথিপত্র ও সংবাদপত্র ইত্যাদি থেকেও গবেষণা ও অনুসন্ধান চালিয়ে ষাট বছরের রেকর্ড জমা করেছিলেন। যেখান থেকে চাঁদ দেখার এই রেকর্ডের একটি উদাহরণ মাওলানা বুরহানুদ্দিনের নামে লিখিত একটি পত্রে শাওয়াল ১৪০৭ হিজরির কিরানে শামস ওয়া কামার অর্থাৎ নিউমুন সংক্রান্ত সময় ও তত্ত্বজ্ঞান সম্পর্কে নিম্নোক্ত কথা লিখেছেন তিনি—

SHAWWAL 1407 H. (শাওয়াল ১৪০৭ হিজরি)
27 MAY 15:13 (3:13) G.MV.T. (WEDNES DAY)
27 MAY 20:45 (8:45) PMV. INDIAN TIME
SUN SET 27 MAY IN DEHLI=) 7:11 PMV.
MOON SET 27 MAY IN DELHI= 7:11 PMV.

এটা ১৪০৭ হিজরি মোতাবেক ১৯৮৭ ঈসায়ী সনের নিউমুনের উদাহরণ দেওয়ার জন্যে লেখা হয়েছে। এভাবে ষাট বছরের রেকর্ড সম্পর্কে অনুমান করা যেতে পারে।

قیاس کن زگلستان من بہار مرا

আমার বাগান থেকেই আমার মধুকাল কোনটা তা অনুমান করে নাও।

আব্বাজান রহ. কয়েকবার রাসূল সা.-কে স্বপ্নে দেখেছেন

আব্বাজন একাধিকবার স্বপ্নে রাসূলে আকরাম সা.-এর দর্শন লাভ করেছেন। যে-সব স্বপ্নে নবীজি দীনের জন্যে যারা শ্রম ও সাধনা করছে, তাদের জন্যে সুসংবাদ দিয়েছেন। বিশেষ করে দীনের দাওয়াতের জন্যে যারা কাজ করছে, তাদের জন্যে সুসংবাদ ছাড়াও হুযুর সা.-এর মনোনিবেশ এই কাজের দিকে থাকবে বলেও বলেছেন। আব্বাজানের এমন বহু স্বপ্ন রয়েছে। এ ছাড়াও অন্য অনেকে আব্বাজানকে হুযুর সা.-এর সাথে দর্শন করেছেন। তবে সেই সব স্বপ্নের মধ্য থেকে কেবল যেই স্বপ্নগুলো আব্বাজানের দেখা এবং যা তিনি নিজেই লিপিবদ্ধ করেছেন, তার মধ্য থেকে কয়েকটি স্বপ্নের কথা লেখা হচ্ছে, যার মাধ্যমে হুযুর সা.-এর প্রতি আব্বাজানের অসম্ভব ভালোবাসা এবং সেই সাথে দীনের দাওয়াতের কাজের গুরুত্ব সম্পর্কেও ধারণা পাওয়া যাবে।

স্বপ্ন ১ ঃ মুহাম্মাদ ওমর পালনপুরী : ২২ রবিউল আওয়াল ১৪০০ হিজরি মোতাবেক ১০ ফেব্রুয়ারি ১৯৮০ ঈসায়ী রোববার দিন পার হয়ে অর্ধরাতে ঢাকার কাকরাইলে থাকাবস্থায় আমি স্বপ্নে দেখলাম— হুযুর সা.-কে আমি খুঁজছি। বিপুল সংখ্যক লোক কোথাও যাচ্ছে। এক জায়গায় কয়েকজন মানুষের মধ্যে হুযুর সা.-কে দেখলাম। আমি হুযুর সা.-কে সালাম দিলাম, মোসাফাহা করলাম এবং জান্নাত সম্পর্কে জানতে চাইলাম। হুযুর সা. বললেন, জান্নাতে ইনশাআল্লাহ তুমি যাবে, খুব আনন্দ সেখানে। এরপর আমি বললাম, হযরত শাইখুল হাদীস জাকারিয়া ও হযরতজী দু'জনেই সালাম বলেছেন। হুযুর সা. সালাম গ্রহণ করলেন এবং বললেন, শাইখুল হাদীস তো এমন যে, চোখে ধাঁধা লেগে যায়, অর্থাৎ অত্যন্ত, জ্যোতির্ময় তিনি।

মনের মধ্যে এই 'ধাঁধা লেগে যাওয়া' শব্দটি এসেছে। তারপর চোখ খুলে গেছে।

স্বপ্ন ২ ঃ জিলহজ্জ ১৩৯৭ হিজরি মোতবেক ৯ ডিসেম্বর ১৯৭৭ ঈসায়ী। নূর মসজিদে হযরতজীর বিশ্রামাস্থলে ঘুমিয়েছি। স্বপ্নে কয়েকজন মানুষকে দেখলাম। এক যুবককে জিজ্ঞেস করলাম— হুযুর সা. কোথায়? সে ইশারায় দেখিয়ে দিলো যে, এই কক্ষে আছেন। আমি সেই কক্ষে ঢুকে দেখলাম, সেখানে অনেক নেককার বান্দা। এক কোণে ইবরাহিম আব্দুল জাব্বারও আছেন। অন্যদের ভালো করে দেখিনি। হুযুর সা. একটি চৌকির ওপর রয়েছেন। আমি মোসাফাহা করতে চাইলাম। তিনি বললেন, বসে যাও। এ কথা বলে তিনি নিজেই চৌকি থেকে নেমে এসে মোসাফাহা করলেন। এরপর

আবার চৌকির ওপর পা ছড়িয়ে বসলেন। আমি হুযুর সা.-এর উভয় পা ধরে চুমু খেতে থাকলাম, তিনি বারণ করলেন না। এরপর আমি তাঁর সাক্ষাৎ ও আলাপ করতে চাইলাম। তিনি অন্য কারও সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত, ছিলেন। তাই আমাকে থামিয়ে দিলেন। কথা শেষ করে আমাকে সম্বোধন করে বললেন, মৌলভী সাহেব, আমরা এখন একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজে আছি, তুমিও এসে পড়ো। আমি বললাম, কবে? তিনি বললেন, কাল। আমি বুঝতে পারলাম। বললাম, কোথায়? বললেন, হেরেমে (অর্থাৎ মদিনার হেরেম শরিফ উদ্দেশ্য)। আমি বললাম, কখন? বললেন, যখন তোমার ইচ্ছা, এসো। এরপর আমি শাইখুল হাদীস ও হযরতজী সম্পর্কে জানতে চাইলাম। কিন্তু ততোক্ষণে স্বপ্ন শেষ হয়ে গেলো।

স্বপ্ন ৩ ঃ ১৩৮৯ হিজরি, জোলাপুরের কাছাকাছি অবস্থিত, সারায়ে গাওঁ এলাকায় ঘুমিয়ে ছিলাম। স্বপ্নে বড় একটি সমাবেশ দেখলাম। যেখানে হুযুর সা. উপস্থিত আছেন। আমি গিয়ে সাক্ষাৎ করলাম। মোসাফাহা হলো। আমি হযরত শাইখুল হাদীস সম্পর্কে কথা বলতে চাইলাম। বলতে চাইলাম যে, কী আয়োজন চলছে। কিন্তু আমার বলার আগেই হুযুর সা. অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে তাবলিগ সম্পর্কে এ কথা বললেন— এটা কেনো বলা হচ্ছে যে, কিছুই হচ্ছে না এবং তাবলিগওয়ালারা কিছুই করছে না। বলা হচ্ছে যে, নিজেরাই এ কথা বলো, আমাদের দ্বারা কিছুই হচ্ছে না। বিনয়ের কথা এমন নয়, অন্যরকম। কিন্তু তা যেন না-শোকর করার সীমা পর্যন্ত পৌঁছে না যায়। পাঁচ-দশবার এ কথাই বলতে লাগলেন। এমনকি শাইখুল হাদীস রহ.-এর সম্পর্কে আমার কথা বলার সুযোগই হলো না। এরই মধ্যে চোখ খুলে গেলো। আমি কথায় এবং লেখায় হুযুর সা.-এর সেই দৃশ্য ফুটিয়ে তুলতে পারবো না। তিনি বারবার চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে চলছিলেন— এমন হচ্ছে।

স্বপ্ন ৪ ঃ পানোলীর ইজতেমার শেষদিন ফজরের নামাযের পরে চোখে ঘুম এলো। তখন স্বপ্নে হুযুর সা.-এর সাক্ষাৎ লাভ হলো। ওই সময় হুযুর সা.-এর কাছে আরেকজন ব্যক্তি চেয়ারে বসা ছিলেন। তার কাছে জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে? তিনি বললেন, হুযুর সা.। এরপর আমি হুযুর সা.-কেও জিজ্ঞেস করলাম, আমি আপনাকে ঠিক ততটা চিনতে পারছি না। তিনি বললেন, আমি আল্লাহর রাসূল সা.। আমি বললাম, আপনি না বললেও আপনার হাদীসের কারণে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ছিলো যে, আপনি আল্লাহর রাসূল। কেননা, শয়তান আপনার রূপে আসতে পারে না। এরপর মোসাফাহা

ও মোয়ানাকা করলাম বেশ ভালো করে। প্রথমে দূর থেকে হযরত শায়েখের মতো আকৃতি লাগছিলো, কিন্তু পরে আকৃতি অন্যরকম হয়ে গেলো। আর ওই আকৃতিটিই শেষ পর্যন্ত ছিলো। তিনি বললেন, হযরত কি দিল্লি গেছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, হযরত শায়েখের আগামিকাল সফর আছে? আমি আগে তো বলেছি, হ্যাঁ, কিন্তু এবার বললাম, এখনও কয়েক দিন আছে। আসলে আমি তাঁর প্রশ্নের আগে মনে করেছিলাম, মুম্বাইয়ের সফর আগামি কাল। পরে উত্তরের সময় বুঝতে পারলাম, মদিনা মুনাওয়ারার সফর উদ্দেশ্য। তখন বললাম যে, আরো কিছুদিন বাকি আছে। তিনি বললেন, খুব ভালো। এরপর আরও অনেক কথা বললেন এবং তাবলিগের কাজের ব্যাপারে বেশ উৎসাহ দিলেন। আমি বললাম, হুযুর, উম্মত অত্যন্ত অস্থির। তিনি বললেন, তাবলিগওয়ালারও তো চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি জানতে চাইলাম, আপনি এই দীনি কাজের ওপর সন্তুষ্ট আছেন? তিনি বললেন, আমি অনেক সন্তুষ্ট। আমি বললাম, আমাদের তাবলিগওয়ালাদের জন্যে কোনো বিশেষ বার্তা থাকলে বলুন। তখন বললেন, তাবলিগওয়ালারা চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে যাচ্ছে। আমি শুধু গুরুত্বের সাথে দু'টি কথা বলছি, যারা এই কাজের সঙ্গে আছে, তারা ভিন্ন উদ্দেশ্য থেকে মুক্ত হয়ে একান্ত আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে কাজ করবে। আর দ্বিতীয় হলো, ইস্তিখলাস থাকতে হবে। অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এই কাজে জড়াবে, সে অন্য কোনো ঝামেলার পেছনে ছুটবে না, শুধু এই কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে। সারা পৃথিবীর মানুষের অস্থিরতার সমাধান এর মধ্যেই নিহিত। আমি বললাম, হুযুর, আপনি স্বপ্নে তো সে কথাই বললেন, যা জাগরণে কুরআন-হাদীসে বলেছেন; অন্য কোনো কথা বলতেন যদি, তাহলে আমাদের ব্যাখ্যার আশ্রয় নিতে হতো। এটা তো সুস্পষ্ট কথা।

আমি ফজর নামাযের পরে সামান্য ঘুমিয়ে তারপর বিদেশ থেকে আসা সঙ্গী-সাথীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ইচ্ছা পোষণ করছিলাম। মৌলভী মূসা বললেন, তোমাকে সাড়ে সাতটায় জাগিয়ে দেবো। আমি বললাম, মিয়াজি মেহরাব সাহেবের হুকুম হলো, আটটায় বড় জমায়েতে যেতে হবে। তাহলে তো কঠিন হয়ে যাবে। সুতরাং তুমি একটা কাজ করো, ফজরের পরেই সাথী-সঙ্গীদের সমবেত হতে বলো। সবাই একত্র হলে, তৎক্ষণাৎ তাদের ডেকে আনো। মধ্যখানে যে দশ-পনেরো মিনিট সময় পাওয়া যাবে, সে-সময়টাতে আমি ঘুমিয়ে নেবো। দ্বিধা না করে আমাকে জাগিয়ে দিয়ো।

সেমতে আমি এই দু'টি ভাবনা নিয়ে ঘুমালাম, যেন আল্লাহ তাআলা দুটি কাজই করিয়ে দেন। আর যেন বড় জমায়েত পর্যন্ত পৌঁছার আগে কথা পূর্ণ

করে যেতে পারি। আমি ঘুমাবার আগে হযরতজীর কাছে জিজ্ঞেস করলাম, বাইরে থেকে আসা লোকদের সামনে কী কথা বলবো? তিনি বললেন, ইখলাস ও ইসতিখলাস বিষয়ে। আমি এই বিষয়ে আলোচনা করার নিয়ত করে ঘুমিয়ে পড়লাম। এই ঘুমের মধ্যেই বর্তমান স্বপ্নটি দেখলাম এবং হুযুর সা.-ও এই দুটি বিষয় ব্যাখ্যাসহকারে ইরশাদ করলেন, যা মূলত হযরতজী রহ.-এর নির্দেশিত দুটি শব্দের বিস্তারিত রূপ। আমি হুযুর সা.-এর কাজে আর্জি করলাম, হুযুর, আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই আমার মোসাফাহা ও মোয়ানাকার সৌভাগ্য লাভ হয়েছে। কিন্তু এমন সুযোগ আমার মতো দুর্বল বারবার কোথায় পাবে! এখন আবার আমি মোসাফাহা ও মোয়ানাকা করবো এবং আপনার কপালে চুমুও খাবো। তিনি মর্জি প্রকাশ করলেন। আমি খুব ভালোভাবে মোসাফাহা করলাম, দীর্ঘক্ষণ ধরে মোয়ানাকা করলাম এবং একে অপরকে পিষ্ট করার চেষ্টা করলাম। শেষ হলে ইরশাদ করলেন, আমি এখন তোমার কপালে চুমু দেবো। আমি লজ্জায় মাথা নিচু করে ফেললাম। হুযুর সা. নিজ হাতে মাথা উঁচু করে কপালে চুমু দিলেন। এরপর ঠোঁটে চুমু দিলেন। এরপর ঠোঁটে দম দিলেন। এ সময় আমার মুখ স্বাভাবিক পরিমাণ খোলা ছিলো। তিনি বললেন, ঠোঁট আরও খোলো, যেন আমার থুথু ও আমার মুখের লালা তোমার জিহ্বা পর্যন্ত পৌঁছে যায়। মুখ ততটাই খুললাম। এরপর তিনি বারবার কিছু পড়ে ভেতরে দম দিতে থাকেন এবং মুখের লালা আমার মুখের ভেতরের ঠোঁটে, বিশেষ করে জিহ্বা পর্যন্ত পৌঁছতে থাকে। এরপর তিনি চলে গেলেন এবং চোখ খুলে গেলো।

আমি কাগজ নিয়ে এই স্বপ্ন লিখতে বসলাম, যেন ভুলে না যাই। ইতোমধ্যে মৌলভী মূসা এসে পড়লেন এবং বললেন, আপনাকে জাগাতে ভয় হচ্ছিলো, কিন্তু জরুরিও ছিলো। তাই সাহস করে আমি কক্ষের দরোজা এই ইচ্ছায় খুললাম যে, আল্লাহ চাহে তো আপনি জাগালে খুশি হবেন, যেহেতু দীনের প্রয়োজনে জাগানো হচ্ছে। এই চিন্তা করে দরোজা খুললাম। মৌলভী মূসার এই সামান্য থমকে যাওয়াটাই ছিলো আমার এই বিশেষ স্বপ্নের সময়। তার ভয় হলো, জাগাতে তাই সামান্য দেরি হলো। এরই মধ্যে স্বপ্ন পূর্ণ হয়ে গেলো। আমি তারপর স্বপ্নটা না লিখে বিদেশি লোকদের কাছে গেলাম সাধারণ স্বভাব পরিপন্থী অজু না করেই। নয়তো অজুসহ বয়ান করাই আমার অভ্যাস, একান্ত যদি ডায়াবেটিসের চাপ না থাকে এবং অনিয়ন্ত্রিত প্রস্রাবের ফোঁটা গড়াতে না থাকে। এখন সময়ের স্বল্পতার কারণে অজু বিহীনই চলে গেলাম। বিদেশিদের থেকে মুক্ত হয়ে বড় জমায়েতে যাবার পূর্বে ইস্তেঞ্জার

চাপ বেড়ে গিয়েছিলো। তাই ইস্তেঞ্জা ও অজু দুটো সেরে নিলাম। এরপর নরম খাবার দিয়ে নাশতা সেরে দ্রুততার সাথে আলহামদুলিল্লাহ বলে চলে গেলাম। হযরতজীর আগমনের পূর্বে যতটুকু কথা বলার ইচ্ছা ছিলো বলে ফেললাম। হযরতজী এরপর কথা বললেন এবং দোয়াও করলেন।

স্বপ্নে হুযুর সা. আমার সঙ্গে অত্যন্ত বিস্তৃত আকারে কথা বললেন এবং কাজের অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছিলেন। আমিও জবাব দিচ্ছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ, প্রতিটি জবাবেই হুযুর সা.-এর খুশি ও তুষ্টি পেয়েছি। পুরো স্বপ্নের মধ্যে এক সেকেন্ডের জন্যেও মলিনতা অনুভব হয় নি এবং স্বপ্নের মধ্যেই অনুভব হলো যে, তিনি তাবলিগের কাজের প্রতি পরিপূর্ণ নিবিষ্ট আছেন। প্রশ্নই এমনভাবে করছিলেন, যেমনটা কোনো তত্ত্বাবধায়ক করে থাকেন। এখন পর্যন্ত যতটুকু মনে আছে, তা লিখে নিয়েছি।

স্বপ্ন ৫ ঃ ১৩৯৬ হিজরি মোতাবেক ১৭ জুন ১৯৭৬। শ্রীলঙ্কায় ফজরের নামাযের পরে স্বপ্নে দেখলাম, সাধারণ ইজতেমা চলছে। কোনো এক সাথী কথা বলছেন। এক কক্ষে হযরতজী এবং অন্য কক্ষে চৌকির ওপর মাওলানা মনজুর আহমাদ নোমানি মাথার দিকে বসে আছেন ও মাওলানা হাবীবুল্লাহ পালনপুরী (হরকতে আফাক ও সূরে ইস্রাফীল গ্রন্থের রচয়িতা, দারুল উলূম ছাপী মাদরাসার মুহতামিম) পায়ের দিকে বসে আছেন। আমি এই দুই মহান ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলাম। মাওলানা হাবীবুল্লাহ সাহেব আমাকে বললেন— আপনার অমুক বয়ানের অমুক আরবি কবিতায় ব্যাকরণ বিবেচনায় এই ভুল ছিলো। মাওলানা মনজুর আহমদ নোমানি তাকে বললেন, এইভাবে ধরা উচিত নয়, বিষয়বস্তু দেখুন। আমি মাওলানা মনজুর আহমদ নোমানিকে বললাম, ব্যাকরণিক ভুলটি বলে দিন। হুযুর সা.ও এক কক্ষে অবস্থান করছেন। কিন্তু আমি কখনো হযরতজীর কাছে, কখনো সাধারণ সমাবেশস্থলে, কখনো বিশেষ ব্যক্তিবর্গের কাছে এদিকে-ওদিকে ছোটাছুটি করছিলাম, যেন তাঁর কাছে যাবার পূর্বে তাবলিগি কাজ সবদিক থেকে সঠিক হয়, যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের পরে অসন্তুষ্টি দেখা না যায়। শেষে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারলাম না এবং স্বপ্নের মধ্যেই আমার চোখ খুলে গেলো। প্রকৃত অর্থে এটা তো একটা স্বপ্নই ছিলো, যাকে বলে স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন।

স্বপ্নের মধ্যেই আমি হযরতজীর কাছে এই সব বিবরণ শোনালাম এবং বললাম, হুযুর সা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়নি বটে, কিন্তু হুযুর সা.-এর পক্ষ থেকে অন্তরে স্বপ্নের ব্যাখ্যা হিসেবে কয়েকটি কথা জমা হয়েছে। সেগুলো

হযরতজীকে শোনালাম। একটা হলো, সফর গ্রহণযোগ্য ও কবুলযোগ্য একটি বিষয় এবং আল্লাহর ভালোবাসা সৃষ্টি হওয়ার একটি মাধ্যম। দ্বিতীয় হলো, আমার উম্মতের সাধারণ মানুষের মধ্যে কাজ করার কারণে উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও সাধারণ মানুষের মতো হচ্ছে। অর্থাৎ, এ কথা প্রশংসার অর্থে এসেছে। তৃতীয় কথা হলো, হিন্দুস্তানে তাবলিগের কাজ আস্থা রাখার মতো। আমি বললাম, পাকিস্তানের কাজ? তখন অন্তরে এ কথা জাগলো, অর্থাৎ হুযুর সা.-এর প্রত্যাদেশ এলো, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, বাংলাদেশ সব হিন্দুস্তানের অন্তর্ভুক্ত। এই ধরনের বিভাজন শত্রুরা করে দিয়েছে।

এই সব কথা শুনিয়ে আমি হযরতজীর কাছে বললাম, এখন যে সাধারণ মানুষজন আপনার খেদমত করে, তাদের সরাবেন না। যারা সরিয়ে দেয়, তারাও এখন সতর্কতা অবলম্বন করবে। চারদিকে খেদমতকারী মানুষের ভিড় ছিলো। এরপর আমি হযরতজীকে বললাম, এখন আমি আবার ঘুমাবো, যেন এবার হুযুর সা.-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। যেন শাইখুল হাদীস সাহেবের কোনো বার্তা পাওয়া যায় কিংবা আপনার নামে পাঠানো কোনো বাণী পাই, অথবা কমপক্ষে তাঁর দর্শন যেন লাভ হয়। এরপর আমি স্বপ্নেই আবার ঘুমিয়ে গেলাম। কিন্তু হুযুর সা.-এর দর্শন আর পেলাম না। এরপর সত্যি সত্যিই আমার চোখ খুলে গেলো।

নোট : এ ছাড়া আরও অনেক স্বপ্ন আছে, যা সামনের খণ্ডে আসবে। ইনশাআল্লাহ।

আব্বাজানের দাফনের পূর্বে দেখা স্বপ্ন

দাফনের পূর্বে দিল্লির এক আলেম একটি স্বপ্ন দেখেছেন, যিনি দিল্লির কোনো এক মসজিদের ইমাম। তিনি বলেন— কয়েকজন জ্যোতির্ময় লোক কোথাও যাচ্ছেন এবং তাদের হাতে আশ্চর্য কোনো এক বস্তু রয়েছে। মনের মধ্যে ধারণা হলো, তারা ফেরেশতা হবেন। আওয়াজ এলো— আমাদের হাতে যা আছে, তা হলো গালিচা। আমরা এটা হুযুর সা.-এর পবিত্র কবর থেকে নিয়ে এসেছি এবং হযরত মাওলানা উমর সাহেব রহ.-এর কবরে বিছানোর জন্যে নিয়ে যাচ্ছি। তখন মনে হলো, তাহলে হুযুর সা.-এর কবরে কী রইলো? উত্তর পাওয়া গেলো— তাঁর জন্যে জান্নাত থেকে এনে নতুন গালিচা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে।

আব্বাজানের ইন্তেকালের পরে মদিনার প্রসিদ্ধ আলেম আব্দুল মান্নান সাহেব স্বপ্নে দেখেছেন– এক স্থানে অনেক লোক একত্রিত হয়েছে, যেখানে হুযুর সা. আগমন করেছেন এবং সকল সাহাবিগণও উপস্থিত আছেন। এমন

সময় দেখা গেলো, আব্বাজান রহ. পায়ে হেঁটে আগমন করছেন। যখন কাছাকাছি এসেছেন তখন হুযুর সা. তাঁকে বেশ সমাদর করলেন এবং এক জোড়া পোশাক দিয়ে এবং বললেন, তুমি এই পোশাক পরে নাও। আরও বললেন— তুমি খুবই ক্লান্ত হয়ে এসেছো। বিশ্রাম নাও। তোমার বয়ান আমার সাহাবিদের অত্যন্ত প্রিয়।

এরপর স্বপ্নদ্রষ্টা লোকটি বলেন, এর পরক্ষণেই শাইখুল হাদীস মাওলানা যাকারিয়া রহ.ও আগমন করলেন। হায়, তাঁর অবস্থান আমরা বুঝতে পারি নি। তাঁর সমগ্র সত্তাই পূন্যগুণ এবং কল্যাণ ও বরকতের কারণ ছিলো। তিনি তাঁর জীবদ্দশাতে হুযুর সা.-এর দর্শনের সৌভাগ্য বহুবার স্বপ্নে লাভ করেছেন এবং আশ্চর্য বহু নির্দেশনা প্রাপ্ত হয়েছেন।

আব্বাজান রহ. বলেন, ১৯৭৭ সনে মক্কা শরিফে হুযুর সা.-এর সাক্ষাৎ লাভ হয়। হুযুর সা. বললেন, ওমর, তোমার মুখ খোলো। তিনি তাঁর মুখের পবিত্র লালা ঢেলে দেয়া শুরু করলেন, এমনকি লালা আমার মুখ থেকে বাইরে আসতে লাগলো। হুযুর সা. বললেন, ওমর! তোমার পেট ভরে গেছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, ভরে গেছে।

একবার আব্বার অসুখ হলো। স্বপ্নে হুযুর সা.-এর সাক্ষাৎ লাভ হলো। হযুর সা. বললেন, ওমর, মদিনা থেকে তোমার শুশ্রূষার জন্যে চলে এসেছি।

আব্বাজানের ইন্তেকালের পরে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে শোক জানিয়ে অজস্র চিঠিপত্র এসেছে। সেসব পত্রে তাঁর ইন্তেকালকে বিশাল শোক অভিহিত করে সমবেদনা প্রকাশ করার সাথে সাথে মুসলিম উম্মতের জন্যে অপূরণীয় শূন্যতা স্বীকার করা হয়েছে। সারা দেশের বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকায় তাঁর সুন্দর গুণাবলি ও সুমহান খেদমতের কথা স্বীকার করে উচ্চকিত ও উন্নত শব্দে প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ করেছে। স্বীকার করা হয়েছে যে, পৃথিবীবাসী একজন কামেল অলী ও যুগের কুতুব থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছে। যুগের সেই অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব এবং সময়ের অনন্য মানুষ, যাঁর মাধ্যমে দীনের সকল শাখা উজ্জ্বলতা পেয়েছিলো, যাঁকে নিয়ে ইসলামী বিদ্যানিকেতনগুলোর গর্বের অন্ত ছিলো না এবং যিনি ছিলেন দীনের মনীষী আলেমদের অহঙ্কারতুল্য, যাঁর আশেপাশে রাসূলপ্রেমীগণ ও উম্মতের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ একত্র হয়ে আলোচনা ও পরামর্শে সর্বদা মজলিস সরগরম রাখতেন, তিনি আজ কবরে চিরনিদ্রায় শায়িত আছেন। সেই সত্য ও স্বচ্ছতার অবয়ব, দৃঢ়তা ও কৃতজ্ঞতার পর্বত এবং ঈমান ও বিশ্বাসের সংরক্ষক এখন জান্নাতের

আলো-বাতাসের সুখ উপভোগ করছেন, এমনটাই আশা। আল্লাহ তাআলা আমাদের এই বিরাট ক্ষতির উত্তম বদল দান করুন এবং তাঁর পদরেখা দেখে চলার তাওফিক দিন, সেই মনোবল আমাদের দান করুন।

خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را

আল্লাহ রহম করুন এই পবিত্র মাটির প্রেমপিয়াসিদের।

اللّٰهُمَّ أَكْرِمْ نُزُلَهُ وَوَسِّعْ مَدْخَلَهُ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ وَنَقِّهِ عَنِ الْخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ وَبَلِّغْهُ الدَّرَجَاتِ الْعُلٰى مِنَ الْجَنَّةِ (آمين)

আব্বাজান রহ.-এর প্রথম চিল্লা

হযরত ইলয়াস রহ.-এর পরে তাঁর সম্মানিত পুত্র হযরতজী মাওলানা মুহাম্মাদ ইউসুফ রহ দীনের দাওয়াতকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে পরিচিত করে তোলা এবং ছড়িয়ে দেবার জন্যে সুউচ্চ প্রত্যয়ের সাথে চেষ্টা ও সাধনা শুরু করলেন। সর্বপ্রথম হিন্দুস্তানের বড় বড় শহরের উদ্দেশে পায়ে হেঁটে জামাআত পাঠালেন। একটি জামাআত গেলো দিল্লি থেকে কলকাতা, দ্বিতীয় জামাআত দিল্লি থেকে মুম্বাই, তৃতীয় জামাআত দিল্লি থেকে পেশোয়ার, চতুর্থ জামাআত দিল্লি থেকে করাচি। এই পায়দল জামাআতগুলো অত্যন্ত কষ্ট ও শ্রম সহ্য করে বন-বাঁদাড় ও পাহাড়ি পথ-ঘাট অতিক্রম করে শহর থেকে শহরে গ্রাম থেকে গ্রামে দীনের দাওয়াতের কাজ করতে থাকে। এর ফলে হিন্দুস্তানের চার দিকে দীনের দাওয়াতের আওয়াজ পৌঁছে যায়।

এরপর এই কাজের জন্যে সবচে' উপযুক্ত স্থান হেজাজ ভূমি বলেই অনুমিত হয়। ১৯৪৬ সালে সর্বপ্রথম জামাআত নিয়ে মাওলানা ওবাইদুল্লাহ রহ. পবিত্র হেজাজে যাত্রা করেন। ১৯৪৭ সালে দ্বিতীয় জামাআতে মুফতি যাইনুল আবেদিন সাহেবকে সাথে করে নিয়ে যান মাওলানা সাঈদ খান রহ.। এই সকল ব্যক্তিবর্গ অত্যন্ত অবিচলতার সাথে কাজ চালিয়ে গেলেন। রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বাধা-বিপত্তি সত্ত্বেও কঠিন পরিস্থিতি সহ্য করে গোপনে কৌশলের সাথে ঘরে ঘরে গিয়ে এবং বিশেষ স্থানসমূহে কাজ চালাতে থাকেন। এ ছাড়া হিন্দুস্তানের হাজীরা মুম্বাই থেকে হেজাজে পৌঁছতো। তাই মুম্বাইয়ের হাজিদের মধ্যেও এই কাজ করা দরকার বলে প্রতীয়মান হলো। ১৯৪৮ সালে দিল্লি থেকে একটি জামাআত হাজীদের মধ্যে এবং শহরে কাজ করার জন্যে যাত্রা করে যে জামাআতে মুন্সি আনিস, মৌলভী হেকমতুল্লাহ, কারী সুলাইমান ও জনাব ইফতেখার ফরিদি প্রমুখ অন্ত

ভুক্ত ছিলেন। তাদের প্রচেষ্টায় মুম্বাইয়ে তাবলিগের কাজের সূচনা হয়। একদিনের জামাআত কখনো তিনদিনের জামাআতে পরিণত হয়, যা ঢাবেল পর্যন্ত গিয়েছিলো। এদের মধ্যে জাব্বারী হোটেল মালিক হাজী আলাউদ্দিন, হাজী আব্দুর রহীম এবং মুম্বাইয়ের আরও কয়েকজন প্রিয়ভাজন লোক ছিলেন। এভাবে একসময় আবার হাজীদের প্রত্যাবর্তনকাল এলো। সেসময় ঘোঘারি মহল্লার সম্মেলনস্থলে একটি ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মাওলানা ইমরান খান সাহেব বয়ান করেন এবং এক চিল্লার একটি জামাআত তৈরি হয়ে যায়। এটিই ছিলো মুম্বাই থেকে দিল্লি যাত্রা করা প্রথম জামাআত। এই জামাআতে আব্বাজান রহ. ছিলেন। এটা ছিলো ১৯৪৮ সালের শেষ এবং ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকের ঘটনা। আব্বাজানের সহযাত্রী জাব্বারী হোটেলের হাজী আলাউদ্দিন, হাজী আব্দুর রহীম ও হাজী হাবীব নাসিরুদ্দিন প্রমুখ ছিলেন। এই জামাআত আনন্দ, এরপর আহমাদাবাদ, সিধপুর, ছাপি, পালনপুর প্রভৃতি স্থানে এক-দু'দিন করে কাজ করে দিল্লি নিজামুদ্দিন এসে পৌঁছে। কয়েকদিন দিল্লিতে কাজ করে এই জামাআতকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেয়া হয়। আব্বাজান রহ. সাহারানপুর থেকে দিল্লি মারকাজে ফিরে আসেন, যেহেতু তিনি তিন চিল্লার নিয়ত করেছিলেন। তাঁকে একটি জামাআতের সাথে মেওয়াত পাঠানো হয়। কয়েক দিন পরে এই তিন চিল্লার মধ্যেই তাঁর মস্তিষ্কে উন্মাদনার আলামত পরিলক্ষিত হতে থাকে। তাই তাঁকে তাঁর নিজ বাড়ি ঘাঠামন ফেরত পাঠানো হয়। তিনি পালনপুরের অভিজ্ঞ চিকিৎসক মাওলানা মুহাম্মাদ নাজির রহ.-এর কাছে কয়েকদিন চিকিৎসা করান এবং উন্মাদনা থেকে নিরাময় লাভ করেন। তিনি মুম্বাই পৌঁছে নিজের লেখাপড়ার কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এই সফরে তিনি হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহ.-এর হাতে বাইয়াত গ্রহণ করেছিলেন। এরপরে লেখাপড়ার ব্যস্ততার মধ্যেই মাঝেমধ্যে চিল্লা বা বিশদিনের জন্যে বের হতে থাকেন। এভাবেই এক সময় ১৯৫৫ সালে একটি জামাআত দিল্লি থেকে মুম্বাই পৌঁছে। তারা আব্বাজনকে চারমাসের জন্যে তাশকিল করলে তিনি রাজি হন। (এই চারমাস সম্পর্কে তিনি তাঁর বয়ানে বলতেন, আমার চার মাস পুরা হয়নি এবং আল্লাহ তাআলা যেন কখনো পুরা না করেন)। যখন তিনি নিজামুদ্দিন পৌঁছেন এবং সময় শেষ হয়ে আসছিলো, অথচ তখনও তাঁর লেখাপড়া শেষ হতে আরও এক বছর বাকি ছিলো, তাই হযরতজী রহ. লেখাপড়ার কাজ পূর্ণ করার পরামর্শ দিলেন। তিনি আবার দারুল উলূম দেওবন্দে ভর্তি হন এবং ১৯৫৬ সালে শিক্ষা সমাপন করে নিজামুদ্দিন মারকাজে ফিরে আসেন।

হযরতজী মাওলানা ইউসুফ রহ.-এর চেষ্টা ও সাধনা এবং কষ্ট ও ভাবনার ফলে আল্লাহর পক্ষ থেকে কাজকে ছড়িয়ে দেওয়া, বৃদ্ধি করা ও দৃঢ় করার নিত্য-নতুন পন্থা সামনে চলে আসতো। সেই অনুযায়ী কাজের লোকজনও প্রস্তুত হচ্ছিলো। তার যেমনিভাবে হেজাজে কাজ করার ভাবনা ছিলো, তেমনি ছিলো ইউরোপের দেশগুলোর চিন্তা, সেখানকার জন্যে ইংরেজি জানা লোকদের প্রয়োজন ছিলো। এ জন্যে তিনি আলীগড় ইউনিভার্সিটির ছাত্র ও শিক্ষকদের এই কাজের জন্যে উপযুক্ত বিবেচনা করলেন এবং সেদিকে পরিশ্রম ঢেলে দিতে লাগলেন। একটা ইজতেমাও ঠিক করলেন। এই কাজকারবার চলাকালেই আব্বাজান রহ. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সম্পন্ন করেছিলেন। তাঁকে সর্বপ্রথম খুরজা ও আলীগড়ের কাজের জন্যে পাঠিয়ে দেয়া হলো। আল্লাহ তাআলা প্রথম থেকেই তাঁকে একনিষ্ঠতা, সরলতা এবং এই পথের দুঃখ ও কষ্ট সহ্য করার গুণ দিয়েছিলেন। যার ফলে তিনি অত্যন্ত অবিচলতার সঙ্গে কাজ করলেন এবং রমজান মাসের শেষ দশদিনের ইতেকাফ মারকাজ মসজিদে সম্পন্ন করলেন। পুনরায় সেই দিকে জামাআত নিয়ে মেহনত করার জন্যে রওনা হলেন। সেখানকার ইজতেমা পর্যন্ত কাজ করতে থাকেন। ইজতেমা শেষ হলে উভয় হযরতজী অর্থাৎ মাওলানা ইউসুফ রহ. মাওলানা এনামুল হাসান রহ. পরস্পরে পরামর্শ করে আব্বাজানকে হেজাজে পুরো একবছর সময় লাগানোর জন্যে তাশকিল করলেন এবং আব্বাজানও তৈরি হয়ে গেলেন। এটাই ছিলো তাঁর দীনের দাওয়াতের জন্যে বিদেশে প্রথম সফর।

একটি উপদেশ

প্রতিশোধ গ্রহণেচ্ছু তার শত্রুর ছাদের নীচেই থাকে
আর ক্ষমাকারী তার থেকে ঊর্ধ্বে উঠে যায়।

বিশ্বাসের উপহার

—সাইয়েদ মুহাম্মাদ জামী

তাবলিগের কণ্ঠস্বর মাওলানা ওমর পালনপুরী রহ.-এর
বিদায়ের বেদনাশ্রু

আলোকিত চাঁদ ও দীপ্তিমান সূর্য চলে গেছে
জ্ঞান, প্রজ্ঞা আর মারেফতের প্রদীপ চলে গেছে
উম্মতের চিন্তায় অস্থির ছিলো যে অন্তর।

জাদু থেকে সুরক্ষার জন্যে অত্যন্ত পরীক্ষিত ওষুধ

১. প্রথমে ও শেষে এগারোবার করে দরূদ শরিফ পড়ে নিন

২. সূরা ফাতেহা তিনবার

৩. চারকুল[২৫১] তিনবার

৪. আয়াতুল কুরসি তিনবার

৫. وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا ۚ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ তিনবার

৬. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُم بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ তিনবার

৭. سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ সাতবার

নিজের শরীরে এবং বাচ্চাদের শরীরে দম দিন, তারপর পানিতে দম দিয়ে নিজে পান করুন এবং তাদেরও পান করান।

সর্বপ্রকার দুশ্চিন্তা থেকে মুক্তির তাবিজ লিখে গলায় ঝুলিয়ে দিন

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ الَّذِىْ لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهٖ شَىْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ، اللّٰهُمَّ لَاسَهْلَ اِلَّا مَاجَعَلْتَهٗ سَهْلًا إِذَا شِئْتَ يَاحَيُّ حِيْنَ فِيْ دَيْمُوْمَةِ مُلْكِهٖ وَبَقَائِهٖ يَاحَيُّ يَاحَيُّ ، أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِيْنِ ، وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ ، أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ مِنْ عَقِبِهٖ وَعِقَابِهٖ وَشَرِّ عِبَادِهٖ.

ছড়ানো মুক্তা

* গিবত নেক আমলকে গ্রাস করে নেয়।
* তাওবা গুনাহকে বিনাশ করে।
* দুশ্চিন্তা আয়ু শুষে নেয়।
* ধৈর্য বিপদ-আপদকে শেষ করে।

---

২৫১. সূরা কাফিরূন, সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাসকে একত্রে চারকুল বলা হয়; যেহেতু প্রতিটি সূরার শুরুতে 'কুল' শব্দটি রয়েছে।

* পুন্য পাপকে হ্রাস করে।

* মিথ্যা রিজিককে গ্রাস করে।

* ক্রোধ বুদ্ধি নষ্ট করে।

* অহঙ্কার জ্ঞান বিনাশ করে।

* ইনসাফ জুলুমকে ধ্বংস করে।

* প্রকৃত বীর হলো, যে বিপদের সময় ধৈর্য ও স্থৈর্যকে কাজে লাগায় এবং সংকটের সময় মন্দ প্রতিবেশিকে সাহায্য করে।

* আল্লাহ তাআলা সর্বোত্তম প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

* সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে জীবন কাটায় এমনভাবে যে, নিজের প্রয়োজনের জন্যে অন্য কারও ওপর নির্ভর করে না।

* কুদরতের রীতিনীতির অবাধ্যতা করে যে ব্যক্তি, সে কখনো শাস্তি থেকে নিরাপদ থাকতে পারে না।

* পার্থিব ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলার সর্বাধিক কার্যকর উপায় হলো জিকির করা।

* একজন সত্যিকারের বন্ধু হীরার চেয়ে কোনো অংশে কম নয়।

* মৃত্যুর সম্পর্ক শরীরের সঙ্গে থাকে না, থাকে অনুভূতির সাথে।

* আত্মীয়দের মধ্যে সর্বোত্তম আত্মীয় এবং সর্বোচ্চ স্থান মায়ের।

* সবচে' বড় পাপ হলো, কারও মনে কষ্ট দেওয়া।

* বন্ধুত্ব করার আগে রূপ নয়, চরিত্র দেখো।

* কাউকে সীমাতিরিক্ত প্রত্যাশা করো যদি, তবে সে উদ্ধত হয়ে ওঠবে।

* তোমার কোনো শত্রু আছে, পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় বিপদ আর নেই।

* ক্রোধ এমন ঝড়ো বাতাস, যা বিবেকের আলো নিভিয়ে দেয়।

* ভুলগুলি শুধরে নেয়ার নামই হলো উন্নতি।

* ভালোবাসা ও শত্রুতা কখনো গোপন থাকে না।

* দেখা যায় না এমন বস্তু বিশ্বাস করাকেই ঈমান বলা হয়।

* বিবেককে কষে বাঁধতে পারে, এমন শৃঙ্খলের সন্ধান এখন পর্যন্ত কোনো অত্যাচারী পায় নি।

* দুনিয়াদারগণ দুনিয়ার পেছনে ছুটছে, আর দুনিয়া ছুটছে আল্লাহওয়ালাদের পেছনে।

* আখেরাতের চিন্তা হৃদয়ের আলো স্বরূপ।

* একরাতে ঘুমের মধ্যে মানুষ সাড়ে ছয় হাজার বার নিঃশ্বাস গ্রহণ করে থাকে।

* মানব শরীরে সাড়ে তিন কোটি ছিদ্র আছে, যেখান থেকে ঘাম নির্গত হয়।

* দক্ষিণ আফ্রিকায় এমন এক ধরনের মাকড়সার সন্ধান পাওয়া গেছে, যা পাখি শিকার করে।

* চিল সূর্যের দিকে এক ঘণ্টা পর্যন্ত, তাকিয়ে থাকতে পারে।

* চীনে এমন একটি ফুল আছে, যার রঙ রাতে সাদা হয় এবং সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে লাল হয়ে যায়।

* হযরত আবু বকর রা.-কে রাসূল সা.-এর খলিফা বলা হয়েছে এবং আমিরুল মুমিনীন সর্বপ্রথম হযরত ওমর রা.-কে বলা হয়।

* হযরত মাওলানা ওমর পালনপুরী রহ. বলেন, বর্তমানে ফকির (فقير) বা দরবেশ মানে হলো, 'ফা'-তে ফিরনি, 'ক্বাফ'-এ কোরমা, 'ইয়া'-তে ইয়াখনি অর্থাৎ ঝোল আর 'রা'-তে রুটি। আর আগের দিনে ফকির দ্বারা উদ্দেশ্য ছিলো, 'ফা'-তে ফাকা বা ক্ষুধা, 'ক্বাফ'-এ কনায়াত বা অল্পেতুষ্টি, 'ইয়া'-তে ইয়াদে এলাহি অর্থাৎ আল্লাহর স্মরণ আর 'রা'-তে রিয়াজত বা সাধনা।

* হযরতজী রহ. বলতেন, আমিরের অর্থ আমরা মনে করি যেন, তিনি আদেশদাতা হয়েছেন। অথচ আমির হলো সে, যে চব্বিশ ঘণ্টা আল্লাহর আদেশসমূহ পালনে লিপ্ত থাকে এবং সাথীদের উৎসাহ-উদ্দীপনা, হৃদ্যতা দেখিয়ে ও তোষামোদ করে করে আল্লাহর আদেশ পালনে জড়িয়ে রাখে।

* সম্পদ অন্তরে অন্ধকার বৃদ্ধি করে।

* যদি ভুল ধারণা দূর করা না হয়, তবে তা ঘৃণায় রূপান্তরিত হয়।

* সর্বদা সত্য বলো, যেন কসম করে বলার প্রয়োজন না হয়।

* শুকিয়ে যাওয়া ফুলও বসন্তকালে তাজা হতে পারে, কিন্তু চলে যাওয়া দিন কখনো ফিরে আসবে না।

* আল্লাহকে যদি হৃদয়ের চোখে দেখো, তবে আল্লাহকে তুমি শিরা উপশিরা থেকেও কাছে পাবে।

* হে আল্লাহর বান্দা, তুমি পৃথিবীতে থাকার সামগ্রীর মধ্যে লেগে আছো, আর পৃথিবী তোমাকে নিজের কাছ থেকে সরাতে তৎপর।

* যদি শান্তিতে থাকতে চাও, তবে লোকজনকে প্রতিশ্রুতি কম দাও।

* জ্ঞানকে ভালোবাসা এবং শিক্ষককে সম্মান করা ছাড়া কিছুই অর্জন হয় না।

* কাজ করো; কেননা, কাজ করলে ভুল হবে, ভুল থেকে অভিজ্ঞতা হবে এবং অভিজ্ঞতা থেকে বুদ্ধিমত্তা আসবে।

* রাগের বশবর্তী হয়ে কখনো এমন কিছু করো না, যার ফলে পরে লজ্জিত হতে হয়।

* প্রতিটি জটিল ও উদ্বেগজনক অবস্থার মধ্যে উত্তেজিত না হয়ে, বরং সচেনতার সাথে কাজটি সম্পাদন করো।

* অন্যের মধ্যে দোষ না খুঁজে নিজের দোষগুলি দূরীভূত করার চেষ্টা করো।

* ভালো বন্ধুর সন্ধান করো, তাতে মানুষের সম্মান বৃদ্ধি পায়।

* কখনো এমন জিনিসের প্রত্যাশা করো না, যা পূরণ হবার নয়।

* সেই আসরে যেয়ো না, যেখানে লজ্জিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

* নিজের পরাজয়ে কেঁদো না; কেননা, তোমার পরাজয় কারো বিজয়ের কারণ হয়।

* যে ব্যক্তি নিজের নিষ্ঠার ব্যাপারে কসম খায়, তার ওপর কখনো আস্থা রেখো না।

* যে ব্যক্তি আজকের কাজ আগামিকালের জন্যে রেখে দেয়, সে এটা ভাবে না যে, তাহলে আজকে আমি কি করেছি, যেটা কালকে করতে চাচ্ছি।

* আলেম তাকে বলে, যে লোকচক্ষুর আড়ালে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহর সন্তুষ্টির বাসনা লালন করে এবং তাঁর অসন্তোষজনক কাজকর্মকে ঘৃণা করে। হযরত ইবনে মাসউদ রা. বলেন, কথা বেশী বলতে পারার নাম ইলম নয়, ইলম হলো আল্লাহকে বেশী ভয় করার নাম।

* যে ব্যক্তি লোকসমাবেশে নিজেই নিজেকে মন্দ বললো, প্রকারন্তরে সে নিজের প্রশংসা করলো এবং এটা অহংকারের নিদর্শন। (হযরত হাসান বসরি রহ.)

* হযরত থানবী রহ. লিখেছেন, কুরআনের দুটি আয়াত আছে, এই দুটি আয়াতকে যে ব্যক্তি পড়ে নিয়েছে, এরপরে তার আর অহংকার আসতে পারে না। একটা হলো ইলম সম্পর্কে, আরেকটা আমল সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূল সা.-কে বলেন,

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ.

'আমি ইচ্ছা করলে আপনার কাছে ওহীর মাধমে যা প্রেরণ করেছি তা অবশ্যই প্রত্যাহার করতে পারতাম।'[২৫২]

---

২৫২. সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত- ৮৬।

আর দ্বিতীয় আয়াতটি বলেছেন আমল সম্পর্কে। আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রিয় রাসূল সা.-কে বলেন,

وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا.

'আমি আপনাকে দৃঢ়পদ না রাখলে আপনি তাদের প্রতি কিছুটা ঝুঁকেই পড়তেন।'[২৫৩]

* 'ইকমালুশ শিয়াম' গ্রন্থে চমৎকার এক কথা লেখা আছে। লেখক বলেন— হে বন্ধু, যে তোমার প্রশংসা করেছে, সে আসলে তোমার প্রতিপালকের গুণবাচক নাম "সাত্তার" অর্থাৎ দোষত্রুটি গোপনকারীর প্রশংসা করেছে। আর বাস্তবিক পক্ষে যদি গুনাহের কোনো গন্ধ থাকতো, তাহলে এমন অনেক পরহেযগার বুযুর্গ যারা পূণ্যবাণ বলে প্রসিদ্ধ— তাদের শরীর থেকে এমন দুর্গন্ধ আসতো যে, তাদের দিকে ফিরে তাকাতেও কেউ পছন্দ করতো না।

* আতা বিন রাবাহ রহ. ইলহামি তথা অদৃশ্য বাণী শোনাতেন। বিস্ময়কর কথাবার্তা বলতেন। একবার আল্লাহ তাআলা তাঁকে বাণী পাঠালেন, আতা, তাদের বলে দাও, যদি তাদের রিজিকে ছোটো-খাটো সংকট দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে তারা লোকসমাবেশে বসে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ শুরু করে দেয়। অথচ যখন তাদের আমলনামা গুনাহপূর্ণ হয়ে আমার কাছে আসে, আমি তখন ফেরেশতাদের সামাবেশে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করি না।

* হাফেজ ইবনে কাইয়িম রহ. বিস্ময়কর কথা লিখেছেন। লিখেছেন— এটা দেখো না যে, গুনাহ ছোটো নাকি বড়। বরং সেই সত্তার বড়ত্ব দেখো, যাঁর হুকুম তুমি অমান্য করছো।

সময়ের মূল্যায়ন

* সময় কারও উত্তরাধিকার সম্পত্তি নয়।
* সময় কারও জন্যে অপেক্ষা করে না।
* মানুষ বলে— সময় চলে যাচ্ছে; জ্বি না, বরং আমরা চলে যাচ্ছি।
* সময়কে ব্যবহার করার অভ্যাস গড়ে তোলো।
* সময়ের নিজস্ব জীবন আছে।

---

২৫৩. সূরা বনি ইসরাঈল : আয়াত- ৭৪।

আল্লাহর একটি বড় নিদর্শন হলো বাতাস

وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ.

আর আবহাওয়া পরিবর্তনে এবং মেঘমালার যা তাঁরই হুকুমের অধীনে আসমান ও জমিনের মাঝে বিচরণ করে, নিশ্চয়ই সে সমস্ত বিষয়ের মাঝে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান সম্প্রদায়ের জন্যে।[২৫৪]

আল্লাহ তাআলার কুদরতের নিদর্শন অগণিত। প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই তাঁর একত্ববাদ ও অদ্বিতীয়তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এক কবি এভাবে ব্যক্ত করেছেন,

فِيْ كُلِّ شَيْءٍ لَهُ اٰيَةٌ تَدُلُّ عَلٰى أَنَّهُ وَاحِدٌ.

প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই নিদর্শন রয়েছে তাঁর, যা প্রমাণ করে তিনি একক।

তাঁর সমস্ত নিদর্শনের মধ্যে একটি নিদর্শন হলো বাতাসের পরিবর্তন ও রদবদল। কখনো বাতাস ঠাণ্ডা হয়, আবার কখনো হয় উষ্ণ। কখনো কঠিন হয়, তো কখনো কোমল। কখনো প্রবলবেগে বয়, আবার কখনো ধীরে মৃদুমন্দ গতিতে চলে। কখনো পূবে চলে, কখনো পশ্চিমে। কখনো উত্তরে চলে, কখনো যায় দক্ষিণে। কখনো রহমতের সুসংবাদ দেয়, আবার কখনো শাস্তি নিয়ে আসে। মোটকথা, বাতাসের এই রদ-বদল ও বিপ্লব আল্লাহর শক্তিমত্তা ও তাঁর একত্ববাদেরই নিদর্শন।

কাজি শারাই রহ. বলেন, এই বাতাস হয়তো রুগ্ন ব্যক্তিকে সুস্থতা ও নিরাময় দান করে কিংবা সুস্থকে অসুস্থ করে দেয়। প্রকৃতপক্ষে হয়ও এমনই যে, বাতাস কারও জন্যে সুস্থতা ও রোগমুক্তির কারণ হয়ে যায় আবার কারও জন্য অসুস্থতা ও দুর্বলতার কারণ হয়।

আলেমগণ লিখেছেন, বাতাস আট প্রকারের। এর আলোচনা কুরআনে বিধৃত হয়েছে। এর মধ্যে চার প্রকারের বাতাস আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও অনুগ্রহের ভূমিকা রাখে, আর চার প্রকার বাতাস আল্লাহর শাস্তি ও ধর-পাকড় বয়ে আনে।

---

২৫৪. সূরা বাকারা : আয়াত- ১৬৪।

এই রহমতের বাতাসের মধ্যে দুই প্রকারের বাতাসের সম্পর্ক স্থলভাগের সাথে, আর দুই প্রকার বাতাসের সম্পর্ক জলভাগের সাথে। একইভাবে শাস্তি দায়ক বাতাসের মধ্যে হতেও দুই প্রকার সম্পর্ক স্থলভাগের সঙ্গে আর দুই প্রকার বাতাসের সম্পর্ক সমুদ্র ও নদ-নদীর সঙ্গে।

রহমতের বাতাসের মধ্য হতে যার সম্পর্ক স্থলভাগের সঙ্গে তার একটিকে বলা হয় 'মুবাশশিরাত' এবং অপরটিকে বলা হয় 'রুখা'। আর যে বাতাসের সম্পর্ক সমুদ্র-অঞ্চলের সঙ্গে, তার একটিকে 'নাশিরাত' এবং অপরটিকে 'মুরসিলাত' বলা হয়।

তেমনিভাবে শাস্তিদায়ক বাতাসের মধ্য হতে যার সম্পর্ক স্থলভাগের সঙ্গে, তার একটিকে 'আকীম' এবং অন্যটিকে 'সরসর' বলা হয়। আর দ্বিতীয় শাস্তিদায়ক বাতাস যার সম্পর্ক জলভাগের সঙ্গে, তার একটিকে 'আসিফ' এবং অন্যটিকে 'কাসিফ' বলা হয়।

এই বাতাস হলো আল্লাহর সুবিশাল সৈন্যবাহিনীর অন্যতম সদস্য। যার মাধ্যমে দীনের শত্রুদের শাস্তি দেয়া হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর সৈন্যবাহিনীর মধ্যে সবচে' বড় সৈন্য বাহিনী হলো বাতাস ও পানি। সুতরাং এই বাতাসের মাধ্যমে বড় বড় শক্তিশালী লোকদের ধ্বংস ও বিনাশ করা হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলা এর মাধ্যমে তাঁর নেক বান্দাদের ও তাঁর রাসূলদের সাহায্য ও সহায়তা করেছেন।

কুরআনে আল্লাহ তাআলা আদ জাতির আলোচনা করেছেন। যাদের প্রতি হযরত হূদ আ.-কে নবী বানিয়ে পাঠানো হয়েছিলো। এই জাতি হযরত হূদ আ.-কে মিথ্যাবাদি আখ্যা দিয়েছে এবং তাঁকে সীমাহীন কষ্ট ও যন্ত্রণা দিয়েছে। তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি পশ্চিমা বাতাসকে নিযুক্ত করে দিলেন ফলে এই বাতাসের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করা হলো। কুরআনে কয়েক স্থানে তাদের আলোচনা করা হয়েছে। কুরআনের মূলপাঠ ও তাফসীর অনুযায়ী যার সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা এমন—

> আদ জাতি, যাকে আল্লাহ তাআলা প্রথম আদ নামে অভিহিত করেছেন এবং যাদেরকে পৃথিবীর প্রাচীনতম জাতির তালিকায় গণ্য করা হয়। অনেকে তাদের খ্রিস্টপূর্ব দু-আড়াই হাজার বছর পূর্বের বলে স্বীকার করেন। সামী বংশদ্ভূত জাতির মধ্যে তাদেরকেই সর্বপ্রথম শক্তিশালী ও ক্ষমতার অধিকারী জাতি হিসেবে স্বীকার করা হয়। তাদের বসতি আম্মানের হাজারামাউত এবং ইয়েমেন পর্যন্ত

বিস্তৃত ছিলো। এই জাতি শারীরিকভাবে অত্যন্ত শক্তিশালী ও উন্নত সভ্যতার অধিকারী ছিলো। আল্লাহ তাআলা তাদের সভ্যতা ও জীবন যাপনের এমন আশ্চর্য উপকরণ ও মূল্যবান মাধ্যম দান করেছিলেন যে, অন্য কোনো জাতির পক্ষে এমন উপায়-উপকরণ লাভ করা সম্ভব হয় নি। পৃথিবীর মধ্যে কোনো জাতি তাদের মতো শক্তি ও দৈহিক গঠনের অধিকারী ছিলো না। তারা ছিলো পাথর খোদাই ও নকশা করার কাজে সুনিপুণ দক্ষতার অধিকারী।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

أَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ.

তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে অযথা নিদর্শন নির্মাণ করছ?[২৫৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ.

যাদের সমান শক্তি ও বলবীর্যে সারা বিশ্বের শহরসমূহে কোন লোক সৃজিত হয় নি।[২৫৬]

এই শক্তি ও ক্ষমতা নিয়ে তাদের প্রবল অহংকার ছিলো। নিজেদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্যে তারা এই বলে শ্লোগান তুলতো,

مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً.

আমাদের অপেক্ষা অধিক শক্তিধর কে?[২৫৭]

তাদের একেক সদস্য সম্পর্কে তাফসীরকারকগণ লিখেছেন, তারা এমনই শক্তিশালী ছিলো, পাহাড়ের বিশাল পাথরের চাঁই উঠিয়ে শত্রুদের গোত্রের ওপর ছুঁড়ে মারতো। তাদের একেকজন বারো গজ দীর্ঘদেহী ছিলো এবং তারা ছিলো বিরাটকায় দেহ ও প্রতাপের অধিকারী। তাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা হযরত হূদ আ.-কে নবী করে পাঠালেন। তিনি নিজ গোত্রকে কুফর ও শিরক থেকে বাধা প্রদান করলেন। তাদেরকে মূর্তিপূজা থেকে সরে এসে আল্লাহর একত্ববাদের দিকে আহ্বান করলেন। কিন্তু তারা তা মানলো না। হযরত হূদ আ.-কে তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করলো এবং হেদায়েত গ্রহণ করতে অস্বীকার করলো।

---

২৫৫. সূরা শুয়ারা : আয়াত- ১২৮।

২৫৬. সূরা ফাজর : আয়াত- ৮।

২৫৭. সূরা ফুসসিলাত : আয়াত- ১৫।

হযরত হূদ আ. তাদের অবাধ্যতা দেখে আল্লাহর আজাবের ভয় দেখালেন। তাতে তাদের মধ্যে ভয় ও শঙ্কা তৈরি হওয়া তো দূরের কথা তারা আজাব জলদি নিয়ে আসার দাবি জানাতে লাগলো। তারা হূদ আ.-কে বলতে লাগলো,

فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا.

আমাদেরকে যে বিষয়ের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছো, তা নিয়ে আসো।[২৫৮]

যখন তাঁর জাতি কোনোভাবেই মানছিলো না এবং চূড়ান্ত স্পর্ধার সাথে আজাব দ্রুত আনয়নের জন্যে হুল্লোড় জুড়ে দিলো, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাদের ধ্বংসের আয়োজন এভাবে হলো যে, একটি মেঘ পাঠানো হলো। যেই মেঘ দেখে আদ জাতি বললো— এই মেঘ আমাদের ওপর বৃষ্টি বর্ষণ করবে।

আল্লাহ তাআলা তাদের এই সন্তুষ্টিবোধকে প্রত্যাখ্যান করে বললেন, এটা তো সেই শাস্তি যা তোমরা দ্রুত আনার জন্যে ছটফট করছিলে। মূলতঃ ওই মেঘ নিজের মধ্যে এক বিশাল ধ্বংসাত্মক ঝঞ্ঝাবায়ু নিয়ে আগমন করেছিলো। এরপর কঠিন শীতে সাত রাত ও আট দিন পর্যন্ত লাগাতার এই ঝঞ্ঝাবায়ু তাদের ওপর বয়ে যেতে থাকে। এতোটা প্রবল ঝড়ো বাতাস বইতে থাকে যে, তাদের দানবীয় আকৃতির মানুষগুলোকে খড়কুটোর মতো ওপরে ওঠাতো এবং মাটিতে আছড়ে ফেলতো। এর ফলে তাদের মাথা চূরমার হয়ে যেতে থাকে এবং তাদের পেট ফেটে যায়। নাড়িভুঁড়ি বাইরে বেরিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। একইভাবে তাদের গবাদি পশুগুলোকেও উঠিয়ে আছড়ে ফেলা হয়। পশ্চিমা ঝড়ো বাতাস তাদের এমনভাবে ধ্বংস করে দেয় যে, মনে হয় যেন তাদের নিষ্প্রাণ দেহগুলো খেজুর গাছের কাণ্ডের মতো পড়ে আছে, যার মাথা ওপর থেকে কেটে ফেলা হয়েছে। তাদের অহঙ্কার আল্লাহ তাআলা তাঁর একটি সৃষ্টি "হাওয়ার" মাধ্যমে নিমিষে শেষ করে দিলেন। এই বাতাস তাদের ঘরবাড়িগুলোতে প্রবেশ করতো এবং ঘরের ছাদকে উঠিয়ে নিক্ষেপ করতো। বাড়ি, গবাদি পশু, গাছ কোনোকিছুকেই এই বাতাস রেহাই দেয় নি, সবকিছুকে ধ্বংস ও বিনাশ করে দিয়েছিলো।

কুরআনের কয়েক জায়গা এর আলোচনা এসেছে। এক স্থানে উল্লেখ আছে—

---

২৫৮. সূরা আহকাফ : আয়াত- ২২।

وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ. سَخَّرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيَالٍ وَثَمَانِيَةَ أَيَّامٍ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ. فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ.

এবং আদ গোত্রকে ধ্বংস করা হয়েছিলো এক প্রচণ্ড ঝঞ্ঝাবায়ু, যা তিনি প্রবাহিত করেছিলেন তাদের ওপর সাত রাত্রি ও আট দিবস পর্যন্ত অবিরাম। আপনি যদি তাদেরকে দেখতেন যে, তারা অসার খর্জুর কাণ্ডের মতো ভূপাতিত হয়ে রয়েছে। আপনি তাদের কোনো অস্তিত্ব দেখতে পান কি?[২৫৯]

৫ হিজরির শাওয়াল মাসে আবু সুফিয়ান আরবের বেশীরভাগ গোত্রকে সঙ্গে নিয়ে মদিনার ওপর চড়াও হয়। তারা সবাই একত্র ও একতাবদ্ধ হয়ে মুসলামানদের মূলোৎপাটন করা, তাদের নাম-নিশানা মুছে ফেলা এবং সবাইকে মেরে শেষ করে দেয়ার অভীপ্সায় জমায়েত হয়েছিলো। এরা সবাই আবু সুফিয়ানের পতাকাতলে সমবেত হলো। তাদের সংখ্যা ছিলো দশহাজারের অধিক। রাসূল সা. তাদের অভিযান সম্পর্কে অবগত হলেন। তিনি তখন সাহাবায়ে কেরামের, বিশেষ করে সালমান ফারসী রা.-এর পরামর্শের পরে মদিনা তাইয়েবার সুরক্ষার জন্যে প্রায় সাড়ে তিন মাইলব্যাপী একটি পরিখা খনন করেন। এ জন্যে দশজন করে সাহাবির একেকটি দল বানিয়ে চল্লিশ হাত করে পরিখা খননের দায়িত্ব তাদের হাতে ন্যাস্ত করেন। রাসূল সা. নিজেও এই পরিখা খননের কাজে অংশগ্রহণ করেন। যখন কুরাইশ কাফেরগণ এই পরিখা দেখলো, তখন একেবারে হতবাক হয়ে গেলো। কেননা, আরবে এ ধরনের পরিখা খননের কোনো রীতি ছিলো না। তাই তারা বলতে থাকে,

إِنَّ هَاذِهِ مَكِيْدَةٌ .

এটা একটা বিরাট কৌশল।[২৬০]

এই পরিখার কারণে কাফেররা মদিনায় হামলা করতে পারলো না এবং মুসলমানদের সঙ্গে বড়মাপের লড়াইও হলো না। অবশ্য তারা এক মাস অবধি মদিনা নগরীকে অত্যন্ত জোরেশোরে অবরোধ করে রাখলো এবং সকল

---

২৫৯. সূরা হাক্কাহ : আয়াত- ৬-৮।
২৬০. বাগাভী।

দিক থেকে সতর্ক ও অত্যন্ত কঠোর নজরদারী রাখলো। এই সময়ে পরস্পরে সামান্য কিছু সংঘর্ষ বাধে এবং মুসলামনদের অত্যন্ত ভয়, শঙ্কা ও উদ্বিগ্নতার মুখোমুখি হতে হয়।

এ ছাড়া তখন ছিলো প্রবন্ত শৈত্যপ্রবাহের ঋতু। একরাতে প্রচণ্ডবেগে পূবাল ঝড়োবাতাস শুরু হলো। এই বাতাস তাদের তাঁবুর আস্তানা উপড়ে ফেলে দেয়, তাদের হাড়িগুলো চুলা থেকে উড়িয়ে নিয়ে যায় এবং অন্যান্য পাত্রগুলো বিক্ষিপ্ত হয়ে যায়। এই প্রবল বাতাসের মধ্যে পাথর, কঙ্কর ও মাটি তাদের মুখের ওপর আঘাত হানতে থাকে এবং অন্তরে এমন ভীতি সঞ্চারিত হলো যে, তারা একেবারে অস্থির হয়ে গেলো। সাহস হারিয়ে এবং পরাজিত হয়ে উন্মাদের মতো পালাতে শুরু করলো। এভাবেই আল্লাহ তাআলা সম্মিলিত বাহিনীকে পশ্চাত বাতাসের মাধ্যমে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছেন। সত্যিকার অর্থে এই বাতাস মুসলমানদের জন্যে রহমতের কারণ হলো এবং নবী করিম সা.-এর মু'জিজা বলে প্রতীয়মান হলো।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا.

হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নেয়ামতের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিলো, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝাবায়ু এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না।[২৬১]

নবী করিম সা. বলেছেন, পূবাল বাতাসের মাধ্যমে আমাকে সাহায্য করা হয়েছে এবং পশ্চিমা বাতাসের মাধ্যমে আদ জাতিকে ধ্বংস করা হয়েছে।

রাসূল সা.-এর শঙ্কিত হওয়া

এমনিতে তো সব সময়ই রাসূল সা.-এর অন্তর আল্লাহর ভয় ও শঙ্কায় কাতর থাকতো। কখনো এ অবস্থা থেকে নবীজি সা. মুক্ত থাকতেন না। চিন্তাহীনতা কখনো তাঁর মধ্যে সৃষ্টিই হতো না। কিন্তু যদি বাতাস প্রবল হতো এবং ঝড়ো হাওয়া বয়ে যেতো, কিংবা আকাশে ঘনঘটা দেখা যেতো এবং কালোমেঘ

---

২৬১. সূরা আহযাব : আয়াত- ৯।

পুঞ্জিভূত হয়ে উঠতো তখন রাসূল সা. সীমাহীন চিন্তায় ত্রস্ত হয়ে পড়তেন। প্রকৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব রাসূল সা.-এর চোহারায় দৃশ্যমান হতো। এর কারণ হলো, আল্লাহ না করুন এই বাতাস ও মেঘ যেন সৃষ্টজীবের জন্যে কোনো বিপদ ও উৎকণ্ঠার কারণ না হয় এবং এর মাধ্যমে জাতিসমূহকে যেন ধ্বংস ও বরবাদ করা না হয়।

আম্মাজান হযরত আয়েশা রা. বলেন, আমি কখনো রাসূল সা.-কে এমনভাবে হাসতে দেখি নি, যাতে তার কণ্ঠনালী দেখা যায়; তিনি শুধু মুচকি হাসি হাসতেন। আর যখন তিনি মেঘ বা বাতাস বইতে দেখতেন, তখন তাঁর জ্যোতির্ময় চেহারায় পরিবর্তন স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হতো।

এই আশঙ্কাগ্রস্ত হবার কারণে একবার তিনি ঘরে আসতেন, আবার ঘর ছেড়ে বাইরে যেতেন। কখনো সামনে অগ্রসর হতেন, কখনো পিছনে যেতেন। হযরত আয়েশা রা. এর কারণ জিজ্ঞেস করলে হুযুর সা. বলেন, হে আয়েশা! আকাশে ছেয়ে যাওয়া এই মেঘ দেখে আমার শঙ্কিত ও অস্থির হওয়ার কারণ হলো, এই মেঘ আবার তেমন না হয়ে যায়, যে সম্পর্কে আদ জাতি বলেছিলো,

هٰذَا عَارِضٌ مُّمْطِرُنَا.

(যখন আদ জাতি এই মেঘকে তাদের উপত্যকা অভিমুখী দেখলো, তখন বললো,) এ তো মেঘ, আমাদেরকে বৃষ্টি দেবে।[২৬২]

প্রবলবেগে বাতাস বইলে এই দোয়া পড়বে

যখন প্রবলবেগে বাতাস বয়ে চলতো, তখন রাসূল সা. এই দোয়া পড়তেন,

اللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْئَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهٖ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهٖ.

হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে প্রার্থনা করছি সেই কল্যাণ, যা তুমি এর মধ্যে রেখেছো এবং সেই কল্যাণ যা তার মধ্যে নিহিত আছে এবং সেই কল্যাণ, যার জন্যে তা পাঠানো হয়েছে। হে আল্লাহ! তোমার কাছে আশ্রয় চাই এর অনিষ্ট থেকে এবং সেই জিনিসের অনিষ্ট থেকে যা তার মধ্যে নিহিত আছে এবং সেই অনিষ্ট থেকে, যার জন্যে তা পাঠানো হয়েছে।[২৬৩]

---

২৬২. সূরা আহকাফ : আয়াত- ২৪।

২৬৩. মেশকাত : মাজাহেরি।

বাতাসকে মন্দ বলো না

বাতাসকে ভালো-মন্দ বলা এবং তাকে অভিশাপ বা ধিক্কার দেওয়া নিষেধ। হুযুর সা. এমন করতে নিষেধ করেছেন। ইবনে আব্বাস রা. বলেন, এক ব্যক্তি হুযুর সা.-এর উপস্থিতিতে বাতাসকে খারাপ কিছু বললো এবং অভিশাপ দিলো। হুযুর সা. বললেন, তাকে মন্দ বলো না এবং তাকে অভিশাপ দিয়ো না। কেননা, এটা তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট এবং আল্লাহর আদেশের ভিত্তিতেই সে প্রবাহিত হয়। যেই বস্তুর ওপর অভিশাপ দেওয়া হয়, যদি সে তার উপযুক্ত না হয়, তবে তা অভিশাপকারীর দিকে ফিরে আসে।[২৬৪]

কুরআনি জ্ঞান

প্রশ্ন ১. ক'জন নবীর নাম জন্মের পূর্বে রাখা হয়েছে?

উত্তর : কুরআনে পাঁচ জন নবীর নাম এসেছে, যাঁদের নাম তাঁদের জন্মের পূর্বে রাখা হয়েছে।

১. হযরত ইসহাক আ.

২. হযরত ইয়াকুব আ.। যেমন আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ.

অতঃপর আমি তাঁকে ইসহাকের জন্মের সুখবর দিলাম এবং ইসহাকের পর ইয়াকুবেরও।[২৬৫]

৩. হযরত ইয়াহইয়া আ.। আল্লাহ তাআলা বলেছেন—

إِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ.

আমি তোমাকে এক পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি, তাঁর নাম হবে ইয়াহইয়া।[২৬৬]

৪. হযরত ঈসা আ.। হযরত মারয়ামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে,

إِنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكِ بِكَلِمَةٍ مِّنْهُ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ.

আল্লাহ তোমাকে তাঁর এক বাণীর সুসংবাদ দিচ্ছেন, যার নাম হলো মসীহ— মারইয়াম তনয় ঈসা।[২৬৭]

---

২৬৪. তিরমিযি।

২৬৫. সূরা হূদ : আয়াত- ৭১।

২৬৬. সূরা মারয়াম : আয়াত- ৭।

২৬৭. সূরা আলে ইমরান : আয়াত- ৪৫।

৫. নবী করিম সা.। যাঁর সম্পর্কে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন,

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ.

এবং আমি এমন একজন রাসূলের সুসংবাদদাতা, যিনি আমার পরে আগমন করবেন। তাঁর নাম আহমদ।[২৬৮]

প্রশ্ন ২. কুরআনে কতজন ফেরেশতার নাম উল্লেখ আছে এবং তারা কারা?

উত্তর : কুরআনে বেশ কয়েকজন ফেরেশতার নাম উল্লেখ আছে। নিচে লিপিবদ্ধ করা হলো, ১. জিব্রাঈল আ. ২. মিকাঈল আ. ৩. হারূত ৪. মারূত ৫. রা'দ ৬. বারক ৭. মালিক ৮. সিজল ৯, কয়ীদ।

প্রশ্ন ৩. জিব্রাঈল ও মিকাঈল-এর অর্থ কী?

উত্তর : হযরত ইবনে আব্বাস রা. থেকে বর্ণিত আছে, যেই নামের শেষে 'ঈল' শব্দ আছে, তার অর্থ আব্দুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা। যেমন ইস্রাফীল অর্থ আব্দুল্লাহ, ইস্রাঈল (ইয়াকুব আ.-এর উপাধি) অর্থ আব্দুল্লাহ, জিব্রাঈল অর্থ আব্দুল্লাহ, মিকাঈল অর্থ আব্দুল্লাহ।

আল্লাহর দরবার অনুষ্ঠিত হওয়া

হাদীসে এসেছে, প্রতি সপ্তাহে, সেখানে সপ্তাহ তো হবে না, কিন্তু এক সপ্তাহে যতটা সময়ের দূরত্ব ও পরিমাণ হয়, ততটা সময় পর পর সেখানে আল্লাহর দরবার অনুষ্ঠিত হবে। ওপর নিচ মিলে শত জান্নাত আছে। প্রতিটি জান্নাত আকাশসমূহ ও পৃথিবীর চেয়েও বড়। সেই শত জান্নাতের ওপরে আছে কুরসি। তার ওপরে সমুদ্র। এর ওপরে আছে আল্লাহর আরশ। সুতরাং কুরসি যেন একেবারে জান্নাতের ছাদের ওপরে। সেখানে সমাবেশ হবে।

আখেরাতে আল্লাহকে কোথায় দেখা যাবে?

সেই দরবার কোথায় হবে?

হাদীসে তার ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছে যে, হযরত জিব্রাঈল আ. একবার এলেন। তখন তার হাতে একটা আয়না ছিলো। আয়নার মধ্যখানে একটা বিন্দু ছিলো। রাসূল সা. জিজ্ঞেস করলেন, এই বিন্দুটি কীভাবে হলো?

হযরত জিব্রাঈল আ. বললেন, এর নাম মাযীদ।

হুযুর সা. জিজ্ঞেস করলেন, মাযীদ কী জিনিস?

---

২৬৮. সূরা সফ : আয়াত- ৬।

হযরত জিব্রাঈল আ. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, বেহেশতে একটা ময়দান আছে। যার নাম মাযীদ। ময়দানটি এত বড় যে, আমি লাখো বছর ধরে ঘুরছি, এখন পর্যন্ত তার শেষ পাই নি। এই ময়দানের প্রতিটি বস্তু সাদা। জমিন সাদা। কঙ্কর সাদা। ঘাসও সাদা। মোটকথা, সবকিছু সাদা। যখন জুমার দিন আসে, তখন ওই ময়দানে দরবার অনুষ্ঠানের জন্যে প্রস্তুত করা হয়। তার একেবারে মধ্যখানে আল্লাহ তাআলার আসন বিছানো হয়।

যার আলোচনা কুরআনে এসেছে,

وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ ۖ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا.

> তাঁর সিংহাসন সমস্ত আসমান ও জমিনকে পরিবেষ্টিত করে আছে। আর সেগুলোকে ধারণ করা তাঁর পক্ষে কঠিন নয়।[২৬৯]

আকাশমণ্ডলি ও পৃথিবীর জমিন থেকেও বড় সেই আসন। কিন্তু ময়দানে যখন সেই আসন বিছানো হবে, তখন মনে হবে একটি বিরাট ময়দানে একটি ছোটো খোসা ফেলা হয়েছে। তা একেবারে মধ্যখানে বিছানো হবে। তার চারপাশে নবীদের মিম্বর থাকবে। তা হবে নূরের মিম্বর। প্রতিটি মিম্বরের পেছনে উম্মতদের চেয়ার থাকবে। এরপর যারা আমলের দিক থেকে নবীদের বেশী কাছাকাছি, তার চেয়ার হবে মিম্বরের বেশী কাছে; আর যে আমলের দিক থেকে দূরবর্তী বা ত্রুটিপূর্ণ, সে থাকবে তাদের থেকে দূরে। এভাবেই শ্রেণিবিন্যাস করা হবে।

আল্লাহর দরবারে জান্নাতবাসীদের অংশগ্রহণ

যখন এই দরবার অনুষ্ঠিত হবার দিন আসবে, তখন জান্নাতের সকল অধিবাসী সেই দরবারে অংশগ্রহণের জন্যে রওনা করবে। আর তা হবে– লক্ষ্য মাইলের দূরত্ব। তাই জান্নাতিরা বাহনে চড়ে যাবে। সেখানে বাতাসের আসন হবে। সেখানে কোনো মেশিন নেই। জেট বিমানের ঝক্কি থাকবে না যে, তা মেরামতের প্রয়োজন হবে। বরং তা সব চিন্তাশক্তির অনুগত হবে। সেই আসনে বসে আপনি যখন চাইবেন যে, চলা শুরু হোক। তক্ষুণি সেই আসন চলা শুরু করবে। কয়েক লাখ মাইলের দূরত্ব সেখানে নিমিষের মধ্যে অতিক্রম করবে। কেউ থাকবে বোরাকের পিঠে, কেউ থাকবে হাওয়াই আসনে

---

২৬৯. সূরা বাকারা : আয়াত- ২৫৫।

আসীন। মর্যাদার স্তর অনুযায়ী বিভিন্ন বাহন হবে। সবাই সেই ময়দানে এসে বসবে। সেখানে চেয়ারের ব্যবস্থা থাকবে।

সেখানে চেয়ারে বসার জন্যে এমন না যে, সিরিয়াল করার জন্যে ব্যবস্থাপক দাঁড়িয়ে থাকবে, আর বলবে, ভাই, এই চেয়ার তোমার, আর এই আসন তোমার। ওখানে বসা যাবেনা। এমন হবে না সেখানে। প্রত্যেক ব্যক্তি তার অন্তরের দর্শনের মাধ্যমেই নিজের স্থান চিনে নেবে। আর ঠিক সেই চেয়ারে গিয়েই বসবে, যা তার জন্যে নির্ধারিত আছে। এমন হবে না যে, অন্যের চেয়ারে গিয়ে বসে যাবে।

সবাই সেখানে সমবেত হবে এবং ময়দান পূর্ণ হয়ে যাবে। সেখানে যারা একেবারে সাধারণ হবে, যাদের মধ্যে আমলি ত্রুটি বেশী ছিলো, তাদের জন্যে চেয়ারগুলোর পেছনে চবুতরা (বেলকনি) থাকবে, সেখানে মেশক ও আম্বরের গালিচা থাকবে, তারা সেখানে বসা থাকবে।

এবার পরিপূর্ণভাবে দরবার শুরু হবে। হাদীসে যেমনটি বলা হয়েছে, এমন অনুভব হবে, যখন আল্লাহ তাআলার জ্যোতি নেমে আসবে, তখন চেয়ারগুলো এমনভাবে চড় চড় করে উঠবে যেন এই বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। সেখানে শরীরের এত ওজন হবে না, কেননা, আল্লাহ তাআলা শরীর থেকে পবিত্র, তিনি তো শরীরেরও স্রষ্টা এবং আত্মারও স্রষ্টা। এই ভার হবে তাঁর মহত্তের ও বড়ত্বের। যা কেবল আত্মা অনুভব করবে। এটা শারীরিক ও ইন্দ্রীয় ভার হবে না। তখন চেয়ার এমনভাবে চড় চড় করে ওঠবে যেন বহনের শক্তি তার নেই।

এখন যেন তাঁর জ্যোতি নেমে এসেছে। আল্লাহ তাআলা উপস্থিত হয়েছেন আর নবী আ.-গণ চেয়ারের চার পাশে আলোকিত আসনে আসন গ্রহণ করবেন। তাঁদের পেছনে তাঁদের উম্মত। পৃথিবীর শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক মানুষ সবাই উপস্থিত রয়েছে।

আল্লাহর দরবারে পবিত্র শরাবের আয়োজন

হাদীসে এসেছে— আল্লাহ তাআলা ফেরেশতাদের বলবেন, কুরআনে আমি তাদের যেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে, তাদের এক পবিত্র শরাব পান করাবো, তোমরা তাদের সেই শরাব পরিবেশন করাও।

وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا.

তাদের পালনকর্তা তাদেরকে পান করাবেন পবিত্র শরাব।[২৭০]

---

২৭০. সূরা ইনসান : আয়াত- ২১।

ফেরেশতাগণ পরিবেশন শুরু করবেন। যেন রাজদরবারের পক্ষ থেকে আপ্যায়ন করা হচ্ছে। সবাই তা পান করবে। তাতে এক আনন্দ সৃষ্টি হবে। তাকে নেশা বলা যায় না, তবে আত্মিক নেশা তো অবশ্যই। দুনিয়ার যে শরাব আছে, তাতে যে নেশা থাকে, তা বোধশক্তি চলে যায়, মানুষ মাতাল হয়ে যায়, উন্মাদ হয়ে পড়ে।

কিন্তু এই শারাব পান করার ফলে মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধি পাবে এবং আল্লাহর পরিচয় ও আল্লাহকে জানার বিষয়টি আরও অধিক স্পষ্ট হয়ে যাবে। নূর ও বরকত আরও বেড়ে যাবে।

এমনই পবিত্র শরাব বিতরণ করা হবে।

হযরত দাউদ আ.-এর তেলাওয়াত ও মোনাজাত

এরপর হযরত দাউদ আ., যার কণ্ঠস্বরকে অলৌকিক আখ্যা দেয়া হয়েছিলো, এতটা বিশুদ্ধ ও মুগ্ধকর কণ্ঠস্বর ছিলো যে, যখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করে মোনাজাত করতেন তখন সব পশু-পাখি তাঁর আশে পাশে জমায়েত হয়ে মনোযোগী হয়ে শুনতো এবং উন্মাতাল হয়ে যেতো।

আল্লাহ তাআলা হযরত দাউদ আ.-কে বলবেন, হে দাউদ, এই দরবারের প্রার্থীদের সেই মোনাজাত শোনাও, যা তুমি দুনিয়াতে পড়তে এবং সেই যাদুকরী কণ্ঠস্বরে শোনাও।

হযরত দাউদ আ. আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান ভরা সেই মোনাজাত পাঠ করা শুরু করবেন। তাঁর কণ্ঠ তো অলৌকিক ছিলোই। একই সঙ্গে সেই ময়দানে সমবেত আছেন সব আল্লাহওয়ালাগণ। সকল নবীগণ, আল্লাহর সান্নিধ্যধন্য ফেরেশতাকুল সমবেত এবং স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সেখানে উপস্থিত। সুতরাং তাঁর প্রভাবের সীমা পরিসীমা কী হবে, অনুমান করা কঠিন। যখন তিনি মোনাজাত পাঠ করতে থাকবেন, তখন আশ্চর্য ধরনের নিদর্শন পরিলক্ষিত হবে এবং সকল বান্দা তাতে মোহবিষ্ট হয়ে পড়বে।

আল্লাহর সৌন্দর্য দর্শনের প্রার্থনা

এরপর আল্লাহ তাআলা বলবেন,

سَلُوْنِیْ مَا شِئْتُمْ.

যার যা মনে চায়, আমার কাছে প্রার্থনা করো।

বান্দাগণ বলবে, কোন নেয়ামত এমন আছে, যা আপনি আমাদের দান করেন নি? বেহেশতের সকল নেয়ামত তো আমাদের কাছে আছে। আপনি

যেহেতু আমাদের সবকিছু দিয়ে দিয়েছেন, তাহলে আমরা আর কী চাইবো? আমাদের ধ্যান-ধারণার চেয়েও বেশী আমরা পেয়ে গেছি। এখন কী চাইবো, আমাদের কল্পনায়ও তো তা আসছে না।

আল্লাহ তাআলা বলবেন, না, চাও!

যখন কারও বুঝেই আসবে না তখন সবাই মিলে আলেমদের শরণাপন্ন হবে। বলবে, আমাদের তো সবই মিলেছে, সব পেয়ে গেছি আমরা, আপনারা বলুন, আমরা এখন কী চাইবো?

আমি বলি, লোকজন তো দুনিয়াতে আলেমদের থেকে দূরত্ব বজায় রেখে চলতে চায় যে, তাদের ছেড়ে দাও। অথচ তারা সেখানে তাদের পিছু ছাড়বে না। সেখানেও আলেমদের প্রয়োজন হবে। আল্লাহর ইলম ছাড়া দুনিয়াতে যেমন কোনো কাজ চলে না, আখেরাতেও চলবে না।

সবাই আলেমদের কাছে আসবে। জিজ্ঞেস করবে, কী চাইবো আমরা? তখন আলেমগণ বলবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের সব নেয়ামত দিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু একটি জিনিস এখনও বাকি আছে। তা হলো আল্লাহর সৌন্দর্যের দর্শন আল্লাহর দিদার এখনও হয় নি আমাদের। সেটাই চাও।

সুতরাং তখন বান্দারা আরজ করবে— হে আল্লাহ! আপনার মহিমান্বিত সৌন্দর্য আমাদের দেখিয়ে দিন। আপনি সব নেয়ামত দিয়েছেন বটে, কিন্তু এই নেয়ামত এখনও অবশিষ্ট আছে।

আল্লাহ তখন তাঁদের এ আবেদন মঞ্জুর করবেন।

অধিক নেয়ামত

আল্লাহ তাআলা বলবেন, أَنْ كَمَا أَنْتُمْ (প্রতিটি বস্তু আপন আপন স্থানে থেমে থাকো)। এটা যদি না বলে দেন তবে, لَأَحْرَقَ سُبْحَاتُ وَجْهِهِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ (তার চেহারার শুচি-শুদ্ধতা প্রতিটি বস্তুকে জ্বালিয়ে ছাই করে দেবে)। তাই তিনি নিজেই বলে দেবেন, প্রতিটি বস্তু আপন স্থানে থেমে থাকো।

এরপরে তার পর্দা ওঠা শুরু হবে। পর্দা সব উঠে গিয়ে শুধু একটি বড়ত্বের পর্দা অবশিষ্ট থেকে যাবে।

সেসময় মানুষের এ অবস্থা হবে, একে তো তারা পবিত্র শরাবের কারণে আত্মিক নেশায় উন্মাদ হয়ে ছিলো। দাউদ আ.-এর মোনাজাতের বিষয়বস্তুর মাধ্যমে মারেফতের নেশা বৃদ্ধি পেয়েছে। উপরন্তু আল্লাহ তাআলার সৌন্দর্য দেখে এমন মোহগ্রস্ত হবে যে, একে অন্যের খবরই থাকবে না। আর এখন মনে

হবে যেন কোনো নেয়ামতই অদ্যাবধি আমরা পাই নি। আজ আমরা নেয়ামত পেয়েছি। এই নেয়ামতের নাম শরীয়তের পরিভাষায় 'مزيد' বা অধিক।

জিব্রাইল আ. বলেছেন, সেটা হলো 'ময়দানে মাযীদ'। সেখানে ওই নেয়ামত পাওয়া যাবে, যা সমস্ত নেয়ামতের ঊর্ধ্বে। কুরআনে যাকে বলা হয়েছে, وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ. এবং আমার কাছে রয়েছে আরও অধিক।[২৭১]

আমি নিয়মতান্ত্রিক প্রতিদান তো সবাইকে দেবো। আরও অধিক কিছু আছে, তা আমি পরে দেবো। সেটাই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ নেয়ামত।

নেতৃত্ব গ্রহণ করতে অস্বীকার করা

হযরত আনাস রা. বলেন, একবার হুযুর সা. হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ রা.-কে এক অশ্বারোহী দলের নেতা বানিয়ে দিলেন। যখন তিনি ফিরে এলেন, তখন হুযুর সা. তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি এই নেতৃত্ব কেমন অনুভব করলে? তিনি বললেন, লোকজন আমাকে ধরে উঠাতো ও বসাতো। অর্থাৎ আমাকে খুব সম্মান করতো। তাই এখন আমার এমন মনে হচ্ছে যেন সেই আগের মিকদাদ আর নেই। (আমার বিনয়ী স্বভাবের মধ্যে ঘাটতি এসে গেছে)।

হুযুর সা. বললেন— বাস্তবিকই নেতৃত্ব এমন বিষয়ই বটে।

হযরত মিকদাদ রা. বলেন, সেই সত্তার কসম, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, আগামিতে আমি আর কখনো কোনো কাজের দায়িত্বশীল হবো না।

এরপর তিনি এতোটাই বদলে যান যে, তাঁকে মানুষ যখন বলতো, আপনি সামনে এগিয়ে গিয়ে আমাদের নামায পড়ান, তখন তিনি সুস্পষ্টভাবে অস্বীকার করতেন। (কেননা, নামাযে ইমাম হওয়াটাও ছোটো নেতৃত্ব)।

একটি বর্ণনায় আছে, মিকদাদ রা. বলেন, আমাকে বাহনের পিঠে বসানো হতো এবং বাহনের পিঠ থেকে নামানো হতো। তাতে আমার এমন মনে হতে লাগলো যে, এই লোকদের ওপর আমার শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। হুযুর সা. বললেন, নেতৃত্ব তো এমন বিষয়ই বটে। (এখন তোমার যা ইচ্ছা) চাইলে তা আগামির জন্যে গ্রহণ করো বা ত্যাগ করো। হযরত মিকদাদ রা. বলেন, সেই

---

২৭১. সূরা ক্বাফ : আয়াত- ৩৫।

সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দিয়ে পাঠিয়েছেন, ভবিষ্যতে আমি কখনো দুইজন মানুষেরও নেতা হবো না।

হযরত মিকদাদ বিন আসওয়াদ রা. বলেন, রাসূল সা. কোথাও আমাকে একবার আমির বানিয়ে পাঠালেন। সেখান থেকে ফেরার পর তিনি আমাকে বললেন, নিজেকে নিজের কাছে কেমন পেয়েছ? আমি বললাম, ধীরে ধীরে আমার অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, আমার সব সাথীকে আমার সেবক মনে হতে থাকে। আল্লাহর কসম, এরপর আমি কখনো দুইজন মানুষেরও আমির হবো না।

এক ব্যক্তি বর্ণনা করেন, হুযুর আকরাম সা. এক ব্যক্তিকে একটি দলের আমির বানিয়ে দিলেন। সে কাজ শেষে ফিরে এলে হুযুর সা. তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমির হওয়াটা তোমার কাছে কেমন লেগেছে?

সে বললো, দলের কয়েকজন সদস্যের মতো ছিলাম। যখন আমি বাহনে আরোহণ করতাম, তখন সাথীরাও আরোহণ করতো। আবার যখন আমি বাহন থেকে নেমে আসতাম তখন তারাও নেমে আসতো।

হুযুর সা. বললেন, সাধারণভাবে প্রতিটি মুসলমান এমন অত্যাচারী কাজ করে থাকে, যার ফলে সে আল্লাহর অসন্তুষ্টির দ্বার প্রান্তে, পৌঁছে যায়। কিন্তু যেই বাদশাকে আল্লাহ তাআলা স্বীয় নিরাপত্তার অধিনে নিয়ে নেন, সে তা থেকে বেঁচে যায় (বরং সে আল্লাহর আরশের ছায়া পেয়ে থাকে)। সেই ব্যক্তি বললো, আল্লাহর কসম, আমি এখন থেকে না আপনার পক্ষ থেকে না অন্য কারো পক্ষ থেকে আমির হবো। এ কথা শুনে হুযুর সা. এমনভাবে হেসে উঠলেন যে, তাঁর দাঁতগুলো দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

হযরত রাফে রহ. বলেন, আমি এক যুদ্ধে হযরত আবু বকর রা.-এর সঙ্গে ছিলাম। ফেরার পথে তাঁকে আমি বললাম, হে আবু বকর, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, ফরজ নামায যথাসময়ে আদায় করো। আপন সম্পদের যাকাত সন্তুষ্টচিত্তে আদায় করো। রমজানের রোজা রাখো। আল্লাহর বিধান হজ আদায় করো। এবং এই কথার ওপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখো যে, হিজরত ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত ভালো একটি আমল। জিহাদ হলো শ্রেষ্ঠ হিজরত। আর তুমি আমির হয়ো না।

এরপর বললেন, এই নেতৃত্ব যা আজ তোমার কাছে শীতল ও সুস্বাদু মনে হচ্ছে, অতি সত্বর তা ছড়িয়ে এত বিস্তৃতি লাভ করবে যে, অযোগ্য লোকেরাও তা অর্জন করে নেবে। আর এই কথা স্মরণে রেখো যে,

তোমাদের মধ্যে যে নেতা হবে, তার হিসাব সবার থেকে বেশী দীর্ঘ হবে এবং তার ওপর শাস্তি হবে সবচে' কঠোর। আর যে নেতা হবে না, তার হিসাব হবে সবচে' সহজ এবং শাস্তিও হবে সবচে' হালকা। কেননা, মুসলমানদের ওপর জুলুম করার সবচে' বেশী সুযোগ লাভ করে নেতারা। আর যে ব্যক্তি মুসলমানদের ওপর জুলুম করে, সে আল্লাহর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে। কেননা, এই মুসলিমগণ হলো আল্লাহর প্রতিবেশি এবং আল্লাহর বান্দা।

আল্লাহর কসম, তোমাদের মধ্য থেকে কারও প্রতিবেশির বকরি বা উটের ওপর যদি কোনো বিপদ নেমে আসে (অর্থাৎ, সেই বকরি বা উট চুরি হয়ে যায়, কিংবা কেউ তাকে মেরে ফেলে, তবে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার কারণে সেই প্রতিবেশি) ক্ষোভে সারা রাত তার নিতম্ব ফুলিয়ে বলতে থাকে, আমার প্রতিবেশির বকরি বা উটের ওপর অমুক মুসিবত এসেছে। (মানুষ যখন তার প্রতিবেশির কারণে এতটা ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে) তখন আল্লাহ তাআলা স্বীয় প্রতিবেশির জন্যে ক্ষুব্ধ হওয়ার অধিক হকদার।[২৭২]

অপবিত্র অবস্থায় কিতাব পড়া যাবে কী?

প্রশ্ন : হায়েয অবস্থায় দোয়া-কালাম লিখিত এমন কিতাব কি পড়া জায়েয হবে, যার মধ্যে কুরআনের আয়াত বা সূরা লিখিত আছে? যেমন— 'মুমিনের হাতিয়ার' বা 'মুনাজাতে মকবুল' বা 'আল-হিযবুল আজম', 'মনজিল' ইত্যাদি। এই সব কিতাবে আয়াতুল কুরসি, সূরা ফাতেহা, চার কুল প্রভৃতি ধরনের বহু কুরআনের দোয়া বিধৃত থাকে। এগুলো কি নারীরা হায়েয অবস্থায় পড়তে পারবে, নাকি পারবে না?

উত্তর : দোয়ার নিয়তে এই আয়াতসমূহ ও সূরাগুলো হায়েয অবস্থায় পড়া জায়েয। কোনো অসুবিধা নেই। তবে কুরআন তেলাওয়াতের নিয়তে এগুলো পড়া জায়েয হবে না। আর সবার জানা কথা এসব কিতাব অজিফা ও নিত্যপঠিত হিসেবে পড়া হয়। কুরআন তেলাওয়াত মনে করে পড়া হয় না। হ্যাঁ, ছাব্বিশটি সূরা তেলাওয়াত হিসেবে পড়া হয়ে থাকে, তাই সেগুলো হায়েয অবস্থায় পড়া জায়েয নেই।[২৭৩]

প্রশ্ন : দোয়ার ওই সমস্ত কিতাবগুলো অজু ছাড়া কিংবা হায়েয অবস্থায় ধরা জায়েয আছে কি না?

---

২৭২. হায়াতুস সাহাবা।

২৭৩. ইমদাদুল ফতোয়া : খ ১, পৃষ্ঠা ৯৩; আহসানুল ফতোয়া : খ ২, পৃষ্ঠা ৭১।

উত্তর : এই কিতাবগুলো অজুবিহীন ও হায়েয অবস্থায় ধরা জায়েয আছে। অবশ্য কুরআনের আয়াত যেখানে আছে, নির্দিষ্ট সেই জায়গাটিতে হাত দিয়ে স্পর্শ করা জায়েয নেই। এ ছাড়া অন্যান্য অংশে হাত দেওয়া জায়েয।[২৭৪]

নিবেদন্তে মুফতি আদম সাহেব পালনপুরি, ২ শাওয়াল, ১৪৩০ হিজরি

নোট : এই ফতোয়া সঠিক। আমি তা সত্যায়ন করছি।

আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় মুহাম্মাদ ইউনুস পালনপুরি।

নির্বুদ্ধিতাও নেয়ামত

পৃথিবীর বুকে যেসব উপকারী বস্তু বা জীব-জন্তু রয়েছে তুমি যদি সেগুলোর সৃষ্টির উদ্দেশ্যাবলির প্রতি লক্ষ্য করো, দেখবে তাদের জন্যে বোধ ও বুদ্ধির প্রয়োজন ছিলো না, বরং বুদ্ধি তাদের বহির্ভূত বিষয়। কেননা, যদি তাদের মধ্যে বোধ-বুদ্ধি থাকতো, তবে যখনই মানুষ তাদের ওপর আরোহণ করার জন্য পা রাখতো, অথবা বোঝা রাখতো, তখন বুদ্ধিমান পশু বলতো— একটু থামুন। প্রথমে আপনি প্রমাণ করুন, আমার ওপর আরোহণ করার অথবা বোঝা চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার আপনার আছে কি না। তখন আপনি নিজের প্রমাণ পেশ করতেন– সে তার বুদ্ধি অনুযায়ী আপনার সঙ্গে বিতর্ক করতো। তখন আরোহণ করা আর বোঝা বহন করানো সম্ভব হতো না এবং বিতর্কে লিপ্ত হতে হতো। আর যদি কখনো বিতর্কে পশুটি জিতেও যেতো তখন আপনার পশুটির মুখের দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার থাকতো না, বরং সম্ভব হলে সেই আপনার ওপর আরোহণ করতো। নিশ্চয়ই এটা খুব কঠিন বিষয় হতো। প্রতিটি পশুকে কাজে লাগানোর সময় এমনই তর্কযুদ্ধে বাজার সরগরম হয়ে উঠতো। না বলদ ক্ষেত চাষ করতো, না ঘোড়ায় আরোহণ সম্ভব হতো, আর না হালাল প্রাণীর গোশত খাওয়াও সম্ভব হতো। ব্যবসা ইত্যাদি সব কাজ অকেজো হয়ে পড়তো। আর মানুষ এই পশুদের বিতর্ক থেকে কখনই নিস্তার পেতো না। আর এই সব অকল্যাণ ঘটতো কেবল জীব-জন্তুর বোধ-বুদ্ধি থাকার কারণে।

একইভাবে দেখা যেতো আপনার শিক্ষায়তনে যখন ছাত্ররা জ্ঞান অর্জনের জন্যে একত্রিত হতো, তখন একই ক্লাসে ঘোড়া-গাধা, কুকুর-বানর সব একত্রিত হতো। তখন আপনার শিক্ষা অর্জনে বিপদ বিরাজ করতো। মোটকথা ইলম ও আমলের নিকেতনগুলো সব বিশৃঙ্খল পরিবেশ হয়ে

---

২৭৪. ইমদাদুল ফতোয়া : খ ১, পৃষ্ঠা ৯৩।

যেতো। তাই শুকরিয়া আদায় করুন যে, আল্লাহ্ তাদের বোধ-বুদ্ধি দেননি। তাই আপনাদের কাজকর্ম সঠিকভাবে চলছে।

এ থেকে বোঝা যায়, যেমনিভাবে বুদ্ধিমত্তা আল্লাহর নেয়ামত, একইভাবে নির্বুদ্ধিতাও আল্লাহর রহমত। পশু-পাখীদের নির্বুদ্ধিতা থেকে মানুষ উপকৃত হচ্ছে। এমনকি যেই মানুষ নির্বোধ ও বুদ্ধিহীন, সে-ও বুদ্ধিমানদের কথায় চলে। যার কারণে লিডারদের রাজত্ব চলছে। যদি নির্বোধ লোক না থাকতো তাহলে লিডারদের খাবার মিলতো না। যদি নির্বোধ না থাকতো তবে লিডারদের ব্যবসা চলতো না। সুতরাং কোথাও বুদ্ধিমত্তা নেয়ামত, আবার কোথাও বুদ্ধিহীনতা নেয়ামত। এ কারণে জীব-জন্তুর মধ্যে বুদ্ধিমত্তা না থাকা নেয়ামত। যার কারণে তাদের দ্বারা বিভিন্ন ধরনের কাজ বিবাদ ও বিতর্ক ছাড়া করানো যাচ্ছে। নয়তো যদি তাদের মধ্যে বুদ্ধি থাকতো, তবে সেগুলোর মাধ্যমে মানুষের উপকার লাভের পথ বন্ধ হয়ে যেতো।

মোটকথা, জীব-জন্তু সৃষ্টি করার সঙ্গে যেইসব উদ্দেশ্য সম্পর্কিত, তা অর্জনের জন্য বুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা ছিলো না। তাই এগুলোকে তাদের কর্তব্যের কারণেই বোধহীন রাখা হয়েছে যেন তা মানুষের আনুগত্য করার ক্ষেত্রে মুখ ফিরিয়ে না নেয়। আর যেহেতু বোধ ও বুদ্ধি তাদের দেওয়া হয় নি, তাই এগুলোকে সম্বোধন করে কিছু বলারও প্রয়োজন হয় নি। যেহেতু এদের জন্যে কোনো শরয়ী বিধান অবতীর্ণ করা হয় নি যে, যার জন্যে তাদের সম্বোধন করা হবে এবং বিধান পালনের উপযুক্ত জ্ঞান করা হবে। সুতরাং তাদের জন্যে না কোনো আদেশ আছে, না আছে কোনো নিষেধ। কোনো শরয়ী বিধানও নেই। আছে কেবল লাঠি ও ডান্ডা। যদ্দ্বারা তাদের কাজে লাগানো যায়। ফলে দিন-রাত সর্বদা কাজে ব্যস্ত ও মগ্ন থাকে।

ধর্মভীরু স্ত্রী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ নেয়ামত

মানবেতিহাসে মানবতার প্রতি অনুগ্রহশীল হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সা.-এর পবিত্র সত্তাই অদ্বিতীয় সত্তা যিনি স্বীয় শিক্ষা ও বিধানের মাধ্যমে অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও সূক্ষ্ম পরিস্থিতিকে অপদস্থতা ও অবমাননার গভীর গহ্বর থেকে বের করে সম্মান ও গৌরবের সুউচ্চ অবস্থানে পৌঁছে দিয়েছেন এবং মানব সমাজে নারীকে ইজ্জত ও শ্রদ্ধার সেই স্তরে উন্নীত করেছেন, যা স্বভাবজাত ও মানবতার সঙ্গত দাবি ছিলো। ইসলামের পূর্বে নারীদের ইতিহাস ছিলো কেবল নির্যাতিত ও শোষিত হওয়ার ইতিহাস। নারীকে সকল জাতি ও গোষ্ঠীতে হীন ও অসহায় সৃষ্টি বলে মনে করা হতো। তাদের কোনো স্বতন্ত্র

অবস্থান ছিলো না এবং কেউ তাদের জীবিত থাকার অধিকার দিতেও প্রস্তুত ছিলো না। দীন-ইসলাম তাদের জন্যে রহমতের বারিধারা হয়ে এসেছে এবং ইসলাম নারীকে নিপীড়ন ও শোষনের বিরুদ্ধে এতো জোরালোভাবে প্রতিবাদের আওয়াজ উচ্চকিত করেছে যে, সারা পৃথিবী কেঁপে উঠেছে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً.

'হে মানবসমাজ, তোমরা তোমাদের পালনকর্তাকে ভয় কর, যিনি তোমাদের এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার সঙ্গীনীকে সৃষ্টি করেছেন; আর বিস্তার করেছেন তাদের দু'জন থেকে অগণিত পুরুষ ও নারী।'[২৭৫]

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে,

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا.

'নারীদের সাথে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর। অতঃপর যদি তাদেরকে অপছন্দ কর, তবে হয়ত তোমরা এমন এক জিনিসকে অপছন্দ করছ, যাতে আল্লাহ অনেক কল্যাণ রেখেছেন।'[২৭৬]

ইসলাম তাকে নিরাপত্তার সুশীতল ছায়ায় স্থান দিয়েছে। নারীদের সম্ভ্রমের মূল্যকে যথার্থতা দিয়েছে। অপকর্ম, নির্লজ্জতা ও বেইজ্জতির যত উৎসমুখ ছিলো, একটি একটি করে সব বন্ধ করে দিয়েছে। এভাবে মানবীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির উন্নতি ও মজবুতির জন্যে এমন একটি স্থায়ী, দৃঢ় ও নিখাদ ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে, যা ছাড়া একটি সঠিক-সমাজ ব্যবস্থার অস্তিত্ব অসম্ভব। এরপর তাকে মীরাস ও সম্পত্তিতে অংশীদার করা হলো। তাকে সমাজে সম্মান ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো, বরং একে ঈমানের পূর্ণতা আখ্যা দিলো। কুরআনে নারীকে পুরুষের এবং পুরুষকে নারীর পোশাক বলে আখ্যায়িত করলো।

---

২৭৫. সূরা নিসা : আয়াত- ১।

২৭৬. সূরা নিসা : আয়াত- ১৯।

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ.

'তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ।'[২৭৭]

এর অর্থ হলো, মানুষ যেভাবে পোশাক পরে শীত-গ্রীষ্মের কষ্টকর প্রভাব থেকে নিরাপদে থাকে এবং এর মাধ্যমে যেমন সাজ-সজ্জা গ্রহণ করে, সেভাবে নারী-পুরুষ বৈধপন্থায় বৈবাহিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করে সর্বপ্রকারের নষ্টামি ও নির্লজ্জতা থেকে নিরাপদ থাকে। পুরুষের জন্যে নারী জীবনের বন্ধুও বটে এবং মন ও মস্তিষ্কের জন্যে আরাম ও শান্তিরও মাধ্যম। নারীর অস্তিত্ব ছাড়া পুরুষের জীবন অনর্থক ও নিরানন্দ হয়ে পড়ে। নারীই পুরুষের ধূসর জীবনে খুশির হিল্লোল ছড়িয়ে দেয় এবং তার জীবন কাননকে বিভিন্ন ও বিচিত্র রকমের সুন্দর ও বাহারি ফুলের সমারোহে ভরিয়ে তোলে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً.

'আর আল্লাহর অন্যতম নিদর্শন হলো, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সঙ্গিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন।'[২৭৮]

অন্যান্য সমাজে স্বামীর কাছ থেকে নারী নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার (খলার) অধিকার ছিলো না। ইসলাম এসে নারীকে স্বামীর কাছ থেকে ছাড়িয়ে নেবার অধিকার দিয়েছে। অমুসলিম সমাজে স্বামীর মৃত্যুর পরে নারী বিধবা হতো। তখন সে বিয়ে করতে পারতো না এবং সারাটি জীবন শোক ও দুঃখ-কষ্টের অবস্থায় কাটিয়ে দিতে হতো। সাধারণভাবে নারীর জন্যে দ্বিতীয়বার বিয়ের সম্বন্ধে জড়ানোকে অত্যন্ত দোষনীয় মনে করা হতো। কিন্তু ইসলাম এই সকল ভ্রান্ত চিন্তা ও ধারণাকে শক্তভাবে দমন করেছে এবং ঘোষণা করেছে, জীবন ও মৃত্যুর মালিক আল্লাহ তাআলা। তিনি যাকে চান, মৃত্যু দেন এবং যাকে চান জীবিত রাখেন। স্বামীর মৃত্যুর কারণে নারীকে চিরজীবনের জন্যে আনন্দ ও খুশি থেকে বঞ্চিত রাখা যাবে না। বরং সেও নির্ধারিত দিন ইদ্দত পালন করার পরে বৈবাহিক বন্ধনে

---

২৭৭. সূরা বাকারা : আয়াত- ১৮৭।

২৭৮. সূরা রূম : আয়াত- ২১।

আবদ্ধ হতে পারবে এবং কোনো পুরুষের জীবন বাগিচার সৌরভ ছাড়ানো মুকুল হতে পারবে।

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন,

وَأَنكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنكُمْ.

'তোমাদের মধ্যে যারা বিবাহহীন, তাদের বিবাহ সম্পাদন করে দাও।'[২৭৯]

ইসলাম তাকে শিক্ষা, সংস্কৃতি ও উপার্জনের অধিকার দান করেছে। ইসলাম এসে নারী-পুরুষের ব্যবধান নির্মূল করেছে এবং সম্মানের মাপকাঠি আল্লাহভীতি ও পরহেজগারির ওপর নির্ভরশীল বলে আখ্যা দিয়েছে। ইসলাম অন্যান্য ধর্মের মতো সম্মানিত ও নিকৃষ্ট হওয়ার মাপকাঠি জাত বলে আখ্যা দেয় নি, বরং এখানে মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও বড়ত্বের মাপকাঠি হলো আমলের যথার্থতা, চিন্তার শুদ্ধতা, আল্লাহভীতি, ভালো ব্যবহার, ঐকান্তিকতা ও সুন্দর চরিত্র। যে কোনো মানুষ, চাই সে পুরুষ হোক বা নারী, যত বেশী সে আল্লাহভীরু ও আল্লাহর পরিচয় লাভে সমর্থ হবে, আল্লাহর বিধানাবলি পালন করার প্রতি সচেষ্ট থাকবে এবং সুন্নত মোতাবেক জীবন যাপন করবে, সে আল্লাহর কাছে তত বেশী সম্মানিত, মর্যাদাশীল ও মহিমান্বিত হিসেবে গণ্য হবে।

সুতরাং ইসলাম এই মৌলিক নীতিমালাকে এভাবে ব্যাখ্যা করেছে,

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ.

নিশ্চয় আল্লাহর কাছে সে-ই সর্বাধিক সম্ভ্রান্ত যে সর্বাধিক পরহেযগার।[২৮০]

পরিষ্কার বোঝা যায়, ইসলাম নারীদের সাম্য দিয়ে বলেছে, নারী আল্লাহ তাআলার সন্তুষ্টি, মর্জি ও নৈকট্য কেবল তার সেই সকল শর্ত পালন করেই অর্জন করতে পারে, যা পুরুষের জন্যেও নির্ধারিত। পুরুষ যদি ভালো আমলের মাধ্যমে জান্নাত পায়, তবে নারীও তার ভালোকাজের বদলায় জান্নাতের অধিকারী হবে।

ইসলাম জীবনের বিনির্মাণ ও উন্নয়নের যেই চিত্র উপস্থাপন করেছে, চাই তার সম্পর্ক আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগির সাথে হোক কিংবা পারস্পরিক লেনদেন ও আচার-আচরণের সঙ্গে হোক; বংশীয় ধারা ও ব্যবস্থাপনার সঙ্গে

---

২৭৯. সূরা নূর : আয়াত- ৩২।

২৮০. সূরা হুজরাত : আয়াত- ১৩।

হোক কিংবা সামাজিক শিষ্টাচার ও মূল্যায়নের সঙ্গে হোক, জীবনের প্রতিটি শাখায় নারীর পদ ও অবস্থান নির্ধারিত রয়েছে এবং তার উল্লেখও করেছে কল্যাণ ও প্রশংসার সাথে। নারীকে ইসলাম সামাজ ও সোসাইটির জন্যে লজ্জা ও বিব্রতকর বলে গণ্য করে নি, বরং সমাজের অপরিহার্য অংশ বলে স্বীকৃতি দিয়েছে।

ইসলাম নারীকে অভিশাপ ও নিন্দিত না করে তাকে রহমত ও শান্তির স্থান বলে গণ্য করেছে। মানবতার বন্ধু হুযুর সা. নারীদের সম্পর্কে অন্তরে ঘৃণা ও মন্দভাব রাখার মন্দত্ব এবং ভালোবাসা, সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহানুভূতির প্রেরণা সৃষ্টি করার উৎসাহ অসংখ্য হাদীসে স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। নিচে কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করা গেলো।

হুযুর সা. ইরশাদ করেছেন, পৃথিবীর সবকিছুর মধ্য হতে আমার কাছে সবচে' প্রিয় নারী ও সুগন্ধি আর আমার চোখের শীতলতা হলো নামায।[২৮১]

তোমাদের মধ্যে সবচে' পরিপূর্ণ মুমিন সে ব্যক্তি, যার চরিত্র ভালো এবং যে তার স্ত্রীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে।[২৮২]

তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই ব্যক্তি, যে তার স্ত্রীর কাছে সর্বোত্তম প্রতীয়মাণ হয়েছে। আর আমি নিজে পরিবার ও সন্তানাদির কাছে তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম।[২৮৩]

নেককার ও ধার্মিক স্ত্রী দুনিয়ার সবচে' বড় নেয়ামত। দুনিয়ার নেয়ামতের মধ্যে কোনো জিনিসই নেককার স্ত্রী থেকে উত্তম নয়।[২৮৪]

দুনিয়ার নেয়ামতের মধ্যে সবচে' উত্তম নেয়ামত হলো নেককার স্ত্রী।[২৮৫]

---

২৮১. নাসায়ী।
২৮২. তিরমিযি।
২৮৩. মেশকাত।
২৮৪. ইবনে মাজাহ।
২৮৫. নাসায়ী।

প্রকৃত সৌন্দর্য

সৌন্দর্য একদা আল্লাহর কাছে প্রশ্ন করলো—
জগতে কেনো তুমি আমাকে অক্ষয় করে দিলে না?
উত্তর এলো, কেননা জগত হলো একটা কল্পনা-রাজ্য
শেষ হয়ে যাওয়া দীর্ঘ রজনীর গল্পই মাত্র এই দুনিয়া
রঙ বদলের মাধ্যমে যখন তা দৃশ্যমান হলো
তখন থেকে এটাই হলো সৌন্দর্য, বিনাশ যার নিয়তি
হয়তো কাছেই ছিলো, তাই এই আলাপ শুনে ফেললো চন্দ্র
আকাশে রটে গেলো এ কথা; শুনলো শেষরাতের তারা (শুকতারা)
শেষরাত তারার থেকে শুনে শুনিয়ে দিলো ভোরের শিশিরকে
আকাশের কথা জানিয়ে দিলো মাটির অন্তরঙ্গ বন্ধুকে
এরপর শিশিরের বার্তা শুনে ফুলের চোখে অশ্রু এলো
মুকুলের ছোট্ট হৃদয় দুঃখে ভেঙ্গে চূর্ণ হলো
বাগান থেকে বসন্ত গেলো কাঁদতে কাঁদতে
যৌবন এসেছিলো প্রমোদ ভ্রমণে, সে বিষণ্ন হলো

* * *

হযরত কাতাদা রা.-এর দার্শনিক মন্তব্য হলো, জীবনের সামগ্রী এতটুকু থাকাই ভালো, যতটুকু হলে অবাধ্যতা ও বেপরোয়া ভাব না আসে।

অন্তরের মরিচা দূর করার নববী উপায়

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর রা. থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল সা. বলেছেন, বনি আদমের অন্তরে এমনভাবে মরিচা পড়ে, যেমনভাবে পানি লাগার কারণে লোহায় মরিচা পড়ে। বলা হলো, হে আল্লাহর রাসূল সা.! অন্তরের মরিচা দূর করার মাধ্যম কী? হুযুর সা. বললেন, মৃত্যুকে বেশী বেশী স্মরণ করা এবং কুরআন মাজিদ পাঠ করা।[২৮৬]

অন্যের সন্তানকে খারাপ বলাও পাপ

ইসমাঈল সাহেব যদিও আলেম ছিলেন না, কিন্তু অত্যন্ত ধর্মভীরু, তাহাজ্জুদগুজার ছিলেন এবং নিয়মিত জামাআতে প্রথম তাকবিরের সঙ্গে নামায আদায়ে সচেষ্ট ছিলেন। তার সর্বমোট ছয়জন সন্তান ছিলো। ইন্তেকালের পূর্বে তিনি যে পরিমাণ কষ্টকর অস্থিরতা ও যন্ত্রণার মধ্যে ছিলেন,

---

২৮৬. বায়হাকি : শুয়াবুল ঈমান।

তা ছিলো তার সন্তানদের জন্যে প্রচণ্ড দুশ্চিন্তা। তার তিনজন সন্তানের বিয়ে হয়েছিলো। বাকি ছেলেরা ছিলো এখনও অবিবাহিত। এদের মধ্যে ছোট দুই ছেলে তার জন্যে দুর্নামের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তারা অযোগ্য ও দুষ্টপ্রকৃতির হয়ে গিয়েছিলো। পুরো মহল্লা ও এলাকার লোকজন তাদের কারণে অতিষ্ঠ হয়ে গিয়েছিলো। এদের কারণে অন্য ছেলেরাও দুর্নামের ভাগীদার হয়ে গিয়েছিলো।

বাবা ইসমাঈল মৃত্যু পর্যন্ত কেঁদে কেঁদে বলতে থাকেন— হে আল্লাহ, আমার মনে পড়ছে না, আমি জীবনে এমন কী পাপ করেছি, যার কারণে আমাকে আজ এমন দুর্দিন দেখতে হচ্ছে। তার সমবয়সীরাও বলছিলো যে, তিনি ছেলেবেলা থেকেই সজ্জন ও ভালো মানুষ ছিলেন। সবসময় হারাম-হালাল বাছবিচার করে চলতেন। কখনো মাদক, ব্যভিচার ও জুয়াবাজির ধারেকাছেও যান নি। একদিকে এমনই ছিলো তার ইতিবাচক অবস্থা, আর অন্যদিকে তার সন্তানদের নেতিবাচক পরিস্থিতি। সমস্যার সমাধান হচ্ছিলো না– কিছু মানুষ তার ব্যাপারে গভীর পর্যবেক্ষণ করলেন। এ ক্ষেত্রে সমকালীন এক বুযুর্গ সাহায্যার্থে এগিয়ে এলেন এবং বিষয়টি অল্প সময়ে বোঝা গেলো। তার বুযুর্গ সঙ্গীর বক্তব্য ছিলো— যৌবনকালে মসজিদে যাওয়ার সময় যখন দুষ্ট ছেলেরা তার সামনে পড়তো, তখন তিনি ধিক্কার দিতেন যে, তোমরা কোন বদমাশ বাবার সন্তান? তোমাদের বাবা কি হারাম রোজগার করে আর সেগুলো তোমাদের খাওয়ায়, যার কারণে তোমাদের এই দূরবস্থা হয়েছে?

স্বজনদের কারও কোনো নেতিবাচক, অপছন্দনীয় ও অবিশ্বাসযোগ্য কথা যদি কানে আসতো, তবে তিনি সবার সামনে মন্তব্য করতেন যে, ইতরদের সন্তান ইতরই হয়ে থাকে। এই ছেলেদের বাবাও যুবক থাকতে এমন কোনো কাজ করে থাকবে। এ জন্যেই তার ছেলেদের এই অবস্থা হয়েছে।

মোটা কথা, কাউকে ধিক্কার দেয়া এবং কারও পাপের কারণে তাকে লজ্জা দেয়ার ক্ষেত্রে তার জুড়ি মেলা ভার ছিলো। এই কথা শুনে আল্লাহর রাসূল সা.-এর হাদীস মনে এসে গেলো— কোনো ব্যক্তি কাউকে যদি তার পাপের কারণে লজ্জা দেয়, তবে মৃত্যুর পূর্বে নিজেই সেই পাপে জড়িয়ে পড়বে। নবী করিম সা. বলেছেন, কারও বিপদে খুশি না হলে আল্লাহ তাআলা তার দোষ গোপন রাখবেন।

আমাদের এই কথাটি বেশ ভালো করে বুঝে নেওয়া উচিত যে, সন্তানদের এই মন্দ পরিণতি যুবক বয়সে তার মন্দভাষণ ও অন্যদের ধিক্কার

দেয়ার ফল হতে পারে। তার সেই বুযুর্গ বন্ধু এটাও বলেন— নিজের সন্তানদের ক্ষেত্রে তিনি অত্যন্ত কঠোর আচরণ করতেন। তাদের কোনো অযাচিত কাজ তিনি কিছুতেই সহ্য করতেন না। ধমকাতেন, মারতেন এবং কখনো ক্ষুদ্ধ হয়ে তাদের ইবলিস, শয়তান, অভিশপ্ত ও মরদুদ (ধর্মত্যাগী) ইত্যাদিও বলতেন। হতে পারে, তা তক্ষুণি আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হয়ে গেছে। এ জন্যেই হয়তোবা আল্লাহ তাআলা তার সন্তানদের শয়তানের বৈশিষ্ট্যধারী বানিয়ে দিয়েছেন। কেননা, সন্তানদের ব্যাপারে মা-বাবার দোয়া যেভাবে দ্রুত কবুল হয়, একইভাবে বাবা-মার বদ দোয়াও সন্তানদের বেলায় দ্রুত কার্যকর হয়ে দেখা দেয়। তাই কখনো মনের ভুলেও, রাগে ও উত্তেজিত হয়ে নিজের সন্তানদের ধমকানোর ক্ষেত্রে খারাপ নামে ডাকা উচিত নয়। এমনও হতে পারে সেটাই কবুল হওয়ার সময় এবং তার প্রভাব প্রকাশ পেয়ে যাবে।

তিনি যদি তার সন্তানদের ক্ষেত্রে দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নির্দেশিত নীতিমালা পালন ও দোয়া-প্রার্থনার মাধ্যমে নিজের সন্তানদের প্রতিপালন করতেন এবং অন্য কারও সন্তানকে খারাপ না বলতেন, সম্ভবত তাহলে এমন দুর্দিন তাকে দেখতে হতো না। আল্লাহর কাছে আমাদের প্রার্থনা করা উচিত, হে আল্লাহ, আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান দান করুন, যারা আমাদের জন্যে চোখের শীতলতা বয়ে আনবে এবং আমাদের আল্লাহভীরুদের নেতা বানান।

হুযুর সা.-এর মজলিসের একটি ঘটনা

একবার হুযুর সা., হযরত আবু বকর রা., হযরত ওমর ফারুক রা. ও হযরত ওসমান গনি রা. একসঙ্গে হযরত আলী রা.-এর ঘরে গেলেন। সেখানে একটি পবিত্র মজলিসের সূচনা হলো, যেই মজলিসে হুযুর সা. ও খোলাফায়ে রাশেদীনের চারজনই উপস্থিত আছেন। হযরত আলী রা. ও তাঁর স্ত্রী হযরত ফাতেমা রা. এই সম্মানিত অতিথিদের অপ্যায়নের জন্য তাঁদের সামনে সম্মানার্থে একটি চাকচিক্যময় পাত্রে মধু উপস্থাপন করলেন। ঘটনাক্রমে মধুর পাত্রে একটা চুল পড়লো। হুযুর সা.-এর হাতে যখন পাত্রটি এলো, তখন তিনি উপস্থিত সাহাবীদের সামনে পাত্রটি রেখে বললেন, দেখো, কী চমৎকার একটি পাত্র আর এর মধ্যে মিষ্টি মধু রয়েছে। তবে এর মধ্যে একটি চুল পড়ে আছে। প্রত্যেকেই নিজের বুদ্ধি-বিবেক খাটিয়ে নিজের রুচি অনুযায়ী এই পাত্র ও চুল সম্পর্কে মতামত দাও।

১. হযরত আবু বকর রা. বললেন, আল্লাহর রাসূল আমার কাছে মনে হচ্ছে মুমিনের অন্তর এই পাত্র থেকেও বেশী আলোকিত ও উজ্জ্বল এবং তার হৃদয়ে যে ঈমান আছে, তা মধুর চেয়েও বেশী মিষ্টি। কিন্তু ঈমানকে মৃত্যু পর্যন্ত সুরক্ষিত রেখে বহন করতে পারা চুলের চেয়ে বেশী সূক্ষ্ম।

২. হযরত ওমর রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার কাছে দেশ শাসনকে এই পাত্রের চেয়ে বেশী আলোকময় মনে হয়। রাজত্ব পরিচালনা করা এই মধুর চেয়ে বেশী মিষ্টি। কিন্তু রাজত্ব পরিচালনাকালে ন্যায় ও সুচিার করা চুলের চেয়ে বেশী সূক্ষ্মকাজ।

৩. হযরত ওসমান রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মতে দীনের জ্ঞান এই পাত্র থেকে বেশী দীপ্তিময়, উজ্জ্বল। দীনের জ্ঞান অর্জন করা মধুর চেয়েও বেশী মিষ্ট। কিন্ত তদানুযায়ী আমল করা চুলের চেয়েও বেশী সূক্ষ্ম।

৪. হযরত আলী রা. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মতে সম্মানিত অতিথি এই পাত্রের থেকে বেশী আলোকময় ও উজ্জ্বল। তাঁকে আপ্যায়ন করা মধুর চেয়েও বেশী মিষ্ট। আর তাঁকে সন্তুষ্ট করা চুলের চেয়ে বেশী সূক্ষ্ম।

৫. হযরত ফাতেমা রা. বললেন, আমার কাছে নারীর জন্যে লজ্জা এই পাত্রের চেয়ে বেশী দীপ্তিবান ও আলোময়। তার চেহারায় পর্দার আবরণ এই মধুর চেয়েও বেশী মিষ্টি এবং ভিন পুরুষের ওপর দৃষ্টি না পড়া আর ভিন পুরুষের দৃষ্টিও তার ওপর না পড়া এটা চুলের চেয়েও বেশী সূক্ষ্ম।

৬. হুযুর সা. বললেন, আমার কাছে আল্লাহর পরিচয় লাভ এই পাত্র থেকে বেশী আলোকময় উজ্জ্বল। এরপর আল্লাহর মারেফাত সম্পর্কে অবগত হওয়া এবং আল্লাহর মারেফাত অর্জন হওয়া এই মধুর থেকেও বেশী মিষ্ট। আর আল্লাহর মারেফাত অর্জন হওয়ার পরে তদানুযায়ী আমল করা চুলের চেয়েও বেশী সূক্ষ্ম।

৭. হযরত জিবরাঈল আ. বললেন, হে আল্লাহর রাসূল সা., আমার মতে আল্লাহর পথ পাত্র থেকে বেশী আলোকজ্জ্বল।

আল্লাহর পথে নিজের জান-মাল খরচ করা অর্থাৎ জিহাদ করা মধুর থেকেও বেশী মিষ্ট। আর তার ওপর অবিচল থাকা, অর্থাৎ মৃত্যু পর্যন্ত আল্লাহর পথে চলতে থাকা চুলের চেয়েও বেশী সূক্ষ্মতর।

৮. আল্লাহ তাআলা বলেন, বেহেশত এই পাত্র থেকে অনেক বেশী চাকচিক্যময়। বেহেশতের নেয়ামতসমূহ এই মধুর চেয়েও বেশী মিষ্ট। কিন্তু বেহেশতে পৌঁছার জন্যে পুলসিরাত অতিক্রম করা এই চুলের চেয়েও বেশী সূক্ষ্ম।

স্বভাব ধর্ম ও আমাদের জীবন

সারা বিশ্বে এখন মুসলিম উম্মাহের সংখ্যা বিপুল পরিমাণে মজুদ আছে। বলা হয় যে, মুসলমানরা দুনিয়ার সমগ্র জনবসতি ছয় ভাগের একভাগ জুড়ে আছে। এমনিভাবে মুসলিমগণ অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার অনুসারীদের তুলনায় সুবিশাল জাতি হিসেবে গণ্য হচ্ছে। প্রতি নিয়তই এই সংখ্যা বেড়ে চলছে। কেবল আমেরিকাতেই রয়েছে প্রায় এক কোটি মুসলমান। তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একইভাবে ইউরোপের সকল দেশে এবং প্রাচ্যের ভূভাগেও ইসলাম গ্রহণকারীদের সংখ্যা অত্যন্ত দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, জাতিগত কৃষ্টি-কালচারের ছায়ায় যারা যাপিত জীবন পার করেছে এবং স্বচ্ছলতা ও বিলাসিতার সম্পূর্ণটাই উপভোগ করেছে, তারা সবকিছু পাওয়া সত্ত্বেও শান্তি নামের দুর্লভ বস্তু থেকে বঞ্চিত। এই অভাব দূর করার জন্যে তারা তাদের সকল ফর্মুলা পরীক্ষা করে দেখেছে, কিন্তু সেই শান্তি তারা পায় নি, যা ব্যতীত জীবনের কোনো স্বাদ বা কোনো মূল্য বাকি থাকতে পারে।

অবশেষে তাদের ইসলাম অধ্যয়ন করা এবং ইসলাম প্রণীত জীবন বিধান গভীর দৃষ্টিতে দেখার সুযোগ হয়েছে। ফলে তারা সেই হারানো সম্পদ পেয়ে গেছে। যার কারণে তাদের জীবনের গতিধারা বদলে গেছে। জগত স্রষ্টার প্রতি তাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস অর্জিত হয়েছে। তাঁর দেয়া জীবনের নীতিমালা তারা যাচাই করে দেখেছে। এই দেখতে যেয়েই সহসা তাদের ভেতরে এক বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

এটাই ইসলাম স্বভাবধর্ম হওয়ার নিদর্শন এবং মানসিকতার সঙ্গে পুরোপুরি সঙ্গতিপূর্ণ হওয়ার প্রমাণ।

আল্লাহ তাআলা এর বাস্তবতা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ.

> তুমি একনিষ্ঠভাবে নিজেকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখ। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যার ওপর তিনি মানব সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নেই। এটাই সরল ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।[২৮৭]

অতএব, যাদের কাছে এই মর্ম উন্মোচিত হয়েছে, তারা একে গ্রহণ করতে এবং এই ধর্মকে নিজের জীবনের দিশারী বানাতে একমত হয়েছে। পৃথিবীর বড় থেকে বড় সম্পদ তাদের দৃষ্টিতে মূল্যহীন হয়ে পড়েছে। তারা এই প্রাপ্তির কারণে কেবল যে সীমাহীন আনন্দিত ও পরিতৃপ্ত, তা-ই নয়, বরং এটাকে আল্লাহ তাআলার বিশেষ অনুগ্রহ ও উপহার ভেবে গর্বিতও বটে এবং এটাকে তাদের জীবনের মূলধন মনে করে।

এক নওমুসলিম ইসলাম গ্রহণের পরে সীমাহীন আনন্দ প্রকাশ করলে মুসলিম পথপ্রদর্শক তাকে অভিনন্দন জানালো। তখন নওমুসলিম বললো, এই অভিনন্দন কিসের জন্যে? আমি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে সেই স্বভাব ধর্মকে পেয়েছি, যার ওপর আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানকে সৃষ্টি করেছেন। সেই স্বভাব ধর্ম হলো ইসলাম। সুতরাং আমি যেন আজ আমাকে আবিষ্কার করেছি। এতদিন আমি পথহারা হয়ে ঘুরছিলাম এবং নিজের সত্তা সম্পর্কেই অজ্ঞাত ছিলাম।

এই চিত্রের অপর দিকটি হলো, আমরা মুসলিমরা নিজস্ব স্বভাব-প্রকৃতির বিপরীত পথে জীবনের গাড়ি চালিয়ে যাচ্ছি। এ কারণেই আমাদের পদে পদে কঠিন অবস্থার মুখে পড়তে হচ্ছে, আমাদের নিঃশেষ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা এ জন্যেই প্রবল গতিতে চলছে এবং এর ফলেই আমরা সফলতা থেকে দূরে সরে পড়ছি।

রাসূল সা. সমগ্র জগতের জন্যে রহমত হয়ে এসেছেন। সেই অভাবিত রহমতের দৃষ্টান্ত তাঁর পবিত্র সীরাতে বিদ্যমান থাকার পরেও আমরা তা থেকে

---

২৮৭. সূরা রূম : আয়াত- ৩০।

মুখ ফিরিয়ে আছি এবং আমরা পৃথিবীর নানান কৃষ্টি-কালচারের নির্দয় বন্দিত্বে নিজেরাই নিজেদের বন্দি করে নিতে কোনো সংকোচবোধ করছি না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সবখানে আমরা এই ভাব ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি যে, এখন ইসলামী ন্যায় ও সাম্যের নীতি এবং বিশ্বভ্রাতৃত্বের চিত্র একটি স্বপ্ন হয়ে গেছে এবং বস্তুবাদী জীবন বিধানে তার কোনো জায়গা নেই।

নারীদের সেখানে এক দীর্ঘ দাসত্ব ও নির্মম জীবন থেকে মুক্তি দিয়ে সম্মান ও মর্যাদার সুউচ্চ আসন দান করেছে এবং ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা বিনির্মাণে তাদের কৃতিত্ব ও অবদান পার্থিব ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচনা করা হয়েছে। আজ আমরা আমাদের সিরাতে মুসতাকিম থেকে সরে গিয়ে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মতো নিদাগ বস্তুপূজারির পতাকাবাহী বনে গেছি। ইহুদি-খ্রিস্টানদের কর্মপ্ল্যান কার্যকর করতে কোনো লজ্জাই অনুভব করছি না।

এটা এমন এক কঠিন বিপদ যে, আমরা তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা গাম্ভীর্যতার সাথে তখনই করতে পারবো যখন আমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামী সভ্যতা-ভব্যতার প্রতি নিবিষ্ট হতে পারবো। এই সভ্যতাই জীবন্ত ও চিরন্তন এবং সর্বযুগে ও সর্বক্ষেত্রে তার নেতৃত্ব মানুষের মহত্তকে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে পথের মশাল হয়ে কাজ করে। রহমাতুল্লিল আলামিনের উম্মত আজ দুটি পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে। তারা নিজের কর্মকাণ্ডকে রহমতের দর্পণের সামনে উপস্থিত করতে পারছেনা।

একফোঁটা অশ্রুর মর্যাদা

রাসূল সা. থেকে বর্ণিত, তিনি ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তির চোখ আল্লাহর ভয়ে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে, আল্লাহ তাআলা তার দেহকে দোজখের জন্যে হারাম করে দেবেন। এরপর যদি সে অশ্রু তার কপোলে গড়িয়ে পড়ে, তবে তার চেহারায় কখনো কষ্ট পৌঁছবে না এবং তাকে কখনো লাঞ্ছিত হতে হবে না।

আর যদি কোনো বান্দা জামাআতের মধ্যে কান্নাকাটি করে, তবে আল্লাহ তাআলা সেই বান্দার কান্নার কারণে তাকে দোজখ থেকে মুক্তি দেবেন। প্রতিটি আমলের ওজন ও সওয়াব আছে। কিন্তু চোখের পানির কোনো হিসাব নেই। এই চোখের পানি দোজখের অগ্নিপর্বতকেও নিভিয়ে ফেলে।

হাশরের ময়দানের আশ্চর্য ঘটনা

হাদীসে বর্ণিত আছে, হাশরের ময়দানে এক ব্যক্তির আমলের নিক্তির উভয় পাল্লাই সমান সমান হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তুমি জান্নাত-জাহান্নাম কোনোটাতেই যাবে না। এমন সময় একজন ফেরেশতা একটি

কাগজ নিয়ে আসবে এবং কাজগটি নিক্তির একটি পাল্লায় রাখবে। কাগজটিতে লেখা থাকবে 'উফ'। এই কাগজখণ্ডটির কারণে পুণ্যের পাল্লার বিপরীতে গুনাহের পাল্লা ভারী হয়ে যাবে।

কেননা, এটা মাতা-পিতার অবাধ্যতার এমন এক শব্দ যা দুনিয়ার পাহাড় থেকেও বেশী ভারী। তখন তাকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার আদেশ দেয়া হবে।

হাদীসে বর্ণিত আছে, সেই ব্যক্তি দাবি জানাবে যে, তাকে যেন আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। আল্লাহ তাআলা বলবেন, তাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসো। আল্লাহ তাআলা তাকে জিজ্ঞেস করবেন, হে অবাধ্য বান্দা, কোন কারণে তুমি আমার কাছে ফিরে আসার দাবী জানাচ্ছিলে? সে বলবে, হে মাবুদ, আপনি দেখেছেন যে, আমি দোজখের দিকে যাচ্ছি এবং আমার পলানোর কোনো জায়গা নেই। আমি আমার মা-বাবার অবাধ্য ছিলাম। অথচ তারাও আমার মতো জাহান্নামে যাচ্ছে। আপনি তার পরিবর্তে আমার শাস্তি বাড়িয়ে দিন এবং তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করুন।

বর্ণিত আছে, আল্লাহ তাআলা হেসে ফেলবেন এবং বলবেন, তুমি দুনিয়াতে তাদের অবাধ্যতা করেছো, আর এখন আখেরাতে এসে তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করেছো। যাও তোমার বাবার হাত ধরো এবং দুজনেই বেহেশতে চলে যাও।[২৮৮]

আল্লাহর রহমতে বিশ্বাসী যুবক

হযরত আবু গালিব রহ. বলেন, আমি হযরত আবু উমামা রা.-এর সাথে সিরিয়ায় আসা-যাওয়া করতাম। একদিন আমি আবু উমামা রা.-এর প্রতিবেশি যুবকের কাছে গেলাম, যে অসুখে ভুগছিলো। তার কাছে তার চাচাও উপস্থিত ছিলেন। তিনি যুবকটিকে বলছিলেন, হে আল্লাহর দুশমন, আমি তোমাকে এই কাজ করতে বলি নি? আমি তোমাকে ওই কাজ করতে বারণ করি নি? সেই যুবক ছেলেটি বললো— চাচাজান, যদি আল্লাহ তাআলা আমাকে আমার মায়ের কাছে অর্পণ করে দেন, তাহলে তিনি আমার সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন? চাচা বললেন, সে তোমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেবে। ছেলেটি বললো, আল্লাহ তাআলা আমার মায়ের চেয়ে বেশী স্নেহপরায়ণ, মায়ের চেয়ে বেশী অনুগ্রহশীল আমার ওপর। শুধু এই কথাটুকু বলতে পারলো। এরপরই তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলো।

---

২৮৮. জান্নাত কে হাসীন মানাযির।

তার চাচা কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করলেন। তার জানাযার নামায পড়লেন। যখন তাকে কবরে নামাতে চাইলেন, তখন আমি তার চাচার সাথে কবরে নামলাম। কবরের ভেতরটা ঠিকঠাক করতে গেলে তার মুখ থেকে চিৎকার বেরিয়ে এলো এবং তিনি বেশ ঘাবড়ে গেলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার আবার কী হলো? সে বললো, তার কবর অনেক প্রশস্ত হয়ে গেছে এবং আলোয় ভরে গেছে। এ কারণেই আমি ভয়ে তটস্থ হয়ে পড়েছি।[২৮৯]

চির আবাদ দেশ চির অমর রাজা

অতীতকালে এক বাদশা একটি মহল বানালেন এবং অত্যন্ত সুন্দর করে মহলটি নির্মাণ করলেন। তার সাজসজ্জা ও সৌন্দর্যের পিছনে বহু সম্পদ ব্যয় করলেন। এরপর তিনি খাবারের আয়োজন করে লোকজনকে নিমন্ত্রণ করলেন। কিছু মানুষকে তিনি দরজায় বসিয়ে দিলেন, যেই বের হবে তাকে যেন জিজ্ঞেস করে, মহলে কোনো ত্রুটি নেই তো? যথারীতি সবাই জবাব দিলো— না, কোনো ত্রুটি নেই।

শেষের দিকে কম্বল পরিহিত এক লোক এলো। তার কাছেও প্রশ্ন করা হলো, তুমি এই মহলে কোনো ত্রুটি কি দেখতে পেয়েছো? সে বললো, দুটি ত্রুটি আছে। প্রহরীরা তাকে আটকালো এবং বাদশাকে খবর দিলো। বাদশা বললেন, আমি একটি ত্রুটিও মানতে রাজি না। তাকে হাজির করো। প্রহরীরা সেই কম্বল পরিহিত লোককে বাদশার সামনে উপস্থিত করলো। বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, কী সেই ত্রুটি? সে বললো, এই মহল ধ্বংস হয়ে যাবে একদিন এবং এর মালিকও মরে যাবে।

বাদশা জিজ্ঞেস করলেন, এমন কোনো মহল কি আছে, যা কখনো ধ্বংস হবে না এবং তার মালিকও মরবে না। সে বললো, আছে। তিনি জান্নাত ও তার মধ্যকার নেয়ামতের কথা বর্ণনা করলো এবং সেখানে যাবার প্রতি উৎসাহ জোগালো। দোজখের শাস্তির ভয় দেখালো সে। আল্লাহ তাআলার ইবাদতের প্রেরণা জাগালো।

বাদশা ওই দাওয়াত গ্রহণ করলেন। নিজের রাজত্ব ছেড়ে চলে গেলেন এবং আল্লাহর দরবারে তাওবা করলেন। আল্লাহ তার প্রতি রহম করুন।

---

২৮৯. জান্নাত কে হাসীন মানাযির।

অন্তরঙ্গতা থাকলেও অনুমতি নেওয়া আবশ্যক

হযরত জাবের রা. বলেন, হুযুর সা. ও তাঁর কয়েকজন সাহাবি এক মহিলার বাড়িতে গেলেন। সে একটি বকরি জবাই করলো এবং খাবার প্রস্তুত করলো। হুযুর সা. সেখান থেকে এক লোকমা মুখে নিলেন। কিন্তু তা গলা থেকে নামছিলো না। হুযুর সা. বললেন, এই বকরি তার মালিকের অনুমতি ব্যতীত জবাই করা হয়েছে। সেই মহিলা জবাব দিলো, আমরা মুআজ রা.-এর (তার প্রতিবেশি) পরিবার থেকে সাধারণত কোনো কিছু নিতে সংকোচ করি না। আমরা তাদের জিনিস নিয়ে নিই, তারাও একইভাবে আমাদের জিনিস নিয়ে থাকে।[২৯০]

এই ঘটনার মধ্যে এই বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় যে, বকরিটি না চুরি করা হয়েছিলো, আর না ছিনিয়ে আনা হয়েছিলো। বরং পারস্পরিক সম্পর্ক, প্রচলন ও রীতিনীতির কারণে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন মনে করা হয় নি। তাই নির্বিঘ্নে জবাই করে ফেলা হয়েছে। এরপরও তার মধ্যে এতটা অশোভন ও অকল্যাণ তৈরি হয়েছে।

ইলমের গুরুত্ব

ইবনে জাওযী রহ. বলেন, সবচে' বড় যেই দরজাটি দিয়ে ইবলিস মানুষের কাছে আসে, তা হলো মূর্খতার দরজা। ইবলিস মূর্খদের কাছে নির্বিবাদে ঢুকে পড়ে। আর আলেমের কাছে ইবলিস চুরি করে ঢোকা ছাড়া অন্য কোনোভাবে ঢুকতে পারে না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস রা. বলেন, হুযুর সা. একবার হযরত সা'দ রা.-এর কাছে এমন অবস্থায় গেলেন, যখন তিনি অজু করছিলেন। হুযুর সা. বললেন, হে সা'দ, এ কোন ধরনের অপচয় হচ্ছে? সা'দ রা. বললেন, অজুর মধ্যে পানির অপচয়ও বিচারযোগ্য? হুযুর সা. বললেন, তুমি যদি প্রবাহমান নদীতেও অজু করো (তবুও বেশী পানি খরচ করলে অপচয় হবে)। হুযুর সা. বললেন, অজুর মধ্যে প্রবঞ্চনা দেওয়ার জন্যে এক শয়তান নিযুক্ত আছে। তার নাম 'ওয়ালহান'। তুমি তার থেকে বেঁচে থেকো। সে অজুর মধ্যে মানুষের সঙ্গে হাসি-ঠাট্টা করে।

---

২৯০. মুসনাদে আহমাদ।

শেষ মোঘল বাদশা বাহাদুর শাহ জাফরের
একটি মজলুম কবিতা

আমি কারও চোখের আলো নই, কারও হৃদয়ের অভিব্যক্তি নই
কারও কাজে আসে না এমন একমুঠি ধূলি আমি।
আমার রঙ-রূপ বিকৃত হয়ে গেছে, আমার বন্ধু আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে
যেই বাগান হেমন্তেই ফসল ছেড়ে বিরান হয়েছে, আমি তার বসন্ত ঋতু।
আমি তো কারও প্রেমিক নই, আমি কারও বন্ধুও নই
বিগড়ে যাওয়া দুর্ভাগ্য আমি, ধ্বসে পড়া প্রাচীর আমি।
কেনো ফাতেহা পড়তে আসবে কেউ, কেনো ফুল দিতে আসবে কেউ
কেনো প্রদীপ জ্বালাতে আসবে কেউ, আমি তো এক নিঃসঙ্গজনের মাজার মাত্র।
আমি কোনো প্রাণময়ী সঙ্গীত নই, আমাকে শুনে কে কী করবে
আমি বড় বিরহের শব্দ, আমি বড় দুঃখীর আর্তনাদ।

রহমতের মেঘ জমেছে, করুণার বৃষ্টি ছেয়ে গেছে
যখন রোজ হাশরে 'সল্লি আলা' বাণী পড়া হবে, অমনি
রহমতের মেঘের ঘণ্টা বাজবে এবং করুণার বারিধারা নামবে।
যখন সময় হবে সঙ্কটাপন্ন এবং নিজেই নিজের কাছে অপরিচিত হয়ে যাবে
তখন কাজে যদি কিছু আসে, তবে তা কেবল নবী তোমার নাম।
যখন পাপাচারের ছিলো খোঁজখবর এবং পক্ষপাতিত্বের ছিলো বিশ্ব
অসহায়ের খবর নেওয়ার জন্যে তখন আল্লাহর প্রিয় নবী সা. এসেছেন।
এটা ছিলো শুভ নাম এবং এ ছিলো সত্যের উদ্ভাস
তার নামের বাতাসে দম নিতেই পাপীষ্ঠ আল্লাহর অলীদের সঙ্গ পেয়েছে।
ফেরেশতাদের আলোচনার বিষয়, দুনিয়াত্যগীদের ঈর্ষার বিষয়
এমন মহিমা নিয়ে জান্নাতে নবীর প্রেমিক এসেছে।
তর্কের ঝঞ্ঝাট কেনো সহজ হয়ে যাবে না
তোমার নাম যে ঠোঁটে আর মাথায় ছিলো তোমার ছায়া।
হেকমতের শিক্ষা ছেড়ে দিয়েছি, সম্মানের তালাশ বাদ দিয়েছি
দুনিয়া থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছি, সব হারিয়ে তোমায় পেয়েছি।
বুঝেছিলাম সীমাতিরিক্ত নিজের শিকারী
দেখেছি। তোমার করুণা তার চেয়েও বেশী পেয়েছি।

জীবন আল্লাহর স্মরণেই কাটানো উচিত

কারাগারে যাবার কয়েক মাস পূর্বে হযরত মুজাদ্দিদ রহ. আপন সাথীবর্গের সঙ্গে প্রায়ই বলতেন, আমার ওপর আরেকটি মুসিবত নেমে আসবে; যা আমার জন্যে 'মাকামাত' ও 'বিলায়াত'-এর পথে উন্নতির কারণ হয়ে আসবে। এই মুসিবত ছাড়া এ ধরনের উন্নতি অর্জন সম্ভব নয়।

হযরত মুজাদ্দিদ রহ. বন্দি জীবনেও কখনো বাদশার জন্যে বদদোয়া করেন নি। বরং তিনি বলতেন, বাদশা যদি আমাকে জেলে না পাঠাতো, তবে এই অজস্র মানুষ দীনি কল্যাণ কিভাবে পেতো! তা ছাড়া আমাদের মর্যাদার উন্নতি ছিলো এই মুসিবত নেমে আসার ওপর নির্ভরশীল, সুতরাং এটা না হলে কিভাবে এই উন্নতি লাভ হতো! তার সাথীরা চাইতো যে, তিনি যেন বদদোয়া করে বাদশার ক্ষতির ব্যবস্থা করেন। তিনি তাদের বারণ করতে থাকতেন। যেহেতু তিনি যথাসম্ভব নবীদের সুন্নত ছাড়তেন না, তাই আল্লাহর নির্ধারিত নিয়তির দাবি ছিলো যে, কারাবন্দির মাধ্যমে হযরত ইউসুফ আ.-এর সুন্নতও তাকেও আদায় করিয়ে দেওয়া হোক।

তিনি জেলখানা থেকে তার ছেলে খাজা মাসুমকে লিখলেন, পরীক্ষা যদিও তিক্ত ও বিস্বাদ হয়ে থাকে, কিন্তু আল্লাহর তাওফিক হলে এটা অনেক সৌভাগ্য। এখন তুমি যদি অবসর পাও তাহলে আল্লাহর শোকর আদায় করে নিজের কাজে ব্যস্ত থাকো। এক মুহূর্তও যেন নষ্ট না হয়। তিনটি বিষয়, প্রথমত: কুরআন তেলাওয়াত, দ্বিতীয়ত: দীর্ঘ কেরাতের সাথে নামায আদায় করা এবং তৃতীয়ত: লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর জিকির করা। এর মধ্য থেকে কোনো একটি আমল সর্বদা চালু রাখবে। কালেমার 'লা'-এর মাধ্যমে নফসের প্রভুদের নাকচ করো, নিজের ইচ্ছা ও বাসনাকে নিশ্চিহ্ন করো। নিজের স্বার্থের আকাঙ্ক্ষা, এটাই হলো নিজের রবের দাবি। বুকের মধ্যে নিজের কোনো বাসনা ও চিন্তা-চেতনার মধ্যেও যেন নিজের কোনো কামনা অবশিষ্ট না থাকে। বান্দার মহিমা তখনই প্রকাশ পায়।

নিজের কামনা-বাসনা প্রার্থনা করার মাধ্যমে নিজের রবের ইচ্ছাকে প্রত্যাখ্যান করা হয় এবং এটা প্রকারান্তরে নিজের রবের ইচ্ছার সাথে মোকাবেলা। যেন নিজের মনিবের আদেশকে প্রত্যাখ্যান করে নিজেকে মনিব আখ্যা দেওয়া হচ্ছে। এর জঘণ্যতা ভালো করে মগজে গেঁথে নিয়ে নফসানি প্রভুর প্রভুত্বের দাবিকে প্রত্যাখ্যান করবে। এই পরীক্ষা ও মুসিবতের সময়ে আশা এইটুকুই যে, আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহে এই বিষয়টি পরিপূর্ণভাবে সহজলভ্য হয়ে যাবে। মুসিবতের সময় ছাড়া অন্যান্য

সময় নিজের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা এবং কামনা ও বাসনা ইসকান্দারিয়া প্রাচীরের মতো উঁচু হয়ে থাকে। আল্লাহ তোমাকে ভালো রাখুন, আর দেখা হোক বা না হোক, আমার উপদেশ হলো, নিজের চাহিদা ও কামনা যেন অবশিষ্ট না থাকে। যা কিছুই হবে, সব যেন আল্লাহর সন্তুষ্টি এবং তাঁর মর্জি মোতাবেক হয়। এমনকি আমার মুক্তির বাসনা, যা বর্তমানে তোমাদের অনেক বড় একটা লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, এটাও যেন নিজেদের উদ্দেশ্য ও একান্ত কাম্য না হয়। আল্লাহ তাআলার নির্ধারণকৃত নিয়তির ওপর এবং তার ইচ্ছা ও মর্জি পূর্ণ সন্তুষ্টিচিত্তে মেনে নাও।

হাবেলি, কূপ, বাগান ও কিতাবাদির চিন্তা অত্যন্ত তুচ্ছ বিষয়। যদি আমি মরে যেতাম, তবুও এসব চলেই যেতো। এখন জীবিত অবস্থায় চলে যাচ্ছে তো দুশ্চিন্তার কিছুই নেই। আল্লাহর ওলীগণ এসব জিনিস নিজেরাই পরিত্যাগ করে থাকেন। এখন আল্লাহর শোকর আদায় করো যে, আল্লাহ তাআলা নিজের ইচ্ছা থেকে এসব জিনিসকে পৃথক করে দিয়েছেন। অল্প কয়েকদিনের জীবন। যেখানে বসে আছো, সেটাকে নিজের ঠিকানা ভাবো। জীবন যেখানেই কাটুক আল্লাহর স্মরণে অতিবাহিত হওয়া উচিত। দুনিয়ার বিষয়-আশয় সহজ, আখেরাতের দিকে মনোনিবেশ করো। নিজের আম্মাকে সান্ত্বনা দিতে থাকো। যদি আল্লাহ তাআলা চান, তবে আমাদের দেখা হবে, নয়তো আল্লাহর হুকুমের ওপর সন্তুষ্ট থাকো। আর দোয়া করো, আল্লাহ তাআলা যেন জান্নাতে আমাদের একসঙ্গে রাখেন এবং দুনিয়ার এই দেখা না হওয়ার ক্ষতিপূরণ দান করেন।

প্রেমাস্পদের দানে যতো সুখ

মুজাহিদ আলফে সানী রহ.-এর দ্বিতীয় চিঠিটি ছিলো শায়েখ বদরুদ্দীন রহ.-এর নামে প্রেরীত। সেখানে তিনি লেখেন- 'তোমার চিঠিতে বিভিন্ন মানুষের অত্যাচার ও সীমালংঘণের অভিযোগ লেখা ছিলো। আসলে অন্যদের এই জুলুম ও নিপীড়ন ওলীদের জীবনে (জামালি) আলোর বিচ্ছুরণের মতো। এগুলো তাদের জন্যে মরীচার ওপর সিরিশ কাগজের প্রতিকার। কাজেই এগুলোর কারণে অন্তরে সংকোচ কেনো বোধ করছো, কেনো বিষন্ন হচ্ছো? আমি যখন (গোয়ালিয়র)-এর কেল্লাটিতে (বন্দি হয়ে) পৌঁছি তখন মনে হতো, মেঘমালার আকৃতিতে আমার কাছে এসে পৌঁছুচ্ছে। আর সেই নূরানী মেঘমালা আমাকে গহ্বর থেকে চূড়ার দিকে টেনে তুলছে।

এতোদিন জামালি (তথা আল্লাহর কোমল দীক্ষা) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বছরের পর বছর (আধ্যাত্মিকতার পথ) পাড়ি দিয়েছি। এখন জালালি

(আল্লাহর কঠিন ও বন্ধুর) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বাকি পথ পাড়ি দিচ্ছি। কাজেই ধৈর্য ও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি অবলম্বন করো। জামালি ও জালালি উভয় দীক্ষাকে সম্পূরক মনে করো।

তিনি আরো লেখেন, 'যদিও ইতোপূর্বে ফেতনার মুখোমুখি হওয়ার অভিরুচি ছিলো না। ফেতনায় প্রবেশ করার ইচ্ছেও ছিলো না। অথচ বাস্তবতা হলো, আধ্যাত্মিক উন্নতি ও প্রবৃদ্ধির জন্যে ফেতনার সঙ্গে লড়াই করা আবশ্যক। কারণ, মাওলার দান যতোটা মধুর তারচেয়ে অধিক মধুর হলো তার ব্যথা। কথা বলছো? সত্তাকেন্দ্রিক ভালোবাসা থেকে এতো দূরে সরে গেছো কেনো? মূল কথায় ফিরে আসছি। অতীতের মানসিকতা থেকে সরে এসে এখন জামালি দীক্ষার তুলনায় জালালি দীক্ষাকে শ্রেষ্ঠতর মনে করবে, পুরস্কারের তুলনায় কষ্টকে অধিক উপকারী জ্ঞান করবে। কারণ হলো, জামাল ও পুরস্কার হলো এমন দান– যে দানের সঙ্গে প্রেমাস্পদের চাওয়ার সঙ্গে নিজের চাওয়াও সমান সম্পৃক্ত থাকে। এর বিপরীতে জালাল ও ব্যথার মাঝে শুধু প্রেমাস্পদের চাওয়াটাই দৃষ্টির সম্মুখে থাকে। উপেক্ষা করতে হয় নিজের চাওয়া ও কামনাকে।

প্রেমাস্পদের প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গিই দৃষ্টিনন্দন

মুজাদ্দিদে আলফে সানী রহ. আরেকটি চিঠি লিখেছেন মীর লোকমান সাহেবের নামে। সেখানে তিনি লেখেন, 'আমার কারামুক্তির ব্যাপারে শুভাকাঙ্ক্ষীদের উদ্যোগ ও পদক্ষেপগুলো সফলতার মুখ দেখছে না।

আরবীতে একটি প্রবাদ আছে–

اَلْخَيْرُ فِيْمَا صَنَعَ اللهُ تَعَالٰى

আল্লাহর প্রতিটি সিদ্ধান্তই বান্দার জন্যে কল্যাণকর।

যদিও মানবিক চাহিদার কারণে সামান্য হলেও কষ্ট পেয়েছি। তবে সেই কষ্ট ও দুশ্চিন্তা খুব দ্রুতই আল্লাহর দয়া ও করুণাবশতঃ আনন্দ ও প্রফুল্লতার রূপ ধারণ করেছে। বিশেষতঃ যখন এ বিশ্বাস অন্তরের মাঝে বদ্ধমূল হয়েছে যে, যারা আমাদেরকে কষ্ট দেওয়ার জন্যে আদাজল খেয়ে লেগেছে তারা মূলতঃ আমার জন্যে আল্লাহর নির্ধারিত পদক্ষেপকেই বাস্তবায়ন করে যাচ্ছে। কাজেই এ নিয়ে বিষন্ন হওয়া ও মনের ভেতর কষ্ট বোধ করার কোনো অর্থ হয় না। উপরন্তু এটি প্রেমের ভুবনে সমীচিনও নয়। কারণ, প্রেমিকের চোখে প্রেমাস্পদের প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গি মনোহর হতে হয়।

প্রেমাস্পদের কাছ থেকে পুরস্কার পেলে প্রেমিক যেভাবে খুশি হয়, তদ্রুপ তার কাছ থেকে কষ্ট পেলে সেই কষ্টের ওপরও প্রেমিক খুশি হয়, বরং কষ্ট পেলে সে অধিক কষ্ট হয়। কারণ ওই কষ্ট তার ব্যক্তিচাহিদার সম্পৃক্ততার অনেক ঊর্ধ্বে।

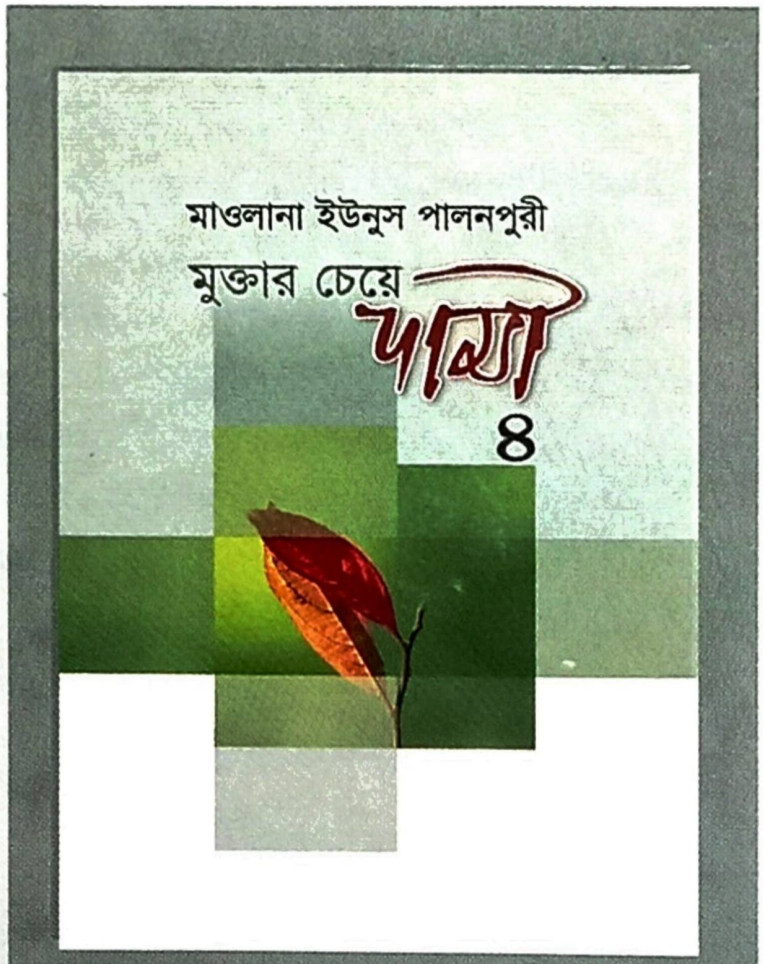
আল্লাহ তাআলার সত্তার আদ্যোপান্তে শুধু সুন্দর আর সুন্দর। যাকে বলে নিরঙ্কুশ সুন্দর। কাজেই প্রতিটি ব্যথা ও পেরেশানির ওপর আমি সবসময় খুশি। কারণ, আমি মনে করি সেই ব্যথা আল্লাহরই দান। বরং ব্যথা পেলে আমি অধিক খুশি হই। কাজেই যাদের কারণে আমি আল্লাহর এই কষ্টের দান পাচ্ছি তাদের বিরুদ্ধে আমার কোনো অভিযোগ-অনুযোগ নেই। এমনকি আমি তাদের কোনো অকল্যাণও কামনা করি না। কারণ, তাদের নিজস্ব কোনো পরিচয় বা অস্তিত্ব নেই। তারা তো আমার প্রেমাস্পদ আল্লাহর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের দর্পণ মাত্র। আমি আরেকটু এগিয়ে বলবো, এ মুহূর্তে সমস্ত মানুষের মধ্য হতে ওই কষ্টদায়করাই আমার কাছে বেশী প্রিয়। কাজেই বন্ধু-বান্ধবদের জানিয়ে দেবে– তারা যেন এ নিয়ে বিষন্ন না হয়। মন খারাপ না করে। আমার শত্রুদের বিরুদ্ধে কোনো ধরণের পদক্ষেপ না নেয়। তারা যেন তাদের প্রতিটি কার্যক্রম উপভোগ করে। পাশাপাশি যেহেতু আল্লাহ সর্বাবস্থায় দোয়ার আমল চালিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন, এজন্যে বলবো, সবসময় আল্লাহর কাছে অক্ষমতা ও বিনম্রতার সঙ্গে বিপদ দূরভিত হওয়ার দোয়া অব্যাহত রাখবে। এ দোয়া কিন্তু মনের আকাঙ্ক্ষা নয়; এটি হলো আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন। কারণ, মনের চাওয়া সেটাই যা প্রেমাস্পদ চান।

মনে রাখবে, আল্লাহর ক্রোধ শুধু তাঁর শত্রুদের জন্যেই বরাদ্দ। যারা আল্লাহর আশেক তাদের ওপর তিনি রাগ করেন না; রাগের ভণিতা ধরেন মাত্র। এই রাগের ভণিতা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর রহমতের দর্পণ। এর মাঝে এতো প্রচুর উপকার রয়েছে যে, তার বিশদ বিবরণ এ মুহূর্তে লেখা সম্ভব নয়। কাজেই তাঁর রাগের এই ভণিতার মাঝে মূলতঃ আল্লাহর অস্বীকারকারীদের জন্যে সমূহ অকল্যাণ লুকায়িত রয়েছে। তাদের জন্যে সেখানে অপেক্ষা করছে চরম পরীক্ষা ও সমূহ বিপদ।

নবুওয়তের রাজদরবারে মিনতি

নবুওয়তের রহমত-বারিধারা কখনও ভোলা যায় না,
কত শত দান অবদান বর্ষিত হয়েছে তা ব্যক্ত করা সম্ভব নয়!
এক নযর দর্শন লাভের উত্তাপ যে কী পরিমাণ তা প্রকাশের ভাষা নেই,
বিরহ সইতে পারার শক্তিও নেই,
দরবারে হাযির হওয়ার উপযুক্ত যে আমি নই,
আবার দূরে সরে যাওয়ার সাহসও আমার নেই!
ব্যথিত হৃদয়ের উপশম চাই, বিরহ সইবার শক্তিও চাই
মদীনার এই রোগী এত অসুস্থ যে, কষ্ট দূর করার ক্ষমতাও তার নেই!
হে আল্লাহ! আমি তো নগণ্য গোলাম, তুমি আমার খালেক,
আমিই বা কী, আমার সেজদারই বা কী মূল্য আছে!
তোমার দরবারে মাথা ঝুঁকানো ফরজ বলে কেবল সেজদা করি,
নয়তো মাথা ঝুঁকানোর মতো কতটুকু পাপহীন নিষ্কলুষ আমি?!
নবীর দরবারে পৌঁছে দীর্ঘক্ষণ কেবল এই-ই ভেবেছি আমি,
কোন মুখে আমি সামনে যাবো, মুখ দেখানোর মতো সম্বল যে নেই আমার!
গুনাহগারদের তালিকায় নাম লেখা আমার, কিছু অশ্রুও আছে নবীর স্মরণে,
এমতাবস্থায় রোজ হাশরে কী ফয়সালা হবে আমার, বলতে পারি না!
সবাইতো তোমার করুণা ও মহানুভবতার ভিখারী দুই জাহানে,
প্রিয় নবীর উম্মত ভাবার যোগ্যতাও যে নেই আমার!
দেখে আমার শুকিয়ে যাওয়া শক্ত চোখ, কাফেলার লোকেরা বলতে লাগলো;
ছেড়ে দাও একে নবীর শহরে, এখন ফিরে যাওয়ার মতো অবস্থা নেই তার!
এক পলক তাকাও এদিকে হে হৃদয়ের রাজধিরাজ, দেখো আমার ভগ্নহৃদয়,
অবনত শিরে এসেছি তোমার দরবারে, শির উঁচু করছি না কভু, হে আল্লাহ!

আলহামদুলিল্লাহ!
॥ ৭ম ও ৮ম খণ্ড সমাপ্ত ॥



আকিক পাবলিকেশন্স

শুনি অসীমের আহ্বান

১১/১ ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
ফোন : ৯৫৮৯৮৫২, ০১৭২৪৬০৪১৩৬
E-mail : akikpublication@gmail.com